কালপেঁচার রচনাসংগ্রহ

বিনয় ঘোষ

পাঠভবন
১২।১ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

শ্রীমতী বীণা ঘোষ

প্রকাশক : শ্রীমতী বীণা ঘোষ
পাঠভবন। কলিকাতা-১২

পাঠভবন সংস্করণ : ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫
১৪ জুন ১৯৬৮

প্রচ্ছদ

রচনাসংগ্রহ : প্যানোরামা
কালপেঁচার নক্‌শা : শ্রীমতী গীতা দাশ
কালপেঁচার দু'কলম প্যানোরামা
কালপেঁচার বৈঠকে : প্যানোরামা
রেখাঙ্কন : শ্রীমতী গীতা দাস

ষোল টাকা

অনেকদিন পরে 'কালপেঁচা' নামে লেখা রচনাগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করা সম্ভব হল। কালপেঁচার নক্‌শা, কালপেঁচার দু'কলম ও কালপেঁচার বৈঠক—এই তিনখানি বইয়ের রচনাবলী এই সংগ্রহে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই তিনখানির পৃথক নতুন সংস্করণও এই সঙ্গে প্রকাশিত হল। 'পাঠভবন' কর্তৃপক্ষ এই বইগুলি নতুন রূপে প্রকাশে উৎসাহী হয়েছেন, সেজন্য তাঁদের কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ।

৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫। ১৪ জুন ১৯৬৮ — বিনয় ঘোষ

কলিকাতা-৩২

কালপেঁচার নকশা

সেই কলকাতা!

এই সেই কলকাতা!

সেই ভারতবর্ষ, যার মতন 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি', যে-দেশ 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী' আর 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা', যে-দেশের মতন 'ভায়ে মায়ের এত স্নেহ' কোথাও গেলে পাবে না-কো, যে-দেশের হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মেশে, যেখানকার লোকজন 'পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে, পাখীর ডাকে জাগে'—সেই ভারতের অন্যতম মহানগর এই সেই 'ক ল কা তা' !!

সুদূর পল্লীগ্রামের নিশ্চিন্ত কোলে বসে আপনারা এই কলকাতার স্বপ্ন দেখেছেন, এই কলকাতার রোমাঞ্চকর রূপকথা শুনে ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর মনে মনে আশৈশব ভেবেছেন যে গয়া, কাশী, বৃন্দাবনের মতন সর্বতীর্থসার এই কলকাতা একবার অন্তত জীবনে স্বচক্ষে দেখে দেহত্যাগ করতে পারলে আপনাদের কোন আশাই অপূর্ণ থাকবে না। আপনারা হেঁটেই আসুন আর উড়েই আসুন, ট্রেনেই আসুন আর স্টীমারেই আসুন, একবার যখন এসেছেন এই কলকাতায় তখন চোখ মেলে দেখে নিন। সবার আগে কলকাতার একজন নগণ্য নাগরিক 'কালপেঁচা'র আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। তারপর লঙ্গরখানায় খান আর হোটেলেই খান, স্টেশনেই থাকুন আর বাস্তুহারার শিবিরেই থাকুন, যদি সময় পান (নিশ্চয়ই পাবেন, কারণ তা ছাড়া আর কোন কাজ থাকবে না) তাহলে ঘুরেফিরে হরেক রকমের জিনিস দেখুন। দুপুরের পিচগলা পথে পায়ে হেঁটে দেখলে পয়সা লাগবে না। যদি পয়সা লাগে তাহলে পথের শেষ সম্বল ঘটিবাটি বিক্রি করে, অথবা অঙ্গের অবশিষ্ট ভূষণ নাকছাবি আর কানপাশাটা বন্ধক দিয়ে, একবার জীবনের শেষ দেখা প্রাণভরে দেখে নিন। কলকাতার

আসল বায়স্কোপ দেখুন। নকল বায়স্কোপ ছবিতে না দেখে, জ্যান্ত বায়স্কোপ দেখুন।

প্রথমে দেখুন লাটসাহেবের বাড়ি। তারপর মনুমেণ্ট দেখুন, গড়ের মাঠ দেখুন, যাদুঘর দেখুন, বাসে-ট্রামে নানারকমের লোক দেখুন, রঙবাহারে সব দোকান বাজার দেখুন, দেখতে দেখতে চ'লে যান কালীঘাট পর্যন্ত। কালীঘাটের কালী দেখুন, কলিকালের গঙ্গা দেখুন, তারপর চিড়িয়াখানায় বিচিত্র সব জন্তুজানোয়ার দেখুন। জিরাফ দেখুন, উট দেখুন, হাতী দেখুন, গণ্ডার দেখুন, বাঘ দেখুন, ভাল্লুক দেখুন, উল্লুক দেখুন, বাঁদর দেখুন, শিম্পাঞ্জী দেখুন, গোরিলা দেখুন, বনমানুষ আর বনবিড়াল দেখুন। এরই নাম চিড়িয়াখানা, দ্বিতীয় নাম কলকাতা। অর্থাৎ যার ডাকনাম 'ক্যাবলা' তার ভাল নাম যেমন 'পরমেশ্বর', তেমনি যার ডাকনাম 'চিড়িয়াখানা' তারই ভাল নাম 'কলকাতা'।

এইভাবে কলকাতা দেখাচ্ছি বলে কালপেঁচার ওপর রাগ করবেন না যেন। কালপেঁচার কোন অপরাধ নেই এতে, কালপেঁচা তার পূর্বপুরুষ হুতোমপেঁচার পদাঙ্ক অনুসরণ করছে মাত্র। হুতোমপেঁচা তার নক্‌শার ভূমিকাতে বলেছিলেন ঃ

"নক্‌সাখানিকে আমি একদিন আরসি ব'লে পেশ করলেও করতে পারতাম, কারণ পূর্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙে ফেলেন না, বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির ক'রে থাকেন, কিন্তু···ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসি ধরতে আর সাহস হয় না, সুতরাং বুড়ো বয়সে সং সেজে রঙ করতে হলো—পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবি মাফ করবেন।"

প্রায় একশ বছর আগেকার হুতোমের এই কথাগুলো আজ কালপেঁচারও বলতে কোন দ্বিধা নেই। হুতোমের কাল কেটে গেছে কবে, সে-সব লোকজনও মরে হেজে গেছে, কিন্তু জলজ্যান্ত বেঁচে আছে তাদের বংশলোচনরা। কলকাতার বাইরের চেহারাটা অনেক বদলেছে, ইট-পাথরের কদর্যতা আরও অনেক ঠেলাঠেলি করে মাথা তুলেছে, জনতা আর ব্যস্ততা বেড়েছে, তার সঙ্গে জোয়ার এসেছে লোভের আর হিংসার।

কলকাতার বাড়ি গাড়ি গরু ঘোড়া মানুষ বদলেছে, কিন্তু কলকাতার কালচার বদলায় নি। হয়তো হুতোমের কালের কলকাতার মতন পানের দোকানে আজ আর বেল-লণ্ঠন বা দেয়ালগিরি জ্বলে না, ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ভুরভুর করে বেরিয়ে শহর মাতিয়ে তোলে না, রাস্তার ধারের বাড়িতে খেমটা নাচের তালিম হয় না, ঝুমুর খেউড় আখ্ড়াই বুলবুলির গান হয় না। অনেক কিছুই হয় না, কিন্তু তবু আজও যা হয় তাও যদি হুতোম বেঁচে থেকে দেখতেন, তাহলে একে কলকাতা শহর বলে চিনতে তাঁর এক মুহূর্তও দেরী হত না। কাকগুলো ‘কা-কা’ করে বাসা থেকে যেমন উড়লো, অমনি দোকানীরা দোকানের ঝাঁপতাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে, হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক খাবার বদলে হয় একটা বিড়ি ধরালো না হয় খৈনি টিপলো। মাছের ভারিদের সঙ্গে লরী দৌড়চ্ছে, মেছুনীরা ছুটছে, বস্তিবাটির বেগুন, কাটোয়ার ডাঁটা, লাউ কুমড়ো শাক লরী বোঝাই আসছে। পূজারী বামুনরা কাপড় বগলে করে গঙ্গাস্নান করতে চলেছে, বুড়ো বেতোরা মর্ণিংওয়াকে বেরিয়েছেন, উড়ে বেহারাদের বদলে রিক্শওয়ালারা দাঁতন করছে, ইংলিশম্যান হরকরা ফিনিক্সের বদলে যুগান্তর অমৃতবাজার স্টেটস্ম্যান বসুমতী বাড়ির দরজায় পৌছচ্ছে। বেলা হবার সঙ্গে সঙ্গে সিপ্সরকার, বুকিং ক্লার্ক, কেরানী, হেড রাইটার, উকিল, মোক্তার, ডাক্তাররা বেরিয়েছেন। সবই ঠিক আছে, কিছুই বদলায় নি কলকাতার। কেবল দু'চারটি জীব বুদ্বুদের মতন কালস্রোতে মিলিয়ে গেছে। যেমন সেই সব পাড়াগেঁয়ে জমিদার যাঁরা বারোমাস শহরে কাটান, দুপুরবেলা ফেটিং গাড়ি চড়েন, মাথায় ক্রেপের চাদর জড়ান, জন দশবারো মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে থাকেন, তাঁদের আর আজকাল দেখা যায় না। তবু তাঁদের ভাইরা-ভাইদের আজও দেখলেই চেনা যায় যে ইনি “একজন বনগাঁর শেয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মীরী গাধার বেহদ্দ, বিদ্যায় মূর্তিমান মা”, অর্থাৎ হয় অফিসার, না হয় কোন পোলিটিক্যাল পার্টির নেতা।

বাইরের কলকাতার পালিশ বদলেছে, কিন্তু একশ বছরেও ভেতরের

কলকাতার কালচার বদলায়নি। সেই কলকাতা কালচারের মূলকথা হল 'হুজুক' আর 'বুজরুকি'। সাধারণে কথায় বলেন, 'হুনরেচিন' ও 'হুজ্জুতে বাঙ্গাল', কিন্তু হুতোম বলেন 'হুজুকে কলকাতা'। কালপেঁচা বলে, ঐ হুজুক আর বুজরুকিটাই কলকাতার বনেদি কালচার। কোন কাজকর্ম না থাকলে 'জ্যাঠাকে গঙ্গাযাত্রা দিতে হয়, সুতরাং দিনরাত সিগরেট বিড়ি ফুঁকে গল্প করে, তাস ও রেস খেলে, লোকেরা যে আজগুবী হুজুক তুলবে সেটা মোটেই বিচিত্র নয়'। হুতোম বলছেন: "আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েই শুনলাম, শহরে ছেলে ধরার বড় প্রাদুর্ভাব। কাবুলি মেওয়াওয়ালারা ঘুরে ঘুরে ছেলে ধরে কাবুলে নিয়ে যায়, সেথায় নানাবিধ মেওয়া ফলের বিস্তর বাগান আছে, ছেলেটাকে তারই একটা বাগানের ভেতর ছেড়ে দেয়, সে অনবরত পেটপুরে মেওয়া খেয়ে খেয়ে যখন একেবারে ফুলে ওঠে—রং দুধে আলতার মত হয়, এমন কি টুস্কি মারলে রক্ত বেরোয়, তখন এক কড়া ঘি চড়িয়ে ছেলেটাকে ঐ কড়ার উপর উপরপানে পা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়···রক্ত টোসা টোসা ঘিয়ের কড়ার উপর পড়ে,—মেওয়া ও মিছরির ফোড়ন দিয়ে কড়াটি নাবানো হয়।" এই ছেলেধরার অনেক হুজুক ভূমিষ্ঠ হয়ে কালপেঁচাও শুনেছে। এমন কি, এই সেদিন ১৯৪৯ সালে, এই কলকাতা শহরে ছেলেধরার যে কি ভয়ানক হুজুক উঠেছিল, তা নিশ্চয়ই সকলে ভুলে যাননি। সেই হুজুকে কত সাধু সন্ন্যাসী ইহলোক ত্যাগ করেছেন, কত খাঁটি বাপেরা পর্যন্ত মার খেয়ে আধমরা হয়ে গেছেন এই কলকাতায়। মনে করুন, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতেও কলকাতার মতো বিরাট মহানগরও ছেলেধরার হুজুকে মেতে ওঠে, বাসে ট্রামে বিলেত-ফেরত থেকে জেল-ফেরতদের মধ্যে ছেলেধরার উদ্দেশ্য নিয়ে তুমুল তর্কের ঝড় বয়ে যায়। কলকাতার মহিমা বোঝা ভারবিশেষ!

হুতোম বলেছেন: "একদিন আমরা স্কুলে একটার সময়ে ঘোড়া ঘোড়া খেল্‌চি, এমন সময় আমাদের জলতোলা বুড়ো মালী বল্লে যে, ভূকৈলেসে রাজাদের বাড়ি একজন মহাপুরুষ এসেচেন, মহাপুরুষ সত্যযুগের মানুষ, গায়ে বড় বড় অশথ গাছ ও উইয়ের ঢিবি হয়ে গিয়েছে—চোখ বুজে ধ্যান কচ্চেন, ধ্যান ভঙ্গ হয়ে চক্ষু খুললেই সমুদয়

ভস্ম করে দেবেন।" হুতোমের কথা ছেড়ে দিন, এই সেদিন মাসখানেক আগেকার কথা বলছি। একদিন সন্ধ্যাবেলায় একদল রেস্থুড়ের আড্ডায় কয়েকটা টিপ্‌স নিয়ে ক্যাল্‌কুলেশান করছি, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে আমাদের পাড়ার এক ডাক্তার এসে বললে যে ব্যারিস্টার মিত্রের বাড়ি এক বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ এসেছেন, লোক দেখলেই নাম ধরে ডেকে বসাচ্ছেন, তার মনের কথা, জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব ঘট্‌কে পড়ার মতো গড়্‌গড়্‌ করে বলে দিচ্ছেন। ডাক্তারের কথা শেষ না হতে হতেই সকলে ছুটলো সেখানে, আমিও গেলাম, যদি একটা ঘোড়ার টিপ্‌স পাওয়া যায় সিদ্ধবাবার দৌলতে। গিয়ে দেখি বাবাজীকে ঘিরে সব জাতের সব সম্প্রদায়ের লোকের ভিড় জমেছে, বাবাজী ধ্যান-নিমীলিত নেত্রে যোগাসনে বসে আছেন। এরকম ভিড় সচরাচর দেখা যায় না।

তাই বলছিলাম, কলকাতার কালচার বদলায়নি। সেই হুজুক, বুজরুকি আর জনতা এই নিয়ে কলকাতা। শনিবারে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যেমন ভিড়, আমবারুণীতে গঙ্গার ঘাটে তেমনি ভিড়। ভুঁইফোড় নেতার লাটপ্রাসাদে যাবার পথে যেমন ভিড়, মরে-যাওয়া নেতার শবযাত্রার পথে তেমনি ভিড়। মহাপুরুষ দেখতে যেমন ভিড়, রাস্তায় পাগলী দেখতেও তেমনি ভিড়। হুতোম বলছেন ঃ "সাতপেয়ে গরু বাজারে ঘর ভাড়া করলেন, দর্শনী দু'পয়সা রেট হলো ; গরু দেখবার জন্য অনেক গরু একত্র হলেন। বাকি গরুদের ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকা হতে লাগলো ; কিছুদিনের মধ্যে সাতপেয়ে গরু বিলক্ষণ দশটাকা রোজকার করে দেশে গেলেন।" এই চৈত্র মাসে সেদিন কালীঘাটের পথে হাজার কয়েক লোকের ছুটোছুটি দেখলাম। কিছুক্ষণের জন্য ট্রাফিক বন্ধ হয়ে গেল, আর্মড পুলিশ পর্যন্ত টহল দিতে লাগলো। ব্যাপার কি ? দু-মুখো গরু ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে। দক্ষিণ কলকাতা যেন ভেঙে পড়ল তাকে দেখার জন্য। শুধু কলকাতা কালচার নয়, আপস্টার্ট 'বালিগঞ্জী কালচারে'ও বাধলো না কারও ছুটোছুটি করতে।

এই হল কলকাতা শহর। আপনারা যাঁরা ঘটনার কুটিল চক্রে আজ

নতুন কলকাতায় এসেছেন, তাঁরা ভাল করেছেন, কি মন্দ করেছেন, তার বিচার করার সময় নয় আজ। তবে যখন এসেছেন, তখন কলকাতাকে চিনে যান। কলকাতা শহরে দেখা যায় না এমন জিনিস নেই, না আসেন এমন দেবতা নেই, না ঘাড়ে চাপেন এমন ভুত নেই। এখানে ছেলেধরা, নিরাহার, বাক্‌সিদ্ধ, ভুতনাবানো, চণ্ডুসিদ্ধ, সাতপেয়ে দু'মাথা গরু, অনেকেই পেটের দায়ে এসে পড়েন। অনেক হুজুক, অনেক বুজরুকি, এখানে দিনদুপুরে ভূতের নৃত্য করে। উদ্বাস্তু আপনারা আজ বাস্তুভিটে ত্যাগ করে, নিঃস্ব হয়ে, আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে মুক্ত হবার জন্য এই কলকাতায় এসেছেন। রাস্তাঘাটে, স্টেশনে, ক্যাম্পে, আপনাদের ঘিরে কৌতূহলীদের ভিড় জমেছে। কাঁটাতার দিয়ে আপনাদের ঘিরে রাখা হয়েছে। যেখানে জীবন-মরণের সমস্যা, সেখানে এত হুজুক কেন? তার জন্য দুঃখ করবেন না। এই হল কলকাতা, ক্যালাস ক্রুয়েল কলকাতা। এখানে মুষ্টিভিক্ষা হল মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। আপনাদের মর্মান্তিক আবেদন এখানে শুনবে কে? ইট-পাথরের কলকাতায় তার প্রতিধ্বনি হবে মাত্র, ট্রাফিকের শব্দে তাও শোনা যাবে না।

বাসযাত্রী

মহাপ্রস্থানের পথের যাত্রীদের কথা বলছি না, কলকাতা শহরের নানারকম যানবাহনের যাত্রীদের কথা বলছি। বাসযাত্রী, রিক্‌শাযাত্রী, ছ্যাক্‌রাযাত্রী, মোটরযাত্রী—প্রত্যেক যানের যাত্রীদের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, অথবা প্রত্যেকটি যানের কিছু বিশিষ্ট যাত্রী আছেন যাঁদের

যাওয়া-আসার ছন্দ ও ভঙ্গি স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। নিছক যাত্রী হিসেবে তাঁরা প্রতিভাবান। বাস, ট্রাম, রিক্‌শ, ছ্যাকরা বা মোটর,—যখন যাতে চড়েই তাঁরা যাতায়াত করুন না কেন, তাঁদের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর তাতে থাকবেই। মনে হয় যেন সেই বিশেষ বাহনে, বাসে বা রিকশায় চড়বার জন্যেই তাঁদের জন্ম হয়েছিল এবং তাঁরা যদি সেই যানবাহনে সর্বদাই সচল হয়ে না থাকতেন তাহলে শহরের যানবাহন ব্যবস্থাই অচল হয়ে পড়ত। এই সব যাত্রীদের হেজলিট ও রবার্ট লুই স্টিভেন্‌সন কি বলতেন জানি না, তবে আমার মতে নিঃসন্দেহে তাঁদের 'ট্র্যাভেলিং জিনিয়াস' বা 'চলমান প্রতিভা' বলা যায়। হেজলিট স্টিভেনসনের নিঃসঙ্গ আত্মকেন্দ্রিক 'ভ্রমণতত্ত্ব' তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

মনে করুন, আমাদের সকলের চিরপরিচিত সেই দুর্দমনীয় নির্ভীক বাসযাত্রীর কথা। কল্পনা করুন, কলকাতা শহরের প্রাইভেট ও স্টেট সব রকমের বাস চলছে, অথচ সেই নিত্যসঙ্গী বাসযাত্রীটি নেই! এক মুহূর্তে দেখবেন কলকাতার সমস্ত বাস চলাচল অচল হয়ে গেছে, যাত্রীদের মধ্যে কোন প্রাণের স্পন্দন নেই, ভীড়ের চাপে আপনার প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে এবং বাসের ভেতরটা একটা বিরাট গুদোমঘরে পরিণত হয়ে আপনার সমস্ত উদ্যমকে অর্গলবদ্ধ করে রেখেছে। এই অবস্থায় আপনার মেজাজের টাইমবোমা কারণে-অকারণে অসহায় কণ্ডাক্টরের উপরেই ফেটে পড়তে চায়। ঠিক এমন সময় দেখলেন যে সেই নির্দিষ্ট স্ট্যাণ্ড থেকে প্রতিদিনের সেই সহযাত্রীটি হাতে কয়েকটা খালি থলে ঝুলিয়ে 'বাঁধ্‌কে বাঁধ্‌কে' করতে করতে কেমনভাবে যেন উঠে পড়লেন। মুখে একগাল হাসি, বিরক্তির কোন চিহ্ন নেই কোথাও, পান চিবোতে চিবোতে, হাসতে হাসতে, ঝুলতে ঝুলতে তিনি চললেন। 'একটু এগিয়ে যান' বলতেও কেউ যখন এগুলেন না, তখন তিনি পাশের লোকটিকে বললেন, 'তাহলে দাদা আপনার ঠ্যাংটা একটু তুলুন, আমি তলা দিয়ে গলে যাই।' দু'এক মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল তিনি এর কনুই সরিয়ে, ওর ঘাড়টা ঘুরিয়ে, বগলের তলা দিয়ে, কোথা দিয়ে কেমন করে বাইরের ফুটবোর্ড থেকে একেবারে বাসের মধ্যিখানে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং

যাত্রীদের সঙ্গে টপিকাল আলোচনা শুরু ক'রে দিয়েছেন। হঠাৎ হয়ত কণ্ডাক্টরের সঙ্গে কোন যাত্রীর সামান্য কারণে তুমুল ঝগড়া বেধে গেল, বীর যাত্রীটি হুঙ্কার দিয়ে বললেন: 'আর একটা কথা বললে তোমার দাঁতের পাটি খসিয়ে দেব।' এমন সময় আমাদের সেই বিশিষ্ট সহযাত্রী 'বাঁধ্‌কে বাঁধ্‌কে' বলে এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন যে ড্রাইভার কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে ভেবে সশব্দে ব্রেক কষে দিলেন। ব্যাপার কি? সকলেই জিজ্ঞাসু ও কৌতূহলী হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন, এমন সময় তিনি বললেন: 'দাঁড়ান দাদারা, আগে ঝগড়াটা থেমে যাক। ভদ্রলোক যে রকম রেগেছেন, হঠাৎ যদি কণ্ডাক্টরকে ধরে চলন্ত বাস থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেন, তাহলে আমাদের সকলের আফিসের দফা গয়া হয়ে যাবে, থানায় গিয়ে বসে থাকতে হবে। ঝগড়া না থামলে আমি কিছুতেই বাস চলতে দেব না, দেখি কে চালায়, বাসের সামনে শুয়ে পড়ে সত্যাগ্রহ করব।' বলা বাহুল্য, ঝগড়া থামল, বাসও ছাড়ল। সকলে আবার হাসতে হাসতে, মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করতে করতে মহাফিসের পথে যাত্রা করলেন।

কলকাতার পথে এই বাসযাত্রীটিকে সকলেই আপনারা দেখেছেন, কিন্তু কোন-দিন ভেবেছেন কি যে, বাসের ইঞ্জিন হলেও বাস চলতে পারে, কিন্তু এই যাত্রীটি না থাকলে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে? বাসে চলা-ফেরা কলকাতা শহরে আমরা অনেকেই করি, কিন্তু আদর্শ যাত্রী হবার মতন প্রতিভা আমাদের অনেকেরই নেই। শুধু জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল রকমের কাজের মধ্যে প্রতিভার স্ফূরণ হতে পারে। জীবনের পথে বেচাকেনা, কথাবার্তা, চলাফেরা, সব কিছুর জন্যই ট্যালেন্টের প্রয়োজন হয়। বোবারা ছাড়া সকলেই তো কথাবার্তা বলেন, কিন্তু তার মধ্যে 'ট্যালেণ্টেড টকার' যে কয়েকজন আছেন তাঁদের সংখ্যা হাতে গোণা যায়। বেচাকেনাও অনেকে করেন, কিন্তু সুদক্ষ প্রতিভাবান ক্রেতা ও বিক্রেতা ক'জন আছেন? ঠিক তেমনি বাসে-ট্রামে ট্রেনে-রিক্‌শায় মোটরে অনেকেই চলে বেড়ান, কিন্তু চলার মতন চলতে পারেন ক'জন? কথা বলার মতন, কেনাবেচার মতন, চলে বেড়ানোও একটা

আর্ট এবং যাঁরা কথা বলেন, কেনাবেচা করেন বা চলেফিরে বেড়ান তাঁরা সকলেই আর্টিস্ট পদবাচ্য নন। যেমন ধরুন, আমাদের ঐ বাসযাত্রী। অনেক যাত্রী আছেন যাঁরা বাসটাকে তাঁদের প্রাইভেট গাড়ি মনে করেন, তাঁদের ব্যবহার ও চলাফেরার ভঙ্গিমার মধ্যেই সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনেকে আছেন যাঁরা বাসটাকে মনে করেন, তাঁদের প্রাইভেট ড্রয়িংরুম, যা খুশী আলোচনা অনর্গল তার মধ্যে করা যায় তাঁদের ধারণা। অনেকে আছেন, যাঁরা বাসটাকে, অথবা বাসের যাত্রীদের নীরেট চলন্ত বা জীবন্ত 'বস্তু' বলেই মনে করেন না, একটা নিরবয়ব 'আইডিয়া' মনে করেন, তাই কোনদিকে দৃক্‌পাত না করে তাঁরা থুৎকার, ফুৎকার, হাঁচি-কাসি, ধূমপান, নস্যদান, সবই বাসের মধ্যে ধ্যানস্থ হয়ে চালাতে থাকেন। অনেকে আছেন, যাঁরা বাসটাকে গড়ের মাঠ বা শ্রদ্ধানন্দ পার্ক মনে করে এমনভাবে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন যে সকলের নাভিশ্বাস উঠতে থাকে। বাসটাকে 'জিমন্যাসিয়ামের আখড়া' মনে করে অনেকে কথায় কথায় বক্সিং ও কুস্তীর প্যাচ্‌ দেখান। এঁদের কারও সঙ্গে আমাদের ঐ বিশিষ্ট বাসযাত্রীর তুলনা হয় না কিন্তু। যাত্রাটাকে তিনি যাত্রা হিসেবেই নেন, তাই চলার পথে কোনরকমে চলা এবং ফেরার পথে কোনরকমে ফেরাটাই তাঁর চরম লক্ষ্য। চলাফেরার পথে সমস্ত বাধাকে তিনি অবাধে ঠেলে ফেলে দেন, চরৈবেতির মন্ত্র-সাধনায় এমনভাবে সিদ্ধিলাভ করতে তাঁর মতন আর কাউকে দেখিনি। সকলকে নিয়ে একসঙ্গে হেসে-খেলে চলাই তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য, সে আফিসের পথেই হোক আর জাহান্নামের পথেই হোক। জন্মালে যেমন আমরা মরতেই হবে ধরে নিই, তিনিও তেমনি ধরে নিয়েছেন ; 'জন্মেছি যখন তখন চলতেই হবে, চলতে হলে বাসে চড়তেই হবে এবং এই বাসেই চলতে চলতে একদিন মরতেও হবে।' কলকাতা শহরে বাসে ছাড়া অন্য কোন বাহনে তিনি জীবনে কোনদিন চড়েননি—ট্যাক্সি, রিক্‌শ, ছ্যাক্‌রা গাড়ি কোনটাতেই না। দেখলে তাঁকে এই কথাই মনে হয়। বাসে যাবার উপায় থাকলে তিনি ট্রেনে কোথাও যান না, পয়সা কিছু বেশী লাগলেও না, বর্ধমান রাণাঘাটে তো কখনই না। তিনি বলেন যে, বাসে চলার একটা বিশেষ রোমাঞ্চ আছে—ভবিষ্যতে

টিউবট্রেনই হোক আর হেলিকপ্টারই হোক, বাস যতদিন যেখানে চলবে, ততদিন আর কেউ না থাকলেও তিনি তার যাত্রী থাকবেনই। তাই একলাই হোক বা পুত্রকলত্রসহ একত্রেই হোক, শূন্য হাতেই হোক বা রেশন ও বাজার নিয়েই হোক, কলকাতার বাসে সব সময় চলাফেরা করতে তাঁর কোন অসুবিধা হয় না।

সদলবলে পুত্রকলত্রসহ প্রায় জনদশেক যাত্রী ও পোঁট্‌লাপুঁট্‌লি নিয়েও তাঁকে মধ্যে মধ্যে বাসে উঠতে দেখা যায়, কিন্তু রিক্‌শ বা ট্যাক্সি বা ছ্যাকরা গাড়িতে কোনদিনও দেখা যায় না। ওভারলোডেড্ বাসেও তিনি সপরিবারে স্বচ্ছন্দে উঠতে পারেন, কারও কোন টিপ্পনির ধারও ধারেন না। ছেলেপিলেদের কনুই ধরে যাত্রীরাই বাসের ভেতরে চালান করে দেন, তাদের সঙ্গেই ছোটখাট অনেক পুঁটলিও পার হয়ে যায়। স্ত্রী তাঁর মতন ভেটারেনের কাছে ট্রেনিং পেয়ে যথেষ্ট চালু হয়েছেন, সুতরাং ঠেলেঠুলে উঠতে তাঁর বিশেষ কষ্ট হয় না। অবশেষে সবচেয়ে ভারী পোঁট্‌লাটি নিয়ে তিনিও টুক্ করে উঠে পড়েন এবং ইঁদুরের মতন কোথা দিয়ে কেমনভাবে গলে গিয়ে ভেতরে দাঁড়িয়ে বোঝা নিয়ে এমন করুণভাবে হাঁপাতে থাকেন যে, কোন সহৃদয় যুবক তাঁকে বসতে তখনই সীট ছেড়ে দেয়। ছেলে-পিলেরাও তখন এর ওর কোলে নিজেদের স্থান করে নিয়েছে, স্ত্রীও তাঁর রিজার্ভড্ সীটে নিশ্চিন্তে বসেছেন। একটা আলাদা ট্যাক্সিতেও যাঁর এই যাত্রীগোষ্ঠী ও পোঁট্‌লা নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না, তিনি স্বচ্ছন্দে যে কোন চলন্ত যাত্রীভরা বাসে এইভাবে উঠে এবং জাঁকিয়ে বসে সকলকে হাসিয়ে চলতে পারেন। এর পরেও যদি যাত্রী হিসেবে তাঁকে 'জিনিয়াস' না বলেন, তাহলে বুঝতে হবে 'জিনিয়াস' কাকে বলে তাই আপনারা জানেন না। আফিস থেকে ঘরে ফেরার পথেও থলে-ভর্তি তরিতরকারী মাছ নিয়ে বাসে নির্বিবাদে চলতে তাঁর কোনদিন কিছু অসুবিধা হয়েছে দেখিনি। কতদিন দেখেছি তাঁর থলের বেগুনের বোঁটার কাঁটা পাশের লোকের গায়ে বিঁধেছে, কাটোয়ার ডাঁটা অন্য যাত্রীর কাছার মধ্যে ঢুকে গিয়ে আটকে গেছে, কিন্তু তবু কেউ তাঁর উপর রাগ করতে পারেনি, যেমন

সিচুয়েশন ঠিক তেমনিভাবে তিনি ম্যানেজ করে নিয়েছেন। এমনও দু-একদিন দেখেছি, তাঁর থলের উপর থেকে দুটি বড় বেগুন অথবা সীটের তলায় সযত্নে রাখা ইলিশ মাছটি নিয়ে ভীড়ের মধ্যে কেউ সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে কেটে পড়েছে, কিন্তু তাঁর কোন রিয়্যাকশান হয়নি তাতে। সেই একভাবেই হাসতে হাসতে তিনি বলেছেনঃ 'দুদিন অন্তর মাছ খাই, সস্তায় শিয়ালদার বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসি, তাও সহ্য হল না বাবা!' অন্য কোন যাত্রী হলে অন্তত কিছুটা হৈ হৈ করতেন, এর ওর সীটের তলা দেখতেন, বেশ খানিকটা উতলা হতেন, বাসেট্রামের ভ্রাম্যমান চোরদের সম্বন্ধে একটা নীতিদীর্ঘ লেকচার দিতেন, কিন্তু তিনি নির্বিকার। কারণ তিনি বলেনঃ 'জার্নি ইজ জার্নি, পথেঘাটে চলতে গেলে এ হয়েই থাকে।' জীবনের চলার পথে এই যে টলারেশন, এই যে হাসব-হাসাব, চলব-চালাব মনোভাব, এ ক'জনের মধ্যে দেখা যায়? যাঁদের এমন গুণ আছে তাঁরা নিঃসন্দেহে যাত্রী হিসেবে 'জিনিয়াস,' বাসের যাত্রী হলেও।
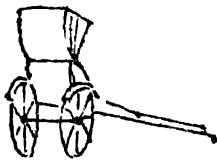
রিক্‌শাযাত্রী

কলকাতা শহরে একসময় পাল্কি চড়ে বেড়াত লোকে, আজও পাল্কির বদলে আমরা রিক্‌শা চড়ে বেড়াই। চক্রহীন স্কন্ধযান থেকে দ্বিচক্র হস্তযান পর্যন্ত গতি অগ্র-না-পশ্চাৎ কোন্ গতি তা সঠিক বলা যায় না। একসময় মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে যেতাম, আজ সেই মানুষের টানে মাটির উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে যাই। তাতে অবশ্য

চলার পথে কতটা এগিয়েছি বলা যায় না। 'পাল্কি চলে তুল্‌কি চালে' থেকে 'রিক্‌শা চলে ঠুঙঠুঙিয়ে'—গতি হিসেবে কূর্মগতি হলেও, পাল্কি ও রিক্‌শাযাত্রীদের মধ্যে গভীর আত্মীয়তার যে অদৃশ্য বন্ধন রয়েছে তা আজও ছিন্ন হয়নি। কলকাতা শহরের সকল শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে গোঁড়া রিক্‌শাযাত্রীরা বাস্তবিক এক রোমান্টিক যুগের নায়ক-নায়িকা। হেজ্‌লিটের মতন তাঁরাও যেন মুক্তকণ্ঠে বলতে চান: 'মাথার উপরে মুক্ত নীলাকাশ, মাটির উপরে কিছু সবুজ ঘাসের বিক্ষিপ্ত দ্বীপ আশেপাশে, আর সামনে একটা আঁকাবাঁকা অদৃশ্য পথ—এর সঙ্গে যদি একখানা রিক্‌শা পাই, তাহলে আপন মনে ভাবতে ভাবতে, গাইতে গাইতে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দিগন্তের সীমানা পর্যন্ত নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারি।' নিঃসঙ্গ নিঃশব্দতার মধ্যে রিক্‌শার ঠুঙ্ ঠঙ্ শব্দ তাঁদের একমাত্র সঙ্গী।

বাসের ভীড় সহ্য করতে পারেন না, জীপ্ বা স্ট্রীমলাইন্‌ড হাড্‌সনে উঠলেও হাঁপিয়ে ওঠেন, এমন লোক কলকাতা শহরে দেখেছেন কি? দেখেছেন, কিন্তু লক্ষ্য করেননি। ঘর থেকে বাজারে, বাজার থেকে বন্ধুর বাড়িতে, সেখান থেকে আফিসে বা আদালতে, বিবাহ বাসরে, এমনকি শবানুগমনে শ্মশান পর্যন্তও তাঁরা রিক্‌শায় চড়ে যান। যেকোন কারণেই হোক, রিক্‌শার প্রতি তাঁদের এমন একটা গভীর অনুরাগ আছে যা তাঁদের চলার পথে প্রত্যেক পদে পদে আত্মপ্রকাশ করে। এমন কি, মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের স্বচ্ছন্দে রিক্‌শা-নিউরটিক বলতে পারেন। ঘণ্টা বাজলেই পাভলভের কুকুরের জিব দিয়ে যেমন লালা ঝরে পড়ত, তেমনি চলার পথে রিক্‌শার ঘণ্টা শুনলেই যেন তাঁদের কোমরটা কন্‌কন্ করে ওঠে, হাত-পা আল্‌গা হয়ে মাজাটা ভেঙে পড়ে। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার হ'ল এই যে, আমি আপনি রাস্তা দিয়ে রিক্‌শার দিকে তাকাতে তাকাতে গেলেও কোন রিক্‌শাওয়ালাই হয়ত একবার ফিরেও তাকাবে না, কিন্তু রিক্‌শানুরাগী যাঁরা তাঁরা আন্‌মনে উল্টোদিকে হাঁ করে পথ চললেও, তাঁদের গন্ধ পেয়েই যেন রিক্‌শাওয়ালারা খৈনি ফেলে সচকিত হয়ে ওঠে এবং ঘন ঘন ঘণ্টা বাজিয়ে, এমন কি রিক্‌শা নিয়ে দৌড়ে কাছে এসে পর্যন্ত তাঁদের আহ্বান জানায়। রিক্‌শাওয়ালার সঙ্গে

বোনাফাইড্ রিক্শাযাত্রীর এই যে গভীর আত্মিক যোগাযোগ, এটা কলকাতা শহরে সত্যিই একটা দ্রষ্টব্য জিনিস। যাত্রীশিকারের অব্যর্থতায় ট্যাক্সিওয়ালারাও কলকাতার রিক্শাওয়ালার কাছে হার মেনে যায়। আগেই বলেছি, ঘণ্টা শুনলেই খাঁটি রিক্শাযাত্রীর মাজা ভেঙে পড়ে, 'এই রিক্শা' বলে ক্লান্তস্বরে ডেকে তিনি গা এলিয়ে দিয়ে তার উপর চড়ে বসেন। ট্যাক্সিচড়িয়েদের একটা স্বাভাবিক স্মার্টনেস্ আছে, যাকে আধুনিক ভাষায় 'বুর্জোয়া স্মার্টনেস্' বলা যায়, কিন্তু রিক্শাচড়িয়েদের সে-সব কোন বালাই নেই, তার বদলে যা আছে তাকে বলা যায় 'ফিউডাল স্ল্যাকনেস্"। ট্যাক্সিতে যাঁরা নিয়মিত চড়েন, লক্ষ্য করে দেখবেন তাঁদের 'ট্যাক্সি' বলে ডাক দেওয়া থেকে শুরু করে, দরজা খুলে ভেতরে ঢোকা, পায়ের উপর পা দিয়ে বসা, এবং যথাস্থানে নেমে যাওয়া পর্যন্ত চলাফেরার মধ্যে বুর্জোয়াযুগের একটা যান্ত্রিক ছন্দ ও ভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, রিক্শাযাত্রীদের মধ্যে যার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। নিয়মিত রিক্শা-যাত্রীদের ডাক থেকে শুরু করে, রিক্শায় ওঠা, উঠে বসা তারপর নামা এবং নেমে ভাড়া দিয়ে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত আগাগোড়া নড়াচড়ার মধ্যে এমন একটা দীর্ঘবিলম্বিত তাল ও ছন্দ আছে যা দেখলেই মনে হয় তাঁরা যেন বাদ্শাহীযুগে বাস করছেন। ট্যাক্সি যাঁরা চড়েন, অটোমেটিক হাত-ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটায় তাঁদের মূল্যবান সময় বাঁধা থাকে, কিন্তু রিক্শায় যাঁরা চড়েন আজও তাঁরা আকাশের সূর্যের দিকে চেয়ে বেলার হিসেব করেন, এবং ঢেঁকুর ও হাঁই তুলতে তুলতে গন্তব্যস্থানে পৌছান। একজনের বেগের আবেগ, আর একজনের জৃম্ভনের বিলাসিতা হল জীবনের চলার পথের আদর্শ।

কিন্তু আদর্শ যাই হোক না কেন, আমাদের এই কলকাতা শহরের টিপিক্যাল রিক্শাযাত্রী অত্যন্ত দুর্দমনীয় ব্যক্তি। তাঁকে চেনে না এমন কোন রিক্শাওয়ালা তো নেইই, এমন কি যেখানে-সেখানে ট্র্যাফিকের স্রোতের মধ্যে হঠাৎ রিক্শায় সমাসীন অবস্থায় জলহস্তীর মতন ভেসে উঠে, ট্র্যাফিক জ্যাম্ করে একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে তিনি কলকাতার বাস ও ট্যাক্সিওয়ালাদের কাছে পর্যন্ত ভয়াবহরূপে পরিচিত হয়ে গেছেন। এমন

কোন অকথা-কুকথা নেই যা তিনি বাস, ট্যাক্সি ও 'প্রাইভেট'দের কাছ থেকে শোনেননি। সকলেই পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা করে কটু মন্তব্য করে যায়। প্রথমে রিক্‌শাওয়ালাকেই বলত সকলে, কিন্তু পরে তাকে একান্ত অসহায় ভেবে যাত্রীর উপরেই বাণবর্ষণ চলতে থাকে। অধিকাংশ কটূক্তিই তাঁর কানে পৌছায় না, কারণ তিনি সর্বক্ষণ প্রায় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় রিক্‌শায় বসে থাকেন। তিনি যে শুধু ট্র্যাফিকেরই ধার ধারেন না তা নয়, কোন তথাকথিত সামাজিক আভিজাত্যকেও পরওয়া করেন না। মালপত্রসহ তো বটেই, সপরিবারেও তিনি স্বচ্ছন্দে রিক্‌শা চড়ে বেড়ান, এমন কি শ্যামবাজারে স্টার রঙ্গমঞ্চ থেকে থিয়েটার দেখে গভীর রাত্রে যেদিন স্ত্রীপুত্রসহ টালিগঞ্জের বাড়িতে ফিরতে হয় সেদিনও। শীত হোক, গ্রীষ্ম হোক, ঝড় হোক, বাদলা হোক শ্যামবাজার থেকে শখের বাজার বা টালা থেকে টালিগঞ্জ, যখন যেখানে যেতে হোক, রিক্‌শা তাঁর চাই-ই চাই। তিনি বলেন যে, ধ্যানস্থ হয়ে ভাবতে ভাবতে বা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চলতে হলে রিক্‌শা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আরও অনেককে জিজ্ঞাসা করে দেখেছি, বাস্তবিকই জীবনের পথে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাঁরা চলতে চান, রিক্‌শায় চলা ছাড়া তাঁদের গতি নেই।

কলকাতায় তাঁর নিজের পাড়ায় তিনি সকলের কাছে 'রিক্‌শা-দাদা' হিসেবে পরিচিত। জীবনে সাইকেল-টুরিস্ট, মোটর-টুরিস্ট, এমন কি পায়ে-হাঁটা পর্যটকদের অনেক কাহিনী অনেকে শুনেছেন, কিন্তু কলকাতার রিক্‌শাযাত্রীর কোন রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী কেউ শোনেননি কোনদিন। রিক্‌শা-দাদা বলেন যে, তাঁর প্রাক্-বৈবাহিক জীবনের রোমান্স ঐ রিক্‌শার মধ্যেই শুরু হয়। তিনি বলেন, অমন নিবিড় অথচ নিরিবিলি আলাপের সুযোগ রিক্‌শার মতন আর কিছুতেই নাকি পাওয়া যায় না। দাঙ্গার সময়ও তিনি যে-সব দুঃসাহসিক অভিযান করেছেন, তার তুলনা হয় না। সামনের পর্দা ফেলে, মুসলমানের রিক্‌শায় মুস্লিম এলাকা এবং হিন্দুর রিক্‌শায় হিন্দু-এলাকা পার হয়ে তিনি সারা কলকাতা শহর এপার-ওপার করেছেন। কোন বিঘ্ন ঘটেনি। দরকার হলে এ-রকম অনেক কাহিনী তিনি বর্ণনা করতে পারেন, যার এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

সবার উপরে আমাদের এই রিক্‌শাযাত্রীর একটা নিজস্ব 'ভ্রমণ-দর্শন' আছে, যা সহজে উপেক্ষা করা যায় না। ষ্টিভেনসন বলেছেন:

"A walking tour should be gone upon alone, because freedom is of the essence ; because you should be able to stop and go on, and follow this way or that as the freak takes you ; and because you must have your own pace and neither trot alongside a champion walker, nor mince with a girl."

রিক্‌শাযাত্রীও তাই বলেন। তিনি বলেন যে, বাসে-ট্রামে চলে বেড়ানোটা চলাও নয়, বেড়ানোও নয়, কেবল দৌড়ানো আর হাঁপানো। এ-ছাড়া ট্যাক্সিতেই চড়ুন, আর 'প্রাইভেটেই' চড়ুন, যাতে চড়েই চলুন না কেন, রিক্‌শায় যেমন একান্তভাবে আপনার মতন করে চলা যায়, তেমন আর কিছুতেই চড়া ও চলা যায় না। রিক্‌শায় চলার মধ্যে এমন একটা ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে, যা আর কিছুতেই নেই। হাঁটার মতন ধীরে-সুস্থে হেঁটে চলো, কদমে চলো, দৌড়ে চলো, যখন যে-রকম খুশী চলো সবই যেমন মানিয়ে যায় রিক্‌শায়, তেমন হাডসন-বুইকে মানায় না। কিন্তু মানুষে টানার মানবিক প্রশ্ন যদি ওঠে? তাহলে অবশ্য মুশ্‌কিল। কিন্তু রিক্‌শাযাত্রী বলেন যে, একবার রিক্‌শায় চড়লে ওসব কোন প্রশ্নই আর থাকে না, সবই অতল আত্মচিন্তার গর্ভে তলিয়ে যায়। প্রখর দ্বিপ্রহরে অথবা গভীর রাত্রে, মহানগরীর প্রশস্ত রাজপথে রিক্‌শায় চললে কেবল 'আমি' ও তার প্রতিধ্বনি ঐ 'ঠুঙ্‌ঠুঙ্‌' শব্দ ছাড়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না।

ছ্যাকড়াযাত্রী
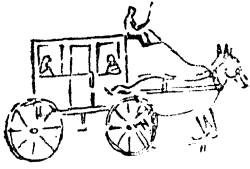
গরুর গাড়ি ও পাল্কির যাত্রী আজও আছেন, তবে গ্রামাঞ্চলেই তাঁদের গতিবিধি বেশী, শহরে নয়। সভ্যতার মধ্যমণি শহর, তাই শহরের মধ্যে গরুর গাড়িতে চলা নিষেধ, কিন্তু রিক্‌শার মতন মানুষের গাড়িতে চলতে কোন বাধা নেই। তাজ্জব সভ্যতা। শহরে ছক্কোড় আজও আছে তবে তার প্রতিপত্তি আর নেই। ছক্কোড় থেকে অটোমোবিলের স্তরে আমাদের জীবনের ধারা উন্নীত হয়নি আজও, তবু কলকাতা শহর থেকে ছক্কোড় আজ বিলীয়মান, থ্যাঙ্কস্ টু পার্টিশান! ঘোড়া ও সহিস দুইই আজ পলায়মান অথবা বিলীয়মান।

কলকাতায় এমন এক যুগ ছিল যখন ছক্কোড়-মহলে ছিল পোয়াবারো! ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন বিধবাদের পুনর্বিবাহের জন্য আন্দোলন করছেন, ঈশ্বর গুপ্ত যখন কবির দলে বাঁধনদার বা দ্রুতকবির কাজ করছেন, বাঙালী নব্য-বাবুরা এবং হিন্দু কলেজের ছাত্ররা যখন টেক্কা দিয়ে গো-মাংস ভক্ষণ করে প্রগতির কেতন উড়াচ্ছেন, কেশব সেন, গিরীশ ঘোষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলে যখন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কথামৃত শুনছেন, তখন কলকাতা শহরে রীতিমত ছক্কোড় চলছে। সেটাকে নিঃসন্দেহে ছক্কোড়ের স্বর্ণযুগ বলা চলে। গরুর যুগ থেকে ঘোড়ার যুগে উত্তীর্ণ হওয়া সভ্যতার ইতিহাসে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। গোযান থেকে অশ্বযান পর্যন্ত অগ্রগতিও আমাদের সামাজিক জীবনে একটা বৈপ্লবিক উত্তরণের সমান। সমাজের মধ্যে চারিদিকে যখন তুমুল বিক্ষোভ ও আন্দোলন শুরু হয়েছে, পচা ডোবার বদ্ধ জলে যখন কিছুটা নদীর স্রোত সঞ্চারিত হয়েছে, ঠিক তখনই গরুর বদলে ঘোড়া চলতে শুরু করেছে কলকাতার রাস্তায়। গ্রামের মেঠো পথ ভেঙে খোয়া-কাঁকরের পাকাপথ তৈরী হয়েছে কলকাতায়, আর তার উপর দিয়ে ছক্কোড় চলেছে, গরুর গাড়ির চেয়ে

অনেক বেশী দ্রুতগতিতে। কতকটা যেন আমাদের নতুন জীবনের চলার ছন্দের সঙ্গে তাল রেখেই কলকাতার নতুন রাস্তায় ছক্কোড় চলতে শুরু করেছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের গুরুগম্ভীর গর্জনে আধমরা সমাজের বুক যখন শিউরে উঠছে, তখন গাড়ির হর্‌রায়, সহিসের পয়িস্‌ পয়িস্‌ শব্দে, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে কলকাতার রাস্তাও কেঁপে উঠছে। জীবনের চলার ছন্দের সঙ্গে বাইরের পথচলার ছন্দের এমন অপূর্ব মিলন আমাদের দেশের ইতিহাসে এর আগে আর কখনও হয়নি। বাংলার 'রিনেইসান্স' বা নবজাগরণের অগ্রদূত ও প্রতিমূর্তি ছ্যাকরাগাড়ী তথা ছক্কোড়, ওরফে হ্যাক্‌নি ক্যারেজকে তাই অভিনন্দন জানাই।

কথাটা পাঠকরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবেন। ছক্কোড়কে আমি অকারণে অভিনন্দন জানাচ্ছি না। যে যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ভূমিকায় ছক্কোড় একদিন বাংলার রাজধানী কলকাতার রাস্তায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তার জন্য আজও তাকে আমি নিঃসঙ্কোচে অভিনন্দন জানাতে পারি। ছক্কোড়ের আগেকার চলার ছন্দ কি? কবির ভাষায়—

পাল্কি চলে
পাল্কি চলে
তুল্‌কি তালে
গগন তলে—
পাল্কি চলে—

মানুষের পায়ে চলার ছন্দ, হয়ত দ্রুততালে, তবু পায়ে চলা এবং সে পা মানুষের পা। চলবার শক্তি তার দূর পথে ঝিমিয়ে আসতে বাধ্য। এরই পাশাপাশি গরুর গাড়ির মন্থর গতি এবং দীর্ঘ-বিলম্বিত ক্যাঁচ্‌-ক্যাঁচ্‌-কোঁ শব্দ, শুনলেই মনে হয় জীবন্ত মানুষের পথচলার শব্দ নয়, ঘুমন্ত মানুষের নাকডাকার শব্দ। এই হল আমাদের ছক্কোড়পূর্ব যুগের পথচলার ইতিকথা। যেমন সমাজ, যেমন জীবনের ধারা, তেমনি তার চলার ছন্দ, একেবারে একসূত্রে গাঁথা, একসুরে বাঁধা। গরুর গাড়ির এই 'ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি, ঘুম দিয়ে যা'—চলার ছন্দকে ভেদ করে ছ্যাক্‌রার ঘুমভাঙানি

ছন্দে চলা শুরু হল। ছ্যাক্‌রার প্রথম লক্ষ্য হল ঘুমভাঙানো। আর বাস্তবিকই, ছ্যাকরার এমনই চলন-মহিমা যে কারও সাধ্য নেই তার মধ্যে বসে ঘুমোয়, এমন কি ঝিমোয় পর্যন্ত, শয়নে পদ্মলাভের তো উপায়ই নেই, হাঁটু-মাজা দুম্‌ড়ে কুঁক্‌ড়েও না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ছ্যাক্‌রার চেহারা দেখলেই তা বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, যে রাস্তা দিয়ে ছ্যাক্‌রা চলবে তার আশপাশের মানুষের ঘুম ভাঙানোও ছ্যাক্‌রার ধর্ম—এমনই চলার ছন্দ ছক্কোড়ের ঃ

গুড়ু গুড়ু—ঘচ্চো
ঘচ ঘচ ঘচ্চো
ওখানে কি কোচ্চো ?
খোলা পথে গচ্ছ !
ঘটা ঘং ঘচ্চোড়
ছুটে চলে ছক্কোড়
মাঝে মাঝে দোত্তোর—(তবু)
ছুটে চলে ছক্কোড়
উঁচু নীচু গর্ত্ত'র
পথ তোর—ছক্কোড়।
টপাটপ্, ঝুম্ ঝুম্
ভাঙ্গে ঘুম, নিঝঝুম্,
ঘচাঘচ্ ঘটাঘাঁই
ভেঙ্গেছি ঘুমের চাঁই—
ঘুট্‌ঘাট্—ঘট্‌কা
ফের লাগে খট্‌কা
কি বলছে ? দোত্তোর
খোয়াওঠা পথ তোর
উঁচু-নীচু গর্ত্ত'র
পথ তোর—ছক্কোড়।

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'রেল-ঘুম' অনুসরণে

যাঁরা কবি ন'ন এবং যাঁদের ছন্দোজ্ঞান নেই, তাঁরাও সামান্য একটু কান পেতে থাকলে বুঝতে পারবেন যে পাল্কির ছন্দ আর ছক্কোড়ের ছন্দের মধ্যে কতো তফাৎ, গরুর গাড়ির ভাটিয়াল ছন্দের সঙ্গে ছক্কোড়ের গজল-খেম্‌টার কি বিরাট ব্যবধান। রাস্তা হিসেবে এই ছন্দের তারতম্য বা মাত্রাভেদ আছে। ছিদামমুদি লেনে একরকম ছন্দ, সার্কুলার রোডে একরকম, দ্বিপ্রহরে একরকম, চাঁদ্‌নীরাতে একরকম এবং ঘোড়া তৃপ্ত হলে একরকম, চাবুকাঘাতে ক্ষিপ্ত হলে আর একরকম—একই মূল ছন্দের বিচিত্র ভেরিয়েশন। ক্লাইভ স্ট্রীটে চাঁদ যাঁরা দেখেছেন বাজোরিয়ার আমলে, তাঁরা মতিলাল শীল বা রামদুলাল সরকারের আমলে ক্লাইভ স্ট্রীটে চাঁদনীরাতে ছ্যাক্‌রার চলার শব্দ শুনেছেন কি ? শোনেন নি। যদি শুনতেন তাহলে বুঝতেন, সেযুগের ছ্যাক্‌রার ছন্দোমাধুর্য এ যুগের অটোমোবিলের চেয়ে কম ছিল না।

হুতোম ঠাট্টা করে বলেছিলেন ছক্কোড় সম্বন্ধে: "কলকেতার কেরাঞ্চি গাড়ি বেতো রোগীর পক্ষে বড় উপকারক, গ্যাল্‌বানিক শকের কাজ করে।" নিঃসন্দেহে ছক্কোড় সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি। কিন্তু হুতোম শুধু ছক্কোড়ের বাইরের চেহারাটাই দেখেছিলেন, তার ঐতিহাসিক ভূমিকাটা লক্ষ্য করেন নি। তা যদি করতেন তাহলে তিনি দেখতে পেতেন যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক যখন মনের দিক থেকে পঙ্গু বেতো রুগী ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তখন ছক্কোড়ের এই গ্যালভানিক শকের প্রয়োজন ছিল। আমাদের বাপ-ঠাকুরদা যাঁরা ঘোড়ার গলায় ফুলের মালা ও কপালে চাঁদমালা দিয়ে, আসমানি দোলদার ছক্কোড় সাজিয়ে, কলকাতা শহরে বিয়ে করতে গেছেন, তাঁরা ঐ গ্যালভানিক শক্‌ খেয়ে খেয়ে মনের দিক থেকে অনেক বেশী চাঙ্গা ছিলেন। আজকাল পিচ্ছিলগতি অটোমোবিলে চড়ে আমাদের কোন শক্‌ লাগে না বটে, কিন্তু সেই শক না লাগার ফলে আমরা সকলে অটোমেটন হয়ে গেছি, মনপ্রাণ আবার আমাদের বেতো রুগীর মতন পঙ্গু হয়ে গেছে। ছক্কোড়ের যুগে যে নতুন জাগরণের সূচনা হয়েছিল, অটোমোবিলের যুগে তার শেষ হয়ে গেছে। ছক্কোড়ের যুগ আজ অস্তাচলে, তার পুনরুদয়ের কোন সুদূর

সম্ভাবনাও নেই। তবু আজও যাঁরা ছক্কোড়ে চলে বেড়ান স্টেশন থেকে বাড়ি, বাড়ি থেকে কালীঘাট বা কালীঘাট থেকে চিড়িয়াখানা, তাঁরা সেকেলে হলেও এবং শহরের গরীব নিম্নমধ্যবিত্ত যাত্রী হলেও, তাঁরা বলেন: 'মনটা যদি গরুর গাড়ির যুগেই থাকে তাহলে অটোমোবিলে দেহটা বহন করে লাভ কি? মনের দিক থেকে আজও আমরা পুরোপুরি ছক্কোড়ের স্তরেও পৌঁছইনি, অটোমোবিলে তো দূরের কথা! বুইক্-পন্টিয়াকে চড়ে যাঁরা আজও নানারকম সিদ্ধবাবাদের কাছে যান তাঁদের কান ধরে তা থেকে নামিয়ে দিয়ে গরুর গাড়িতে চড়িয়ে দেওয়া উচিত, ছক্কোড়েও তাঁদের স্থান নেই।' সুতরাং তাঁরা বলেন যে মনটা যতদিন না তৈরী হচ্ছে ততদিন অন্তত ছক্কোড়ে চলার প্রয়োজন আছে, বিশেষ করে ঐ গ্যালভানিক শকের জন্য।
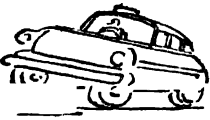
মোটরযাত্রী

বাস ও রিক্‌শযাত্রীর কথা শুনেছেন, কিন্তু মোটরযাত্রীর কথা এখনও শোনেননি। কলকাতা শহরে মোটরের কথা চিন্তা করলেই আপনার মনে হবে অসংখ্য পিচ্ছিলগতি হাড্‌সন-হাম্বার-রোভার-বুইক-পন্টিয়াকের কথা, কিন্তু ভুলেও একবার মনে হবে না, হেনরী ফোর্ডের সেই প্রথম যুগের প্রচেষ্টার চলমান প্রতিমূর্তির কথা, অথবা অস্টিন সাহেবের বোনি বেবীদের কথা, যাদের উচ্ছল গতি আজও মহানগরীর বুকে বেগের আবেগ সঞ্চার করে এবং জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তন-নীতি অনুসারে

আজও যারা রাজপথে সগর্বে সচল। অটোমোবিলগত-প্রাণ এ-হেন এক চ্যাম্পিয়ন মোবাইল যাত্রীর কথা বলছি, মোবিলিটি বা গতিশীলতাই যাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য এবং স্বচালিত অটোমোবিল যাঁর কাছে আত্ম-সচলতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। শিশু-মোটরের এক পাকাপোক্ত প্রৌঢ় যাত্রী তিনি, কিছুতেই দমবার পাত্র ন'ন।

বেবি অবশ্য আজ আর বেবি নেই, এখন তার বয়স অন্তত বিশ বছর হবে। যখন সেই বেবির আবির্ভাব হয়েছিল, খুব বেশী হলে তার বিশ বছর আগে হয়ত কলকাতা শহরে সত্যিকারের অটোমোবিল যুগের প্রবর্তন হয়েছিল। তবু বেবি আজও বেবির মতনই হেলেছুলে চলে বেড়ায়, দেখলে মনে হয় যেন সোজা হয়ে স্বচ্ছন্দগতিতে আজও সে চলতে শেখেনি, যে কোন মুহূর্তে হোঁচট্ খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় আর কি। কিন্তু সহজে পড়ে না, বেশ দিব্যি গড়িয়ে যায় রাজপথের উপর দিয়ে। পিচ্‌ঢালা প্রশস্ত পথের ট্র্যাফিকের মধ্যে বেবিকে চল্‌তে দেখলে দর্শকদের ভয় পাবারই কথা, কিন্তু বেবির মালিক বৃদ্ধ যাত্রী নির্ভীক, রীতিমত উদ্ধত বলা যায়। বুইকের বুমিং, পন্টিয়াকের পু-পু, হাম্বার হাড্‌সনের হাউলিং, রোভারের রক্তচক্ষু, চ্যাপ্টামুখো বিশটন লেল্যাণ্ডের গর্জন, সমস্ত অগ্রাহ্য করে বেবি আপন মনে চলে-ফিরে বেড়ায়। তার অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতায় এতটুকু হস্তক্ষেপ করে এমন ক্ষমতা ফোর্ড, ক্রাইসলার, নুফিল্ড, বিড়লা কারও নেই। 'গতি' ও 'গণতন্ত্রে'র আদর্শের যুগপ্রতিনিধি ঐ বেবি মোটর ও তার দুর্ধর্ষ যাত্রী।

বেবির মালিক বটুবাবুকে কলকাতা শহরে সকলেই প্রায় চেনেন এবং সকলেই জানেন যে, ঐ বেবির মালিকানা সম্বন্ধে তিনি রীতিমত গৌরবান্বিত। বটুবাবু বলেন, যুগটা হ'ল অটোমোবিলের যুগ, সুতরাং রিক্‌শায় চড়ে বেড়ানো, বা বাসে-ট্রামে ঝুলে বেড়ানোর কোন অর্থ হয় না। তাঁর মতে রিক্‌শায় চড়া অসভ্যতা এবং সভ্যতা নাকি এখনও এমন স্তরে পৌঁছয়নি যখন বাসে-ট্রামে চলাফেরা করা যেতে পারে। বাস যদিও অটোমোবিলের মধ্যে গণ্য, তবু পাবলিক বাসে ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন মর্যাদা বজায় রাখা যায় না, পদে পদে ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করে চলতে হয়।

তার ফলে নাকি যাত্রীদের মানুষিক অবনতি ঘটে এবং মানুষ ক্রমে এক নিম্নস্তরের জীবে পরিণত হয়। অনেকে বটুবাবুর এই মতামতকে গণতন্ত্র-বিরোধী বলে প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু বটুবাবু বলেছেন যে, পাঠ্যপুস্তকের সস্তা গণতান্ত্রিক আদর্শে তিনি বিশ্বাস করেন না। বর্তমান যুগ বেগের যুগ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগ। বেগ যাতে অকারণে সংযত হয় এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা যাতে পদে পদে খর্ব হয়, এমন কোন কিছুকেই তিনি 'গণতান্ত্রিক' বলে স্বীকার করেন না। এইদিক দিয়ে বিচার করলে পাবলিক বাস একটা 'নুইসেন্স' ছাড়া আর কিছু নয়। যখন যেমনভাবে যেরকম বেগে আপনার চলতে ইচ্ছা করে তখন ঠিক তেমনিভাবে আপনি বাসে চলতে পারেন না। চলার গতি নিয়ন্ত্রিত এবং শুধু চলার গতি নয়, চলার পথও সুনির্দিষ্ট, বাঁধাধরা। যেপথে, যেখানে খুশী আপনি পাবলিক বাসে চলতে পারেন না। আপনার চলার পথ এক্সেন্ট্রিক্ নগরকর্তারা নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং সেই পথ ধরে সারাজীবন আপনাকে চলতে হবে। মনে করুন, আপনি যাবেন আপনার নিজের শ্বশুরবাড়ি, কিন্তু পাবলিক বাস আপনাকে আর একজনের শ্বশুরবাড়ির দরজার কাছে নামিয়ে দেবে, সেখান থেকে আরও অন্তত একশজনের শ্বশুরবাড়ির পাশ দিয়ে আপনাকে যেতে হবে নিজের শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু নাই বা হল হাড্‌সন হাম্বার, আপনার যদি একখানা বেবি গাড়িও থাকে, এমন কি ওল্ড মডেলেরও, তাহলেও আপনি যে-পথ দিয়ে খুশী সোজা আপনার শ্বশুরবাড়ি যেতে পারেন, ইচ্ছা হলে একেবারে অন্দর-মহলে পর্যন্ত। তারপর শাশুড়ীকে গঙ্গাস্নান করিয়ে আনুন, অথবা শ্যালিকাদের নিয়ে চিড়িয়াখানা বা সিনেমাতেই যান, যে পথ দিয়ে খুশী যেতে পারেন, যেতে যেতে ধর্মকথাই হোক, বা রঙ্গকথাই হোক, অনর্গল বলতে পারেন। কোথায় পাবেন এই স্বাধীনতা পাবলিক বাসে?

বটুদার কথাগুলো কিন্তু সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিনি বলেন, একসময় স্টীমইঞ্জিন ও রেলপথের ট্রেন আমাদের চলার পথে গতি সঞ্চার করেছিল। কিন্তু তার মধ্যেও মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিকাশ হয়নি। লোহাবাঁধানো সমান্তরাল সড়কের উপর দিয়ে ট্রেন চলে,

ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে হলেও এতটুকু এদিক-ওদিক চলবার উপায় নেই তার।

ঘ্যাচা ঘ্যাচ্ ঘ্যাত্তোর
লোহা বাঁধা পথ তোর
লোহা বাঁধা পথ তোর—

এটা জীবনের চলার পথের ছন্দ নয়, যান্ত্রিক লোকোমোটিভের চলার ছন্দ। জীবনের পথ লোহা-বাঁধাও নয়, সমান্তরাল ও সমতলও নয়। জীবনের পথ আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নিচু, যান্ত্রিক লোকোমোটিভ্ তার প্রতীক নয়, অবাধগতি অটোমোবিল তার আদর্শ প্রতীক। জীবনের চলার ছন্দ রেলপথের যান্ত্রিক শব্দে প্রতিধ্বনিত হয় না, আঁকা-বাঁকা অসংখ্য রাজপথের বিচিত্র শব্দঝঙ্কারে প্রতিধ্বনিত হয়। সমতল, সমান্তরাল 'রেলওয়ে' নয়, অসমতল আঁকা-বাঁকা 'হাইওয়ে' হল জীবনের চলার পথ। সে পথের আদর্শ বাহন অটোমোবিল।

বেবি গাড়ির সমর্থনেও বটুদার বক্তৃতা যদি কেউ শোনেন তাহলে অবাক হয়ে যাবেন। হাড্‌সন বুইককে চলার বিরোধী তিনি নন, কিন্তু চলবার মতন পথ কোথায়? ঘোড়া ও ছ্যাক্‌রাগাড়ির পরে অটোমোবিলের যুগ এল, কিন্তু সেই পুরনো ছ্যাক্‌রাগাড়ির জীর্ণ পথটা এবং নক্সাটা বিশেষ বদলালো না। ছ্যাক্‌রার পথের উপর দিয়েই অটোমোবিল চালিয়ে দেওয়া হল। বিংশ শতাব্দীতে কিছু কিছু প্রশস্ত কংক্রীটের পথ তার জন্য তৈরী করা হল বটে, কিন্তু পথের বিন্যাস-পরিকল্পনা বদলালো না। শহরের প্রচণ্ড ভীড় ও ট্র্যাফিকের মধ্যে পথের যদি অসংখ্য কাটাকাটি হয়, তাহলে হাই-স্পীড্ অটোমোবিলের চলার স্বাধীনতা থাকে কি? হাড্‌সন যদি হাড্‌সনের মতন চলতে না পারে, বুইক যদি ষোল ঘোড়ার বাহনের মতন ছুটতে না পারে, তাহলে লাভ কি তার রূপের বিশালতায় ও মসৃণতায়? চলার পথটাই হল আসল, তারপর তার বাহন। আমরা পথ বিশেষ বদলাইনি, কেবল বাহন বদলেছি। আমাদের এই কিমাকার সভ্যতার বিশেষত্বই তাই। কেবল টেক্‌নিকেরই উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু তার প্রয়োগক্ষেত্রের বিস্তার হচ্ছে না। অটোমোবিলের যুগ এসেছে, কিন্তু

তার চলবার উপযোগী দিগন্তবিস্তৃত 'townless highways' এবং তার পাশাপাশি অসংখ্য 'highwayless towns' গড়ে ওঠেনি। শুধু চলবার পথ নেই বলে আমরা হাড্‌সনে চড়েও সেই ছ্যাক্‌রার গতিতে চলেছি। সুতরাং বটুদা বলেন, পথ যতদিন না তৈরী হয়, ততদিন আমার বেবিই ভাল, কারণ চলবার স্বাধীনতা বুইকের চাইতে বেবির অনেক বেশী।

এ ছাড়াও আরও অনেক কারণ ও যুক্তি আছে যার জন্য বটুদা বেবি মোটরে চড়ে বেড়ান, বাসে-ট্রামে বা রিক্‌শায় ভুলেও চড়েন না। তাঁর বেবির বয়স আজ বিশ বছর হলেও এবং মধ্যে মধ্যে পথে-ঘাটে বেবি বিকল হলেও, বেবি নেই অথচ বটুদা আছেন, এমন অবস্থায় তাঁকে কেউ কোনদিন রাস্তায় দেখেনি। মধ্যে মধ্যে বেবি তাঁর উপর চড়ে বেড়ায়, অর্থাৎ তিনি নিজেই রাস্তায় নেমে গাড়ি ঠেল্‌তে থাকেন, তবু বেবিকে ছাড়তে চান না। ব্যক্তিস্বাধীনতার পূজারী বটুদা, ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিমূর্তি বেবি অটোমোবিলকে প্রাণাধিক ভালবাসেন। অন্যের হাতে বেবি হয়ত প্রতি মিনিটে বিকল হয়ে যায়, কিন্তু বটুদার হাত ও পা একবার স্টিয়ারিং ও এ্যাকসিলারেটরে লাগা মাত্রই বেবি ঠিক যেন টাট্টু ঘোড়ার মতন দৌড়তে থাকে। সঙ্কীর্ণ অলিগলি থেকে প্রশস্ত রাজপথ, সর্বত্র বেবির অবাধ গতি। বর্ষাবাদলে কলার-ভেলার মতন বেবি ভেসে গেলেও বটুদা ভয় পান না। তিনি বলেন, 'আমারও যেমন, ওরও তেমনি, জীবনে একটা দিনও চলার বিরাম নেই।' ছেলেমেয়েরা বেবিতে চড়ে স্কুলে যায়, বটুদা আফিসে যান, সপরিবারে বেড়াতে যান, পিক্‌নিকে যান, সভাসমিতিতে যান। দুরন্ত ট্রাফিকের জোয়ারের মধ্যে বেবি ঠিক জোয়ান ঘোড়ার মতন ঘাড় উঁচু করে চলতে থাকে, বেবির টায়ার কাঁপলেও, পাঁজর কাঁপে না। বনেদী বেবির কল্‌জের জোর আছে বৈকি! তা না হলে হাডসন হাম্বার বুইক রোভারের দুর্দান্ত ছুটোছুটির মধ্যে 'বেবি' কখন এমন নির্ভয়ে দৌড়তে পারে এবং ডাইনোসারের মতন অতিকায় লেল্যাণ্ড দানবের পাশ দিয়ে যুযুৎসুর কায়দায় এমন নির্বিবাদে চলে যেতে পারে? অতিকায় অটোমোবিলের হুঙ্কারে ও দাপটে কলকাতার ফাঁপা রাজপথ কেঁপে কেঁপে ওঠে, মনে হয় 'বেবি' বুঝি চূর্ণ হয়ে পথের ধুলোয় মিশে

যাবে ! কিন্তু কত দানব পাঁজর ভেঙে পড়ল কলকাতার রাজপথে তবু বেবির কিছু হল না। চল্‌তে চল্‌তে হয়ত বেবির একটা চাকা খুলে বেরিয়ে গেছে অনেকদিন, তবু বেবির মালিক পরওয়া করেননি। তিনি হাসতে হাসতে বলেছেন: 'ঠাট্টাই করুন আর বিদ্রূপই করুন, যতদিন আমি আছি ততদিন আমার বেবি মোটরও আছে। বাসে বা রিক্‌শায় চলার চাইতে বেবিতে চলা আমি অনেক বেশী হিউম্যান ও সিভিলাইজড বলে মনে করি। আমি সেই দিনের স্বপ্ন দেখি যখন প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে আমার মতন বেবি মোটরে চলে বেড়াবে, তবু রিক্সায় চড়বে না বা বাসে ঝুলতে ঝুলতে যাবে না। সেইদিন চলার পথে মানুষের কোন বাধা থাকবে না, গতি, গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শ অটোমোবিলের পথচলার মধ্যে সার্থক হয়ে উঠবে।

কলকাতার ভিখিরী

অনেকটা সেই আদিমতম মানুষ পিথিক্যানথ্রোপাস্‌ ইরেক্টাসের মতন চেহারা, ছোট্ট মাথা, ঘাড়ে-গর্দানে লাগানো, বিরাট চোয়াল, বিশাল কৃন্তক ও ছেদক বার করা মুখব্যাদান, কোটরস্থ চোখ দুটো জবাফুলের মতো টুকটুকে লাল, গলিতকুষ্ঠে একটি হাত বিলীয়মান, আর একটি হাতে ভর দিয়ে চলার ক্রাচ, আঙুল নেই। কোন আদিম জানোয়ারের কথা বলছি না, অথবা প্লাইওস্টোসিন যুগের কথাও নয়, বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কলকাতা শহরের এক হতভাগ্য 'হোমো স্যাপীয়েন্সের' কথা বলছি।

রাজকীয় কলকাতার কোন রাজপুত্তুর নয়, ঘৃণ্য কুৎসিত কলকাতার এক ভয়ানক ভিখিরী সে। আজ আর তাকে দেখতে পাবেন না কেউ, কারণ শীতের এক ধোঁয়াটে সন্ধ্যায় টাউয়ার হোটেলের জানলা দিয়ে রাস্তার ধারে তার মৃতদেহ নিয়ে বৈঠকখানার কুকুরদের কাম্ড়া-কাম্ড়ি করতে দেখেছি। বছর পাঁচেক আগেকার কথা বলছি। ভিক্ষে করত সে শিয়ালদহ স্টেশনের উল্টোদিকে হ্যারিসন রোডের মোড়ের বাসস্ট্যাণ্ডে। বাসের ধারে এসে কুষ্ঠগলা হাতটা বাড়িয়ে যাত্রীদের কাছে সে পয়সা চাইত। ঘৃণায় ও ভয়ে যাত্রীরা আঁৎকে উঠে মুখ ঘুরিয়ে নিত, একটি আধ্লাও কাউকে কখনও দিতে দেখিনি তাকে। কিন্তু বাসে গীয়ার দেবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হত তার অনর্গল অভিসম্পাত বর্ষণ—'আঁটকুড়ো ব্যাটারা, নির্বংশ হবি, কুট হয়ে মরবি, মরবি, নির্বংশ হবি !!' চলন্ত বাসের যাত্রীরা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত তার উৎকট মুখভঙ্গিমা।

কলকাতার ভিখিরী-রাজ্যের এই রাজপুত্তুর আজ আর ইহলোকে নেই। তার বংশধরদের আজও কলকাতার অনেক বড় রাস্তার মোড়ে ভিক্ষে করতে দেখা যায়। আজব শহর কলকাতায় যেমন বড়লোকের অভাব নেই, গেঁজেল, মাতাল, জোচ্চোর, জুয়াড়ীর অভাব নেই, তেমনি কাঙাল আর ভিখিরীরও অভাব নেই। স্ট্যাটিস্টিক্যাল্ ইন্স্টিটিউট্ থেকে যদি কলকাতা শহরের নানাজাতের নানারকমের নানাঢঙের ভিখারীদের আধুনিক পদ্ধতিতে ক্লাসিফাই করে একটা হিসেব নেওয়া হয় তাহলে সেটা যতই ভীতিপ্রদ হোক না কেন, চমকপ্রদও কম হবে না। সে যাই হোক, ভিখিরী অনেক দেখেছি, কিন্তু যার কথা বলছিলাম তার মতো ভয়াবহ দোর্দণ্ডপ্রতাপ ভিখিরী আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। জানি না, পরলোকেও সে ভিক্ষে করছে কিনা, তবে ভূত-প্রেতও যে তাকে দেখলে ভয়ে পালাবে, ভিক্ষে দেবে না, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কলকাতার ভিখিরীদের সম্বন্ধে অনেক আজগুবি সব গল্প শোনা যায়। হেদুয়ার কাছে এক ভিখিরী নাকি ভিক্ষে করে ষাট হাজার টাকা জমিয়েছিল, আর একজন কে চৌরঙ্গীর ভিখিরী নাকি ভিক্ষে করে সামান্য

পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করে লাখপতি হয়েছে। এসব গল্প আজগুবি না-ও হতে পারে। ভিখিরী-রাজ্যের সবচেয়ে তাজ্জব খবর হল, কলকাতার ভিখিরীরাই একটা বিরাট গোপন ব্যবসায়ের মূলধন। সে কথা পরে বলছি। তার আগে হরেকরকমের ভিখিরী, ভিক্ষের রীতি ও বুলি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। সবরকমের চালু রীতি ও বুলির কথা বলা সম্ভবপর নয়। কয়েকটির কথা বলা যাক।

কলকাতার কদর্য ফুটপাথের উপর দিয়ে প্রচণ্ড জনস্রোতে মোচার খোলার মতো হেলে-দুলে ভাসতে ভাসতে চলেছেন, এমন সময় কিসে ঠোক্কর খেয়ে হঠাৎ কার্নিক মেরে দাঁড়িয়ে দেখলেন, ইট নয়, পাথর নয়, জীবিত মাংসপিণ্ডের মতো কুঁজওঠা বামনাকার দুই বিচিত্র ভিখিরী, আধ ফুট লম্বা দুটি হাত আছড়ে অবিরাম 'হে বাপ্!' 'হে বাপ্!' ধ্বনি করছে। কিছু দূর এগিয়েই দেখলেন, ল্যাম্পপোস্টের তলায় দীর্ঘাকৃতি অর্ধনিমীলিতনয়ন এক বৃদ্ধ ঠিক পাথরের স্ট্যাচুর মতো হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একেবারে মৌন। মনে হবে বুঝি হিমালয়ের কোন তপস্বী কলকাতার ফুটপাথে ছদ্মবেশে এসে দাঁড়িয়েছেন। রাস্তা পার হতেই একপাল উলঙ্গ বাচ্চা ছেলে-মেয়ে আপনার পায়ের পাতা থেকে পেট পর্যন্ত খাব্‌লে খাম্‌চে প্রণাম করবে, একটি নয়া পয়সা তাদের না দিলে নিস্তার নেই। রেস্টুরেন্ট থেকে চা খেয়ে বেরুচ্ছেন, ঠিক দরজার সামনে ভিখিরী-মা তার ছেলেটিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আট গণ্ডা পয়সা নিজে খেয়ে খরচ করে তাকে অন্তত দুটো পয়সা খেতে দিতেই হবে। চৌরঙ্গীর নিওন্ আলোকিত ফুটপাথে ফ্যাশনদুরস্ত নর-নারীর ভিড় ঠেলে চলতে চলতে হঠাৎ সেই অকর্মণ্য প্রাক্তন সৈনিকের জাপানী বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনবেন, অথবা কয়েক জোড়া মেমসাহেবের নিটোল পায়ের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাবেন বিকলাঙ্গ সেই নুলোর হাতখানা উঁকি মারছে। এস্‌প্লানেডে কার্জন পার্কের একোণে সেকোণে দেখবেন ইরাণী কি আফগানী মেয়েরা ঘাঘরা পরে ঘুরছে, কোথাও নাচছে গাইছে, পয়সা চাইছে, আর মাছির মতো লোক ঘুরছে তাদের চারিদিকে। একদল ছুঁড়ী বুড়ী কিশোরী যুবতী অপেক্ষা করছে এসপ্লানেডের ট্রাম-জংশনে, যাওয়া মাত্রই চীনে-

জোঁকের মতো আঁকড়ে ধরবে আপনাকে, ছাড়ালেও ছাড়বে না। পাশেই গাছতলায় দেখবেন, সামনে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় ঢাকা এক শীর্ণকায় শিশু নিয়ে জীর্ণবেশ ভিখারিণী বোবার মতো বসে আছে। কাণা অন্ধ যারা তাদের কথা তো বললামই না, কারণ তাদের নির্ভীক চীৎকার ও কাত্‌রানির কায়দা দেখে মনে হয়, দয়াদাক্ষিণ্যের উপর দাবী সর্বাগ্রে যেন তাদেরই।

এছাড়া কলকাতা শহরে আর একজাতের ভিখিরী আছে যাদের "ফাইন আর্টিস্ট" বলা যেতে পারে। নিজের মনে ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে চলছেন, হঠাৎ পিছন থেকে ডাক এল—'শুনছেন, শুনছেন স্যার!' ফিরে দাঁড়ালেন। একজন ভদ্রলোক আপনার কাছে এগিয়ে এসে বললেন: 'চার আনা পয়সা দেবেন?' কেন? আপনি জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তর এল: 'বাস-ভাড়া নেই, রামরাজাতলা যাব।' 'ভিক্ষে করে বাসে চড়বেন, তার চেয়ে আমার কাঁধে চেপে চলুন বলে আপনি সোজা চলে গেলেন। যদি একটু লক্ষ্য করে দেখেন, তাহলে দেখবেন সেই লোকই আর একজনের কাছে পয়সা চেয়ে বলছে: 'চারখানা রুটি খাব—সারাদিন কিছু খাইনি স্যার!' ইত্যাদি। আপনি হয়ত বেকার হয়ে ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলে ঘুরছেন, আর কেউ না জানলেও যারা জানবার তারা জানে। কোন অফিসে দরখাস্ত দিয়ে বেরিয়ে এসেছেন, ফুটপাথে একজন যেন আপনারই জন্য অপেক্ষা করছিল। দেখা হতেই আপনাকে বলল: 'তোর মনে বড় কষ্ট আছে, বড় ভাবনায় আছিস্ তুই! কেটে যাবে সব, আর দুটো মাস কষ্ট হবে—এই পাথরটা কাছে রাখবি, তোর চাকরি হোবে ইত্যাদি।' অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তাকে কিছু পয়সা খেতে দিতে হবে, তাহলেই নিজের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

কলকাতা শহরে সব জাতের ভিখিরীর সংখ্যা কত জানি না, তবে মনে হয় প্রায় লাখের কাছাকাছি হবে। উৎসব পার্বণের দিনে কলকাতার তীর্থস্থানে, কালীমন্দিরে ও গঙ্গার ঘাটের পথে তাদের সমাবেশ হয়। দান-খয়রাতের খবরগুলো কোন অদৃশ্য দূত মারফত সকলের কাছে যথাসময়ে পৌঁছে যায়। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, কলকাতার ভিখিরীদের মধ্যে বাঙালী ও অবাঙালীদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান, এবং অবাঙালীদের

মধ্যে বিহারী ও দক্ষিণ ভারতীয়দের সংখ্যাই বেশী। অর্থাৎ মোদ্দাকথা হল, ভিক্ষাবৃত্তির হাত থেকে বাঙালীর পরিত্রাণ নেই, অবাঙালীরা সেখানেও তাদের হটিয়ে দিয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছে। তাই ভাবি, হায় বাঙালী! তুমি যে ভিক্ষে করে দু'মুঠো পেটের ভাত যোগাড় করবে, তারও উপায় নেই। সেখানেও বিহারী তামিল তেলেগু ভিখিরীর সংখ্যা ও তাদের ভিক্ষার বিচিত্র কলাকৌশলের প্রতিযোগিতায় তুমি কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছ। তোমার ভবিষ্যৎ যে কি তা মা জগদম্বাই জানেন!

মানুষের দয়া ও করুণার প্রবৃত্তিই হল ভিখিরীদের একমাত্র আশাভরসা। তাকেই জাগাবার জন্য এত সব ভীতিপ্রদ কাণ্ড ও বিস্ময়কর ছলাকলার প্রয়োজন। সকলের সব ব্যাপারেই দয়া বা করুণার উদ্রেক হয় না, তাছাড়া অনেকে আবার ভয় পেয়েও দুটো পয়সা দান করে। কেউ বৃদ্ধ, কেউ কাণা, কেউ অন্ধ, কেউ বিকলাঙ্গ, কেউ ব্যাধিগ্রস্ত, কেউ অসহায় মা ও শিশু দেখলে অভিভূত হয়, সুতরাং ভিখিরীর ভ্যারাইটির অভাব নেই। আর মনে হয় যেন সবার উপরে ভিখিরীদের একটা পরিচালক-মণ্ডলী আছে, যারা মনস্তত্ত্বের কিছুটা খোঁজ রাখে এবং মানুষের দুর্বলতা ভাঙিয়ে মানুষ নিয়ে ব্যবসা করে। শুনেছি, কলকাতার ভিখিরীরা একটা বিরাট গোপন বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের পণ্যদ্রব্যস্বরূপ। ব্যভিচার অথবা দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদি বিপর্যয়ে আবর্জনাস্তূপে যারা নিক্ষিপ্ত হয়, যাদের জন্ম হয় কলকাতার ডাস্টবিনে অথবা পল্লীগ্রামের জঙ্গলে, আঁস্তাকুড়ে, অভাবের তাড়নায় দিশাহারা হয়ে যারা ঘরছাড়া হয়, তাদেরই কুড়িয়ে এনে জড়ো করা, মানুষ করা এবং তারপর কাউকে অন্ধ, কাউকে কাণা, কাউকে একপেয়ে, কাউকে নুলো, কাউকে অস্পৃশ্য ব্যাধিগ্রস্ত ও বিকৃত করে ভিখিরী তৈরী করা, এই হল সেই রহস্যাবৃত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। তারপর তাদের শহরের চারিদিকে পোস্ট ক'রে দেওয়া এবং সময়মতো সারাদিনের কলেক্‌শন একদল কলেক্টর মারফৎ সংগ্রহ করে নেওয়া—এই হল সেই বাণিজ্যের অর্গানাইজেশন। অসহায় মানুষকে বিকৃত ও বিকলাঙ্গ ক'রে ব্যবসা চালিয়ে মুনাফা করাই হল কলকাতার ভিখিরীর মালিকদের কাজ। বোনাফাইড্‌ ভিখিরী যে শহরে দু'চারশ

নেই তা নয়, কিন্তু এই ম্যানুফ্যাকচার্ড ভিখিরীর সংখ্যাই কলকাতায় বেশী।

মধ্যে মধ্যে তাই মানুষের মুখের দিকে ক্যাবলার মতো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে ভাবি ঃ হে গোরিলা ওরাং শিম্পাজীর বংশধরগণ, অমৃতের পুত্র হোমো স্যাপীয়েন্স! কি বিচিত্র সভ্যতাই না গড়েছ! মানুষকেও কাঁচামালে পরিণত করে তাকে ভিখিরী ম্যানুফ্যাক্চার করছ! তোমাদের অসাধ্য কিছু নেই। জঙ্গলের জানোয়ারকেও তোমরা যে পদে পদে লজ্জা দিতে পারো হিংসায় ও বর্বরতায়, তা তো প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখছি।···ভাবছি, ভগবান আমাকে রক্ষা করুন এই ভিখিরীর সভ্যতার হাত থেকে।'

কলকাতার মেছুনী

"ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালী সকল
ধানভরা ভূমি ভাই মাছভরা জল।"

বুড়ো-আঙুল চোবার বয়স থেকে একথা আমরা দু-কান দিয়ে শুনে আসছি যে, তেলে জলে আর ভাতে বাঙালীর প্রাণ,—বাঙলার মাঠ ধানভরা আর বাঙলার নদনদী দীঘি পুষ্করিণী খানাডোবা বিল সব মাছভরা। বাঙালী 'মছলী খাতা হ্যয়' বলে ছাতু খায় যারা তারা বাঙালীকে ঠাট্টা করে, আর রুটি ও চাপাটির বদলে বাঙালারা ভাত খায় বলে তাদের বলা হয় 'ভেতো বাঙালী'। কিন্তু বাঙালী ভেতোই হোক আর মেছোই হোক, মাছ কেবল ভোজনবিলাসী বাঙালীর অপরিহার্য

আহার্য নয়, বাঙালীর বিশিষ্ট কালচারের সঙ্গে মাছ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। মাছধরার জন্য বাংলার জেলেরা যে কতরকমের পানসি ডিঙি নৌকো, কতরকমের জাল ফাঁদ ও হাতিয়ার, কত বিচিত্র কলাকৌশল আবিষ্কার করেছে, সে সম্বন্ধে একটা চলনসই ধারণাও যদি কেউ করতে চান তাহলে মিউজিয়ামের নৃতত্ত্ব-বিভাগের গ্যালারিতে গিয়ে দেখবেন। তা ছাড়া বাংলার জেলেরা নিজেরা মাছ ধরার গান রচনা করেছে এবং জেলেদের নিয়ে বাংলার পল্লীকবি ও সাহিত্যিকেরা যে কত গান, কত ছড়া, কত গাথা কবিতা রচনা করেছেন তার হিসেব নেই। বাঙলা দেশে তাই প্রাত্যহিক জীবনে যেমন মাছের একটা প্রকাণ্ড গুরুত্ব আছে, তেমনি বাঙালীর কালচারে জেলে-জেলেনীর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। কলকাতা শহরে আমরা জেলেকে জেলেই বলি, কিন্তু জেলেনীকে বলি মেছুনী। বাঙালীর জীবনে মাছের অখণ্ড প্রতিপত্তির জন্য, বাংলার-তথা কলকাতার দৈনন্দিন বাজারে মেছুনীই দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহারানী। বাজারে মেছুনীর বসার ভঙ্গি থেকে শুরু করে পাল্লা নাড়ার কায়দা, চালচলন, কথাবার্তা ইত্যাদি দেখলে শুনলে মেছুনীকে বাজারের 'আনক্রাউণ্ড কুইন্' বলতে হয়। মেছুনীকে সমীহ করেন না, বিশেষ করে কলকাতার মেছুনীকে, এমন সৎসাহসী বাঙালী ভদ্রলোক খুব কমই আছেন।

কলকাতা শহরে মেছুনীর প্রতাপ দিন দিন যে কিভাবে বেড়ে চলেছে তা শহরের বাঙালী বাবুরা নিশ্চয়ই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। অথচ মেছুনীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস নেই কারও। তার একটা প্রধান কারণ আমার মনে হয়েছে, মেছুনীরা যেমন গলা ছেড়ে গাল দিতে জানে, তেমনি মুখ নেড়ে হাত চোখ ঘুরিয়ে রসিকতা করতেও জানে। বাঙালী মাত্রেই রসিক, অতএব মেছুনীর বাপান্ত ভুলতে তাদের দেরী হয় না। আজকাল বিশেষ করে মেছুনীদের ছ্যামাক বেড়েছে বাজারে মাছ নেই বলে। পাকিস্তানের হাটে মাছ পচে যাচ্ছে, কলকাতার বাজারে মাছ নেই। কলকাতার মেছুনীদের মেজাজ তাই টং হয়ে থাকে সব সময়, মাথায় সযত্ন বিন্যস্ত খোপার বদলে দেখা যায় উর্ধ্বমুখী ঝুঁটি,

পাত্রবিশেষে কোথাও রঙ্গ করে, কোথাও আদর করে সোহাগ করে ডেকে চুপড়িতে মাছের মুড়োটা দিয়ে বলেছে: 'খোকাকে দিও গো বাবু! বলো, তার মাসী দিয়েছে।' আমার পূর্বপুরুষ হুতামপেঁচার নক্শাতেই মেছুনীদের চরিত্রের এই আভাস পাওয়া যায়। হুতোম লিখেছেন: "শোভাবাজারের রাজাদের ভাঙা বাজারে মেছুনীরা প্রদীপ হাতে ক'রে ওঁচা পচা মাছ ও লোনা ইলিশ নিয়ে ক্রেতাদের—'ও গামছা কাঁধে, ভালো মাছ নিবি ?' 'ও খেংরাগুঁপো মিন্সে, চার আনা দিবি' ব'লে আদর কচ্চে—মধ্যে মধ্যে দু-একজন রসিকতা জানাবার জন্য মেছুনী ঘেঁটিয়ে বাপান্ত খাচ্ছেন।" বাঙালী বাবুর সঙ্গে বাঙালী মেছুনীর এই যে একটা মধুর সম্পর্ক সেকালের বাজারে ছিল একালে তা আর নেই। রঙ্গ-রসিকতা বাবুরাও বোঝেন না, মেছুনীরাও ভুলে গেছে। ধার করেও বাঙালী একদিন মাছ খেতে ভোলেনি, ধার চাইলে মেছুনীরা ধারও তখন দিত, আর এখন ? এখন দু'পয়সা দর কমাবার কথা বললেই মেছুনীরা বঁটি তুলে তাড়া করে। মাছ না খেয়ে খেয়ে বাঙালীর ছেলেমেয়েদের মেজাজও বদলে যাচ্ছে। কথায় কথায় চোখ রাঙানি, মারামারি, কাটাকাটি, পটকাপটকি, বোমা, লাঠি, এসব লেগেই আছে। কেবল পাত্‌লা মটরের ডালের ঝোল, সজনের ডাঁটা আর কুমড়ো কচু খেয়ে খেয়ে কি আর উদারতা মানবিকতা ও সুকুমারবৃত্তি জীইয়ে রাখা যায় ? রুই-কাৎলার কথা বাদই দিলাম, বাজারে চুনোপুঁটি পর্যন্ত যেরকম তেজী হয়ে উঠছে, তাতে বাঙালীর বাঙালীত্ব খুব বেশীদিন বজায় রাখা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। একদিকে মাড়োয়ারী কালচার আর একদিকে আরবী কালচারের সাঁড়াশী-আক্রমণে বাঙালীর নিজস্ব কালচার যে ক্রমে উবে যাচ্ছে তা আজকের কলকাতার বাজারে মাছ ও মেছুনীর অবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। বাংলার তথা কলকাতার বাজারে মহারানী মেছুনী আজ করালবদনা চামুণ্ডার মূর্তি ধারণ করেছে। সেটা ভবিষ্যৎ বাঙলা ও বাংলীর অবস্থার একটা ইঙ্গিত মাত্র।

কলকাতার কেরানী

ড্যালহৌসী স্কোয়ার লোকে লোকারণ্য। গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজল। কুলকুল করে কেরানীর স্রোত বয়ে এল শিয়ালদহ, হাওড়া, শ্যামবাজার আর কালীঘাটের দিক থেকে। বেলা ন'টা থেকে শুরু হয়েছে কেরানীর জোয়ার, দশটার মধ্যে দু'কূল ছাপিয়ে গেল। ফুটপাথ থেকে আছ্ড়ে এসে কেরানীর ঢেউ পড়ল ভেঙে শহরের রাজপথে। ট্রাফিক জাম্ হয়ে গেল। ওদিকে বর্ধমান, এদিকে রাণাঘাট, নৈহাটি, বনগাঁ, বারাসাত, ওদিকে খড়দহ, বজ্বজ্ লক্ষ্মীকান্তপুর, ক্যানিং, ডায়মণ্ডহারবার, ওদিকে শ্যামবাজার, এদিকে টালিগঞ্জ, বেহালা, বালিগঞ্জ থেকে শত শত বাস, ট্রাম, ট্রেন প্রাণপণে দৌড়ে হয়রান হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে যাদের উগ্‌রে দিল কলকাতা শহরে, তারাও হাঁপাচ্ছে। তারা কেরানী, সংখ্যায় কয়েক লক্ষ হবে। বাসে, ট্রামে, ট্রেনে কেবল ঝাঁকুনি খেয়ে পেটের ভাত যাদের আবার চাল হয়ে গেল, কোমরের ও লিভারের ব্যথাটা আম্‌তার মৌনবাবার মাদুলি থাকা সত্ত্বেও হন্‌হন্ করে চলার জন্য কন্‌কন্ করে উঠলো, তারা কিন্তু কেউ একবারও একমিনিটের জন্যও দাঁড়াল না, দুরন্ত বেগে এগিয়ে চলল। কেউ চলল কাস্টম্‌স আফিসে, কেউ পোস্ট আফিসে, কেউ হাইকোর্টে, কেউ সেক্রেটারিয়েটে, কেউ গিল্যাণ্ডারে, ম্যাকেঞ্জীতে, র‍্যালী ব্রাদার্সে, কেউ ব্যাঙ্কে, কেউ ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীতে। একহাতে পান আর পরটা, আলু চচ্চড়ির টিফিনের কৌটো, আর একহাতে ছাতি কিংবা থলে কিংবা ফাইল। সকলেই এক-তীর্থযাত্রীর মতো একপ্রাণ! প্রাণের সঙ্গে প্রাণের এমনই যোগাযোগ যে সকলেই একমুখী হয়ে চলতে চলতে বিশ গজ ব্যবধানেও ট্রাফিকের ঘর্ঘরানির মধ্যে একজন কেরানীর সঙ্গে আর একজনের আলাপ-

আলোচনা, ঠাট্টা মস্করা চলছে। কেউ পেন্সনের কত দেরী এবং পেন্সন নিয়ে কিভাবে শহর থেকে দূরে বিঘে দুই জমি নিয়ে চাষবাস করবেন, গরু পুষে তার খাঁটি দুধ খাবেন, ছাগলী পুষে পাঁঠা বেচবেন, তাই নিয়ে আলোচনা করছেন—কেউ পঞ্চম কন্যার বিয়ের সমস্যা এবং তৃতীয় কন্যার হঠাৎ-বৈধব্যের বিষয় আলাপ করছেন—কেউ বলছেন দেশের হালচালের কথা, কেউ বাজারের তরিতরকারীর চড়া দামের কথা, কেউ গিন্নীর বাতের কথা, কেউ বা নিজের ডায়েবিটিস, ব্লাডপ্রেসারের কথা। ড্যালহৌসী-অভিমুখী সমস্ত ফুটপাথ যেন বাড়ীর বৈঠকখানা হয়ে উঠেছে। কেরানীরা যাচ্ছেন কলকাতার আফিসে।

কিছুক্ষণের মধ্যে চারিদিক স্তব্ধ হয়ে গেল, ফুটপাথের কলরব গেল থেমে। গির্জার ঘড়িতে তখনও সাড়ে দশটা বাজেনি। চারিদিকের ইট-পাথরের বিরাট অট্টালিকাগুলো যেন মুহূর্তের মধ্যে গিলে ফেলল কয়েক লক্ষ লোককে। রাস্তায় কেবল ফিরিওয়ালা, ব্যবসাদার আর ফাট্‌কা বাজারের দালালদের আনাগোনা চলছে। সকলেই যখন অফিসরূপী বিশাল বকযন্ত্রের গহ্বরে ঢুকে পড়ল, একজন শুধু ঢুকল না। ক্লাইভ স্ট্রীটের এক নামজাদা ব্যাঙ্কের সামনে ফুটপাথে ভজহরিবাবু ছাতিটা হাতে করে দাঁড়িয়ে রইলেন চুপ করে। ব্যাঙ্কে আজ পঁচিশ বছর তিনি কেরানীগিরি করছেন, কোনদিন এমন হয়নি তাঁর। হিসাবে একটা মারাত্মক রকমের গরমিল করে তিনি বেয়াকুফ হয়ে গেছেন। অনেক কাকুতি-মিনতি করে তদন্তের ফলাফল পর্যন্ত চাকরিটা তিনি বজায় রেখেছেন বটে, কিন্তু বিনা বেতনে সাসপেণ্ড করা হয়েছে তাঁকে। ব্যাঙ্কে প্রবেশ নিষেধ। রোজই তিনি অভ্যাসবশে একবার করে বাকি আর সকলের সঙ্গে ঢুকতে যান, কিন্তু বন্দুকধারী দ্বারোয়ান তাঁকে 'কাঁহা যাতা হায়' বলে বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে আটকায়। 'আরে বাবারে, কিয়া করতা হায়, হাম্ কি ব্যাঙ্কে ডাকাতি করতে যাতা হায়' বলে ভজহরিবাবু হাউমাউ করে চীৎকার করে ওঠেন। নতুন বি-কম পাস করা ছোকরা কেরানী ও টাইপিস্টদের দল ভজহরিবাবুর দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হেসে গেটের মধ্যে ঢুকে যায়। দু'চার জন প্রবীণ কেরানী দ্বারোয়ানকে

একটু ভদ্র ব্যবহারের অনুরোধ জানিয়ে ঢুকে যান। সকলেই জানে তাঁর রোজ হন্তদন্ত হয়ে আফিসে আসার কোন দরকার নেই, কিন্তু তবু তিনি কেন যে রোজ আসেন সেকথা কেউ বিবেচনা করবার সুযোগ পায় না। পঁচিশ বছরের অভ্যাস একদিনে ছাড়া যায় না। তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা, আফিসের এই ঘটনার কথা ভজহরিবাবু তাঁর স্ত্রীকে পর্যন্ত বলতে সাহস পান নি, কারণ তাহলে আর কোন উপায় ছিল না, বাড়িতে তিষ্ঠোনো দায় হত। তাই বেলা ন'টার সময় দু'মুঠো খেয়ে রোজই ভজহরিবাবু আফিসে বেরোন, আবার ছ'টার সময় বাড়ি ফেরেন। দশটার সময় ব্যাঙ্কের সামনে ফুটপাথে এসে দাঁড়ান এবং ঢোকার চেষ্টা ব্যর্থ হলে উপরের বারান্দার দিকে চেয়ে থাকেন। ব্যাঙ্কের বড়বাবু যখন দোতলার বারান্দা দিয়ে পাস্ করেন, ভজহরিবাবু তখন নিচের ফুটপাথ থেকে ছাতিসুদ্ধ হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বলেনঃ 'এই যে আমি এসেছি স্যার!' বড়বাবু শুনলেন কি দেখলেন সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আবার বেলা পাঁচটার সময় ভজহরিবাবু রেডী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। বড়বাবু যখন পাস্ করেন তখন নমস্কার জানিয়ে বলেনঃ 'তাহলে এখন যাই স্যার!' তারপর মুহূর্তের মধ্যে ভজহরিবাবু ফেরার পথের যাত্রীদের মধ্যে মিলিয়ে যান বুদ্বুদের মতন।

গির্জার ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। কারখানা এলাকায় আজকাল সাইরেন বাজে, কেরানী এলাকায় সাইরেন বাজে না। কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্লাইভ স্ট্রীট, ডালহৌসী স্কোয়ার উজাড় হয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ কেরানী আত্মসাৎ করে গম্গম্ করছিল যেসব পাথুরে অট্টালিকা, কয়েক মিনিটে সমস্ত উগ্‌রে দিয়ে তারা নিঃস্ব হয়ে গেল। আবার কলরব-মুখর হয়ে উঠল চারিদিকের রাস্তাঘাট ফুটপাথ। ডালহৌসী-অভিমুখী কেরানীর স্রোত বেলা দশটায় যেন সাগরাভিমুখী নদীস্রোতের মতো মনে হয়। কিন্তু বিকেলে ছুটির সময় তা মনে হয় না। অজস্র খরস্রোতা ভিন্নমুখী পাহাড়ী নদীর মতো কেরানীর প্রবাহ চারিদিকে বয়ে চলে যায়, পুবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে। দক্ষিণের প্রবাহে ভজহরিবাবুর ছাতির ডগাটা একবার কাঁধের উপর দিয়ে সোজা হয়ে ঠেলে উঠে কোথায় যে মিলিয়ে যায় অজস্র

মাথার তরঙ্গের মধ্যে, তার কোন হদিসই আর পাওয়া যায় না। তারপর যদি কেউ তাঁকে দেখতে চান তাহলে ফিল্ম শটে দেখুন।

মিড্‌শট্ অনবরত কাটতে কাটতে দেখতে হবে। প্রথমে ভজহরিবাবুকে দেখবেন এক আম-লিচুওয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দর করছেন, দরে পোষাল না। মাথা গুণতি একটা করে আম কিনতে গেলেও দশটি আম কিনতে হয়, লিচু দুটো করে হাতে দিতে গেলেও বিশটে। কেনা সম্ভব নয়। রেডীমেড জামা-কাপড়ের হকারের সামনে ভজহরিবাবু দাঁড়ালেন। সকলের নগ্নতা ঢাকতে গেলে আরও অন্তত গোটা পাঁচেক প্যাণ্ট কিনতে হয়। অসম্ভব ব্যাপার। শায়া-সেমিজ, কাপড়, লজেন্স, বিস্কুট সমস্ত কাটতে কাটতে চলে যান, তারপর লঙ-শটে দেখুন অজস্র ডেলী-প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে ধাক্কা-ধাক্কি করে ভজহরিবাবু বারুইপুরের ট্রেনে উঠলেন। মিড্‌শটে দেখুন, কামরার মধ্যে তুমুল তর্ক হচ্ছে বাস্তুহারা সমস্যা নিয়ে, চ্যাঙড়া একপাল ক্যানভাসার দাঁতের মাজন থেকে চানাচুর ভাজা পর্যন্ত বিক্রি করছে, এককোণে চুপটি করে ভজহরিবাবু বসে আছেন।

এইবার ক্লোজ-আপে ভাল করে ভজহরিবাবুকে দেখুন। এতক্ষণ তাঁকে ভিড়ের মধ্যে দেখেছেন, ঠিক চিনতে পারেন নি। ব্যাঙ্কের পঁচিশ বছরের কেরানী ভজহরিবাবুকে চিনতে হলে আরও কাছে থেকে ভাল করে দেখতে হবে। গাল দু'টো চুপ্‌সে গেছে, চোখের ঝাপসা দৃষ্টি চশমার কাচেও স্বচ্ছ হয় না। লক্ষ লক্ষ টাকার হিসেব তিনি আই-কম্ বি-কম্ পাস না করেও এক এনট্রান্সের জোরেই আজ পঁচিশ বছর ধরে করে আসছেন, কোনদিন গরমিল হয় নি। বাড়িতে চালের জালায় যখন ইঁদুর মিথ্যে ঘুরপাক খেয়েছে, দু'দুটো ছেলে যখন একসঙ্গে টাইফয়েডে ভুগেছে এবং পাঁচ পয়সার হোমিওপ্যাথি হালে পানি পায় নি, সে রকম অনেক দিন কেটেছে ভজহরিবাবুর জীবনে, তবু ডিপোজিটরদের লক্ষ লক্ষ নোটের তাড়া গুণতে ভুল হয় নি কোনদিন। আর আজ কি এক রহস্যা-বৃত ফাইলের চক্রান্তে তিনি যে শুধু পথে বসেছেন তাই নয়, তাঁর নামে অসাধুতার অপবাদ পর্যন্ত রটনা করা হয়েছে। মাগ্‌গী ভাতা নিয়ে একশ

বাহাত্তর টাকা মাইনে পেয়ে তিনি কোটি টাকা খোলামকুচির মতন নেড়েছেন-চেড়েছেন, কিন্তু জীবনে কোনদিন ঘুমের ঘোরেও লক্ষপতি হবার স্বপ্ন দেখেন নি। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের ফাটকা-বাজারের হার-জিৎ কোন্ যাদুশক্তিতে ফাইলের ভেতর গরীব কেরানীর হিসেবের গরমিলে পরিণত হয়, তা তিনি জানেন না, রাতারাতি কর্মচারীদের অজ্ঞাতসারে পর্যন্ত কিভাবে বড় বড় ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, হাজার হাজার গৃহস্থ পরিবার যথাসর্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখিরী হয়, আদার ব্যাপারী চুনোপুঁটি কেরানী তিনি, কাজ কি তাঁর এই আজব দুনিয়ার এতো কূট-চক্রান্ত জানবার! সমাজের জোচ্চুরি জালিয়াতি নিয়ে তাঁর মাথা ঘামিয়ে লাভ কি, তিনি যে লয়াল অনেস্ট কেরানী তাতেই তিনি খুব খুশী। কিন্তু আজ তাঁর মতো কেরানীর লয়ালটি ও অনেস্টিকে পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করেছে ব্যাঙ্কের বড়কর্তারা। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম এবং কর্তার অপকর্মের অভিশাপ আজ কেরানী ভজহরিবাবুকেই বহন করতে হচ্ছে।

এত কথা যে ভজহরিবাবু কোনদিন ভেবেছেন বা এখনও ভাবছেন, তা নয়। তিনি ভাবছেন আজ ট্রেনে বসে তাঁর সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনের কথা। একটানা দাম্পত্য বন্ধন কেরানী জীবনের অভাবের ঘুর্ণি-ঝড়ে শত টুক্‌রো হয়ে ছিঁড়ে গেছে ইতিমধ্যে, হাজারটা গেঁট বেঁধে টেনে রাখা হয়েছে সেই বন্ধন। আজ হাজার গাঁটছড়া বাঁধা সেই বন্ধন বুঝি একেবারে ছিঁড়ে যায়। আর দু'দিন পরে মাইনের টাকা না পেলে স্ত্রীর কাছে সব ধরা পড়বে, আফিসে আসার নাম করে ব্যাপারটা চাপা দিয়ে রাখা যাবে না। তখন কি হবে?

সোনারপুর স্টেশনে নেমে মন্থরগতিতে ঘরের দিকে এগিয়ে চললেন ভজহরিবাবু। আর একটু এগিয়েই সামনে কেরানীর সেই চিরন্তন সংসার, সদাজাগ্রত স্ত্রী আর একপাল ঘুমন্ত ছেলেপিলে নিয়ে রাবণের চিতার মতো দাউ দাউ করে জ্বলছে। মাসান্তের একশ বাহাত্তর টাকা যার মধ্যে পড়লে এক ফোঁটা ঘৃতাহুতির মতো দপ্ করে জ্বলে উঠে ছাই হয়ে যায়, আজ সেখানে শূন্য পকেটে তিনি ফিরছেন। তবু এগিয়ে চললেন ভজহরিবাবু। দুর্গম পথের দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর মতো তিনি এগুতে থাকলেন।

কলকাতা শহরের লক্ষ লক্ষ নিরীহ নিরুপদ্রব কেরানীর মূর্তিমান প্রতিনিধি ভজহরিবাবু। জীবনের কোন আশা নেই, ভরসা নেই, কোন ইচ্ছা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, কোন বিদ্বেষ নেই, অভিযোগ নেই। তবু নিষ্ঠুর কুচক্রী মহানগরের ষড়যন্ত্রে শান্তিপ্রিয় কেরানীর জীবনও এমনি করে আতঙ্কে অসাড় হয়ে আসে, কেরানীরাই হয় শহরের দালালদের ব্যঙ্গবিদ্রূপের পাত্র। কলকাতা শহর ধনপতি ও দালালদের স্বর্গরাজ্য, নেপোরাই এখানে দই মেরে বেড়ায়, কেরানীরা শাক-কচুপাতার ছিব্‌ড়ে চোষে। দালালরাই তাই কলকাতা শহরে তুম্বার মতো নাদুশ-নুদুশ হয়ে ওঠে, আর কেরানীরা চুপসে শুকিয়ে ছোবড়া হয়ে যায়।

ঘরের সামনে এসে ভজহরিবাবু থমকে দাঁড়ালেন। আতঙ্কে দেহটা যেন আড়ষ্ট হয়ে এল। ভেতরে কেরানীর সংসার অনির্বাণ চিতার মতো জ্বলছে। ব্যাঙ্কের হিসেব গরমিলের মিথ্যা অভিযোগে ভজহরিবাবুর কেরানী-জীবনের সমস্ত হিসেব এতদিনে বুঝি সত্যিই গরমিল হয়ে যায়।

কলকাতার দালালবাবু

বাবুর নাম রাধিকা। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সঙ্গিনী শ্রীরাধা নন, ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রীরাধিকারঞ্জন। হামাগুড়ি দিয়ে যেসময় থেকে ভূপৃষ্ঠে তিনি সরীসৃপের মতো চলতে আরম্ভ করেছেন, সেই সময় থেকেই তাঁর নাম ভাষা-বিজ্ঞানের নিয়মে, সোহাগের টানে 'রাধিকা' থেকে 'রাধা; রাধা, রাধু, রাদু'-তে পরিণত হয়েছে। পায়ে হাঁটতে শিখে পাঠশালা যাওয়া পর্যন্ত

নামটা সঙ্কুচিত বা বিকৃত হয়নি, রাধিকারঞ্জনই ছিল। তৃতীয়বার ট্রাই করার পর বাইশ বছর বয়সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় থার্ড ডিভিশনে উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা করজোড়ে বাড়িতে আসতে আরম্ভ করলেন। অবশেষে একদিন যূথিকারানীর দিদিমা পিসিমারা বললেন: 'পাসকরা ছেলে, তার ওপর কার্তিকের মতন চেহারা, জামাই করতেই হবে।" জামাই হতেই হল। রাধিকা ও যূথিকার শুভমিলনের পর যূথিকার শ্বশুর একদিন রাধিকাকে ডেকে বললেন: 'বাপু হে! এইবার চরে খাবার চেষ্টা করো। বিয়ে করেছ, দুদিন পরে ছেলের বাপ হবে, নিজের আঁচানোর ব্যবস্থা নিজে করে নাও।' রাধিকার অভিমান হল, কারণ কথাগুলো যূথিকা শুনেছে আনাজ কুট্‌তে কুট্‌তে। সারাদিন কাটার পর ঘোর বর্ষার রাতটি যখন এল, রাধিকা তখন ভাঙাগলায় অভিভূতের মতো ডাক দিলেন: 'জুঁই!' বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি হচ্ছে, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। অর্থাৎ অবস্থাটা হল—

এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘন ঘোর বরষায়—

তবু বলতেই হল কথাগুলো শেষ পর্যন্ত। রাধিকা পিতৃগৃহ ত্যাগ করে বাইরের পৃথিবীতে জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপ দেবে। সাঁত্‌রে যতদিন না কূল পাবে ততদিন পিতার অন্ন স্পর্শ করবে না। রাধার হরধনুর্ভঙ্গপণ শুনে জুঁইয়ের পাপড়ি যেন শুকিয়ে গেল। জুঁই গেল বাপের বাড়ি, রাধা গেলেন বাপের কথা মতো বাইরে চরতে। বন্ধুবান্ধব শ্বশুর শাশুড়ী শালাশালী মামা-শ্বশুর পিস্ শাশুড়ী সকলেই পরামর্শ দিলেন: 'চাকরির চেষ্টা ক'রো না রাধু, দালালি করো, যুদ্ধের বাজার, চেহারা ভালো, কথা-বার্তা কইতে পারো, পয়সা পাবে।' মোটামুটি একটা ডিসেন্ট স্টার্ট নেবার জন্য শ্বশুর ট্রামের একখানা অল্‌সেক্‌শান টিকেট, কয়েকটা ট্রাউজার ও বুশসার্ট এবং একটা পোর্টফোলিও কিনে দিলেন। রাধিকারঞ্জন দালালি করাই সাব্যস্ত করলেন, কারণ শেষ পর্যন্ত গণৎকারও হাত দেখে বললেন যে, দালালিতেই তাঁর অর্থাগম হবে। বাঙালী জীবনের এই

বৈজ্ঞানিক মিউটেশনের ফলে তাঁর নামটিও তারপর থেকে রূপান্তরিত হয়ে হল 'রাডু সেন।'

কিছুদিন যেমন সব দালালকেই করতে হয়, রাডু সেনকেও তাই করতে হল। ট্রাউজার পরে বুশসার্ট উড়িয়ে, সিগ্রেট ফুঁকে রাডুবাবু কলকাতা শহরটা চরে বেড়ান, অথচ মাথা গোঁজার কোন চুলো নেই। ভোরে উঠে টালিগঞ্জে মাসীর বাড়ি চা-টোস্ট মারেন, দুপুরে শ্বশুরবাড়ি অন্ন লোটেন, শালার আফিসে আড্ডা দেন, মামাশ্বশুরবাড়ি বিকেলে জলপান করেন, বন্ধুর বাড়ি গিয়ে সিগ্রেট ফোঁকার ব্যবস্থা করেন, তারপর রাত বেশ গভীর হলে সুড়্ সুড়্ করে খিড়কির দরজা দিয়ে শ্বশুরবাড়ি ঢুকে দুটি ভাত মেরে শুয়ে পড়েন। দালালরা চিরকালই জীবনযুদ্ধে গেরিলা ট্যাক্‌টিক্সের পক্ষপাতী। এইভাবে নিজের খাওয়া-দাওয়া চলাফেরার ব্যাপারটা রাডু-বাবু রোজ গেরিলা-কৌশলে বেশ চালিয়ে যান, উত্তিষ্ঠ হলেও কেউ কোন উচ্চবাচ্চ করতে পারে না। হাতে কোন সময়ই বিশেষ কোন কাজ থাকে না, সুতরাং সব সময়ই রাডুবাবুর একটা হন্তদন্ত ভাব, চলাফেরায় কথা-বার্তায়। সকালে উঠে টালিগঞ্জের মাসীর বাড়ি চা-টোস্ট মেরে চোটাখোর বেণের ঘরে ও বড়বাজারে টাকাওয়ালা মেড়োদের গদিতে একবার করে হাজ্‌রে দিতেই হয়। তা ছাড়া কার বাড়ি বিক্রি হবে, কে জায়গা কিনবে, কে টাকা ধার করবে, কে নতুন লিমিটেড কোম্পানী গড়বে, কে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মোটর কিনবে, কার ফার্নিচার সাপ্লাই করতে হবে, কে ইন্সিওর করবে, কার মাল আসবে জাহাজে, কোন্ কেমিস্ট্রিবর্জিত কেমিক্যাল কোম্পানীর মাল চালাতে হবে বাজারে—এসব খবর রাখা দালালদের প্রধান কাজ, রাডুবাবুকেও তাই খবর রাখতে হয়। দু-পয়সা কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা হয় তাতে পেট চলার মতো ব্যবস্থা প্রায় হয়ে উঠেছে। এদিকেও শ্বশুরবাড়ির জোয়ান শালারা ক্রমে বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করছে, অরক্ষণীয়া শালীরাও মুচকি হাসছে। শাশুড়ীও আর 'বাবা বাছা' বলে কথা বলেন না, দেখা হলেই জিগ্যেস করেন, 'কিছু করতে পারলে বাধু?' সারাদিন হন্যে কুকুরের মতো এ-দরজায় সে-দরজায় ঘোরার পর ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরলে বৌ দাঁত খিঁচিয়ে অভ্যর্থনা করে এবং সারারাত

চ্যাটাং চ্যাটাং কথার ঝাঁটা দিয়ে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেয়। অপমানিত বোধ করে রাডুবাবু বৌ নিয়ে আলাদা বাসা করেন।

ভাগ্যটা যেন একটু ফিরল বলে মনে হল। এর মধ্যে দু-চারটে মেড়োর গদি ঠিক হয়ে গেছে, জমিবাড়ি কেনা-বেচার ক্লায়েন্টও কিছু জানাশুনা হয়েছে, দু-একটা গ্যারাজ ঘরের কেমিক্যাল কোম্পানীর এজেন্সীও ঠিক হয়েছে। তা ছাড়া সবচেয়ে সেরা দালালির খবর তিনি ঘুরেফিরে শহরের পাকা দালালদের কাছ থেকে যোগাড় করেছেন। সেকালের শহুরে বেণে-বাবুরা দালাল চাকর রাখতেন, দালালেরা শিকার ধরে আনত, বাবুরা আড়ে গিলতেন। আজকাল যে সে-সব বেণেবাবু একেবারেই নেই তা নয়, আছেন এবং তাঁদের শিকার ধরার দালালও আছে। কিন্তু যুদ্ধের বাজারে আর তার সঙ্গে দুর্ভিক্ষের মরশুমে, তার চেয়েও বড় সুযোগ এসেছিল দালালদের জীবনে কলকাতা শহরে। বিদেশী সৈন্যদের শিকার ধরার কাজে কাঁচা পয়সা আছে এবং সে সন্ধান পাকা দালালরা রাডু সেনকে দিয়ে দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে রাডুবাবু শিকার ধরার বিশেষ কাজটিতে যেরকম যোগ্যতার পরিচয় দিলেন তাতে মার্কিন নিগ্রো ব্রিটিশ সকলের কাছেই তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। রাডু সেন কলকাতার নামজাদা দালাল হয়ে উঠলেন, এদিকে যূথিকারানীরও পায়ের জুতোর হিল্ ক্রমে উঁচু হতে লাগল, চলার ভঙ্গি বদলে গেল, পাড়াপড়শীর সঙ্গে কথাবার্তার ঝাঁঝ বাড়ল, 'মানে-না-মানা' থেকে 'দিল্‌মে-চাক্কু' শাড়ির আঁচল উড়ল বালিগঞ্জের দখ্‌নে হাওয়ায়।

জাহাজ থেকে নতুন মাল নামলে যেমন পাইকেরে ছেঁকে ধরে, সেই রকম সেকালে পাড়াগেঁয়ে জমিদার ও বড়মানুষ শহরে এলেই দালালরা তাঁকে ছেঁকে ধরত। বাড়ি ভাড়া করে দেওয়া, গাড়ি যোগাড় করা, খ্যামটা নাচের বায়না করা, সাত পুকুরের বাগান দেখানো, এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়াম, হাওড়ার ব্রিজ, বাগবাজারের খালের কলের দরজা, শহুরে বাবুদের সাজানো বৈঠকখানা, নামজাদা নৈশবিহারের আড্ডায় নিয়ে বেড়ানো, ইত্যাদি সব কাজ করতেন। এ ছাড়া ইংরাজী কেতায় জমিদার বাবুদের ডিকাণ্টরে ব্রাণ্ডী পান করানো, টেবিলে খাওয়ানো, কমোডে

বসানো ইত্যাদি শিক্ষাও দালালরা দিতেন। আজকাল আর দালালদের তা করতে হয় না। তবু যুদ্ধের সময় সেকালের এই হালচাল বিদেশী সৈনিকেরা অনেকটা ফিরিয়ে এনেছিল বলতে হবে। স্টেশন থেকেই অফিসারগোছের লালমুখো কাউকে পাকড়াও করে রাডুবাবু তাঁর বরাদ্দ হোটেলে নিয়ে তুলতেন, তারপর তাকে যাবতীয় মাল সাপ্লাই করে এবং সমস্ত কম্‌ফর্টস দিয়ে যা দালালি তিনি পেতেন তা মিনিস্টারদের মাইনের চেয়ে অনেক বেশী। যুদ্ধের হিড়িকে এবং দুর্ভিক্ষের সুযোগে অনেক ভদ্রলোকের ছেলেকে তাই গাড়িঘোড়ায় চড়ে দালালি করতে দেখা গেছে, অনেক রেস্তহীন লাখপতি চারবার ইনসল্‌ভেন্ট হয়েও দালালি ধরেছেন এবং অনেক ক-অক্ষর-গো-মাংস পদ্মলোচন দালালির দৌলতে 'কলাগেছে থাম' ফেঁদে ফেলেছেন এবং রোভার গাড়ি চড়ে বেড়িয়েছেন। রাডু সেন অতদূর না এগুতে পারলেও, ছোট্ট একখানা স্ট্যাণ্ডার্ড গাড়ি কিনলেন এবং বালিগঞ্জে ফ্ল্যাট ভাড়া করলেন। 'জুঁইও' ফুটে উঠলেন পাপড়ি মেলে। রাডু সেন শুধু দালাল নন এখন, কালচারের একজন রীতিমত পাণ্ডাও বটে। জনসন থেকে মাও, আইনস্টাইন থেকে ফজলুল হক, অ্যাটম বোমা থেকে অজন্তার শিল্পকলা—সমস্ত বিষয় তাঁর মুখে দিনরাত যেন খৈ ফোটার মতো ফুটছে। তাঁর ড্রয়িং-রুমটি বালিগঞ্জ অঞ্চলের একটা অন্যতম কৃষ্টিকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। গানবাজনার মজলিস বসে, সাহিত্যের বৈঠক হয়, কালচার বিতর্ক চলে, রাডু সেন ও তাঁর স্ত্রী লিডারী করেন।

দালালি কাজটা ভাল, নেপো মারে দইয়ের মতো, এতে বিলক্ষণ রস আছে। সারা কলকতা শহরটাই দালালদের হাতের মুঠোয়। কলকতার কালচার, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার সবই দালালদের কৃপায় চলে। কেবল মধ্যে মধ্যে রস যখন শুকিয়ে যায়, দালালদের তখন দুর্দিন আসে। আজ-কাল আর যুদ্ধের বাজার নেই, চারিদিকে মন্দা, দালালিও অচল। রাডু সেন এখন 'স্ট্যণ্ডার্ড' গাড়িটা বেচে দিয়েছেন, ফ্লাটটাও বদলেছেন। তবু তাঁকে চেনা যায়। 'বাইরে কোঁচার পত্তন ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন', সং সেজে আজও তিনি কলকাতার পথে ঘুরে বেড়ান। ডালহৌসী স্কোইড

স্ট্রীটের ভিড়ের মধ্যে নেপোদের দলে আজও তাঁকে দেখা যায়। আজও তিনি ওভারলোডেড বাসে ট্রামে মেজাজ দেখান, লেডীদের শিভালরি দেখান, পলিটিক্স আলোচনা করেন, কন্‌ডাক্টরদের চোখ রাঙিয়ে ইংরেজী-হিন্দীতে গালাগাল দেন, ধারে জিনিস কেনেন, এক কাপ চা নিয়ে রেস্টুরেন্টে আড্ডা জমান, মুখে লঙ্কা মারেন এবং বাড়িভাড়া না দিয়ে রাতারাতি সরে পড়েন। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে তাঁকে দেখলেই চেনা যায়, কারণ তিনি কলকাতার অবিনশ্বর দালাল।

কলকাতার পাগল ?

বছর নব্বুয়ের কম বয়স হবে না, কিন্তু জিগ্যেস করলেই একশ বলার অভ্যাস আছে। কলকাতা শহরের বেওয়ারিশ বুড়োদের মধ্যে অন্যতম একজনের কথা বলছি। আপনারা কেউ তাকে দেখেছেন কি না জানি না। দেখেছেন নিশ্চয়ই, তবে বুড়োর এমন একটা কিছু চটকদার বৈশিষ্ট্য নেই যে, লক্ষ জনতার সমুদ্রের মধ্যে তাকে মনে থাকার মতো নজরে পড়বে। যদিও বা কেউ দেখে থাকেন তাহলেও নিশ্চয় ভুলেও তার সঙ্গে কোনদিন কথাবার্তা বলে আলাপ করেন নি, করার প্রবৃত্তিও হয়নি। আমার সঙ্গে এই বুড়োর রীতিমত আলাপ ছিল। শহরের আঁস্তাকুড় ঘাঁটার একটা নিউরসিস্ আমার আছে। দেখেছি, পাথরের প্রাসাদের চাইতে শহরের ডাস্টবিনে আঁস্তাকুড়ে, রাজপথের অলিগলিতে এই শহুরে সভ্যতার পাঁজরগুলো ঝক্‌মক করে ওঠে। তাই বুড়োরা আমার কাছে নতুন ফিল্মের

চাইতে অথবা ভয়েল-জর্জেট-জড়িত শহুরে মেয়েদের চাইতে অনেক বেশী রোমান্টিক ও ইন্টারেস্টিং বলে মনে হয়েছে। ভোরের ট্রামে গঙ্গাস্নানযাত্রী বৃদ্ধদের সঙ্গে অনেকদিন নিজে বকধার্মিক সেজে গঙ্গাস্নানে গেছি, আর ঘাট পর্যন্ত সারাটা পথ তাদের আলাপ- আলোচনা মশ্‌গুল হয়ে শুনেছি। রিটায়ার্ড বুড়োদের সান্ধ্য মজলিস কোনদিন কোন কর্পোরেশন পার্কের কাঠের বেঞ্চিতে বসে মন দিয়ে শুনেছেন কিনা জানি না। যদি শুনে থাকেন, আর যদি কোনদিন গঙ্গার ঘাটে তাদের সহযাত্রী হয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই দেখেছেন, জীবনের সমস্ত ব্যর্থতার গ্লানি, সমস্ত টুঁটি-টিপে-মারা ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার একটা অসহ্য উত্তাপ কিভাবে তাঁদের কথা-বার্তার ভেতর দিয়ে ছিট্‌কে উপ্‌চে পড়ে। লক্ষ্য করে দেখবে, তারুণ্য ও যৌবনের প্রতি এই বুড়োদের একটা বিজাতীয় ঘৃণা আছে, জীবনের বাঁধভাঙা উদ্দামতার প্রতি একটা প্রচণ্ড আক্রোশ আছে। এই সব পেন্‌সনভোগী বাগানবিলাসী পাকা আমের মতো বুড়োদের কথা আমি বলছি না, ডালডা আর ভেরেণ্ডার বীচির তেল খেয়ে তাঁদের সমালোচনা করার মতো বুকের পাটাও আমার নেই। আমি যে বুড়োর কথা বলছি, সে বুড়ো কলকাতার রাজপথের ভিক্ষুক দার্শনিক। আমার বুড়োর কোন জুড়ি নেই শহরে, সে একক ও অদ্বিতীয়।

ধর্মতলায় গির্জের পাশের ফুটপাথে বুড়ো রোজ দাঁড়িয়ে থাকত। কতদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকত জানি না। কলকাতার 'লড়্‌কে লেঙ্গে' দাঙ্গার সময় বীভৎস নরহত্যালীলার মধ্যে বুড়োকে প্রথম আমি আবিষ্কার করি। দেখে কোনদিন বুড়োকে ভিখারী বলে মনে হয়নি। চেহারায় মুখে চোখে এমন একটা প্রশান্তির ভাব, হাবভাবে এমন একটা শ্রমণসুলভ নিরাসক্তি যে দেখলেই আকৃষ্ট হতে হয় এবং কাছে গেলে শ্রদ্ধায় মাথা হেঁট হয়ে আসে। ভিক্ষা সে কারও কাছে কোনদিন চায় না, কেউ স্বেচ্ছায় দিলে গ্রহণ করে, একটু হেসে কৃতজ্ঞতা জানায়। দেখে কথা বলার ইচ্ছা হত রোজ, কিন্তু সুযোগ পেতাম না। একদিন নির্জন সন্ধ্যায় জনবিরল ফুটপাথে বুড়োকে দেখলাম রাস্তার ফ্যাকাসে আলোয় একদৃষ্টে আকাশের দিকে ঘোলাটে চোখ দুটো মেলে চেয়ে আছে। পিছনে খৃস্টানদের গির্জে,

সামনে মুসলমানদের মসজিদ, কাছাকাছি অবশ্য হিন্দুদের কোন দেবমন্দির নেই। তবু হঠাৎ এই সান্ধ্য পরিবেষ্টনের মধ্যে বুড়োকে দেখে মনে হল ফিলিস্তিনের পথে যেন যীশুখৃস্ট দাঁড়িয়ে আছেন। সাদা লম্বা দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে, মনে হয় বুড়ো যেন মক্কার পথে কোন মুসলিম দরবেশ ফকির। চোখ বুজলে বুড়োর শান্ত উদাসীন মুখখানা যখন ভেসে ওঠে, তখন মনে হয় রাজপথে সর্বত্যাগী রাজপুত্র গৌতমবুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন।

কাছে এসে বুড়োকে 'তুমি' বলার সাহস হল না। মুখ থেকে আমার প্রথম প্রশ্ন বেরিয়ে এল ; 'আপনি কি হিন্দু, না মুসলমান ?' আমার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বুড়ো বলল ঃ 'তোমার কি মনে হয় বাবা !' সসঙ্কোচে উত্তর দিলাম ; 'হিন্দুও মনে হয়, মুসলমানও মনে হয়।' কিছুক্ষণ নীরব থেকে বুড়ো গম্ভীর স্বরে বলল ঃ 'আমি হিন্দু।' দেখলাম, বুড়োর সমস্ত শরীরটা একবার যেন কেঁপে উঠলো, চোখ দু'টো আকাশের দিকে ক্রমে স্থির নিবদ্ধ হয়ে এল। আমিও চম্‌কে উঠে বললাম ঃ 'আপনি হিন্দু ? এখনও ধর্মতলায় বেঁচে আছেন যে !' বুড়ো বলল ঃ 'হ্যাঁ, বেঁচে আছি বাবা। ধর্মতলায় ধম্মের খেলা দেখছি।' 'আপনাকে ওরা মারল না কেন ?'

'ওরাই জানে। আমার একটা দশ বছরের নাতি ছিল বাবা, শেষ জীবনের সম্বল। সামনে যেদিন সেটিকে মেরে ফেলল—আর আমাকে কিছু বলল না—সেদিন, সেদিন'—এদিক ওদিক ফিরে বুড়ো হাত নাড়তে থাকল—'সেদিন, এই গির্জে, ঐ মস্‌জিদ, আর—ঐ—ঐ—।' আত্মসম্বরণ করে বুড়ো বলল ঃ 'কিচ্ছু না বাবা ! আমি হিন্দুঁও নই, মোছলমানও নই, আমি চিড়িয়াখানার জন্তু।'

গভীর মর্মবেদনার ঔরস থেকে যখন বিদ্রূপের জন্ম হয়, তখন কত মিলিয়ন ভোল্ট্‌ শক্তি নিয়ে যে সে সামান্য কথায় আত্মপ্রকাশ করে তা কল্পনা করা যায় না। অনুভব করে শিউরে উঠলাম বুড়োর কথায়, মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বিদ্যুৎ-স্পর্শে কেঁপে উঠল যেন। মনে হল,

ফলিং টাওয়ার্স
জেরুজালেম এথেন্স আলেকজান্দ্রিয়া
ভিয়েনা লণ্ডন (ক্যালকাটা)
আন্‌-রিয়েল্‌

গির্জে মস্‌জিদ মন্দির সমস্তই সেই ইংরেজ কবির ভাষায় মনে হল 'ক্র্যাকস অ্যাণ্ড রিফর্মস অ্যাণ্ড বার্স্টস ইন দি ভায়লেট এয়ার।' 'কিয়া হ্যায়' বলে পিছন থেকে বিহারী পুলিশের ওয়ার্নিং শুনলাম। একপাল লোমওঠা নেড়ী কুকুর একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। গির্জের ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত দশটা বাজল। ধর্মতলা জনশূন্য। বুড়োকে ছেড়ে ভয়ে কাঠ হয়ে রিক্‌শায় উঠে ঠুং ঠুং করে ঘরের দিকে চললাম। কলকাতার খুনীরা তখন রাস্তায় টহল দিতে বেরিয়েছে।

কয়েকদিন পরের কথা বলছি। সেই একই জায়গায় ফুটপাথের একপাশে বসে বুড়ো দেখি গাঁজার কল্‌কেয় দম দিচ্ছে প্রাণপণে। কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলাম : 'কেমন আছেন ?' 'কে' বলে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বুড়ো বলল : 'ওঃ—সেই তুমি এসেছ আবার ! বসো বসো বাবা !' বললাম : 'গাঁজা খান কেন ?' অট্টহাসি হেসে বুড়ো বলল : 'হুঁ ! তা ছাড়া আর কি করার আছে বাবা ! তুমি বুঝি ধরো নি এখনও ?' বললাম : 'না, ওটা অভ্যেস করিনি।' 'ভুল করেছ বাবা' বুড়ো বললে, 'যদি বাঁচতে চাও এই জাহান্নমে, তাহ'লে তাড়াতাড়ি গাঁজা ধরো বাপ্‌ আমার !' মনে হল, বুড়ো প্রকৃতিস্থ নয়, তাই উঠছিলাম। উঠতে দেখে বুড়ো বললে : 'উঠছো কেন, বসো, বাবা, বসো, ধম্মতলায় একটু ধম্মের কথা শোনো।'

তারপর ধর্মের কথা বুড়োর কাছ থেকে যা শুনেছি তা একটা ইতিহাস-বিশেষ, এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব নয়। শুনলাম, মুসলমানরা এদেশে এসেছে, হিন্দুদের জবাই করেছে, বোষ্টমদের টিকি কেটেছে, শাক্তদের চুল কামিয়ে দিয়েছে, বামুনদের পৈতে ছিঁড়েছে, কায়েতদের কাছা খুলেছে, মন্দির দেবদেউল ভেঙেছে, দেবতাদের পথের ধুলোয় গুঁড়িয়ে ফেলে দিয়েছে। শুনলাম, খৃস্টানরা এসেছে এদেশে, হিন্দু'র ধর্মের কেচ্ছা করে পাদ্‌রীরা ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলিয়েছে এই কলকাতা শহরেই।

তারপর হিন্দুরা ? বেদ উপনিষদ যাদের মুখের বুলি তারা দেবতার পুজোয় নর-বলি দিয়েছে এই সেদিন পর্যন্ত, বর্ধমানের রঙ্কিণীশ্বরী, হুগলীর সিদ্ধেশ্বরী আর কলকাতার কালী-মন্দিরে। জ্যান্ত লোককে গঙ্গাজলির নামে গঙ্গায় ডুবিয়ে মারা, বুড়ো স্বামীর চিতায় উঠে বালিকা বধূদের সহমরণ, রথের চাকার তলায় জীবন বলিদান দেওয়া, মা-কালীর সামনে জিব্ কেটে রক্ত দেওয়া—এসব তো কলকাতা শহরেই এই সেদিনও হয়েছে এবং সবই সেই ধর্মের নামে। বুড়ো নিজে দেখেছে অনেক কিছু, শুনেছেও নিজে বাপ-ঠাকুরদার মুখে। বুড়ো বললে, 'আজকাল হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন হয় না। আমরা দেখেছি এই চুঁচড়োতে শাক্ত বোষ্টমের ঝগড়ায় দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন হয় নি, রাস্তায় বৃষ্টিতে গলে গেছে মা দুর্গা।'

'এই কি মানুষের ধর্ম বাবা ? আর এই কি তোমাদের সভ্যতা ?' বলে বুড়ো গাঁজায় একটা সুখটান দিল। অন্ধকারে কে একজন এসে বুড়োকে দু'খানা রুটি দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাছে। দেখলাম, পেত্নীর মতো একটি স্ত্রীলোক—ধর্মতলার 'পাগলী' বলে বুড়ো পরিচয় করিয়ে দিলে। পিছন থেকে খৈনি টিপ্‌তে টিপ্‌তে ট্রাফিক পুলিশ এগিয়ে এসে বলল, 'গাঁজা পিতা হ্যায়' ?,

'নেহি ধর্মরাজ ! কুছ্ নেহি পিতা হ্যায় !'

'আব্ ভদ্দর আদ্‌মি নেহি ?'

'কি জানি বাবা, কিয়া আদ্‌মি হ্যায়, আবি যাতা হ্যায়' বলে উঠে পড়লাম।

তারপর আর কোনদিন বুড়োকে দেখিনি ধর্মতলায় অথবা কলকাতার আর কোন জায়গায়। কতদিন ভেবেছি, বুড়োকে যদি আর একবার দেখতে পাই !

কলকাতার চড়কপূজা

'বুড়ো শিবের চরণে সেবা লাগে, মহাদেব!' 'তারকনাথের চরণে সেবা লাগে, মহাদেব!' 'বল ভদ্দেশ্বরো শিবো মহাদেব!' ইত্যাদি চীৎকারের মধ্যে বাংলা পুরনো একটা সনের সংকার শেষ হয়ে গেল। ভূমিষ্ঠ হল নূতন সন। এখনও আশা আছে, কারণ বাহাত্তর সনের অনেক দেরি।

যুবক যুবতীদের ভরাযৌবনের একটা বছর কেটে গেল দেখে নিশ্চয়ই তাঁরা বিষণ্ণ হবেন। কারাগারের কয়েদীর নির্দিষ্ট কালের একটা বছর কেটে গেল দেখে তার আনন্দ হবে হয়ত। নতুন মাস্টারের মুখ দেখলে স্কুলের ছাত্রদের বুক যেমন ভয়ে গুর্‌গুর্ করে, হুতোমের ভাষায় 'মড়ুঞ্চে পোয়াতীর বুড়ো বয়সে ছেলে হলে মনে যেমন মহান সংশয় উপস্থিত হয়', পুরোনোর যাওয়াতে আর নতুনের আসাতে আজ আমরা প্রায় তেমনি অবস্থায় পড়লাম। ভূত যেমন ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে চলে গেল, বর্তমান তেমনি এল ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে। এই জন্মন্যাংড়া বর্তমান অমৃতের পুত্রদের কানে কানে 'চরৈবেতি'র মন্ত্র শোনানো একমাত্র চণ্ডুখোরের দ্বারাই সম্ভবপর, কালপেঁচার পক্ষে নয়।

সেকালে কলকাতা শহরে চড়কপার্বণ ঠিক দোল-দুর্গোৎসবের মতো জমকালো ছিল। বছরের শেষ কটা দিন বেশ হুজুক আর হুল্লোড়ের মধ্যে কাটত। কলকাতা শহরের চারদিকে ঢাকের বাজনা শোনা যেত। সর্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নূপুর, মাথায় জরির টুপি, কোমরে চন্দ্রহার, সিপাই-পেড়ে ঢাকাই শাড়ি মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরের ছোপানো গামছা হাতে, বিল্বপত্র বাঁধা সুতো গলায়, যত ছুতার গয়লা গন্ধবেণে কাঁসারির আনন্দের সীমা থাকত না—বাবুদের বাড়ি গাজন। তখন কালীঘাট থেকে

সন্ন্যাসীদের এক বিরাট মিছিল বেরুত, নানা ঢং করে সং সেজে, সারা শহর প্রদক্ষিণ করে, কলুটোলা, মেছোবাজার দিয়ে চিৎপুরে এসে জম্‌ত। হুতোমের কাছ থেকে ধার করে তারই একটা বর্ণনা দিচ্ছি, আপনারা নিশ্চয়ই উপভোগ করবেন।

প্রথমে ছুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটাঘড়ি বাঁশে বেঁধে কাঁধে করেছে, কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি দিয়ে সেটা বাজাতে বাজাতে চলেছে। তার পেছনে এলোমেলো নিশেনের শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা দলবেঁধে ঢোলের সঙ্গতে ভজন গাইতে গাইতে চলেছে—

ব্যোম্ ভোলা, ব্যোম্ ভোলা
ভোলা বড় রঙ্গিলা
লেংটা ত্রিপূরারি, শিরে জটধারী
ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা

তার পেছনে বাবুদের অবস্থা মতো তক্‌মাওয়ালা দরওয়ান হরকরা সেপাই। মধ্যে সর্বাঙ্গে ছাই ও খড়ি মাখা, টিনের সাপের ফণার টুপি মাথায় হরপার্বতী সাজা সং। তার পেছনে কতকগুলো সন্ন্যাসী দশলকি ফুঁড়ে ধুনো জ্বালতে জ্বালতে নাচতে নাচতে চলেছে। পাশে বেণেরা জিবে হাতে বাণ ফুঁড়ে চলেছে। লম্বা লম্বা ছিপ, ওপরে শোলার চিংড়ীমাছ বাঁধা। সেট্‌কে সেট্ ঢাকে ড্যানাক্ ড্যানাক্ করে বাদ্যি বাজছে। দর্শকেরা হাঁ করে গাজন দেখছে, রোদে মাথা ফেটে যাচ্ছে, তবুও কেউ নড়ছে না। চড়কগাছ পুকুর থেকে তুলে মোচ বেঁধে মাথায় ঘি কলা দিয়ে খাড়া করা হয়েছে। ক্রমে চড়কতলা লোকে লোকারণ্য হল। শহরের বাবুরা বড় বড় জুড়ি, ফেটিং ও স্টেট্‌-ক্যারেজ করে নানারকমের পোশাক পরে চড়ক দেখতে বেরিয়েছেন। কেউ সঙের মতন পাল্‌কি গাড়ির ছাতের উপর বসে চলেছেন। এদিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরি, টিনের মুহুরী দেওয়া তল্‌তা বাঁশের বাঁশী, হল্‌দে রঙকরা বাঁখারির চড়কগাছ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার তৈরী গুরিয়া পুতুল, শোলার বাঁদর, পেল্লাদে পুতুল, চিত্রিত হাঁড়ি বিক্রি করতে বসেছে, গোলাপী খিলির দোনা বিক্রি হচ্ছে। একজন চড়কী পিঠে কাঁটা ফুঁড়ে নাচতে নাচতে এসে চড়কগাছের সঙ্গে কোলাকুলি করলে,

মইয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগল। সকলেই আকাশপানে চড়কীর পিঠের দিকে চেয়ে রইলেন। চড়কী প্রাণপণে কখন দড়ি ধরে, কখন দড়ি ছেড়ে পা নেড়ে ঘুরতে লাগলো। আর চারদিক থেকে কেবল 'দে পাক' 'দে পাক' চীৎকার হতে থাকলো।

এইভাবে সন্ন্যাসী গাজন সং আর চড়কগাছের এক মহোৎসবের ভেতর দিয়ে বাংলার রাজধানী এই কলকাতা শহরে পুরানো মৃত বৎসরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হত। চৈত্র মাস থেকেই ঢাকীরা ঢাকের টোয়াতে চামর, পাখির পালক, ঘণ্টা ও ঘুঙুর বেঁধে পাড়ায় ঢাক বাজিয়ে সন্ন্যাসী সংগ্রহ করত। গুরুমহাশয়রা পাঠশালার ঝাঁপ বন্ধ করে দিতেন, ছেলেপিলেরা পাড়ায় গাজনতলাকেই ঘরবাড়ি করে তুলতো। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে দিন নেই, রাত নেই, ঢাকীর পেছনে পেছনে তারা মাছির মতন ভ্যান্ ভ্যান্ করে বেড়াত। কখন তারা 'শিব মহাদেব' চীৎকারের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, কখন ঢাকের টোয়ের চামর ছিঁড়ছে, কখন পিছনটা ডুম্ ডুম্ করে বাজাচ্ছে, এবং অবশেষে হরদম্ তেলেভাজা ফুলুরি সেঁটে ওলাওঠায় সিঙেও ফুঁকছে। আজ কাঁটাঝাপ, কাল নীলের গাজন, এই নিয়ে রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল, মাতাল থেকে হাফ-শিক্ষিত বাবু ও বুড়োবুড়ীরা পর্যন্ত মশ্‌গুল হয়ে মেতে থাকত। আর চড়কগাছও পোঁতা হত শহরের চারদিকে। তখনকার হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা সম্ভ্রান্ত বাবুদের কাছে চড়ক উৎসবটাও আভিজাত্যের একটা মাপকাঠি ছিল। যাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান ভদ্রলোক বলে মনে করতেন তাঁরাই শিবালয় প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেক বছর গাজন করতেন, খরচপত্র নিজে দিতেন, চড়কগাছ পুঁতে আর সন্ন্যাসী ঘুরিয়ে আমোদ পেতেন। তারপর শৌখিন চড়ক-পার্বণ শেষ হলে পুরানো বছরও শেষ হয়ে যেত, হালখাতা আর গণেশপুজো করে নতুন বছর শুরু হত।

এই ধরনের চড়ক-পার্বণ দেখার ও উপভোগ করার সৌভাগ্য হুতোমের মতন কালপেঁচার হয়নি। তবু বাল্যকালে চড়কের উৎসব আমরাও দেখেছি। কলকাতার দক্ষিণপাড়াতে এই সেদিন পর্যন্ত আটচড়ক ও পদ্মপুকুরের চড়ক মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত। আজও অবশ্য পদ্মপুকুরের

চড়ক ও মেলা নিয়মিতভাবে হয়, এ বছরেও হয়েছে। তারকেশ্বরের চড়কের মেলা ও ভিড় আজও ঠিক তেমনি আছে। তবে শহরের বাবুদের ব্যক্তিগত বিলাস ও খেয়ালরুচি থেকে যে-সব চড়কগাছ শহরের পাড়ায় পাড়ায় অলিগলিতে এককালে গজিয়ে উঠতো, আজকাল আর তেমন গজিয়ে ওঠে না। আজকাল বারোইয়ারী ব্যাপারটাই হল কালের রীতি, তাই চড়কও বারোইয়ারী ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। চড়ক উপলক্ষে হাফ-আখড়াই, তরজা আর বুলবুলির গানের বদলে শখের যাত্রা থিয়েটার একালে দু'এক জায়গায় হয়েছে; আমরা বছর ত্রিশ আগে আটচড়কের মাঠে তরজার লড়াই শুনেছি, আবছা আবছা আজও তা মনে পড়ে। এ কালের রুচিবাগীশ লোকেরা তরজা খেউড় তুলে দিয়েছেন, কারণ মাঠের মধ্যে খোলা আকাশের তলায় বারোজনের মধ্যে খেউড় উপভোগ করতে তাঁদের মার্জিত রুচিতে বাধে। আজকাল ঐ ব্যাপারটা হোটেল, নাইটক্লাবেই যখন ভাল জমে, তখন খোলা মাঠের তরজাতে বাবুদের মন উঠবে কেন? ঢাক পিটোলে গাজনের সন্ন্যাসী এখনও কলকাতার প্রত্যেক পাড়া থেকেই যথেষ্ট পরিমাণে জড়ো করা যায়, কিন্তু চড়কগাছ পুঁতে গাজনতলা তৈরী করার মতন খোলা জায়গা কলকাতা শহরে অত্যন্ত কম বলেই পার্বণটা প্রায় উঠে গেছে বললেও ভুল হয় না। শিক্ষিত বাবুদের রুচি বদলেছে বলে যে চড়কগাছগুলো সব লোপ পেয়েছে, তা একেবারেই সত্যি নয়। হোলির উৎসবের মধ্যে আজও তার জ্বলন্ত প্রমাণ রয়েছে। চড়কগাছ পোঁতার যদি জায়গা থাকত কলকাতায় তাহলে অনেক বাবুই 'গাজন' করে সঙের নাচন দেখতেন এবং কিঞ্চিৎ পয়সা খরচ করলে ঢাক পিটিয়ে সং সংগ্রহ করাও কঠিন হত না। সুতরাং কলকাতার কালচার বদলেছে বলে যে চড়কগাছ চোখে দেখতে পাচ্ছেন না, এমন আজগুবি কথা কেউ চট্ করে ভেবে বসবেন না যেন। কলকাতার খালি জায়গা সব ইট পাথরে ভর্তি হয়ে গেছে, পুকুরের ওপর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে, তাই চড়কগাছও সব অন্তর্ধান করেছে। তার ওপর বাকি যেটুকু জায়গা ছিল তাও আবার বাস্তুহারারা দখল করে নিয়েছেন। চড়কগাছ লোকের চাপে পড়ে বিলীন হয়েছে, তার জন্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

হাটে-মাঠে অলি-গলিতে যাঁরা আজকে কলকাতায় চড়কগাছ দেখতে পেলেন না, গাজন সন্ন্যাসীর নাচ ও পাক খাওয়া উপভোগ করতে পারলেন না, তাঁরা আফসোস করবেন না তার জন্য। চড়কগাছ আজও আছে, সঙেরও অভাব নেই। কালপেঁচার কথায় একবার চক্ষু মুদ্রিত করুন। আপনি যদি তরুণ শিক্ষার্থী হন, আর তার ওপর বাস্তুহারা হন, তাহলে দেখতে পাবেন, কলেজ স্কোয়ারের ঠিক উল্টো দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট অট্টালিকা জুড়ে গাজন বসেছে, মধ্যিখানে বিশাল এক চড়কগাছে পা ছেড়ে মাথা ঝুলিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ঘুরপাক খাচ্ছেন, আর চারদিক থেকে 'দে পাক্ দে পাক্' ধ্বনি উঠছে। আপনি যদি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বা ব্যবসায়ী হন, তাহলে দেখবেন গোলদীঘিতে বিরাট এক চড়কগাছ ঠেলে উঠেছে আর বেকাররা তাতে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং চারিদিক থেকে 'দে পাক্ দে পাক্' চীৎকার হচ্ছে। আপনি যদি বাস্তুহারা হন তাহলে তো কথাই নেই। সারা কলকাতা শহরজুড়ে ধ্যাননিমীলিত চক্ষে অসংখ্য চড়কগাছ দেখতে পাবেন, তাতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই ঘুরছেন, পুরুষ, নারী, শিশু কেউ বাদ নেই, মন্ত্রীরাও ঘুরছেন, নেতারাও ঘুরছেন, আর সারা শহর জুড়ে, দেশটা জুড়ে বারংবার 'দে পাক্ দে পাক্' ধ্বনি উঠছে।

কে বলে চড়কপার্বণ উঠে গেছে? মাঠ থেকে উপ্‌ড়ে গিয়ে মানসচক্ষে গজিয়ে উঠেছে আজ সেই কলকাতার সনাতন চড়কগাছ, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্তিমান ঘূর্ণায়মান কাষ্ঠপ্রতীক। নববর্ষের প্রারম্ভে তাকে নমস্কার জানাই।

'হেল্‌প মি স্যার'

'হেল্‌প, হেল্‌প মে স্যার !'

'জয় হিন্দ' নয়, 'বন্দেমাতরম্‌' নয়, 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ'ও নয়, 'আমাদের দাবী মানতে হবে'ও নয়। বাস্তবিক বলতে কি, ব্যাপারটা একেবারে কিছুই সিরীয়াস্‌ নয়, এমন কি রাত দুপুরে 'বলহরি হরিবোল্‌' অথবা দিন দুপুরে 'ছাঁটাই করা চল্‌বে না'র মতন হৃৎপিণ্ড কাঁপানো কোন ধ্বনিও নয়। সামান্য একটা ক্ষীণকণ্ঠের আওয়াজ, ভিটামিন ও নিউট্রিশনের অভাবে এত ক্ষীণ যে প্রায় শোনাই যেত না, যদি না দুটো দাঁতের মাজনের প্যাকেট নাসিকারন্ধ্রের কাছে উঁচিয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ এনে ভদ্রলোক বলতেন—'হেল্‌প, হেল্‌প, মি স্যার !' হেল্‌প যিনি চাইছেন, তিনি একজন বাঙালী ভদ্রলোক। কলেজ স্ট্রীট্‌ হ্যারিসন রোডের মোড়ে অথবা বৌবাজারের শিয়ালদহের কাছাকাছি আপনারা অনেকেই প্রায় তাঁকে দেখে থাকবেন। কিন্তু তিনি যে একটি কি প্রচণ্ড সমস্যার প্রতীক স্বরূপ তা কেউ কোনদিন একবার ভেবে দেখেছেন কি ? বাঙালী ভদ্রলোক আসলে বিত্তহীন, কিন্তু সমাজে মধ্যবিত্ত বলে চালু, দৈন্যের দায়ে কলকাতার মতন মহানগরের ফুটপাথে নেমেছেন ভিক্ষে করতে, এবং সবার উপরে তিনি ভিক্ষে চাইছেন বাংলা ভাষায় নয়, ইংরেজীতে। খালি হাতে ভিক্ষে চাইতে সোশ্যাল প্রেস্টিজে বাধে বলে, কিছু দাঁতের মাজন উপলক্ষ করে সেটা নির্বিবাদে চাওয়া হচ্ছে ইংরেজী ভাষায়। মোড়ের দোকান থেকে এক খিলি পান চিবোতে চিবোতে মনে হল বাঙালী কালচারের এমন টিপিক্যাল নমুনা আগে কোনোদিন নজরে পড়েনি। বাসে উঠে চলতে চলতে ভাবলুম চমৎকার সমাধান ! কালচারের কথাটা তখনকার মতন ভিক্ষানুষঙ্গিক একরাশ এলোমেলো চিন্তার আবর্জনার তলায় চাপা পড়ে গেল। চারদিক থেকে অসংখ্য হাত প্রসারিত হয়ে এল আমার দিকে—'ভিক্ষে দাও।' অথচ আফিম খাইনি, সম্পূর্ণ স্যানিটি

নিয়ে মাত্র এক খিলি পান খেয়ে বাসে উঠে ঝিমুতে ঝিমুতে বাড়ি ফিরছি।

বাড়ি ফেরার পথে আর এক দৃশ্য দেখলাম। বিচিত্র এই মহানগর! একদল বাস্তুহারা নারী গান গাইতে গাইতে চলেছে, সঙ্গে কয়েকজন পুরুষ তাদের লীড দিচ্ছে, গলায় হারমোনিয়াম ঝোলানো। এখানেও লক্ষ্যটা হল জীবনধারণ আর উপায়টা হল ভিক্ষে, মাধ্যম হল সেই দ্বিজেন্দ্রলালী ঢঙের সুর যা এদেশে বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারী দাঙ্গা ইত্যাদি সকল সমস্যার ক্ষেত্রে ঠিক আদিম যুগের যাদুমন্ত্রের মতন ধন্বন্তরী ও অবশ্য ফলপ্রদ। বাসে আসার সময় রিলিফ সেণ্টারের একজন তরুণ বক্স-কালেক্টরের সঙ্গে যে তর্ক হয়েছিল তা তো বলিইনি। আমি শুধু বলেছিলাম যে রিলিফের জন্য যৎসামান্য কিছু দেওয়াও প্রতিদিন আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তাহলে বাস্তুহারাদের খাদ্যের আয়োজনটাও প্রতিদিন করার দরকার নেই বলুন! বলার কিছুই নেই। তাছাড়া এইসব তরুণ কর্মীর অপরিসীম উৎসাহ ও নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতাকে আমি শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি আমার মস্তিষ্কে যা ঘুরপাক খাচ্ছিল তা অন্য জিনিস। তা ব্যক্ত করে কিছুই লাভ নেই। শুনেছি, চিত্রশিল্পীরা বলেন, প্রত্যেক ভাব-অনুভাবের প্রকাশের একটা বিশেষ রং আছে। জানি না বেদনার কি রং, বিদ্রূপেরই বা কি? বেদনা ও বিদ্রূপ মেশালে যে রং হয় তারই একটা ছোপ পড়েছিল আমার মুখে। অন্যে না দেখুক, নিজের মুখ নিজেই স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম অনুভূতির আয়নায়। সুতরাং যখন বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লাম, তখন ভাবনার মেঘগুলো বেশ ঘোরালো হয়ে জমে উঠলো, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের ঝিলিকও দিতে লাগলো, অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আর এল না চোখে। নিজের সমস্যায় নিজে বাঁচিনে, তার উপর সর্বজনীন ঘূর্ণিবাত্যায় চোখ বুজে কেবল সরষের ফুল দেখতে লাগলাম।

টিকি যাদের আছে তাদের টিকি ধরে টান মারলেই যেমন মাথাটি আসে, তেমনি আমাদের এদেশে সমস্যা ধরে টান মারলেই সমাধানও আসে। চিন্তা-ভাবনার দরকার হয় না। তার কারণ সমাধানের সনাতন

পথ খোলা রয়েছে সামনে—ভিক্ষের পথ। সাহিত্যে শিল্পে ধর্মে এদেশে যেমন ভিক্ষের ঝুলির গুণগান করা হয়েছে, তেমন আর কোন দেশেই হয়নি। সেই বুদ্ধ-মহাবীরের কাল থেকে ভিক্ষের ঝুলির মহিমা কীর্তন করা এদেশের কালচারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার অন্তর্নিহিত মহান গূঢ় সত্যটা লোপ পেয়েছে অনেকদিন, বাষ্পের মতন সেটা বিলীন হয়ে গেছে শূন্যে। কঙ্কাল যেটা পড়ে রয়েছে সেটা একেবারে নীরেট ভিখিরীর ভিক্ষে, সঙ্কীর্ণ জীবনের চোরকুঠ্‌রী পর্যন্ত তাকে টেনে আনা হয়েছে মহত্ত্বের মুকুট পরিয়ে। আমরা তাই বিরাট এক ভিখিরীর জাতে পরিণত হয়েছি, অথচ ভিক্ষের ভেতরকার নির্লোভ নিরহঙ্কার আত্মত্যাগ শিখিনি, একেবারেই না। কিন্তু এ কথা থাক, যা বলব ভেবেছি তাই বলি।

কলকাতা আধুনিক কালের মহানগর, বাণিজ্য ও ধনোৎপাদনের তাগিদে তার জন্ম ও বিকাশ। কাঁসারিপাড়া শাঁখারিপাড়া কলুটোলা দর্জিপাড়া যুগীপাড়া নামগুলো কারুশিল্পীদের কেন্দ্র হিসেবে আজও সেই মধ্যযুগের গন্ধ বহন করছে, কালীঘাটের মন্দির আজও তীর্থকেন্দ্র হিসেবে বিরাজ করছে কলকাতায়। এসব মধ্যযুগের নগরেরই স্মৃতিচিহ্ন। কিন্তু তবু কলকাতা যে এ যুগের শ্রমশিল্পের মহাকেন্দ্র তা অস্বীকার করার উপায় নেই। ধনদৌলতের মহিমাকে গলা ফাটিয়ে ব্যক্ত করাই কলকাতার বিশেষত্ব হওয়া উচিত। তবু বাংলার-তথা ভারতের মহানগর কলকাতা তার নিজস্বতা বর্জন করেনি। তীর্থধর্মের কেন্দ্র থেকে শুরু করে বাণিজ্য-কেন্দ্র ধন-কেন্দ্র ও আদর্শ ভিক্ষা-কেন্দ্র এই কলকাতা। কাটাকাটি, হানা-হানি, লোভ-হিংসার মাতামাতি, অর্থ ও দম্ভের ঝন্‌ঝনানির মধ্যে আছে সেই সনাতন ভারতবর্ষের উদার ভিক্ষাবৃত্তি, বুদ্ধ-চৈতন্যের সেই ত্যাগমন্ত্রের প্রতিধ্বনি। কোটিপতি ও শিল্পপতি ক'জন আছে কলকাতায়, অথবা লেটেস্ট মডেল বুইক পন্টিয়াকের সংখ্যা কত, তার হিসেব করার দরকার নেই। ভিক্ষের কত রকমের টেক্‌নিক আছে কলকাতায়, ভিক্ষাবৃত্তির প্রসার ও বৈচিত্র্য কত এবং ভিখিরী কত ধরনের, তার একটা চলনসই নক্‌শা আঁকতে পারলেও 'আজব শহর কলকাতা'র আজবত্বটা কোথায় তা কারও

বুঝতে কষ্ট হবে না। এই ভিক্ষের কথাটা ভাবতে ভাইতে তাই শেষ পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে গেলাম।

ভাবছিলাম, অর্থোপার্জনের মতন কলকাতা মহানগরের ভিক্ষাবৃত্তির এই তীব্র প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে বেঁচে থাকা কি কলকাতার লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা শরণার্থীর পক্ষে সম্ভবপর? কিন্তু কালপেঁচার ভাবনার কিনারা কোথায়? ভাবতে ভাবতে হাতি ঘোড়া গণ্ডার মহিষ বাইসন পাইথন হাঙর হায়েনা সব হিম্‌সিম্ খেয়ে তলিয়ে গেল, এখন কালপেঁচা বলে কত জল!

মনে করুন, এই কলকাতার মতন মহানগরেও ঘুম ভাঙে আমাদের প্রভাতী সুরের হরিনাম শুনে। জানি না আপনারা সকলে তা শোনেন কি না, তবে জন্ম থেকে কলকাতায় ভোরবেলা এই নামকীর্তন আমি শুনে আসছি। সূর্য না উঠতেই প্রভাতী সুরে আমাদের ঘুম ভাঙছে সেই সনাতন ভিক্ষামন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে। একটু বেলা হতেই বিভিন্ন সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসীরা আসবেন মুষ্টিভিক্ষা চাইতে। তারপর কেউ আসবেন আবেদন-পত্র নিয়ে, নানা রকমের রেফারেন্স ও পরিচয়সহ। কেমন করে কার ভাল চাকরিটা চলে গেল, বাম অঙ্গটা কার হঠাৎ বাতে পঙ্গু হয়ে গেল, কার মার্জার চক্ষুতে ছানি পড়ল, কার মাত্র চারদিন আগে বাবা অথবা মা মারা গেল, কার কন্যাদায় মাতৃদায় ইত্যাদি। তৃতীয় পর্বে শুরু হল সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের চাঁদা আদায়ের বহর। এর সঙ্গে বারো মাসে বিরনব্বুই পার্বণের বারোয়ারী চাঁদার পালা তো আছেই, দুর্গাপুজো লক্ষ্মীপুজো থেকে শুরু করে কালী সরস্বতী শীতলা জগদ্ধাত্রী বাসন্তী চড়ক পর্যন্ত। তার ওপর মড়ক মহামারী বন্যা দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা তো লেগেই আছে এবং লাগলেই সেই চিরন্তন সুরের ভিক্ষের গান, বাক্স, রসিদ বই, বিবৃতি ইত্যাদির আর অন্ত নেই। এ ছাড়া কলকাতার মতন বড় বড় শহরে আছে 'চ্যারিটি' নামক এক রকমের অভিজাত ভিক্ষে, যার হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় নেই কারও। সবার উপরে এ যুগের সব পোলিটি-ক্যাল পার্টির যে ভিক্ষে চাওয়া তার কথা তো ছেড়েই দিলাম। এসব হল উচ্চস্তরের ভিক্ষে, উপরে একটা আভিজাত্যের কোটিং দেওয়া আছে,

যাঁরা চান তাঁরাও ভিখিরী নন, যাঁরা দেন তাঁরাও তাঁদের তা মনে করেন না। এ ছাড়া বাড়ির দরজা থেকে রাস্তায়, ফুটপাথে বাসে ট্রামে, বাজারে ময়দানে যেসব হরেকরকমের জাত-ভিখিরীদের দেখতে পাওয়া যায়, তাদের কথা তো আগেই বলেছি।

পথের জাত-ভিখিরীদের কথা ছেড়ে দিয়েও, শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, বিভিন্ন অভিজাতশ্রেণীর 'ভিক্ষাপ্রার্থী'দের প্রতিযোগিতায় হার মানিয়ে কি বাস্তুহারাদের পক্ষে ভিক্ষে করে বেঁচে থাকা সম্ভবপর? ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি শেষরাত্রের দিকে। ঘুমিয়েই এক কিম্ভুতকিমাকার স্বপ্ন দেখলাম। বাংলার রাজধানী (প্রাক্-পার্টিশানিক) কলকাতার মাঝখান দিয়ে শিব ও অন্নপূর্ণা ভিখিরীর বেশে বিরাট এক শোভাযাত্রা লীড্ করছেন, সামনে একদল ষাঁড় হেলেদুলে চলেছে, আর পিছনে চলেছে চৌরঙ্গী, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু জুড়ে অগণিত নন্দীভৃঙ্গী ভিখিরীর দল, হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে চেয়ে নাচতে নাচতে। বাংলার আকাশ-বাতাস জুড়ে 'ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!' ধ্বনি উঠছে অবিরাম। ঘুমিয়ে পড়েও ভাবছি—এ কি রে বাবা! এ কোথায় এলাম! হঠাৎ সামনের ষাঁড়-গুলো সব ক্ষেপে উঠলো! ভয়ে ধড়ফড় করে বিছানা ছেড়ে সটাং মেঝের উপর দাঁড়িয়ে পড়লাম। বেশ বেলা হয়ে গেছে। রেডিওতে গান হচ্ছে:

'তা বলে ভাবনা করা চলবে না—
ও তুই বদ্ধ দুয়ার দেখবি বলে'
—ইত্যাদি

ভাবনার শেষ নেই আর। রেডিওটা বন্ধ করে দিলাম।
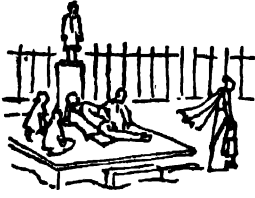
কার্জন পার্ক

কার্জনের নাম যেমন এদেশে কলঙ্কিত হয়ে আছে অনেক কারণে, কার্জন পার্কও তেমনি সমস্ত ক্রাইম্ ও কলঙ্কের মহাকেন্দ্র হয়ে কলকাতা শহরের বুকের ওপর বিরাজ করছে। এই কাজন পার্কের পশ্চিম দিকে স্বয়ং লাট বাহাদুর নিজে বাস করেন, সারা ভারতের ভাগ্যবিধাতারা এখানে আনাগোনা করেন। অথচ এই কার্জন পার্ক থেকে শুরু করে দক্ষিণে ও পশ্চিমে প্রায় মাইলখানেকব্যাপী জায়গা জুড়ে কলকাতার যত চোর ডাকাত খুনে বদমায়েস রাজত্ব করে, মনে হয় বাইরের 'সভ্য সমাজ' থেকে বিচ্ছিন্ন এটা যেন তাদের 'লিবারেটেড্ এরিয়া'। কয়েক গজ দূরে উত্তরে কলকাতার সদাসরগরম কর্মকেন্দ্র ডালহৌসী স্কোয়ার এবং শহরের পুলিশ হেড কোয়ার্টার লালবাজার। কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। মহারানী ভিক্টোরিয়ার মেমোরিয়াল হল্ থেকে আরম্ভ করে মাঠ, রেড রোড, অক্টরলোনি মনুমেণ্ট পর্যন্ত দক্ষিণ দিকে, পশ্চিম দিকে ঈডেন গার্ডেন, আউটরাম ঘাট, পূর্বদিকে লিণ্ডসে স্ট্রীট, আর উত্তরে বেণ্টিক স্ট্রীট, চায়না টাউন পর্যন্ত এলাকার মধ্যমণি হল কার্জন পার্ক। দেশের লাট-সাহেবের প্রাসাদ যেখানে, যার একদিকে ফোর্ট উইলিয়ম এবং আর এক দিকে লালবাজার, তার পাশেই কলকাতার শ্রেষ্ঠ লম্পটদের মগের মুল্লুক কার্জন পার্ক। এ একটা বিচিত্র প্রহসন বলে মনে হয় না কি? কার্জন পার্ককে নিঃসন্দেহে কলকাতার ক্রিমিন্যালদের কৈলাসধাম বলা যেতে পারে।

পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ যেদিক দিয়ে খুশী কার্জন পার্কে ঢুকুন, সেই দিকেই সব-সময় একটা কাণাকাণি, একটা ফিসফিসানি, একটা জটলা, আড্ডা, একটা ছোটখাটো হল্লা দেখতে পাবেন। মনে হবে কলকাতার

সবচেয়ে প্রকাশ্য জায়গায় যেন সবচেয়ে গোপন 'আণ্ডার ওয়ার্ল্ডে' ঢুকছেন এবং দিন নেই, রাত নেই, ঝড় নেই, দাঙ্গা নেই, মহামারী নেই, সব সময় সেখানে দুর্নীতি, যৌনবিকৃতি, ব্যভিচার, জুয়োচুরি, রাহাজানি ও লাম্পট্যের একটা স্রোত যেন অন্তঃসলিলার মতন বয়ে চলেছে। সকালের দিকে ঢুকলে দেখতে পাবেন, এখানে সেখানে ঝোপ-ঝাড়ের আশে-পাশে, পাথরের স্ট্যাচুর তলায়, খোলা মাঠের ওপর, রেলিঙের এপাশে-ওপাশে একদল পুরুষ ও স্ত্রীলোক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে, একদল লোক তাদের কাছাকাছি বুকে হাঁটু গুঁজে বসে বিড়ি ফুঁকছে, একদল লোক বদ্না নিয়ে পাশের কেন্দ্রীয় ল্যাভেটরীতে লাইন-বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাঙালী এর মধ্যে কদাচিৎ দেখতে পাবেন, তবে অবাঙালী হিন্দু-মুসলমান সংখ্যায় প্রায় সমান সমান। ঘুমন্ত ও সদ্যোজাগ্রত স্ত্রীপুরুষ, এমন কি, বালক-বালিকাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, মুখের চেহারা, কথাবার্তা হাব-ভাব দেখলেই বুঝতে পারবেন, পেশাদার তুখোড় লম্পট সব। এ তো গেল সকালের কথা। ঠিক দুপুরের দিকে কার্জন পার্কের আর এক রূপ দেখবেন। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরের মধ্যেও একদল স্ত্রীলোক ও পুরুষ কার্জন পার্কে জড়ো হয়েছে, তার মধ্যে কার্জন পার্কই যাদের বাড়ি-ঘর বৈঠকখানা তারা তো আছেই। এই সময় ভদ্রসন্তানও পার্কের মধ্যে ছড়িয়ে আছে দেখতে পাবেন। কেউ গাছতলায় বসে ইরানী বালিকাকে দিয়ে জুতো পালিশ করাচ্ছে, কেউ একজন ঘাঘ্রা-পরা ইরানী মেয়েকে দিয়ে কানের খোল পরিষ্কার করাচ্ছে, কোথাও ছোট্ট একটা রেস্ুড়ের দল মটরভাজা চিবোতে চিবোতে টিপ্ নিয়ে আলোচনা করছে, কোথাও দু-চারজন কার্জনী পাণ্ডা এক নির্লজ্জ বেহায়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে মশ্করা করছে, কেউ ঘুমুচ্ছে, কেউ খবরের কাগজ খুলে দুপুর রোদেই টোপ্ গেলার অপেক্ষায় আছে, কোথাও এক ষণ্ডা-গণ্ডা সর্দারজী কিশোর একদল বালককে বিভোর হয়ে দেখছে, কোথাও বা একটি কোণে কলকাতায় নবাগত কোন পরিবার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ মিউজিয়াম ও মিউনিসিপ্যাল মার্কেট দেখার পর বসে বিশ্রাম করছে এবং সামনের লাটের বাড়ির আজগুবী সব গল্প বলছে।

কার্জন পার্কের সন্ধ্যার মূর্তি হল রহস্যাবৃত। কলকাতার সমস্ত জাতের ও সম্প্রদায়ের লোক এই সময় থেকে পার্কে ভিড় করে। যত কুখাদ্য অখাদ্যের ফিরিওয়ালা আছে, সন্ধ্যায় তাদের সমাগম হয় এবং কলকাতার মহামারীর বীজ কার্জন পার্কই বেশি করে ছড়িয়ে দেয়। গোটা কার্জন পার্কটা সন্ধ্যার সময় মনে হয় যেন বিরাট একটা জংশন স্টেশন। কর্ণভেদী কোলাহল বিশেষ নেই, একটা চাপা গুঞ্জনধ্বনি মাঠ থেকে মেঘের দিকে উঠতে থাকে। ক্রমে রাত্ যত গভীর হয়, রহস্যের আচ্ছাদন তত গভীরভাবে আবৃত করে ফেলে কার্জন পার্ককে। এই সময় মধ্যে মধ্যে শুনতে পাবেন 'মালিশ' 'মালিশ'—গম্ভীর টানা সুরের আওয়াজ। একদল পাখওয়াজ ছোক্‌রা যুবক তেলের শিশি হাতে ঝুলিয়ে 'মালিশ' 'মালিশ' আওয়াজ করে ঘুরে বেড়ায়। কোথায় দেখবেন কোন ভুঁড়িদার মেড়ো, কোন বিরাটকায় বিহারী বা বাঙালী ভদ্রলোক অন্ধকারে ঝোপের পাশে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়ে, পার্কটাকে নিজের প্রাইভেট বেডরুম মনে করে, এক ছোক্‌রা মালিশওয়ালাকে দিয়ে সর্বাঙ্গ মালিশ করাচ্ছে। ঘড়া ঝুলিয়ে চা-ওয়ালা ঘুরে বেড়াচ্ছে—'গরম চা'। বাক্স ঝুলিয়ে পানওয়ালা পান বিক্রি করছে, চানাচুরওয়ালা চানা। শুট্-শাট্ করে অন্ধকারে ঝোপ্-ঝাপের পাশ দিয়ে লোকজন আনাগোনা করছে। হঠাৎ হয়ত পাশের ঝোপে নারীকণ্ঠের হাসি শুনে চম্‌কে উঠবেন। দেখতে পাবেন, দু'টি মেয়ে একগাল পান চিবুতে চিবুতে হেলে-দুলে চলে গেল। পেছনে তাদের মাছির মতন একঝাঁক লোকও যাচ্ছে, বাঙালী, বিহারী, পাঞ্জাবী, উড়িয়া, কাবুলী, বেলুচী ও সিন্ধি কেউ বাদ নেই। আফিমখোরদের নিশ্চয়ই মনে হয়, সামনে দু'টো গুড়ের ড্যালা গড়িয়ে চলেছে, আর পিছনে চলেছে সর্বভারতীয় প্রতিনিধিরা মাছির মতন ভ্যান্ ভ্যান্ করে। এরই মধ্যে অস্পষ্ট চাপা গলায় আলাপ চলেছে। এই সময় দেখবেন কলকাতার ইউনাকদের গায়েও যেন বসন্তের হাওয়া লাগে, নারীবেশ ধারণ করে তারা কুৎসিত রাক্ষসীর মতন ঘুরে বেড়ায় কার্জন পার্কে। আরও বিচিত্র অনেক দৃশ্য আছে কার্জন পার্কে দেখার, বলে শেষ করা যায় না, চোখ মেলে চেয়ে দেখতে হয়। চোখ খুললে দেখতে পাবেন একদল অল্পবয়সী ছোক্‌রা

লবুলি পাখিটির মতন সেজেগুজে, স্নো পাউডার মেখে চক্‌চকে হয়ে, াছাকোঁচায় ফের্‌তা দিয়ে পুচ্ছ নাচিয়ে, সুরেন বাঁড়ুজ্জে ও লর্ড কার্জনের ট্যাচুর কাছে টহল দিচ্ছে। তারপর দেখবেন তাদেরই একজন এক ।শালকায় মনুষ্যরূপী দৈত্যের সঙ্গে কি কথা বলতে বলতে পার্ক পেরিয়ে ক্ষিণের মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে। এরই মধ্যে সিভিল ও অফিসিয়াল ড্রসে ঘুরে বেড়াচ্ছে পুলিশের দল। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, ার্জন পার্কের অকাজ কুকাজ তার মধ্যেই অবিরাম চলতে থাকে। ুতরাং মনুমেণ্টের কাছে কয়েকদিন আগে যদি দু'জন নারীবেশী যুবক খুন য়ে থাকে এবং কার্জন পার্কে বালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহলে লকাতার অন্ধ ও আগন্তুকরা চমকে উঠতে পারেন, কিন্তু কালপেঁচা ।তটুকুও চমকায়নি। কার্জন পার্ক এবং তার আশেপাশেই কলকাতায় ।ই জাতীয় কুৎসিত ঘটনা ঘটা সম্ভবপর।

এ-হেন কার্জন পার্কের একজন অন্যতম কালোয়াত ও নায়ককে আমি চনতাম। নাম তার 'কাল্লু'। অনেকদিন ধরে তাকে কার্জন পার্কে ।কটি ছোট্ট আম্‌লা অমাত্যগোষ্ঠী নিয়ে রাজত্ব করতে দেখেছি। নিশ্চয়ই উত্তর-ভারতের কোন মুসলমান, চেহারায় কথাবার্তায় তাই মনে হত। ইদানীং তাকে আর দেখতে পাই না। বোধহয় সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় কাল্লু কার্জন পার্ক ছেড়ে ঢাকা কিংবা করাচীতে চলে গেছে। এখন পাকিস্তানই তার গুলিস্তান এবং সেখানেই কার্জনী কালোয়াত কাল্লুর মনের মতন সব শিকার মিলবে ভালো।

কাল্লুর চেহারাটা না হলেও, গায়ের রঙটা অনেকটা লর্ড কার্জনের তন। কটা বাদামী দাড়ি চিজেল্‌ করা মুখে মানাত ভালই। কাল্লুর াসি আরব্য রজনীর নায়কের হাসি। দিনের বেলা তাকে ফল বেচতে দেখেছি, চোস্ত্‌ উর্দুতে খদ্দের পাকড়াতে তার মতন ওস্তাদ্‌ ফিরিওয়ালা ধ্য-কলকাতায় আর কেউ ছিল না। কিন্তু দিনের বেলা শুধু যে কাল্লু লই বেচত তা নয়, রথও দেখত। দেখতাম তার কাছে কার্জন পার্কের মোবাইল্‌" স্ত্রীলোকরা এসে কখন আলাপ করছে, কখন এক মালিশী ছোক্‌রা এসে কি কানের কাছে বলে যাচ্ছে, কখন একজন ষণ্ডামার্কা

লেফ্‌টন্যান্ট হিন্দুস্থানী স্ল্যাঙ্‌ ভাষায় কি ষড়যন্ত্র করছে, এমন কি পুলিশ-মহলেও তার বেশ খাতির ছিল বলে মনে হত। এসপ্লানেডের সমস্ত ফিরিওয়ালাদের উপর কাল্লুকে কর্তৃত্ব করতে দেখেছি, ভিখিরীদের ধম্‌কাতে দেখেছি, মালিশওয়ালাদের পিটিয়ে শাসন করতে দেখেছি, যে-কোন কারণেই হোক, চুলের মুঠি ধরে তাকে কার্জন-মার্কা ভবঘুরে মেয়েদের মধ্যে মধ্যে পার্কের বাইরে বার করে দিতে দেখেছি। বাইরের ঘোড়ার গাড়ির কচুয়ানদের ও দালালদের সর্দার ছিল কাল্লু। তা ছাড়া এদিককার ফিরিঙ্গী মেয়েমহলেও কাল্লুর যে কি প্রতিপত্তি ছিল তা মধ্যে মধ্যে ফল কেনা-বেচার সময় তার আলাপ থেকে বুঝতে পেরেছি। এই কাল্লুই যে কার্জন পার্ক অঞ্চলের সমস্ত ক্রিমিন্যালদের আন্‌ক্রাউণ্ড কিঙ্‌ ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সন্ধ্যার সময় কাল্লু আমীরওম্‌রাহের মতন সেজে কার্জন পার্কে ঘুরে বেড়াত এবং মধ্যে মধ্যে পিয়ারের শাগ্‌রেদ ও বন্‌-কি-চিড়িয়াদের দেখে একখানা যা বোখ্‌রাই হাসি হাসত, তা ভুলবার নয়।

কাল্লু আজ নেই, কিন্তু তার অনেক লেফ্‌টন্যান্ট আজও কার্জন পার্কের রাজত্ব চালাচ্ছে। কলকাতার সমস্ত কদর্যতা ও ক্রাইমের উত্তরাধিকার কার্জন পার্ক আজও বহন করছে। কলকাতার শাসনকর্তারা আজও কি রহস্যময় কারণে জানি না, মহানগরের মহাকেন্দ্র কার্জন পার্ককে এক মহানরকে পরিণত করে রেখেছেন। আজব শহর কলকাতায় তাই যাবতীয় তাজ্জব ঘটনার সেণ্টার। এখনও সেই কার্জন পার্ক ও তার পরিপার্শ্ব। লর্ড কার্জনের পর কত ইংরেজ লাটসাহেব এলেন, এমন কি দেশী লাটও কত বদলে গেলেন, কিন্তু সেই কার্জন পার্কের কোন পরিবর্তনই হল না।*

*সম্প্রতি কার্জন পার্কের পরিবর্তন হয়েছে ট্রাম কোম্পানীর দৌলতে। কিন্তু অতীতের ভূত তার স্কন্ধ থেকে নেমেছে বলে মনে হয় না।

পাগল শুধু 'পাগল' নয়

চণ্ডীদাস বলেছিলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' কলকাতা শহরে সম্প্রতি যে রকম পাগলের সংখ্যা বেড়ে চলেছে তাতে মনে হয়, 'সবার উপরে পাগল সত্য, তাহার উপরে নাই।' আপনারা কেউ কেউ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আজকাল কলকাতায় যত রকমের পাগল-পাগলি দেখা যায়, বিশ-পঁচিশ বছর আগে, এমন কি বছর দশেক আগেও তার দশভাগের এক ভাগও দেখা যেত না। অনেকে বলবেন, কলকাতার লোকসংখ্যা যে পরিমাণে বেড়েছে তাতে কিছু পাগল যে বাড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি! কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, আংশিক সত্য। গোড়াতেই তাহলে পাগলের 'সোশিওলজি' নিয়ে আলোচনা করতে হয়। কারণ বর্তমান যুগ সোশিওলজির যুগ এবং সব কিছুরই একটা 'সোশিওলজিকাল' বিশ্লেষণ করা চলে। 'পাগল' এ যুগের সভ্য সমাজের একটা অন্যতম 'শ্রেণী' হিসেবে ক্রমে বেড়ে চলেছে এবং সেইজন্যই 'পাগল' একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। ১৯৩৫ সালে আমেরিকায় পাগলের হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে চার লক্ষ। অর্থাৎ এই হিসেবে আমেরিকায় কুড়ি বছরের উপর প্রায় দু'শ জন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে একজন পাগল। এই হল আসল পাগলের সংখ্যা। আর পাগল হবার সম্ভাবনা আমেরিকায় তার চেয়ে আরও অনেক বেশী, প্রত্যেক দশজন বয়স্কদের মধ্যে একজনের। অথচ এই আমেরিকাই আধুনিক সভ্যতার গগনস্পর্শী ইমারৎ গড়ে তুলেছে, অ্যাটম ফাটিয়েছে, হাইড্রোজেন ফাটিয়েছে এবং আরও সব কি যে কাণ্ডকারখানা করবে তার ঠিক নেই। সেই আমেরিকায় মানুষের যৌবন আসে 'পাগল' হবার বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে। ব্যাপারটা

একবার কল্পনা করুন। ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌সে ১৯৩৯ সালে প্রত্যেক দশ-হাজার লোকের মধ্যে চল্লিশজন একেবারে বদ্ধ পাগল ছিল। তথ্যগুলো অগবার্ন ও নিম্‌কফের বিখ্যাত সোশিওলজির হ্যাণ্ডবুক থেকে নেওয়া, এতটুকুও বাড়িয়ে বা কল্পনার রঙ চড়িয়ে বলা নয়। নিউইয়র্ক, চিকাগো, লণ্ডন, প্যারিস প্রভৃতি বড় বড় আধুনিক শহরে পাগলের সংখ্যা ক্রমেই এইভাবে বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে, মানুষের জীবনের ও সমাজের নানারকমের সমস্যার মধ্যে সামঞ্জস্যের ও সঙ্গতির অভাব। প্রত্যেক শ্রদ্ধেয় সমাজবিজ্ঞানীই এই কথা বলেছেন। সোশিওলজির আলোকে কলকাতা শহরের পাগলদেরও এইভাবে বিচার করা উচিত। কলকাতার সোশিওলজিস্টরা আজও তা করেন নি। তা না করা পর্যন্ত পাগলদের কেবল পাগল বলে হেসে উড়িয়ে দিলেই চলবে না। 'পাগল' কেবল পাগল নয়, তার চেয়ে আরও অনেক কিছু বেশী। মাথায় গণ্ডগোল হওয়াই যদি পাগলের লক্ষণ হয়, তাহলে গণ্ডগোলটা বাধল কি করে সেটাও জানতে হয়।

কলকাতা শহরের পাগলের একটা সংক্ষিপ্ত সার্ভে এবং কয়েকটি 'টাইপের' পরিচয় দিচ্ছি। কলকাতার স্টেশন আর তীর্থস্থানের দিকে পাগলের সংখ্যা কিছু বেশী বলে মনে হয়। শিয়ালদা ও হাওড়ায়, বিশেষ করে শিয়ালদা স্টেশনের কোয়ার্টার মাইল রেডিয়াসের মধ্যে যতরকমের পাগল-পাগলি দেখতে পাবেন, এমন আর কোথাও পাবেন না। ছবিতে যাকে দেখছেন সে হল দক্ষিণ কলকাতার এক বিখ্যাত পাগলি, কালীঘাটের পথে প্রায়ই তাকে দেখতে পাওয়া যায়। বয়সে বুড়ী, দেখতে যৌবনে 'সুন্দরী' ছিল বলেই মনে হয়, মুখের মধ্যে একটা দার্শনিকের ভাব আছে। কালীঘাটের ছেলেপিলেরা প্রায়ই তাকে ক্ষ্যাপায় এবং তার ক্ষিপ্ত মূর্তি একটা রীতিমত দেখবার মতন জিনিস। ক্ষেপে গেলে যেরকম অকথ্য ভাষায় নাতির বয়সী বাচ্চাদের খিস্তি করার দিকে তার ঝোঁক দেখি, তাতে মনে হয় মাথায় গণ্ডগোলটা অনেকদিন আগেই বেধেছে। না ক্ষ্যাপালে এমনিতে সে খুবই শান্ত, তবে হাসতে বিশেষ তাকে দেখা যায় না, চোখ দু'টোর মধ্যে শূন্যতার ভাবটাই বেশী। কালী-

ঘাট ছাড়াও, কলকাতার পার্কগুলোতেও সম্প্রতি পাগলের উপদ্রব বেড়েছে দেখা যায়। পোঁটলা-পুঁটলি, ছেঁড়া জামাকাপড় নিয়ে পাগলদের প্রায়ই পার্কের বিশ্রামের ঘরটিতে আস্তানা গেড়ে থাকতে দেখা যায়। তা ছাড়া এখানে ওখানে রাস্তার ধারে বাজারের পাশে, হয়ত চৌরঙ্গীর রাজপথের মাঝখানেই এক-একজন পাগলের হঠাৎ আবির্ভাব হচ্ছে দেখতে পাবেন। কেউ ট্রাফিক আটকাচ্ছে, কেউ কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নাগা সন্ন্যাসীর মতন ট্রাম লাইনের উপর দিয়ে সটাং হেঁটে চলেছে।

এ তো গেল একশ্রেণীর পাগল। এছাড়াও কলকাতায় আরও একশ্রেণীর পাগল আছে যাদের রীতিমত শিক্ষিত ও ভদ্র বলে মনে হয়। কিছুদিন আগে কলকাতার এক শ্মশানে দেখেছিলাম এক পাগলকে প্রত্যেকটি মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে চমৎকার ইংরেজী ও বাংলায় আধ্যাত্মিক বক্তৃতা দিতে, কবিতা আবৃত্তি করতে। লোকমুখে শুনেছি, কলকাতার কোন কলেজের অধ্যাপক, পাগল হয়ে গেছেন। আর একজনকে দেখেছি, একরাশ ইংরেজী সংবাদপত্রের বোঝা কাঁধে ঝুলিয়ে বেড়াতে এবং মধ্যে মধ্যে দাঁড়িয়ে তাই থেকে কোন সংবাদ বা সম্পাদকীয় পড়ে রাস্তার লোককে শোনাতে। এক পাগলকে দেখেছি "হ্যালো! হ্যালো!" বলে রাস্তার লোককে ডেকে ভাল ভাল নাটক থেকে এক একটা অংশ অভিনয় করে শোনাতে। কিছুদিন আগে একজনকে দেখলাম গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনের ফুটে চক্ দিয়ে চমৎকার ইংরেজী ভাষায় অনেক কিছু লিখতে এবং তারপর হঠাৎ "নাউ আই অ্যাম্ গোয়িং, থ্যাঙ্ক ইউ" লিখে সোজা চলে যেতে। কয়েক বছর আগে, যুদ্ধের সময় এক সংবাদপত্রের অফিসে এক পাগলকে দেখেছিলাম, যার কথা আজও ভুলি নি। একদিন বিকেলে আমরা কয়েকজন সংবাদবিভাগে বসে গল্প করছি, এমন সময় একজন ভদ্রলোক এলেন, বোধহয় কয়েক দিস্তে হাতে-লেখা কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে। এসে বললেন যে, তিনি হিটলার স্ট্যালিন মুসোলিনী রুজভেল্ট ও তোজোর কাছে কয়েকটি ব্যক্তিগত আবেদনপত্র পাঠাতে চান শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং সেই পত্রগুলি ধারাবাহিকভাবে সংবাদপত্রে ছাপতে হবে। কোনমতে আমরা হাসি চেপে কয়েকটি পত্র

তাঁকে পড়তে বললাম। প্রত্যেক পত্র আরম্ভ করা হয়েছে এইভাবে ঃ 'মনে ভাববেন না আমি পাগল। পাগল আপনি, একেবারে বদ্ধ পাগল, তা না হলে যুদ্ধ করতেন না'—ইত্যাদি। প্রত্যেকটি পত্র শেষ করা হয়েছে এই বলে ঃ 'পৃথিবী থেকে স্ত্রীলোক উচ্ছেদ করে ফেলুন তাহলে আর যুদ্ধ হবে না। পৃথিবীতে শান্তি আসবে। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ শান্তিঃ!' এই কাগজের অফিসেই আর একজনকে দেখেছি, আইনস্টাইনের রেলেটিভিটি থিওরির বিরুদ্ধে খাতার পর খাতা লিখে এনে পড়ে শোনাতে এবং ছাপাবার জন্যে অনুরোধ করতে। এই সব শহুরে শিক্ষিত পাগলদের যে মাথার গণ্ডগোলটা কোথায় এবং কি কারণে তা মনোবিজ্ঞানীরা সহজেই বুঝতে পারবেন।

এ ছাড়াও কলকতা শহরে সম্প্রতি আর-এক শ্রেণীর পাগলের সংখ্যা খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। অফিসে পথে বাসে বা ট্রামে বসে আছেন, হঠাৎ আপনার পাশের এক ধোপদুরস্ত ভদ্রলোককে 'বিড়্ বিড়্' করে উঠতে দেখে আপনি প্রথম চমকে উঠবেন। তারপর বিড়বিড়িনি যখন বক্‌বকানিতে পরিণত হবে এবং কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যাবে অথচ খেই খুঁজে পাওয়া যাবে না, তখন আপনি শিউরে উঠবেন, কারণ সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেও পারবেন না। অবশ্য আঁচড়ে কামড়ে দেবার মতন পাগল এঁরা এখনও হয়ে ওঠেন নি, সুতরাং সীট ছেড়ে না উঠলেও চলে। কিন্তু এই বিড়্‌বিড়ে বক্‌বকে ভদ্র পাগলের সংখ্যা কলকাতায় এত বাড়তে আরম্ভ করেছে কেন ভেবে দেখেছেন কি? সেই 'সোশিওলজির' কথাই আবার এসে পড়ছে। দাঙ্গা মারামারি চুরি ডাকাতি জোচ্চুরি জালিয়াতি কালোবাজার চোরাবাজার, লোকের ভীড়, বাজার দর ও বেকার সমস্যায় কলকাতার কল্‌জে ফেটে যাচ্ছে। তাই মানুষের মাথার তারগুলোও ছিঁড়ে আল্‌গা হয়ে যাচ্ছে, বিড়্‌বিড়িনি বক্‌বকানি বাড়ছে।

'ওগো ভাড়াটিয়া বাড়ি'

দুপুরবেলা কেন যে জোব চার্নক বৈঠকখানা বাজারের কাছে এক গাছতলায় বিশ্রাম নিয়েছিলেন, ঈশ্বর জানেন! তারপরই ব্যাঙের ছাতা হঠাৎ যেমন গজিয়ে ওঠে তেমনি গজিয়ে উঠল একদিন কলকাতা শহর এই গাঙ্গেয় পলিমাটির উপর। শোনা যায়, কলকাতাটা নাকি এককালে সুন্দরবনই ছিল। ভালই ছিল, কলকাতায় তখন অনেক বাঘ-ভাল্লুক, জন্তু-জানোয়ার থাকত, আর আজকাল কলকাতায় হরেকরকমের মানুষ থাকে। সেই আদ্যিকালের কলকাতাটা যদি আজ বায়স্কোপে দেখা যেত। যাই হোক, সকলেই জানেন, কলকাতায় এখন মানুষ বসবাস করে এবং সভ্য মানুষ। কলকাতার এই সভ্য মানুষ সাধারণত দুই রকমের। একরকমের মানুষের নাম 'বাড়ীওয়ালা', আর একরকমের মানুষের নাম 'ভাড়াটে'। দু-রকমের মানুষই কিন্তু দেখতে একরকম, তবে অন্যান্য দিক থেকে সামান্য কিছু তফাৎ আছে। কলকাতার বাড়িওয়ালারা সাধারণত দুপুরে ঘুমিয়ে বিকেলে চোঁয়া ঢেকুর তোলে, বাড়িওয়ালীরা নাকীস্থর টেনে কথা বলে, যেমন 'টাকাকে' 'ট্যাঁকা,' 'ছানাকে' 'ছ্যাঁনা'। কলকাতার ভাড়াটেরা দশটা পাঁচটা অফিস করে। সব রুলেরই যেমন 'এক্সেপ্‌শন্‌' আছে, তেমনি দুপুরে ঘুমানো ভাড়াটেও আছে, আবার স্যুট পরে অফিস-করা বাড়িওয়ালাও আছে। কিন্তু ভাড়াটের কোন জৈবিক বিশেষত্ব থাকুক বা না-ই থাকুক, 'ভাড়াটিয়া বাড়ির' একটা শৈল্পিক বিশেষত্ব আছে যা এযুগের কবিকে পর্যন্ত অনুপ্রাণিত করেছে কবিতা লিখতে—

'ওগো ভাড়াটিয়া বাড়ি!
সেদিন যাহারা এসেছিল ভাড়া,
আজ গেল তারা ছাড়ি?

বৃথা হ'ল যত রং-চুন-কাম,
ঝাড়পোঁচ, ঘষামাজা,
ভাঙা খসা ফুটা মেরামতে ঢাকি,
নবযৌবনে সাজা।......
কত এল গেল জাগিল ঘুমাল
কত সুখদুখরোল,
কত হুলুরব শঙ্খধ্বনি,
'বল হরি হরি বোল'।
কত ওষ্ঠের চাপা হাসি,
কত কণ্ঠের ক্রন্দন,
মর্মছেদন কত বিচ্ছেদ,
কত ভুজ-বন্ধন,--
গাঁথা হয়ে গেছে বন্ধু গো
তব গাঁথনীর স্তরে স্তরে,
তারই চাড়ে চাড়ে ধরিয়াছে ফাট্,
বালি চুন খসে পড়ে।
ভিতরে ভিতরে ঝাঁঝরা হয়েছে
ভাড়াটের সুখে দুখে,
উপরে এখনও রংতালি
তবু দাও ভাই কোন্ মুখে?

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

লাউডন্ কি হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের ভাড়াটে বাড়ির কথা বলছি না, কবিও বলছেন না। আর বললেই বা ক্ষতি কি? আহীরিটোলা, বাগবাজার, বরাহনগর, দমদম থেকে যাঁরা বেহালা, টালিগঞ্জ, কস্‌বা, যাদবপুর পর্যন্ত ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন তাঁরাই জানেন কবির এই কথাগুলো কত সত্যি! কত শত ভাড়াটের সুখে দুঃখে ভেতরটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, তবু রং-চুনকাম করে জোড়াতালি দিয়ে সেজেগুজে ভাড়াটের

জন্যে দাঁড়িয়ে থাকা—এই তো ভাড়াটে বাড়ির বৈশিষ্ট্য! ক্যামাক স্ট্রীট থেকে কলিমউদ্দিন লেন, সমস্ত বাড়িরই ঐ একই বিশেষত্ব—যদি অবশ্য ভাড়াটে বাড়ি হয়।

কলকাতার শতকরা নিরেনব্বুই জন লোক যাঁরা ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন, তাঁরাই জানেন 'ভাঙা খসা ফুটা মেরামতে ঢাকি' ভাড়াটে বাড়ির এই যে 'নবযৌবনে সাজা', কি করুণভাবে তা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং জীর্ণ হাড়গোড়পাঁজর বেরিয়ে পড়ে বর্ষাকালে, বিশেষ করে শ্রাবণের মতন প্রচণ্ড বর্ষায়। সেদিন এক ভাড়াটে বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম ভবানীপুরে। বাড়িটা বোধ হয় মহারাজা নবকৃষ্ণের আমলে তৈরী, জানলার কোণ পর্যন্ত মাটির তলায় বসে গেছে, ফাটা-চটা ছাদ লোহার পিলার দিয়ে ঠেকানো আছে। একতলায় দশ ফুট স্কয়ার দু'খানা ঘর, তার মধ্যে একখানা ঘরে গত দেড়শ' বছরে সূর্যের আলো একটুও ঢোকে নি। তার উপর রান্নাঘর নেই, কারণ বাড়িওয়ালা কথা দিয়েও তৈরী করে দেননি, কথা রাখাটা তাঁদের ধর্মই নয়। কথায় বলে 'খেতে পেলে শুতে চায়', তেমনি বনেদী বাড়িওয়ালারা ভাড়াটেদের বলেন, 'শুতে পেলে খেতে চায়' (এখানেও অবশ্য সব রুলের মতন এক্সেপ্‌শন্‌ আছে)। যাই হোক, এরই মধ্যে এই প্রচণ্ড বর্ষা নেমেছে, এমন বর্ষা যে দার্জিলিং শহরটাই ধসে যাচ্ছে, ভাড়াটে বাড়ি তো কোন্‌ ছার! এমন সময় একদিন গিয়ে যা দেখলাম, তা স্বচক্ষে না দেখলে আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন না। গিয়ে দেখি, সেই একশ' স্কয়ার ফুট ঘরের মেঝেতে গাম্‌লা, বাল্‌তি, হাঁড়ি, ভাঁড়, সরা, ঘটি, বাটি, ড্রাম, প্যান্‌, কুঁজো, কলসী, এমন কি চায়ের কাপ্‌ পর্যন্ত চারিদিকে পাতা রয়েছে, তার উপর জলের ফোঁটা পড়ছে ফাটা ছাদ থেকে, নানারকমের শব্দে যেন জলতরঙ্গ বাজছে, আর ঠিক তার মধ্যিখানে আমার শ্রদ্ধেয় ভাড়াটে কবিবন্ধুটি ছাতি মাথায় দিয়ে বসে সুর করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করছে। দেখে তো আমার চোয়াল প্রায় একহাত 'হাঁ' হয়ে গেল। এর মধ্যে আবার কাব্যচর্চা! ভাবলাম, একেই বলে 'কাব্যরসিক' এবং একেই বলে 'ভাড়াটে'!

'আঠার শত সালে পুলিসের সাহেবলোকেরা কলিকাতার লোকগণনা

করিয়া কাগজ শ্রীশ্রীযুত গবর্নর জেনেরাল বাহাদুরের নিকটে দাখিল করিয়াছিলেন, তাহাতে কলিকাতার লোকসংখ্যা পাঁচ লক্ষ লিখিয়াছিলেন, পরে আঠার শত চতুর্দশ সালে আর একবার গণনা হইয়াছিল তাহাতে জানা ছিল সাত লক্ষ···।' ১৮০০ বা ১৮১৪ সাল এটা নয়, ১৯৫০ সাল। বেশীদিনের কথা নয়, বছর তিনেক আগে ১৯৪৭ সালে, পুলিস সাহেব নন, তখনকার কর্পোরেশনের চীফ্ এক্সিকিউটিভ্ অফিসার ভাস্কর মুখুজ্যে এক বেতার বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, কলকাতার লোকসংখ্যা বিশ লক্ষ থেকে প্রায় চল্লিশ লক্ষ পর্যন্ত বেড়েছে। এখন নিশ্চয়ই পঞ্চাশ লক্ষের কম হবে না। তা ছাড়া জোব্ চার্নকের কলকাতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের 'দ্বিতীয়' মহানগর হলেও বস্তির বাহুল্যে যে 'অদ্বিতীয়' তাতে কোন সন্দেহই নেই। কলকাতায় বস্তির সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার এবং তাতে প্রায় পনের-ষোল লক্ষ লোক বসবাস করে। অর্থাৎ কলকাতার তিনভাগের একভাগ লোক বস্তিতেই থাকে এবং বস্তিগুলোর একটাও মনুষ্য-বাসোপযোগী নয়। বস্তি তুলে দেবার কথা অনেকবার হয়েছে, কিন্তু আইনের দিক থেকে যে করপোরেশনের বস্তি তোলার ক্ষমতা নেই, একথা ভাস্কর মুখুজ্যেই একবার বলেছিলেন। তার কারণ বস্তির জমিদাররা অনেকদিনের প্রাচীন জমিদার, কলকাতা শহর তাঁদের জমিদারী পাবার অনেক পরে গজিয়ে উঠেছে। তাঁদের জমিদারী কেড়ে নেবার ক্ষমতা করপোরেশনের নেই। আর বস্তি তুললেই তো হল না। বস্তির লোকগুলোর তাহলে থাকারও ব্যবস্থা করতে হয়। কার ব্যবস্থা কে করবে? সুতরাং বস্তিও আছে, আর তাতে কলকাতার লক্ষ লক্ষ লোকও আছে। বস্তির চেহারা যদি দেখে থাকেন, তাহলে—এই বর্ষাকালে সেই বস্তির ভাড়াটেদের কথাও একবার ভাবুন। দেখবেন, তার তুলনায় আপনার রংতালি দেওয়া ঘষামাজা ভাড়াটে বাড়িটা বাকিংহাম প্যালেস্।

কলকাতার আশেপাশে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারাদের যেসব হোগ্লার আর ছিটে বেড়ার কলোনি গজিয়ে উঠেছে, সেগুলো কোনদিন ঘুরে ফিরে দেখেছেন কি? যদি না দেখে থাকেন, তাহলে এই বর্ষাকালে একবার অবশ্যই দেখবেন। অধিকাংশ পরিবারের একখানি ঘর, চালবেড়া

অনেকেরই ঝড়জলে ভেঙেচুরে গেছে, ঘরের কাঁচা মেঝে জলে কাদা হয়ে গেছে, আর তার মধ্যে সাপ কিংবা কোলা ব্যাঙ নয়, জলজ্যান্ত মানুষ বাস করছে। বলবেন হয়ত যে তারা তো ভাড়াটে নয়, কিন্তু ভাড়াটে বৈকি! কার জমিতে কে বাস করছে, কার বালুচরে কে বাসা বেঁধেছে, তার ঠিকঠিকানা কি?

আর শিয়ালদা থেকে রাণাঘাট পর্যন্ত স্টেশনে যাদের সপরিবারে বাস করতে দেখেছেন ইদানীং, তারা আমাদের মতন ভাড়াটেদের তুলনায় অনেক সুখে আছে জানবেন। কলকাতার সাধারণ ভাড়াটে বাড়ি বা বস্তিতে যেন তারা না যায় কোনদিন। আমার সেই বন্ধুর ভাড়াটে বাড়ির তুলনায় স্টেশন স্বর্গপুরী, আর কলকাতার বস্তির তুলনায় সেই ভাড়াটে বাড়িও রাজপ্রাসাদ! সুতরাং এই সময় বড় বড় ম্যান্‌সনের বারান্দার তলায় শান-বাঁধানো ফুটপাথে অথবা প্রশস্ত খোলামেলা স্টেশনে বাস করা অনেক ভালো। তাতে সেলামী লাগবে না, চতুর্গুণ ভাড়া দিতে হবে না এবং ছাতি মাথায় দিয়ে গাম্‌লা-বাল্‌তি পেতে ঘরে বাস করতে হবে না। পারিবারিক প্রাইভেসি? ভাড়াটে বাড়ির 'কলেক্‌টিভ্‌' টিউবওয়েল বা জল কলেও নেই। সুতরাং ওসব সংস্কার কাটিয়ে ওঠাই ভাল। তবু ভাড়াটে বাড়িতে ও বস্তিতে থাকবেন না। ফুটপাথে থেকে বাড়ির দিকে চেয়ে বললেন: 'ওগো ভাড়াটিয়া বাড়ি!'

জয় মা কালী রেস্টুরেণ্ট

কলকাতায় এখন কফিহাউসের যুগ। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের ভ্যানিটিতে বাধে সেকেলে কোন 'কেবিন' বা 'রেস্টুরেণ্টে' বসতে, ইন্টিলেকচুয়ালদের মস্তিষ্কের ঘিলু নিঃসরণ নাকি কফির গন্ধ ছাড়া

হয় না এবং পোলিটিকাল কমরেডদের চায়ের বদলে কফির কাপে চুমুক না দিলে নাকি 'সেরিয়াস' আলোচনাই জমে না। কলকাতার সাম্প্রতিক কালচার এখন ক্রমেই কফিহাউস কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে। শহরের ইউথের ক্রীম যদি দেখতে চান, তাহলে কফিহাউসে যান। কেবিনে রেস্টুরেন্টে যাদের দেখবেন তারা সব 'ঘোল' হয়ে গেছে, 'ক্রীম' নেই। আইডিয়াল ক্রীম দেখবেন কফিহাউসে চাপ বেঁধে চক্রাকারে বসে আছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হট্ কফি খেয়েও একটুও গলছে না, অথবা কোল্ড কফি খেয়ে রেফ্রিজারেটরের সলিড বাটারে পরিণত হচ্ছে না। কফিহাউসের কৌলীন্য এমনিতেই যথেষ্ট আছে, তার ওপর কয়েক ডিগ্রি তাকে চাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 'রুম' ও 'ফ্লোর' ভাগ করে। একদল ররাখুরে বামুণ্ডুলে যারা আনায় এক কাপ চা ও একখানা রুটিমাখনের বদলে খালি পেটে এক কাপ কফি খেয়ে পলিটিক্স আলোচনা করতে ভালবাসে, তারা ছাড়া কফিহাউসের বাকি আর সব ক্লায়েন্টেরই একটা 'স্টেটাস' আছে। সে পদমর্যাদা সাধারণ হলঘরেও সম্পূর্ণ বজায় থাকে। তবু যাঁরা ট্যাগ্‌র‍্যাগের একেবারে মুখদর্শন করতে চান না, আরও নিভৃতে মনের মানুষটিকে নিয়ে বসে অবসর বিনোদন করতে চান, যাঁরা আরও 'কোজি নুকে' বসে কাইজু বাদাম চিবুতে চিবুতে আত্মচিন্তায় ডুবে যেতে চান, যাঁরা মোসাহেব, বন্ধুবান্ধবী অথবা নিজেদের গ্রুপগোষ্ঠী নিয়ে একটু গা বাঁচিয়ে আধুনিক সাহিত্য শিল্পকলা সঙ্গীত নৃত্য চলচ্চিত্র ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করতে চান, তাঁদের জন্যে প্রায় দ্বিগুণ মূল্যে পাশের ঘরে বা উপরতলায় স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা আছে। কফিহাউসের রোমান্টিক পরিবেশের কাছে দক্ষিণ কলকাতার লোকের ঐতিহাসিক আকর্ষণ ক্রমে কমে যাচ্ছে। এককালে লেকের পাড়ে তরুণতরুণীদের প্রাণ কচি লাউডগার মতন লতিয়ে যেত, আজকাল কফিহাউসের টবে ডালিয়ার মতন ফুটে উঠছে। সুতরাং লেকই যখন মার খেয়ে যাচ্ছে, কাফে-কেবিনের জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই।

তবু মনটা যদি ব্রেস্ট-চিংড়ি-ফাউল-কাটলেট, ডেভিল-টেবিলের জন্যে কেঁদে ওঠে, তাহলে কাফে রেস্টরেন্টে না গিয়ে উপায় নেই। আলুর দম

ও পরটার কথা এখন বলছি না, পরে বলব। এসব কিন্তু কফিহাউসের ত্রিসীমানায় ঢুকতে পারে না, সবই তার 'নীট অ্যাণ্ড ক্লিন' ব্যাপার, ঝোল-ঝালের নোংরামি নেই। কফির সঙ্গে হাড়টাড় চিবুনো চলবে না। বড় জোর ডিমের ওমলেট খেতে পারেন, অবশ্য রুটির ওপর ক্রাশ্‌ড ডিম বা হাফ্‌সিদ্ধ হলেই ভাল হয়। তা না হলে কফিহাউসের পাকৌড়ির একটা স্বতন্ত্র আভিজাত্য আছে, তাও দু'এক প্লেট স্বচ্ছন্দে খাওয়া চলে। আর লোক তো শুধু খাবার জন্যেই বেঁচে থাকে না, পরিবেশটাও একটা মস্তবড় কথা। এই যে একটা গুন্‌গুনে গম্‌গমে গুরুগম্ভীর কালচারাল অ্যাট্‌মোস্ফিয়ার, এ কি আর 'কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনের' এঁদো রেস্টুরেন্টে মিলবে? সেদিন টেরিটিবাজারের কোণে ছাতাওয়ালা গলিতে একটি রেস্টুরেন্টে এক বন্ধুর সঙ্গে চা খেতে ঢুকে এই নিয়ে তুমুল তর্ক হয়ে গেল। বন্ধুটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের একজন 'কনয়েশ্যুয়োর', কফিহাউসের অপার চেম্বারের রেগুলার ক্লায়েন্ট, ফাটকা বাজারের কাঁচা পয়সাও আছে, কলকাতার বহু 'কুল্‌টুর' সংঘের সভ্য, বেশ একটা গদাইলস্করি চাল আছে কথাবার্তায় চলাফেরায়। হিপোপোটেমাস্‌ ও নেংটি ইঁদুরে যা তফাত, তার চেহারার সঙ্গে আমার চেহারারও সেই তফাৎ। নেহাৎ পাকচক্রে দু'জনের দেখা এবং সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ ও কলেজ স্কোয়ার ছেড়ে ছাতাওয়ালা গলিতে বসা। বন্ধুটি বারবার পারীর সাঁলোর কথা বলে কফিহাউসের সঙ্গে তুলনা করলে। কিছুই বুঝলাম না। ছোটখাটো রেস্টুরেন্ট কাফে কেবিনের ওপর তার বিজাতীয় ঘৃণা, বললে ওখানে যতসব লুম্পেনদের আড্ডা। এমনভাবে নাক সিঁটকে কথাটা বললে যে, প্রতিবাদ না করে পারলাম না। তার কারণ কফিহাউসে গিয়ে নিয়মিত আড্ডা জমানোর মতন ট্যাঁকের জোর আমার নেই। তা ছাড়া আমার বাপ্‌ঠাকুরদারা লেন-বাইলেনের 'পারুল কাফে' 'শ্রীমন্ত কেবিন' 'শোভা কেবিন' 'জয় মা কালী রেস্টুরেণ্ট' ইত্যাদি চাখানায় চা, চপ, কাটলেট খেয়ে সত্তর আশি বছর পর্যন্ত বেঁচেছে এবং জীবনে যা করেছে তার তুলনায় আমার বন্ধুটি কফি টেনে বিশেষ কিছু করেনি। হেরিডিটির প্রভাব ভয়ানক জিনিস, তাই আমি আজও এই সব কাফে রেস্টুরেণ্টের মায়া ত্যাগ করতে পারিনি।

এদের পক্ষে ওকালতি না করে পারলাম না এবং তার জন্যে প্রায় বন্ধু-বিচ্ছেদ হবার উপক্রম হল।

সকলের কথা বলা যাবে না। কালীঘাটের 'জয় মা কালী রেস্টুরেন্টে'র প্রোপাইটর তারিণীচরণই যদি আমার সেই বন্ধুটির কথা শুনত তাহলে হয়তো গরম কেত্‌লিটাই তার ঝুনো নারকেলের মতন মাথায় মেরে বসত। যেদিন তাকে ঘটনাটা এক সান্ধ্য মজলিসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললাম, সেদিন তারিণীর চোটপাট শুনে তাই মনে হল। তারিণী বললে: 'ডেকে নিয়ে আসবেন বাবু আপনার কফিহাউসের বন্ধুটিকে একবার, আমার দোকানের একখানা মাংসের চপ ও এক কাপ চা খেয়ে যেতে বলবেন, তারপর তাঁর লেকচার শুনব।' আমি বললাম: 'আসবে কেন সে তোমার রেস্টুরেন্টে? বন্ধু আমার বুইক গাড়ি চড়ে, সঙ্গে দু-একজন সদাসাথী বান্ধবীও থাকে, তোমার এখানে বসবার জায়গা কোথায় তাদের? প্যাকিং বাক্সের টুলে তো আর তারা বসতে পারবে না। তা ছাড়া তোমার রেস্টুরেন্টের সামনে যদি বুইক গাড়ি দাঁড়ায় তাহলে তো লোকের ভিড় জমে যাবে।' তারিণীর মুখচোখের রং বদলে গেল। সে বললে: 'কি বললেন? আসবেন কেন? বসবার জায়গা কোথায়? বলবেন তাঁকে, যে-রেস্টুরেন্টে হরিশ মুখুজ্যে চা খেয়ে নীল-বাঁদরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, যেখানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বহুবার এসেছেন দেশের আন্দোলনের সময়, বোমার দলের বাবুরা যেখানে মাসের পর মাস গা-ঢাকা দিয়ে থেকেছেন, গত প্রায় একশ বছরের মধ্যে অন্তত তিনশবার যে রেস্টুরেন্টের সামনে হাজার হাজার লোকের ভিড় জমেছে, সেই 'জয় মা কালী রেস্টুরেন্টে'র সামনে বুইক গাড়ি দেখে একটি লোকও দাঁড়াবে না এবং তার ভেতরে বসবার জায়গা না থাকলেও বাইরের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চা খেতে তিনি লজ্জাবোধ করবেন না।'

এসব কাহিনী জানতাম। নিজের বাপ-খুড়োদের কাছ থেকে তারিণীর বাপ-খুড়োদের কথা অনেক শুনেছি। 'জয় মা কালী রেস্টুরেন্টে'র চা-চপ্‌ খেয়ে যে কলকাতার অনেক ছেলে জজ ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে, বড় বড় সাহিত্যিক সাংবাদিক ও দেশনেতা হয়েছে, তাও জানি। তবু তারিণীকে

মধ্যে মধ্যে রাগাতে ভাল লাগে, তাই বলেছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম : 'তিন পুরুষ ধরে এত সব করে, নিজে কি করলে তারিণী?' তারিণী বললে : 'কি আর করব বাবু? আপনাদের আশীর্বাদে দু'বেলা দুমুঠো স্বাধীনভাবে খেতে পাচ্ছি, এই যথেষ্ট। গ্রাণ্ড, ব্রিস্টল, প্রিন্সেস, ক্যাসানোভা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখিনি কোনদিন, আজও দেখি না।'

বাস্তবিকই কলকাতার এই সব ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট কাফে কেবিনের অধিকাংশেরই একটা রোমাঞ্চকর ইতিহাস আছে, কয়েকটির তো আছেই। তাদের মালিকদের এমন একটা গভীর মনুষ্যত্ববোধ আছে যা কোন ক্যাসানোভা কফিহাউসের কর্তাদের নেই। নিছক মুনাফার লোভে তারা কলের পুতুল তৈরী হয়নি। তাই তাদের মাংসের চপ্ বংশপরম্পরায় কাস্টমাররা খায় এবং খেয়ে কোনদিন পস্তায় না। কলকাতার বাঙালীদের জীবনে যদি কারও কোন ঐতিহাসিক ভূমিকা থাকে তাহলে এই 'জয় মা কালী রেস্টুরেন্টে'র মতন ছোট ছোট বহু পুরানো রেস্টুরেন্টগুলোর আছে, বড় বড় হোটেলের নেই। এরা সব একেবারে নারীবর্জিত ঠিক, কিন্তু সেটা দুঃখের কথা। তারিণীর জীবনে কোন স্ত্রীলোক খদ্দের তার দোকানে ঢুকতে সে দেখেনি। তা হোক, তবু তারিণীর রেস্টুরেন্টে অনেক বাঙালী পুরুষ-সিংহের থাবার চিহ্ন আজও আছে, যা চটকদার কোন বিরাট হোটেলে নেই।
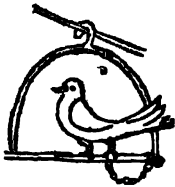
কেরানীদাদুর রূপকথা

ছেলেবেলায় আপনারা ঠাকুরদাদা, ঠাকুমার রূপকথা শুনেছেন। আসুন আজ আপনাদের সেই চিরপরিচিত কেরানীদাদুর রূপকথা শোনাই, শুনুন। র‍্যালি ব্রাদার্সের কেরানী ভবতারণবাবু, সারা বালীগঞ্জে 'দাদু' বলে

পরিচিত। পঁইতিরিশ বছর একনিষ্ঠভাবে কেরানীগিরি করে, দশ বছর হল প্রায় রিটায়ার করেছেন। বয়স এখন সত্তরের কাছাকাছি। দীর্ঘদিনের দশটা-পাঁচটার যান্ত্রিক অভ্যাসটা হঠাৎ ছেড়ে দিলে যদি দেহযন্ত্র বিকল হয়ে যায় সেই আশঙ্কায় ভবতারণবাবু তার বদলে কয়েকটা নতুন অভ্যাস রপ্ত করেছেন। যেমন, ভোরে ফার্স্ট-ট্রামে গঙ্গাস্নানে যাওয়া, স্নান সেরে এসে নিজে বাজার করা এবং বিকেলে গড়ের মাঠে গিয়ে কয়েক মাইল হাঁটা। ভবতারণবাবুকে এ-অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে 'দাছ' বলেই ডাকে, কারণ তিনি খুব ভাল খোশ-গল্প জমাতে পারেন এবং অত্যন্ত রসিক লোক বলে প্রত্যেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে। গড়িয়াহাটা বাজারের প্রত্যেক দোকানদার, আলুপটলওয়ালা, মেছুনি, সব্‌জিওয়ালী তাঁকে বিশেষভাবে চেনে, আর বাজারে যান যেসব ভদ্রলোক তাঁরা তো চেনেনই। 'দাছ' যদি দৈবাৎ কোনদিন না আসেন, গোটা বাজারটা যেন ঝিমিয়ে পড়ে। বাজারেই আমার সঙ্গে দাছুর পরিচয়। এই বাজারেই তাঁর মুখে যেসব টুক্‌রো কথা ও কাহিনী শোনা যায়, তা কোন ঠাকুরদাদার ঝুলিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ছ-একটা টুকরো কাহিনী বলি। বাজারে একদিন বেশ বড়ো সাইজের গলদা চিংড়া উঠেছে। কে একজন ভিড়ের থেকে দাছুকে লক্ষ্য করে বলেছেন: 'খেয়েছেন এরকম চিংড়ী দাছু?' দাছুকে ঘাঁটালে আর রক্ষা নেই। দাছু বললেন: 'এসব ছট্‌কা চিংড়ী হে, ছট্‌কা! একে কি আর গল্‌দা বলে? গল্‌দার খোলায় ভেলার মতন ভেসে আমরা সেকালে সাঁতার শিখেছি—আমাকে গলদা দেখাচ্ছ?' এই রকম, দাছুদের কালে রুই-মাছের ঘাইয়ের চোটে পুকুরপাড়ের বাড়ি-ঘরদোর নাকি কেঁপে উঠত, আজকাল সেই পুকুরও নেই, রুইও নেই। ছধ-ঘি দাছু স্পর্শ করেন না এখন, কারণ সেই গরুও নেই, ছধও নেই। দাছুর কালে ছধ জ্বাল দিয়ে রাখলে তাতে দেড়-ইঞ্চি পুরু সর পড়ত, আর ঘি খেলে হাতে অন্তত এক সপ্তাহ গন্ধ লেগে থাকত। একদিন আধুনিক মিষ্টান্নের কথা উঠতে দাছু বললেন: 'ঐ যে তোমাদের পয়োধি না কি হে! হুঃ! ও কি দই? দই খেইছি আমরা, তোমরা তা চোখেও দেখনি। গয়লা একহাঁড়ি দই

দিয়ে গেলে, হাঁড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমরা দই টেস্ট করতাম। হাঁড়িটা খোলার মতন খসে যেত, দইটা হাঁড়ির মতন বেরিয়ে আসত। তাকেই বলে দই!' এই রকম অনেক কাহিনী কেরানীদাদু বলেন, শোনার আগ্রহে বাজারের লোক তাঁকে তাতিয়ে দিয়ে শোনে।

সেদিন একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেল বাজারে। রোজকার মতন দাদু বাজার করতে এসেছেন, বাড়িতে জামাই এসেছে বলে একটু স্পেশাল বাজার ছিল। জিনিসপত্তরের দাম ভয়ানক চড়া, সুতরাং কিনতে কিনতে দাদুর মেজাজটাও চড়ছিল। রোজই তিনি কেনেন, কিন্তু আজ একটু বেশী কেনাকাটার জন্যে গোড়া থেকেই তিনি চটছিলেন। মাছ আর আলু কিনেই পাঁচ টাকা থেকে সিকে পাঁচেক বেঁচেছে। তাই দিয়ে অন্য সব শাকসব্‌জি কেনা সারতে হবে, তার ওপর দই-মিষ্টি তো আছেই। ব্যাপারটা লাগল ঝিঙে নিয়ে। তার ঠিক আগেই অবশ্য কাঁচকলা নিয়ে এক পর্ব হয়ে গেছে। দশ পয়সা জোড়া কাঁচকলা দেখে দাদু বলেছিলেন: 'এই কাঁচকলা দশ পয়সা জোড়া?' তাতে নাকি কলাওয়ালা খেঁকিয়ে বলেছিল: 'কাঁচকলার কি চেনেন আপনি?' গরম তেলে লঙ্কা পড়ল যেন। দাদু ক্ষেপে গেলেন, বললেন: 'সত্তর বছর বয়সে কাঁচকলা চেনাচ্ছ আমাকে, কানটি ধরে বাজার থেকে বার করে দেব।' এই নিয়ে বেশ এক ঝাপ্‌টা হয়ে গেল, তারপরেই ঝিঙের পালা এল। পাকা বুড়ো ঝিঙে ছয় আনা সের দেখে দাদু বলেছিলেন: 'পেকে ঝুনো হয়ে গেছে, এই ঝিঙে ছ' আনা?' ঝিঙেওয়ালা ফাটা চোঙার মতন গলায় আওয়াজ করে বললে: 'বুড়ো মানুষ! কচি ঝিঙে চিনবেন কোত্থেকে? এই ঝিঙে ঝুনো? একেবারে কচি, এখনও দাঁত গজায়নি বাবু।' 'আবার রসিকতা হচ্ছে' বলে দাদু ফিউরিয়াস হয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে বাজারের লোক ঝিঙের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। দাদুকে সকলেই চেনে। দাদু এর মধ্যে একগোছা ঝিঙে হাতের মুঠোয় তুলে ধরে রীতিমত বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছেন। বাজারের সীমানার বাইরে ফুটপাথে পর্যন্ত কয়েক-শ' লোক দাঁড়িয়ে গেছে।

ঝিঙের ঝুঁটি ধরে দাদু বলছেন: 'এই ঝিঙে ছ' আনা সের? হচ্ছে

কি দিন দিন ? গরুর খাদ্য, তাই ছ' আনা। কাঁচাকলা দশ পয়সা, ডাঁটা দু' আনা, আলু বারো আনা, পটল বারো আনা, মাছ তো তিন সাড়ে তিনের কম নেই,—এটা কি বাজার, না, কসাইখানা ?* আগেকার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। টাকায় ষোলটা ইলিশ মাছ কিনেছি, বললে তো গাঁজাখুরি রূপকথা ভাববেন। কলকাতাতেই টাকায় চারটে ইলিশ দেদার বিক্রি হয়েছে। অত কথায় কাজ কি ? এই কলকাতাতেই আট-নয় বছর আগে বাজারে দশ-বারো আনার বেশী কোন মাছের সের ছিল না, মাংস ছিল দশ আনা, আলু ছ' পয়সা, বেগুন দু' আনা, পটল তিন আনা, ঝিঙে ছ' পয়সা, কাঁচকলা এক পয়সা জোড়া, চার আনা দুধ, দেড় টাকা ঘি। এ তো আর সেকালের রূপকথা নয়, সেদিনকার বাজার দর। আর আজ ? আজ এমন হয়েছে যে, এই কয়েক সালের কথাই আমাদের কাছে ঠাকুরদাদার রূপকথা বলে মনে হয়। একটা টাকার বাজার করলে একজন জামাই কেন, এক ডজন জামাই খেয়ে ফুরুতে পারত না। আর আজ বাড়িতে একটা একটা জামাই এসেছে মশাই, পাঁচটা টাকা নিয়ে এসেছি, থৈ পাচ্ছিনে। সেকালে দশটা টাকা খরচ করলে যে কেউ ভাল করে বাপের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত করতে পারত—আজ একটা জামাই খাওয়াতেই বিশ টাকার ধাক্কা ?'

কেরানী-দাদু বক্তৃতার মধ্যে যে এতটা সিরিয়াসলি বাজার দরের কম্প্যারেটিভ স্টাডি করবেন, কেউ তা ভাবতে পারেন নি। শুনে সকলের যেন সম্বিৎ ফিরে এল হঠাৎ। সকলেই জানে, চার টাকা মণ চাল ষোল টাকা দিয়ে খাচ্ছে, দশ পয়সা সের ডাল বারো আনা, সাত আনা সের সরষের তেল দু'টাকা দশ আনা, তাও সরষের নয় শেয়ালকাঁটার তেল, চার আনা সের দুধ এক টাকা, তাও অর্ধেক জল, আট আনা সের মাছ তিন টাকা, আট আনার কয়লা দু' টাকা, এমন কি তিন আনার আদা আড়াই টাকা। তবু যেন চেতনা নেই কারও, সবাই যেন আমরা কচ্ছপ হয়ে গেছি। মধ্যে মধ্যে বাজারে ও রাস্তাঘাটে মেজাজটা হঠাৎ খিঁচিয়ে ওঠে,

---

* দাদু যদি ১৯৬৭ সালে বেঁচে থাকতেন, তাহলে বাজারে তাঁর রাগারাগির জন্যে দমকল ডাকতে হত।—লেখক

কিন্তু সেটা যে তেল বা মাছের জন্যে তা কেউ বোঝে না। দাদুর বক্তৃতায় সকলের চাপা বেদনা যেন ভাষা খুঁজে পেল। সমর্থন ও সহানুভূতির বন্যায় দাদু প্রায় ভেসে যাবার উপক্রম হলেন। সকলে বললেঃ 'বাস্তবিক! এই তো সেদিনের কথা! অথচ আজ শুনলে মনে হয় যেন অশোক বা আকবরের আমলের কথা শুনছি, নিছক রূপকথা বলে মনে হচ্ছে। নিজেদেরই যদি তাই মনে হয়, তাহলে ছেলেমেয়েদের কাছে এগুলো রূপকথা ছাড়া কি?'

দাদু সোজা ফুটপাথে বেরিয়ে এলেন। চারপাশে তাঁর সমর্থকদের ভিড়। একজন বললেনঃ 'গড়পড়তা প্রায় ছয়গুণ সব খাবার জিনিসের দাম বেড়েছে, রোজগার বেড়েছে কত?' আর একজন বললেনঃ 'কেন? মাগ্‌গী ভাতা?' দাদু বললেনঃ 'আর একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। এই ক'বছরে সংসারের ছেলেপিলে বাড়েনি? তিনটে করে গড়ে তো প্রত্যেক সংসারে বেড়েছে। তার খরচটা ধরছে কে? সুতরাং তোমাদের ঐ সব স্ট্যাটিস্‌টিক্স আর ফ্যামিলি বাজেট, সব ভুল।' সকলে হেসে ফেলল। 'পয়সা শর্ট পড়ে গেল, আবার বাজারে আসতে হবে—'—বলে দাদু হন্ হন্ করে ঘরমুখো চললেন।

কেরানী-দাদুর রূপকথা এইখানেই শেষ হল। বাজারের কাঁচকলা, ঝিঙে যা ছিল সব বিক্রি হয়ে গেল। হবে না? খাবার লোক বেড়েছে কত কলকাতায়!
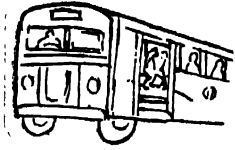
ঠিকা পাল্কি থেকে স্টেট-বাস

পতিহাঁসকে কোনদিন কুকুরে তাড়া করতে দেখেছেন? ডানা মেলে প্যাঁক প্যাঁক করে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে তার ছোটার বহর যদি কেউ দেখে থাকেন, তাহলে কলকাতার রাজপথে ট্রাফিকের চাপে অনভ্যস্ত পথিকের হাঁকপাঁকানির ব্যাপারটাও কল্পনা করতে পারবেন। আর অপরাধই বা কি তার বলুন? ঘরে সব সময় নানারকমের আওয়াজ শুনতে হয়—স্ত্রীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর, ছেলেপিলের প্যানপ্যানানি, রেডিও ও গ্রামোফোনের চীৎকার, ভাবী গায়কগায়িকাদের সুরের কসরৎ ইত্যাদি। তাতেই কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের প্রত্যেকটি স্নায়ু যতদূর সম্ভব জর্জরিত হয়ে থাকে। তার উপর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে যদি অনবরত ঘ্যাঁ ঘোঁ ক্যাঁ কোঁ টুং টাং ঘর্ঘরানির হাজার রকমের আওয়াজ মিলিয়ে এক অভিনব ট্রাফিক-অর্কেস্ট্রা শুনতে হয়, তাহলে কাঁহাতক নার্ভ ঠাণ্ডা রেখে চলা যায় বলতে পারেন? সম্প্রতি যাঁরা কলকাতার নাগরিকদের পথচলার প্রাইমারী শিক্ষা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন, তাঁদের উদ্যম প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁদের সাফল্য নির্ভর করবে ট্রাফিক কণ্ট্রোলের ব্যাপারে শব্দবিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগের উপর। যানবাহনের চালক যাঁরা তাঁরা যদি হর্ন, বেল ইত্যাদির ব্যবহারে সংযমের পরিচয় না দেন, তাহলে লাল নীল আলোয় কলকাতার রাস্তা ছেয়ে ফেললেও, লোকের নার্ভ সব সময় উত্তেজিত হয়ে থাকবেই এবং তাতে দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে না। শব্দবিভ্রাট অধিকাংশ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী এবং সেইজন্য শব্দনিয়ন্ত্রণ ট্রাফিক কণ্ট্রোলের অন্যতম কর্তব্য। অনেকে আছেন হর্ন টিপে বিকট আওয়াজ করে স্পীডে চলেন। তাঁদের ধারণা সারা কলকাতা শহরটাই যেন ফাঁকা গড়ের মাঠ এবং তাঁরা যেন সেই গড়েরমাঠের জমিদার। সেটা তো আর সুস্থ চিন্তা নয়! রাস্তার পাশে হাসপাতাল থাকতে পারে, অনেক বাড়িতে কঠিন রুগী

থাকতে পারে, এসব কথা তাঁদের ভাবা উচিত। আর যাঁরা পাথিকের এক গজ পিছন থেকে হঠাৎ হর্ন বাজিয়ে মজা দেখেন, তাঁদের সেই মজার ব্যাপারটা একজনের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কলকাতার নাগরিকদের পাতিহাঁস বা ভাল্লুক ভেবে নাচানো ও দৌড় করানোর প্রবৃত্তি মোটর-চালকদের মধ্যে উগ্রভাবে দেখা যায়। এ প্রবৃত্তি দমন করা উচিত। সাধারণ লোক রাস্তায় যে সব সময় ট্রাফিকের নিয়মাবলী কণ্ঠস্থ করে চলাফেরা করবে, ভাগ্যবান লোকদের সেটা ভাবা উচিত নয়। প্রত্যেক লোকের মাথায় নানারকমের চিন্তা ও ধান্ধা থাকে, বিশেষ করে কলকাতার লোকের। পথ চলতে হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়া এবং শব্দ শুনে চমকে লাফিয়ে ওঠা তাঁদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এই মনুষ্যত্ববোধটুকু থাকলেই অনেক বিপদ এড়ানো যায়।

মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে বাস করত, তখন সামনে পিছনে বন্য জানোয়ার তাড়া করার ভয় থাকত সব সময়। সভ্য শহরে জন্তু-জানোয়ারের সেই স্থানটা দখল করেছে রাস্তার ট্রাফিক। মনে করুন, কলকাতা শহরে প্রায় ৩০,০০০ প্রাইভেট গাড়ি, ১০,০০০ লরি, ১,৫০০ ট্যাক্সি, ১,০০০ বাস এবং অন্তত ৫০০ ট্রাম আছে। এ ছাড়া প্রায় ১৬,০০০ ঠেলাগাড়ি, ৬,০০০ রিক্‌শগাড়ি, ৪,০০০ ভেণ্ডার ভ্যান, ২,৫০০ মোটর সাইকেল আছে। ঘোড়ারগাড়ি ও সাইকেলের সংখ্যাও বেশ কয়েক হাজার হবে (১৯৫০-৫১-র হিসাব)। অন্যান্য প্রদেশের মোটর লরিও কয়েক হাজার সব সময় কলকাতায় চলাফেরা করে। অর্থাৎ সব রকমের গাড়ি কলকাতা শহরে প্রায় একলক্ষ আছে বলা চলে। শহরের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক এখন বসবাস করে। তার মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক যদি বাইরে নিয়মিত চলাফেরা করে তাহলে কলকাতার রাস্তায় আন্দাজ প্রায় প্রত্যেক ১৫ জন লোকের পিছনে যেকোন একখানা গাড়ি আছে ভেবে নিতে হয়। ব্যাপারটা ভাবা যত সহজ, সামলানো তত সহজ নয়। কল্পনা করুন, একটা জায়গায় পনের লক্ষ লোককে সামনে পিছনে আশেপাশে, চারিদিক থেকে প্রায় একলক্ষ ট্রাম, বাস, মোটর, লরী, ট্যাক্সি, ঠেলাগাড়ি, রিক্‌শ, ভ্যান, ঘোড়ারগাড়ি, মোটরবাইক,

সাইকেল ইত্যাদি তাড়া করেছে। বেচারী পথিক যাবে কোথায়? ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে বাসের তলায়, বাস থেকে নেমে মোটরের তলায়, মোটর দেখে লাফিয়ে ছ্যাকরাগাড়ির ঘোড়ার সামনে, ঘোড়া দেখে লাফিয়ে সাইকেলের সামনে, সাইকেল বাঁচাতে গিয়ে ভ্যান ও রিক্‌শার তলায়, সেখান থেকে একলাফে একেবারে ঠেলাগাড়ির উপরে পড়লেন। পালাবার পথ নেই। যদিও বা কোনরকমে কানিক খেয়ে বোঁ করে ফুটপাথের উপর এসে পড়লেন, তাহলেও সেখানে হঠাৎ যে-কোন স্ত্রীলোক পথযাত্রীর ঘাড়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে বারোয়ারী স্কেলে আপনি প্রহৃত হবেন না, তারও কোন গ্যারাণ্টি বিশেষ নেই। তবে এইটুকু সান্ত্বনা যে, যে কলকাতা শহরে যখন প্রাণ বাঁচানোই দায় তখন আত্মসম্মান রক্ষার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

অথচ কলকাতা শহরের এই ভয়াবহ মূর্তি একশ' বছর আগে ছিল না, এমন কি পঞ্চাশ বছর আগেও না। বাস তো সেদিন হয়েছে, আর তার আগে ট্রামও তো একরকম ঘোড়ার গাড়িই ছিল বলা চলে। ১৮২২ সালে এক সংবাদপত্রে লেখা হচ্ছেঃ 'মোকাম কলিকাতাতে ছকড়া গাড়ির উৎপাতে রাস্তায় চলা ভার।' এটা কিন্তু একেবারে খাঁটি ঘোড়ার সমস্যা, গাড়ির সমস্যা নয়। হুতোমপেঁচা বলছেনঃ 'শহরের বাবুরা ফিটিং সেলফ্‌-ড্রাইভিং বগি ও ব্রাউহামে করে অবস্থাগত ফ্রেণ্ড, ভদ্রলোক বা মোসাহেব সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন।' এখন বগি ব্রাউহ্যামের বদলে সেল্‌ফ-ড্রাইভিং বুইক, হাডসন, প্যাকার্ড প্রেসিডেন্টে করে বাবুরা বেড়াতে বেরোন, ফ্লুইড ড্রাইভিং-এ কোন শব্দ হয় না। সেকেলে ফেটিং ও ছেক্‌রা গাড়ির বদলে স্ট্যাণ্ডার্ড মরিস, অস্টিন, জীপ ইত্যাদির অন্ত নেই আজকাল। সেকালে কলকাতা শহরের চল্‌তি যান ছিল পাল্কী, আজকাল যা গ্রামাঞ্চলেও বিশেষ দেখা যায় না। আমাদের 'বাবারা' হয়ত পাল্কী চড়ে বিয়ে করেছেন, কিন্তু আমাদের জেনারেশনে কেউ অন্তত ট্যাক্সি না চড়ে বিয়ে করেননি। ডেমক্রাসীর যুগে আজকাল অনেকে স্টেট-বাসে করেও বিয়ে করতে যান দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি দু-একজনকে দেখলাম যেতে, এর আগে জীবনে কোনদিন কলকাতায় দেখিনি। স্ট্যাণ্ডের যাত্রীরা

সকলে উলুধ্বনি দিলেন, বর বুক ফুলিয়ে টোপর মাথায় দিয়ে স্টেট-বাসে উঠলেন, কন্‌ডাক্টর টোপরটা খুলে হাতে নিতে বললেন। এ একেবারে চূড়ান্ত ডেমক্রাসীর ব্যাপার! আগে পাল্কী করেই লোকে বিয়ে করতে যেতেন, স্টেট-বাসে নয়। পাল্কীই তখন চলাফেরার একমাত্র ভেহিকেল্ ছিল, ঠিকে উড়ে বেহারারা পাল্কী বইত। পাল্কী ভাড়া ছিল ঘণ্টায় এক আনা। ১৮৩৯ সালের এক সংবাদপত্রে লেখা হচ্ছে : 'সম্প্রতি কলিকাতা নগরের মধ্যে কত ঠিকা বেহারা আছে তাহার এক হিসাব হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইল যে, ১১ হাজার কয়েক শত বেহারা আছে, তাহাদের সংখ্যা চারি দিয়া হরণ করিলে নগরের মধ্যে কত ঠিকা পাল্কী আছে তাহার সংখ্যা অবগত হওয়া যায় অর্থাৎ তাহা দুই হাজার ৫ শতেরও অধিক। এই সংবাদ থেকে আরও জানা যায় যে, পাল্কী বেহারারা সকলেই উড়িয়া ছিল এবং প্রতি বছরে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা তারা রোজগার করে দেশে পাঠাত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কলকাতা শহরে পাঞ্জাবী হিন্দুস্থানী ড্রাইভার কন্‌ডাক্টরদের সমস্যাটা অবাঙালী হিসেবে নতুন নয়। কলকাতার রাস্তায় যখন পাল্কী চলত তখন উড়ে বেহারা পাল্কী বইত। বাস, ট্যাক্সির যুগে পাঞ্জাবী হিন্দুস্থানীরা সেটা দখল করেছে। সাম্প্রতিক স্টেট-বাসের বাঙালী ড্রাইভার কন্‌ডাক্টররা একটা মস্তবড় 'রিলিফ' যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটা প্রাদেশিকতা নয়, দেশের জীবনমরণ সমস্যা। যাই হোক, কলকাতা শহরে আমরা ঠিকা পাল্কীর যুগের উড়িয়া বেহারা থেকে, পাবলিক ট্রাম বাসের হিন্দুস্থানী পাঞ্জাবী ড্রাইভার কন্‌ডাক্টরের একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগ পার হয়ে, আজকাল স্টেট-বাসের বাঙালী ড্রাইভার কন্‌ডাক্টরের যুগে উত্তীর্ণ হয়েছি। এটা শুভলক্ষণ। কিন্তু তাহলেও পাল্কীর যুগের সেই আরাম আর নেই। ভীড় আর ট্রাফিকের চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তার ওপর স্টেট-বাসে চেপে যদি লোকে বিয়ে করতেও যায়, তাহলে তো কথাই নেই। হলই বা ডেমক্রাসী! তারও তো একটা সীমা থাকা উচিত?

ভাগ্যলক্ষ্মী হেয়ার কাটিং সেলুন

কালের যাত্রায় পরিবর্তনের স্রোতে কলকাতা শহর থেকে অনেক কিছু ভেসে যাচ্ছে। ঠিকে পাল্কী জুড়ী বগি স্টেজকোচই যে শুধু ভেসে গেছে তাই নয়, মিউটেশনের ফলে বাবুদেরও মৌলিক রূপান্তর ঘটেছে। কলকাতার বাবুদের মাথার দিকে চাইলেই সেটা বোঝা যায়। মাথার চেহারা বদলে যাচ্ছে, নৃবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে নয়, নাপিতভাই বা পরামাণিকের দৃষ্টিতে। মাথা সম্বন্ধে শুধু যে নৃবিজ্ঞানীদেরই কৌতূহল আছে তা নয়, পরামাণিকদেরও আছে। নিজে পরামাণিক না হলেও এবং সেরকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকলেও, সেদিন অফিস-টাইমে ডালহৌসী স্কোয়ারে অফুরন্ত মাথার ঊর্মিমালার দিকে ধ্যান-নিমীলিত চক্ষে চেয়ে হঠাৎ আমার ব্যাপারটা স্ট্রাইক করল। দেখলাম, জগাই-মাধাইয়ের যুগের সেই থরকামানো চৈতন্য ফক্কা, ক্লাইভের যুগের সেই কার্তিকের মতো বাউরি চুল, রামমোহনের যুগের সেই অ্যালবার্ট ফ্যাশান ও বাঁকা সিঁথি—কোনটারই অস্তিত্ব নেই। জিরোয় ছাঁটা সাদা ঘাড়ই বেশী, তাও দশ আনা-ছ' আনা নয়, চার আনা-বার আনা। যে-সব মাথায় হ্যাট চাপানো আছে, সেগুলো অধিকাংশই দু' আনা-চোদ্দ আনা অথবা এক আনা পনের আনার ছাঁট দেওয়া। শুনেছি, হ্যাট-পরা মাথার দাম সাধারণ মাথার চেয়ে অনেক বেশী, তাই শুধু হ্যাট চাপিয়ে নয়, পনের আনা চুল রেখে তার প্রটেক্‌শনের এরকম সুব্যবস্থা করা হয়। হতেও পারে, হ্যাটের মাহাত্ম্য বোঝার মতন ক্ষমতা আমার নেই, দেশী ক্যাপ বা টুপির কথা বুঝতে পারি। তা ছাড়া আমাদের মতন সাধারণ ব্যক্তির মাথা মোটেই দামী নয়, দেশী বাঁশের মতন রোদে জলে যেমন সেই মাথাটা পুষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি অন্তিম কালে বাঁশের বাড়ি খেয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। তাই বিদ্যাসাগরী কদম ছাঁটেও আমরা দিব্যি বেঁচে থাকি, এক-পনের ছাঁট বা হ্যাট কোন কিছুই মাথার

সিকিউরিটির জন্যে প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে বিদ্যাসাগরী কদম-ছাঁট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের যুগ পর্যন্ত দেখা গেছে, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে, তাও আজকাল আর দেখা যায় না। শেষ পর্যন্ত কদমছাঁটও ভেসে গেল। এখন এক বছরের মেয়ে বাপের কোলে বসে সেলুনে 'বব্' ছাঁট দেয়, আর তারই পাশে উঁচু চেয়ারে চার বছরের ছেলে বসে বাপেরই ডিরেক্‌শনে চার-বারো ছাঁট দিয়ে বাঘের বাচ্চার মতন বেরিয়ে আসে। অথচ এই আমরাই সামান্য পৌনে দশ-সওয়া ছয় ছাঁটের জন্যে সিংহের মতন বাবার কাছ থেকে কি গাঁট্টাটাই না খেয়েছি! সঙ্গে সঙ্গে আবার পরামাণিক ডেকে কদমছাঁটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ আর কতদিনের কথা, এখনও বোধ হয় বিশ বছর হয়নি। বেশ মনে আছে, কলেজে পড়ার সময়ও দশ-ছয় ছাঁটের অনুমতি পাইনি। আজকাল তো নার্সারির ছেলেরাই জিরো চালিয়ে যায়। তার কারণ অবশ্য সেদিন এক পরিচিত পরামাণিক আমায় বললেন, আজকালকার বাবারাও বদলে গেছেন। আগেকার বাবাদের গোঁফ ছিল, আধুনিক বাবাদের গোঁফ নেই। কথাটা হেয়ার কাটিং-এর দিক থেকে উপেক্ষণীয় নয়।

আমাদের দেশে 'হেয়ার কাটিং' বা চুলের ছাঁদ কালচারের একটা অঙ্গবিশেষ। এতটা অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। অন্যান্য দেশে মেয়েদের কেশবিন্যাসের সঙ্গে কালচারের একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু পুরুষদের চুলের ছাঁটও যে কালচারের সঙ্গে জড়িত তা ভারতবর্ষেই বিশেষ করে দেখা যায়। যেমন ঐ ডালহৌসী স্কোয়ারেই সেদিন চার-বারোর স্রোতের মধ্যে হঠাৎ এখানে ওখানে একজন বাঙালী বোষ্টম, অথবা উড়িয়া বা মুক্তকচ্ছ কোন মদ্রদেশীয়ের মাথায় দেখলাম সেই মধ্যযুগের থরকামানো চৈতন্য ফক্কা। তেমনি বাঁকা সিঁতি ও অ্যালবার্ট ফ্যাশনে টেরী কাটা দু' একজন সেকেলে বাবুকে আজও কলকাতার ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ ভেসে উঠতে দেখা যায়। কদমছাঁট প্রায় উঠে গেলেও, একেবারে উঠে যায় নি। স্কুল-কলেজের টিপিকাল ভালো ছেলেরা, বিশেষ করে গরীব গৃহস্থ ঘরের ছেলেরা আজও বিদ্যাসাগরী কদমছাঁট দিয়ে সগৌরবে লেখাপড়া করে। শহরে তাদের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও আজও আছে। পরামাণিকদের

কাছে শুনেছি, ছাঁটের কায়দার সঙ্গে নাকি ইকনমিক ফ্যাক্টরও জড়িত আছে। কদমছাঁটে খরচ কম, দু'মাসে একবার দিলেও ক্ষতি নেই। অন্যান্য হালফ্যাশনের ছাঁটের খরচ বেশী, মাসে দু'বার হলেই ভাল হয়, অন্তত একবার তো দিতেই হবে। অনেকটা এই কারণে কদমছাঁট গরীব ছাত্রমহলে আজও চলে। এ ছাড়া রুচির প্রশ্ন তো আছে। কার্তিকের মতন বাউরি চুল এখন যে একেবারেই দেখা যায় না তা নয়। চিৎপুর অঞ্চলে আজও যেসব শখের যাত্রার দল আছে, তাদের মধ্যে দেখা যায়ই। তা ছাড়া কলকাতার টলিউডে (টালিগঞ্জের ফিল্ম স্টুডিও) ও স্টেজের অভিনেতাদের মধ্যেও যথেষ্ট দেখা যায়। কিন্তু এসব এখন কখন-সখন'র পর্যায়ে উঠেছে। আসল কথা হচ্ছে, বাঙালীর মাথার আদল বৈজ্ঞানিকের চোখে না বদলালেও এবং ঘিলু ক্রমশ কমে গেলেও মাথার ছাঁটের বাহার বদলাচ্ছে, বৈচিত্র্যও বেড়ে চলেছে। এর প্রমাণ আমি 'ভাগ্যলক্ষ্মী হেয়ার কাটিং সেলুনে' দীর্ঘদিন চুল ছাঁটার অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছি। সেই কথাই বলব।

'ভাগ্যলক্ষ্মী হেয়ার কাটিং সেলুন' কলকাতা শহরের অন্যান্য শত শত গরীব গৃহস্থ পরামাণিকদের সাধারণ সেলুনের মতন একটি। বড় বড় কায়দাদুরস্ত সেলুনের কথা জানিও না, বলতেও চাই না। ভেতরের জাঁক-জমক দেখে বাইরে থেকে ঢুকতে কোনদিন সাহস হয়নি। মনে হয়েছে, মাথার চেহারা দেখেই যদি তাড়িয়ে দেয়! তবে শুনেছি, সে-সব সেলুনে দাড়ি কামালে নাকি ঘুম আসে এবং তারপর যখন চীনা ও ফিরিঙ্গি মেয়েরা গাল মাথা টিপে মাসাজ করে দেয়, তখন মনে হয় স্বর্গে যাচ্ছি। দাড়ির দক্ষিণাই এক টাকার কম নেই। কেবল গোঁফ ছাঁটার জন্যই নাকি এক টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ আছে। সুতরাং আমাদের মতন সাধারণ লোকদের জন্য ভাগ্যলক্ষ্মী সেলুনের মতন শত শত সেলুনের শ্রীবৃদ্ধি হোক, অভিজাত সেলুনে দাড়ি কামিয়ে, চীনা মেয়ের গাল টিপুনি খেয়ে স্বর্গে গিয়ে দরকার নেই। যখন শেভিংস্টিক্ বা ব্রাশ কিছুই ছিল না, তখন আমাদের বাঙালী পরামাণিকরা তাঁদের কড়াপড়া হাত দিয়ে আমাদের বাপ-ঠাকুরদার গালে শুধু খাঁটি জল ঘসে, বাঙালী কর্মকারের

তৈরী ক্ষুরে (জার্মানির নয়) তাঁদের দাড়ি কামিয়ে দিয়েছেন এবং তাতেই তাঁরা পরম নিশ্চিন্তে স্বর্গে গেছেন। সুতরাং বাঙালী পরামাণিকদের কড়া হাতই সুস্থ থাক্। দু'গণ্ডা কি চারগণ্ডা পয়সায় যে তৃপ্তি তাদের হাতে পাওয়া যায়, তাই সাতপুরুষের এই বাঙালী গালের পক্ষে যথেষ্ট। গোঁফ যদি লাউগাছের মতন মাটি পর্যন্ত লতিয়েও যায়, অথবা গোঁফের গোড়া মারার জন্যে যদি গন্নাকাটাও হতে হয় তাও ভাল, তবু পাঁচ টাকা দিয়ে পার্ক স্ট্রীটের সেলুনে বিদেশী 'কাটারে'র কাছে গোঁফ ছাঁটব না।

ভাগ্যলক্ষ্মী সেলুনের প্রতিষ্ঠাতা গৌরহরি পরামাণিক আজ বেঁচে নেই। বাপ-খুড়োদের কাছে শুনেছি, গৌরহরি নাকি অনেক বড় বড় বাঙালীর মাথার চুল ছেঁটেছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মাথার চুল সে ছেঁটেছে নিয়মিতভাবে, ছ'পয়সা রেটে, যদিও দাড়ি কামায়নি কোনদিন। অর্থাৎ সে নাকি প্রায় বলত যে, এমন সব মাথা নিয়ে সে নাড়াচাড়া করেছে যার দাম দেওয়া যায় না। সেলুনের হিড়িক এল যখন তখন ছেলেদের তাগিদে সে সেলুন করেছে, কিন্তু নিজে কোনদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে বরাদ্দ মাথা কামানো ছাড়া সেলুনে কাঁচি ধরেনি। আজ তার ছেলে নরহরি ও নাতিরা সেলুনের মালিক। নরহরি বলে: 'চুল ছাঁটব কি! নিত্য নতুন ফ্যাশন বদলাচ্ছে। বাবুরা যা বলেন আমরা তাই ছেঁটে দিই। আজ বড়ুয়া, কাল অশোককুমার, পরশু পাহাড়ী, তারপর দিন ছবি বিশ্বাস ও উত্তমকুমার যদি চুল ছাঁটার বা জুলফি পর্যন্ত রাখার নমুনা যোগান, তাহলে আমরা কি করব বলুন?' শুনে বললাম, সেইজন্যই কি ফিল্মের অভিনেত্রীদের ছবি দেওয়ালে টাঙিয়েছ? নরহরি হেসে বললে: 'কি করব বলুন, বাবুরা পছন্দ করেন। বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, এসব ছবি একখানাও টাঙাতে দেন নি। কেবল স্বামী বিবেকানন্দের একখানা ছবি ছিল।'

কথাটা শুনে চুপ করে রইলাম। ভাবলাম, বাঙালী পরামাণিকদের কারিগরী দক্ষতা নয় শুধু, শৌখিন রুচিটুকু আজও মরেনি। তাকে বিকৃত করেছেন এক শ্রেণীর রুচিহীন বরাখুরে বাঙালী বাবুরা। বাঙালী পরামাণিকদের ভবিষ্যৎ আজ তাই বাংলাদেশে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। রাস্তাঘাটে তাঁদের আজকাল আর বিশেষ দেখা যায় না। তার বদলে

বিহারী নাপিতদের রাস্তায় ঘুরতে এবং 'বার্বার্স কর্নার' তৈরী করে বসতে দেখা যায়। বিহারী নাপিতের সেলুনও সর্বত্র গজিয়ে উঠছে। সমস্যাটা কেবল বাঙালী পরামাণিকরা নন, বাঙালী বাবুরাও একটু ভেবে দেখবেন।

কলকাতার ফিরিওয়ালা

কলকাতার ফিরিওয়ালারা এক বিচিত্র মানবগোষ্ঠী। দ্বারে দ্বারে তারা স্বপ্ন ফিরি করে বেড়ায় না, স্বপনপসারী কবি তারা নয়। রকমারী জিনিস তারা ফিরি করে বেড়ায়, হরেকরকম কায়দায় ও ভঙ্গীতে। কলকাতার ভ্রাম্যমাণ ফিরিওয়ালাদের কথা বলছি। কোন ফুটপাথ বা শহরের কোন চলাফেরার জায়গা জুড়ে তারা বসে না, পথে পথে তারা বেড়ায়, দ্বারে দ্বারে হাঁক দিয়ে যায়। তবু তাদের চলাফেরায়, পোশাক-পরিচ্ছদে, হাবভাবে, হাঁকডাকে, কথাবার্তায় সবসময় একটা শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়, যা সচরাচর আর অন্য কোন শ্রেণীর বিক্রেতাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। বিক্রয়কলাকে এমন সুন্দর অভিনয়কলায় রূপ দিয়ে সার্থক করতে কলকাতার ভ্রাম্যমাণ ফিরিওয়ালাদের মতন আর কাউকে দেখা যায় না। শহরের পাড়ায় পাড়ায় তাই তাদের প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশী, ছেলে-মেয়ে, কিশোর-কিশোরী, এমন কি বুড়োবুড়ীদের কাছেও তাদের 'পপুলারিটি'র তুলনা হয় না। সংসারের দৈনন্দিন পাপচক্রে

হয়ত কোন গৃহিণীর চড়াঝাল আলুর চপ্ তৈরী করে খাওয়ার সুবিধা হয় না, বাড়ির কর্তাকে সামান্য এই লোভটুকুর কথা বলতেও কেমন যেন লজ্জা হয়। তার জন্যে ভাবনা নেই, পাড়ার ঘুগ্‌নিওয়ালা আছে এবং তার সঙ্গে বরাদ্দই আছে রোজ বেলা চারটের সময় দু'খানা করে মনমোহিনী চপ্ দিয়ে যাবে। তা ছাড়া আলুর দম বা আলু-নারকেলের ঘুগ্‌নি তো আছেই। অফিসের ভাত রেঁধে দিয়ে, ছেলেপিলে সামলে, এসব জিনিস কি তৈরী করে জিবের স্বাদ মেটানো সম্ভব? তা হয় না। হন্তদন্ত হয়ে একপেট খেয়ে কর্তা যখন অফিসে বেরুচ্ছে, লেট হবার আতঙ্কে ভাত যখন বুক থেকে পেট পর্যন্ত নামেনি, তখন কি আর আব্দার করে কোন শখের জিনিসের কথা বলা যায় নাকি? হলই বা নববিবাহিতা বধূ, তবু তো একটা সময় অসময় আছে? মাথার ক্লিপ কাঁটা নেই, চুলবাঁধার ফিতে নেই, একটু স্নো পাউডার না হলেই বা চলে কি করে— এসব কথা বলা আর হয় না। মনের বাসনা মনেই থেকে যায়। ঠিক ভরদুপুরবেলা গড়িয়ে গেলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্যে শ্রীভগবানের মতন আবির্ভাব হয় ফিরিওয়ালার, পিঠে বিরাট এক পোঁটলা, হাতে একটা লাঠিতে নানারকমের ফিতে ও ট্যাসেল ঝুলানো, আর মুখে সেই একসুরে রকমারী জিনিসের আবৃত্তি

মাথায় কিলিপ কাঁটা চায়
হেজ্‌লিং চায় পমেটম চায়....
আলপাকার ফিতে চায়
সাবান তরল আলতা চায়।

তারপর পাড়ার সব গৃহিণী একত্র হয়ে দল বেঁধে নানারকমের জিনিস দেখা ও দর করে কেনার পালা চলে। এ ছাড়া, শাড়ি সায়া সেমিজ ব্লাউস-ওয়ালাও আছে। নীলশাড়ি একখানা কিনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, অবসর ও মেজাজ বুঝে কর্তাকে দেখিয়ে অবাক করা হবে। তার ওপর কর্তা যখন [illegible]ব যে শাড়িখানা পকেট-থেকে না-বলে-নেওয়া দু'চার আনা করে পয়সা জমিয়ে কেনা, তখন বিস্ময়ে তাঁর বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে যাবে। খুশীতে গিন্নীর মনটাও তখন উপ্‌চে পড়বে না কি? শাড়ি তো দামী

জিনিস, তার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। হঠাৎ একদিন অফিস যাবার সময় ভাত খেতে বসে যদি একটা নতুন খাগড়াই কাঁসার বাটিতে গরম ঝোল দেওয়া হয়, তাহ'লে কে না অবাক হয় বলুন? কিন্তু টাকার প্রশ্ন তুলে গিন্নীর মুখের দিকে চাইতেই যদি উত্তর আসে যে নগদ পয়সা নয়, ছেঁড়া কাপড়ের বদলে বাটিটা কেনা, তাহলে মনে হয় না, কি যে সামনে আমার গিন্নী, না, স্বয়ং যেন মা লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছেন?

এইবার একবার এই ফিরিওয়ালাদের কথা ভেবে দেখুন। সাধারণত এই শ্রেণীর ফিরিওয়ালারা অত্যন্ত গরীব, কোন মূলধন তাদের নেই। তবু সামান্য পুঁজিতে জিনিস কিনে, সেই জিনিস আবার অনেক সময় মাসিক কিস্তিবন্দীতে ধারে বিক্রি একমাত্র এরাই করে থাকে। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের অভাবের সংসারের কথা এরা জানে। কি ভাবে আমাদের মতন গরীবের ঘরে পুরনো ভাঙা বাটিটার বদলে ঘরের মা-বোন-স্ত্রীরা সংসারের টুকিটাকি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস এদের কাছ থেকে কেনে তাও এরা বোঝে। তাই ধারে ও কিস্তিতে জিনিস বিক্রি করতে এরা দ্বিধাবোধ করে না। কোন অ্যাকাউণ্ট লেজারও এদের নেই, ভাউচারও নেই। সব হিসেব ক্রেতার উপর নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিয়ে এরা খালাস, কারণ মেয়েদের নির্ভুল হিসেবের উপর এদের অগাধ বিশ্বাস। তা ছাড়া যারা দুপুরের অবসর সময়ে নিজেরা মোটরে করে অথবা সন্ধ্যায় স্বামীর সঙ্গে শহরের ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্সে বা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে সওদা করে শখ মেটাতে পারে না, সেইসব সংসারবন্দী মেয়েদের দিক থেকে একবার এই ভ্রাম্যমাণ ফিরিওয়ালাদের কথা ভাবুন, তাহলেই তাদের ভূমিকাটা বুঝতে পারবেন। কলকাতার এই ফিরিওয়ালারা হল গরীব গৃহস্থদের কাছে, বিশেষ ক'রে সংসারী মেয়েদের কাছে, বাইরের জগতের দূত। ছোট্ট হেঁসেলসর্বস্ব সংসারের বাইরে যে বৃহত্তর জগৎ আছে, তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার সেতু হল এই ফিরিওয়ালারা। এমন মিষ্টি স্বভাব আর এমন সমবেদনাভরা মন, শহরের আর কোন শ্রেণীর বিক্রেতার মধ্যে নেই। সমস্ত পৃথিবীর বোঝাটা যেন পিঠে করে নিয়ে এরা ঘরের মধ্যে বন্দী মা ছেলেমেয়েদের জন্যে ঘুরে বেড়ায়। এদের মুখের ডাক শুনলেই

বন্ধ ঘরের দরজা খুলে যায়, পাড়ার গলি ও বারান্দাগুলো মেয়েদের ভিড়ে সরগরম হয়ে ওঠে, ফিরিওয়ালাদের হাট বসে, কেনাবেচা হয়। উনুনে আঁচ দেবার সময় হলেই আবার সেদিনের মতন হাট যায় ভেঙে।

আর একরকমের ফিরিওয়ালা আছে যারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মন ভোলাবার জন্যে শহরের পথে পথে, পাড়ায় পাড়ায় বহুরূপী সেজে ঘুরে বেড়ায়। বাস্তব অভিনয় শিশুদের ভাল লাগে না, রঙ চড়ানো ব্যাপার না হলে তাদের মন ওঠে না। যাত্রা থিয়েটারে সঙের চরিত্রই তাদের খুশী করে বেশী। শিশুদের মনস্তত্ত্বের এই সহজ কথাটা এই ফিরিওয়ালারা যে-রকম বোঝে তাতে বাস্তবিকই অবাক হয়ে যেতে হয়। কিছুই না, সামান্য চানাচুর বেচতে হবে হয়ত, তার জন্যে ঠিক যাত্রাদলের সঙের মতন সেজেগুজে, মাথায় টুপি, পায়ের নূপুর, হাতে চোঙা নিয়ে, চৌতাল নাচের ভঙ্গীতে গলির মোড়ে হঠাৎ—

…কুড়মুড় কুড়মুড় কুড়মুড় ভাজা
গরম গরম খেতে মজা
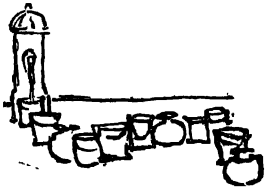
কলকাতার বস্তিপুরাণ

[ক]লকাতা শহরে বস্তিতে যাঁরা বাস করেন তাঁদের নিয়ে কাব্য রচনা [ক]রার প্রেরণা অনেক আধুনিক কবি পেয়েছেন, আমি পাইনি। হয়ত [আ]মি কবি নই বলে। আমার কেবল মনে হয়েছে যে-দেশে মহেঞ্জোদড়ো [হর]প্পার মতন সুন্দর নগর ছিল আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে,

যে-দেশে তাজমহল তৈরী হয়েছে, সে-দেশের আধুনিক শহরে বস্তি গজিয়ে উঠল কোথা থেকে ? কলকাতার তিনভাগের একভাগ লোক চিরকাল এই বস্তিতে বাস করেন এবং তাঁরা যে সকলেই কলকারখানার মজুর, কুলি বা গাড়োয়ান তা নন, তাঁদের মধ্যে গরীব গৃহস্থ মধ্যবিত্তের একটা অংশ বরাবর বাস করেন। আজকাল পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা ভদ্র গৃহস্থ পরিবার হাজার হাজার বস্তিতে বাস করছেন। সেদিন টালিগঞ্জ অঞ্চলের এক বস্তিতে এক বাস্তুহারা আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাসা বলতে একখানা ঘর, বোধ হয় নয় দশ সাইজ হবে, তারই সংলগ্ন একটুখানি বারান্দার এক কোণে রান্নাঘর। বারোয়ারী এক টিউবওয়েল থেকে কয়েক শত লোকের জল সরবরাহ হয়ে থাকে, মেয়ে-পুরুষ সকলের স্নানের কাজও ঐ কলে বসে সেরে নিতে হয়। তাও কলে মাথা দিয়ে বসে স্নান করা চলবে না, বাল্তি করে জল নিয়ে পাশে বসে স্নান করতে হবে। মেয়ে-পুরুষের কোন ভেদাভেদ থাকবে না, পুকুরঘাটে বা গঙ্গার ঘাটেও যেটুকু আছে, বস্তির কলে তাও নেই। মেয়েদের সম্ভ্রম ইজ্জত আব্রু বা লজ্জার কোন লেশ থাকলে বস্তিতে বাস করা একেবারেই চলবে না। সব সময় গলাবাজি করে গালাগাল দিয়ে নিজের অধিকার জানাতে হবে, তার জন্যে মারামারি কাটাকাটি হলেও প্রস্তুত থাকতে হবে লড়বার জন্যে। সেক্ষেত্রেও মেয়েপুরুষে ভেদ নেই। পুরুষরা যদি বালতি ছোড়ে, মেয়েদের কলসী ছুড়তে হবে। পুরুষরা যদি দশটা গালাগাল দেয়, মেয়েদের চীৎকার করে অন্তত একশ' গালাগাল একনিশ্বাসে আওড়ে যেতে হবে। পুরুষে পুরুষে যদি কোস্তাকুস্তি করে, মেয়েদের করতে হবে কোমরে কাপড় জড়িয়ে চুলোচুলি। এই দৃশ্যই সেদিন নাটকীয় ভঙ্গীতে অভিনীত হতে দেখলাম টালিগঞ্জের এক বস্তিতে। অভিনেতা অভিনেত্রীরা প্রায় সকলেই মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের মেয়েপুরুষ। তার মধ্যে আমার গ্রাম-সম্পর্কের এক কাকীমাও একজন। দেখেশুনে চমকে গিয়ে কাকীমাকে বললাম : 'এরকম ভাষায়, আর এরকম গলায় চীৎকার করতে শিখলেন কোথায় ?' কাকীমা ঝঙ্কার দিয়ে জবাব দিলেন : 'তোমাদের এই কলকাতা শহরে, আবার কোথায় ? এই নাকি শহর ? ঝাঁটা মার শহরের মুখে।'

তারপরই 'বস্তিপুরাণ' লেখার প্রেরণা পেলাম। কলিযুগের 'কলিকাতার' বস্তিপুরাণ 'অমৃতসমান' না হলেও, 'ইণ্টারেস্টিং'।

মাত্র একশ' বছর আগেকার কথা বলছি।

কলকাতা শহরের সবচেয়ে অভিজাত অঞ্চলগুলো তখন এই কুৎসিত স্তিতে ঠাসা ছিল। এখন যেখানে একখানা ঘরের ভাড়া একশ' টাকা বং রীতিমত অভিজাত না হলে যে-অঞ্চলে বসবাস করার কথা কল্পনাই রা যায় না, সেখানে মাত্র একশ' বছর আগে জঘন্য সব বস্তি আর াড়ার আস্তাবল ছিল। তার মধ্যে ডান্‌কিন সাহেবের বস্তি একটি। র্ক স্ট্রীটের পাঁজর ঘেঁসে উড্‌ স্ট্রীট থেকে ক্যামাক স্ট্রীট পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় া বিঘে জায়গা জুড়ে কদর্য এই বস্তি ছিল। বস্তিতে বাড়ির চাকর-করই থাকত বেশি, সহিস কচুয়ানও থাকত। ১৮৫৮ সালে মিউনিসি-ালিটি থেকে বস্তিটি দখল করা হয় এবং বসতবাড়ি তৈরীর জন্যে কর্তারা মি বিক্রি করতে থাকেন। এককোণে একটি তিনকোণা ট্যাঙ্ক খোঁড়া া, পরে ১৯০৬ সালে সেটি ভর্তি করে ফেলা হয় এবং তার নাম হয় ্যালেন স্কোয়ার'।

থিয়েটার রোডের দক্ষিণে, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীট আর ক্যামাক স্ট্রীটের মধ্যে ায় চব্বিশ বিঘে জায়গা জুড়ে নোংরা এক বস্তি ছিল—মনি সাহেবের স্তি। এই বস্তিটিকেও মিউনিসিপ্যালিটির কর্তারা দখল করে পরে সতবাড়ি তৈরী করার অনুমতি দেন।

থিয়েটার রোডের উত্তর দিকে ক্যামাক স্ট্রীট আর হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের ধ্যে প্রায় ৫৪ বিঘে জায়গা জুড়ে বামুনবস্তি নামে বিরাট এক কদর্য বস্তি ল। বস্তির মালিক ছিলেন পিটার্সন সাহেব। বস্তির মাঝখানে বেশ ড় একটি ট্যাঙ্ক ছিল। পরে মিউনিসিপ্যালিটির কর্তারা বস্তিটিকে উচ্ছেদ রেন, উড স্ট্রীট, সারকুলার রোড এবং ক্যামাক স্ট্রীট ও হাঙ্গারফোর্ড টের যোগাযোগের জন্যে ছোট ছোট কয়েকটি রাস্তা তৈরী করেন, ঙ্কটারও সংস্কার করেন। এখন তার নাম 'ভিক্টোরিয়া স্কোয়ার'।

কথা হচ্ছে, এই সব নোংরা বস্তি কলকাতা শহরের মধ্যে গজিয়ে উঠে-

ছিল কেমন করে এবং সাহেবরাই তার মালিক বা জমিদার হলেন কোথা থেকে? গ্রাম থেকেই যে কলকাতা শহর গজিয়ে উঠেছে, পচা-গলা নোঙরা বস্তি আর আস্তাবলের স্তূপ থেকেই যে ক্যামাক স্ট্রীট, থিয়েটার রোড, হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের উৎপত্তি হয়েছে তা বেশ বোঝা যায়। নবাবী আমলের সূর্যাস্তের পর ইংরেজরা যখন এদেশের রাজা হয়ে এলেন তখন এই সব গ্রামের জমিদার তাঁরা নিজেরা হলেন, কিছু কিছু তাঁদের বাঙালী মুন্‌শী দেওয়ান মুচ্ছুদ্দীদেরও দিলেন। সেইসব কঙ্কালসার জরাজীর্ণ গ্রামগুলোকে পরে জমিদারীর আয়ের জন্যে বস্তিতে পরিণত করা হয়েছে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ইট-পাথরের প্রাসাদ অট্টালিকা সদম্ভে কলকাতা শহরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, রাস্তাঘাট জলকল নালা-নর্দমা সবই বদলেছে, কিন্তু বস্তি যেমন ছিল ঠিক তেমনি আজও আছে, একটুও বদলায় নি। এখন কেবল বস্তিগুলোকে দেখলে মনে হয় যেন বড় বড় ইট-পাথরের স্তূপের পাশে হাড়গোড় ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

এক-আধটা নয়, এ রকম অসংখ্য বস্তি আছে কলকাতায়। কলুটোলা, খিদিরপুর, মোমিনপুর, বেহালা, চেতলা, কালীঘাট, টালিগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলে এখনও যেসব বিশাল বস্তির চাপ্‌ড়া আছে, তা দেখলেও গা শিউরে ওঠে। এই সেদিন, ১৯৪৪ সালেই একবার গুনে দেখা গিয়েছিল, কলকাতা শহরে প্রায় পাঁচ হাজার বস্তি আছে এবং তাতে প্রায় দশ লক্ষ লোক বাস করে। এখন এই বস্তিবাসী লোকের সংখ্যা বেড়েছে বৈ কমে নি এবং দাঙ্গার কল্যাণে বস্তির সংখ্যা হয়ত কিছু কমেছে। তাই বস্তিবাসীদের জীবন কেবল লোকের ভিড়ের চাপে এখন আরও কদর্য, আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে।

নগরকর্তাদের বললে হয়ত মুচকি হেসে বলবেন, তাতে কি? ইংলণ্ডেও তো ম্যাঞ্চেস্টারের মতন বস্তিভরা কদর্য শহর আছে এবং লণ্ডন শহরকেই তো একদিন কবি শেলী বলেছিলেনঃ 'নরক যদি কোথাও থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেটা লণ্ডন শহরের মতন।' আর দাম্ভিক আমেরিকানদের সবচেয়ে আধুনিক নিউইয়র্ক শহরে এই সেদিন পর্যন্ত তো প্রায় ১৭ বর্গমাইল জুড়ে বস্তি ছিল শুধু। ১৯৩৫ সালের কথা, বেশী দিনের কথা নয়।

নিউইয়র্কের এই বস্তিতে প্রায় পাঁচ লক্ষ গরীব গৃহস্থ মার্কিন পরিবার বাস করত। এটা ক্যাপিটালিস্ট সভ্যতারই বৈশিষ্ট্য। কলকাতা শহর ইংরেজদের গড়া, সুতরাং কলকাতায় তার বৈশিষ্ট্য থাকবেই।

তত্ত্বকথা বাদ দিয়েই বলা যায়, বস্তিটা হল বর্বরতার চিহ্ন, কলকাতা শহরের বুক থেকে তাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা উচিত। যে শহরের প্রায় অর্ধেক লোক বস্তিতে বাস করে, সে শহরের ভবিষ্যৎ কি? সেখানে স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত আর গবেষণাগার গড়া অর্থহীন। মানুষের যেখানে মানুষের মতন বাস করার সুযোগ নেই, বস্তিতে বন্দী করে মানুষকে যেখানে পশু তৈরী করা হয়, চোর ডাকাত খুনী লম্পট হবার পথ খুলে দেওয়া হয়, সেখানে মানুষেরই বা ভবিষ্যৎ কি? ভবিষ্যতের কর্ণধাররা এ কথার যদি উত্তর দিতে না পারেন, তাহলে তাঁদের সমস্ত সোনালি পরিকল্পনা দামোদরের সর্বগ্রাসী গর্ভে প্রকৃতির অভিশাপে ডুবে তলিয়ে যাবে। বস্তির সমস্যা যেরকম ভয়াবহ হয়ে উঠছে দিন দিন, তাতে কলকাতার সামাজিক ও নৈতিক শৃঙ্খলারও বাঁধ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। যে শহরের বস্তিতে বাস করে নিতান্ত নিরীহ গ্রাম্য 'কাকীমারা' পর্যন্ত জাঁহাবেজে মেয়েলোক হতে পারেন রাতারাতি, সে শহরের সকালবেলার সাধু পুরুষেরা যদি রাত্রের খুনী আসামী হন, তাতে আর আশ্চর্য কি!

শহুরে মেয়ের পাঁচালি

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের যুগ আর নেই, সুতরাং পদ্মিনী চিত্রিনী শঙ্খিনী হস্তিনীদের নিয়ে রুচিহীন রসমঞ্জরী রচনা করা চলবে না। শুনবেই বা কে ? মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্ররা অনেকদিন আগেই কেষ্ট পেয়েছেন। এমন কি ঈশ্বর গুপ্তর যুগও কেটে গেছে অনেকদিন। গুপ্তকবিদের হাজার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সত্ত্বেও মেয়েরা শিক্ষা পেয়েছেন এবং ইংরেজী শিখে তাঁরা সবাই যে বিবি সেজে বিলিতী বোল্ বলে বেড়াচ্ছেন তাও সত্যি নয়। হতে পারে, আগেকার মেয়েদের মতন হয়ত তাঁরা সকলে ব্রত-ধর্ম করছেন না, সাজি নিয়ে সাঁজ-সেঁজোতির পালাও গাইছেন না। কিন্তু তাই বলে যে সকলে কাঁটা-চামচ ধরে চপ্-কাট্‌লেট খাচ্ছেন অথবা 'আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী' গড়ের মাঠে যাচ্ছেন, তাও ঠিক নয়। গুপ্তকবির আমলে প্রায় একশ বছর আগে হয়ত নতুন এ-বি শেখা দু-চারজন মেয়েকে দেখে মনে হত—

> 'ঢল ঢল টল টল বাঁকা ভাব ধ'রে
> বিবিজান চ'লে যান, লবেজান কোরে'—

কিন্তু ভুললে চলবে না, এটা বুদ্ধচিন্ত্যান্নদাশঙ্করাদির যুগ, অর্থাৎ বুদ্ধদেব অচিন্ত্য অন্নদাশঙ্করাদির যুগ এবং তার চেয়েও কঠিন প্রগ্রেসিভ্ কবিদের মারাত্মক যুগ আসছে, যখন চাঁদের দিকে চেয়ে কবিতা পড়লে চলবে না, চালভাজা চিবুতে চিবুতে কবিতা পড়তে হবে। সুতরাং 'শাড়ি পরা এলোচুল, আমাদের মেম্‌রা' আজ আর বিদ্রূপের পাত্রী নন। তাঁরা কেউ গেরিলাযুদ্ধ করছেন, কেউ ট্যাক্সির লাইসেন্সের জন্যে চেষ্টা করছেন, কেউ কেউ বা ট্রাফিক কণ্ট্রোল করছেন। গুপ্তকবি বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন তাঁর সেই—

> 'সিন্দুরের বিন্দুসহ, কপালেতে উল্কি
> নসী জশী ক্ষেমী বামী রামী শামী গুল্কি'

আজ আর কলকাতার রাস্তায় একটিও দেখা যায় না। ইদানীং কুম্‌কুমের শ্রীরাধা টিপের কিঞ্চিৎ চলন হলেও, রামী শামী গুল্কিদের কপালেতে উল্কি দেখা যায় না। গুপ্তকবির মতন 'কনজার্ভেটিভ্‌' লোক আজ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই কলকাতার ফুটপাথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতেন এবং মেয়ে-পুলিশরা তাঁকে চ্যাংদোলা করে হাসপাতালে নিয়ে যেত। শহুরে মেয়েদের যদি তিনি টেনিস্‌ খেলতে এবং সুইমিং পুলে কস্টিউম্‌ পরে সাঁতার কাটতে অথবা টুইস্ট নাচতে দেখতেন, তাহলে মৃগীরোগে তিনি যে আরও অনেক আগে মারা যেতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমার অগ্রজ হুতোমপেঁচার মনোভাব এদিক দিয়ে কিন্তু অনেক বেশী 'প্রগতিশীল' বলা চলে। হুতোম আফ্‌সোস্‌ করে বলেছিলেন : 'বাঙ্গালির স্ত্রীরা কি দ্বিতীয় মিস স্টো, মিস টমসন ও মিসেস বরকরলি ও লেডী বুলুয়ার লিটন হতে পারে না? বিলিতি স্ত্রী হতে বরং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী ও ধর্মশীলা—তবে কেন বড়ি দিয়ে, পুতুল খেলে, ঝগড়া ও হিংসায় কাল কাটায়? সীতা, সাবিত্রী, সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্ণাও তো এই এক খনির মণি? তবে এঁরা যে কয়লা হয়ে চিরকাল ফারনেসে বদ্ধ হয়ে পোড়েন ও পোড়ান, সে কেবল বাপ মা ও ভাতারবর্গের চেষ্টা ও তদ্বিরের ত্রুটিমাত্র। বাঙালি সমাজের এমনই এক চমৎকার রহস্য যে, প্রায় কোন বংশেই স্ত্রী পুরুষ উভয়ে কৃতবিদ্য দেখা যায় না। বিদ্দেসাগরের স্ত্রীর হয়ত বর্ণপরিচয় হয় নাই; গঙ্গাজলের ছড়া—সাফরিদের মাদুলী ও বাল্‌সির চন্নামেত্তো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত।' কথাটা আজও পর্যন্ত অনেকটা ঠিক বলা চলে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের স্ত্রী বাড়িতে একশ'বার গোবরজল ছড়া দিচ্ছেন এবং বিশুদ্ধ গঙ্গাজল খেয়ে কলেরায় ভুগেছেন, এরকম দৃষ্টান্ত বাংলাদেশে আজও বিরল নয়। বিখ্যাত সাহিত্যিক বা শিল্পীর স্ত্রী দিনরাত ঘুঁটে আর ধোপাব হিসেব নিয়ে ব্যস্ত আছেন এবং লক্ষ্মী সত্যনারায়ণের পাঁচালি ছাড়া জীবনে আর কিছু পড়েন নি, এমন দৃষ্টান্ত এখনও যথেষ্ট আছে। মেয়েদের কথা ছেড়েই দিলাম। সারাজীবন ফিজিক্স কেমিস্ট্রী নিয়ে গবেষণা করেছেন, তিনবার ইয়োরোপ ঘুরে এসেছেন,

এরকম লোকও যদি তাবিচ, মাদুলি ধারণ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হন, তাহলে তাঁদের স্ত্রীরা গোবরজল ছড়ালে আর অপরাধ কি ?

যাই হোক, হুতোম আজকে বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আফসোস করতেন না। সাম্প্রতিক কালের বিদ্যাসাগরের স্ত্রীদের বর্ণপরিচয় হয়নি, এমন দেখা যায় না বিশেষ। বরং অনেক লীলাবতী, গার্গী, মৈত্রেয়ীর স্বামীরা কোনরকমে নাম সই করতে পারেন এবং তারই ঠেলায় ব্যবসা করে যথেষ্ট অর্থ রোজগার করছেন, এরকম দেখা যায়। আজকাল মেয়েরা কয়লা হয়ে ফার্নেসে বদ্ধ থেকে নিজেরা পোড়েন না এবং কাউকে পোড়ান না। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই কৃতবিদ্য এবং প্রয়োজন হলে স্ত্রীরা 'লেডী বুলুয়ার লিটন' স্বচ্ছন্দে হতে পারেন। শহুরে মেয়ের পাঁচালী আজ তাই নানা ছন্দে লিখতে হবে, কারণ জীবন ও সমাজ গুপ্তকবি বা হুতোমপেঁচার যুগ থেকে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, জীবনের ছন্দ-বৈচিত্র্য বেড়েছে অনেক।

তবু শহুরে মেয়েদের মধ্যে হুতোমপেঁচা বা ঈশ্বর গুপ্তের 'টাইপ' যে একেবারেই দেখতে পাওয়া যায় না, তা নয়। আধুনিক বিদ্যাসাগরদের বর্ণপরিচয়হীন স্ত্রী যে এখনও যথেষ্ট আছেন তা আগেই বলেছি। সেদিন এক মনীষীদের সভায় এক বিরাট স্বনামধন্য শিক্ষাব্রতীর স্ত্রীকে বুকে হাত লেপ্টে আসতে দেখে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। স্বামী যখন সভায় আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন, স্ত্রী তখন ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখতে দেখতে কখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। সেই ফাঁকে দেখলাম তাঁর বিরাট হরিনামের থলেটি বেরিয়ে পড়েছে এবং বুঝলাম বুকে হাত রাখার কারণ, মালা জপ করা। দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। ভাবলাম, হুতোমের কথা আজও মিথ্যে নয়।

গুপ্তকবির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও যে আজ একেবারে অচল তা বলা যায় না। 'ঢল ঢল টল টল, বাঁকা ভাব ধরে' আজও অনেক বিবিজান লবেজান ক'রে চ'লে যান। শাড়ির পাড় নেই, থাকলেও 'পাইপ' বসানো, গাঢ় ফিকে রঙে ম্যাচ করা, চুল কায়দা ক'রে লাড্ডু পাকানো, হাতে রিস্টওয়াচ আর ভ্যানিটি ব্যাগ, (ইদানীং কাঁধে উঠেছে) চলাফেরায়

কথাকলির নৃত্যভঙ্গিমা, কথাবার্তায় শান্তিনিকেতন-কাম্-ক্যামাক-স্ট্রীটের মিশ্রিত সুর ও ঢং—এই ধরনের বাঙালী বিবিজানরা আজও আছেন, তবে তাঁরা যে শিক্ষিতা ও মার্জিতা তা মনে হয় না এবং তাঁদের সংখ্যা শহরে খুব বেশী নয়।

শহরে সত্যিকারের আধুনিক শিক্ষিতা মেয়ে যাঁরা তাঁদের আমি নিঃসঙ্কোচে প্রশংসা করি। ভারতচন্দ্রের ভাঁড়ামি বা গুপ্তকবির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ তাঁদের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই প্রযোজ্য নয়। কলকাতার মতন আজব শহরে তাঁরা যে রকম সৎসাহসের সঙ্গে চলে ফিরে বেড়ান, জীবিকার জন্যে, শিক্ষার জন্যে, একশ' বছর আগে কেউ তা কল্পনা করতেও পারতেন না। এ যুগের শহুরে মেয়েদের অসাধারণ স্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্ম-মর্যাদাবোধ এবং তারই সঙ্গে নারীসুলভ শিষ্টতা, কমনীয়তা ও বিনম্রতা বাস্তবিকই অতুলনীয়। তার মানে পরিপূর্ণ নারীত্বের বিকাশ হচ্ছে তাঁদের মধ্যে। জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগছে। কেবল বড়ি দিয়ে, পুতুল আর তাস খেলে, পরনিন্দা আর পরচর্চা করে, সেকালের ঘরের বধূদের মতন তাঁরা জীবন কাটান না, কাটাবার সুযোগও নেই। কারণ এটা রসিকতা আর ভাঁড়ামির যুগ নয়, প্রত্যেক পদে পদে জীবন-সংগ্রামের যুগ, কন্‌ট্রোল আর কো-অপারেশনের যুগ। তাই পথে-ঘাটে মেয়েদের চলতে ফিরতে দেখে, অথবা অফিস যাবার সময় নিদারুণ ভিড়ে স্কুল-কলেজ ও অফিসযাত্রী মেয়েদের নিরুপায় হয়ে বাসে-ট্রামে উঠতে দেখে কোন কোন রসিক পুরুষ 'স্ত্রীলোকের বেয়াদফি' সম্বন্ধে যখন ফোড়ন কাটেন, তখন আমার মতন অহিংস লোকেরও অসহ্য মনে হয়, মনে হয় তাঁর গালের ডাইনে-বাঁয়ে অনবরত তবলার মতন তেহাই মারি। আধুনিক মেয়েদের বাসে-ট্রামে ভিড় ঠেলে ওঠা অথবা কাজে-কর্মে অফিস যাওয়াটাই অপরাধ হল? আর সেকালের জ্যেঠিমা, পিসিমা, খুড়িমারা যখন বারমাসের তেরপার্বণে লক্ষ লক্ষ পুরুষের ভিড় ঠেলে উন্মুক্ত গঙ্গার বুকে স্নান করতে, অথবা শ্রীশ্রীকালীমাতার মুখদর্শন করতে যান, তখন কোন বেয়াদফি বা বেইজ্জতির প্রশ্ন ওঠে না কেন? আজকালকার শহুরে মেয়েদের নিয়ে যে শ্রেণীর লোক পথে-ঘাটে প্রকাশ্যে টিপ্পনী কাটেন, তাঁরা

এই প্রশ্নের জবাব দেবেন কি ? নথ নাকে দিয়ে ঘোমটা টেনে রান্নাঘরে আর আঁতুড় ঘরে বন্দী হয়ে থাকলেই কি মেয়েদের 'নারীত্ব' পূর্ণিমার চাঁদের মতন ফুটে ওঠে ?

মেয়ে-কেরানীর বিজ্ঞাপন

খবরের কাগজ পেলে প্রথমেই বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাটি পড়েন, এরকম বেরসিক পাঠক আর কেউ না থাকলেও, আমি আছি। অথচ জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও আমি 'বেকার' হইনি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কোনদিনই 'বেকার' হব না আমি। তবু 'বিজ্ঞাপন' প্রথমেই পড়ি, একাধিকবার পড়ি এবং তার জন্যেই প্রধানত কাগজ কিনি। শহরে যখন থাকি, তখন পথ চলতে অসংখ্য বিড়ির দোকানের রেডিও থেকে 'সংবাদ' সজোরে প্রতিধ্বনিত হয় কানে, কাগজ পড়ার দরকার হয় না। তাছাড়া হকারদের চীৎকার তো আছেই। সুতরাং বিজ্ঞাপনই আমার কাছে খবরের কাগজের প্রধান পাঠ্যবিষয়। তার কারণ কাগজের বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাটা হল আমাদের সমাজের দর্পণ। কতটা স্পীডে আমাদের সমাজ কতদিকে এগুচ্ছে তা বিজ্ঞাপনের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী প্রতিবিম্বিত হয়। 'কর্মখালি' 'কর্মপ্রার্থী, সম্পত্তি বাড়ি জমি 'নিলাম বিক্রয়' ইত্যাদির মধ্যে, অথবা 'পাত্রপাত্রী'র বিজ্ঞপ্তির মধ্যে দেশের আর্থিক ও সামাজিক জীবনধারার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনটি কোন তিন কলম সংবাদেও পাওয়া যায় না। যেমন ধরুন কেরানীগিরি। বিজ্ঞাপন পড়ে দেখেছি, গত দশ

বছরের মধ্যে কেরানীগিরির জন্যে মেয়েদের 'ডিমাণ্ড' প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে এবং ক্রমেই দ্রুত-হারে বাড়ছে। এইভাবে বাড়তে থাকলে, আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে কেরানীগিরি থেকে পুরুষরা যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। জানি না, সমস্যাটা পুরুষদের স্ট্রাইক করেছে কি না, তবে সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর। আর কিছুদিনের মধ্যেই কেরানীগিরিটা 'মেয়েলি' কাজ বলে গণ্য হবে, এবং তখনও দু'চারজন পুরুষ কেরানী যাঁরা থাকবেন তাঁরা বিদ্রূপের পাত্র হবেন।

কেরানীর ঠিকুজী বিচার করলে দেখা যায়, তার জন্ম বিগত শতাব্দীতে। তখন কেরানীরা 'রাইটার' বলে পরিচিত ছিলেন, 'ক্লার্ক'ও বলা হত। পেশা হিসাবে কেরানীগিরির খাতির ছিল তখন, কারণ নতুন ইংরেজী-শেখা দেশী বাবুরাই কেরানী হতেন এবং ইংরেজী শেখা ও কোনরকমে লেখাটাই তখন একটা তাজ্জব ব্যাপার ছিল। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কেরানীগিরি চলছে এবং সম্প্রতি কেরানীগিরি নতুন খোলস বদলাচ্ছে বলা চলে। সেকালে পালকের ও কঞ্চির কলম দিয়ে টেনে-জড়িয়ে যাঁরা লিখতে পারতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তাঁরাই ছিলেন আদর্শ কেরানী। এখন টাইপিস্ট না হলে সে কেরানীপদবাচ্যই নয়, তাও স্টেনো-টাইপিস্ট হলেই ভাল হয়। তার ওপর, 'সবার উপরে নারীই সত্য'—কথাটা যেন দিনে দিনে কেরানীগিরিতেই বেশী প্রমাণিত হচ্ছে। বড় বড় অফিসে মেয়ে-কেরানী বা টাইপিস্ট না থাকলে তো চলেই না, এমন কি 'অর্ডার সাপ্লাইয়ে'র মতন বেমক্কা ফাঁকা দালালির অফিসেও নিদেনপক্ষে একজন 'লেডী টাইপিস্ট' থাকা চাই-ই। বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, বড়বাবু ও বাবুসাহেবরা সকলেই প্রায় মেয়ে-কেরানী চান। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখবেন, কেবল যে তাঁরা মেয়ে-কেরানীই চান তা নয়, সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী (অবশ্য গৃহকর্মে নিপুণা না হলেও চলবে) স্মার্ট ও ইয়ং মেয়ে-কেরানী চান। মুশকিল তো সেইখানেই। অন্য কথা কিছু বলছিনে, প্র্যাক্‌টিকাল ডিফিকাল্‌টির কথা বলছি। সকলেই যদি ইয়ং চান, তাহলে মধ্যবয়স্কা ও প্রৌঢ়াদের মধ্যে রীতিমত কর্মঠ যাঁরা তাঁরা কি করবেন ? সেদিন এক টাইপ-রাইটিং স্কুলে প্রায়

পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের এক বৃদ্ধাকে 'টাইপ' শিখতে দেখে অনেকক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবলাম, ব্যাপারটা কি হতে পারে? ইয়ং মেয়েরা অনেকেই টাইপ শেখেন, তার কারণও আছে। কিন্তু বৃদ্ধার উদ্দেশ্য কি? নিশ্চয়ই স্বল্পশিক্ষিতা, পারিবারিক জীবনের আর্থিক গুরুভারে চাকরি করতে চান, তাই যোগ্যতা আর একটু বাড়াবার জন্যে টাইপ শিখছেন। কিন্তু ভেবে দুঃখ হল, কে তাঁকে চাকরি দেবে?

ইয়ং মেয়েদের কর্মক্ষেত্র যত প্রসারিত হয় ততই ভাল এবং তাঁরা যদি কেরানী বা টাইপিস্টের কাজে দলে দলে যোগদান করেন তাতেও দুঃখের কোন কারণ নেই। পিতৃমাতৃহীন একটি মধ্যবিত্ত সংসারের কথা ভাবুন, যার সমস্ত দায়িত্ব একটি তরুণী মেয়ের উপর পড়েছে। ছোট ছোট পাঁচ ছ'টি ভাইবোনের সে বড়দিদি। এই দুর্দিনে তাদের খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচাতে হবে, লেখাপড়া শেখাতে হবে। সুতরাং চাকরি ছাড়া আর কি করতে পারে সে? উচ্চশিক্ষিতা না হলে তার পক্ষে কেরানীগিরি করাই ভাল। এই রকম একটি মেয়েকে আমি জানি, সে কেরানীর চাকরি করে তার এক ভাইকে ডাক্তারী, এক ভাইকে ইঞ্জিনীয়ারিং এবং আরও দু'টি ছোট ভাই-বোনকে স্কুলে পড়াচ্ছে। তাছাড়া বৃদ্ধা মাও আছেন। বিয়ে করার তার স্বাভাবিক ইচ্ছা যথেষ্ট থাকলেও, আজ পর্যন্ত বিয়ে করার সুযোগ হয়নি। যে কয়েকজন প্রেমিক পুরুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিয়ে করতে এসেছেন, তাঁরা সকলেই শুধু তাকেই উদ্ধার করতে চেয়েছেন, তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল অতগুলো জীবনকে নয়। সুতরাং মেয়েটি প্রত্যেকটি বিয়ের প্রস্তাব অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছে। আজও সে অবিবাহিতা। হয়ত সারাজীবনই তাই থাকতে হবে। তবু কেন যে সে তার জীবন যৌবন সব উৎসর্গ করল নির্মম কেরানীগিরিতে, কে তার খোঁজ রাখবে? এরকম এক-আধজন নয়, অনেক মেয়েকেই আজকাল কলকাতা শহরে দেখা যায়। তাদের 'মেয়ে-কেরানী' বলেই আমরা চিনি, তার বেশী কিছু জানি না, কখন-সখন ঠাট্টাবিদ্রূপও হয়ত করে ফেলি। কিন্তু তাদের সামনে শ্রদ্ধায় মাথা হেঁটে করা উচিত নয় কি?

এ ছাড়াও, অসহায় মধ্যবিত্ত সংসারের অন্যরকম চেহারা আছে। মনে

করুন, কয়েকগণ্ডা নাবালক ছেলেমেয়ে রেখে বাড়ীর কর্তা যিনি তিনি সংসারটিকে ভরাডুবি করে চোখ বুজলেন। অসহায় স্ত্রী তাঁর, অতগুলি ছেলেপিলের মা হয়ে কি করবেন? লেখাপড়া যা তিনি জানেন, তাতে চাকরি হয়ত তিনি স্বচ্ছন্দে করতে পারেন। কিন্তু চাকরি তাঁর করা উচিত, না কোন দেবর বা ভাসুরের সংসারে দাসীর মতন থেকে সমস্ত ছেলেমেয়ের জীবন নষ্ট করা উচিত? নিশ্চয়ই চাকরি করা উচিত, এবং কেরানীর চাকরি ছাড়া কি-ই বা তিনি করবেন? এখানেই সেই 'প্র্যাকটিক্যাল ডিফিকাল্‌টি'র কথা এসে পড়ছে। সকলেই যদি ইয়ং 'মেয়ে-কেরানী' চান তাহলে এই ভদ্রমহিলা চাকরি পাবেন কোথায়?

স্থতরাং বিজ্ঞাপনদাতারা মেয়ে-কেরানী নিন তাতে কোন আপত্তি নেই, তবে ফিজিওলজিকাল কোয়ালিফিকেশনগুলো আরও একটু উদার হওয়া উচিত নয় কি? অবশ্য বিজ্ঞাপনে এও দেখেছি, বিপত্নীক ভদ্রলোক তাঁর একলার সংসারে দুটি ছোট ছেলেমেয়েকে মানুষ করা ও ঘরকন্নার কাজ করার জন্যে নির্ঝঞ্ঝাট স্ত্রীলোক চান, তাও আবার ইয়ং হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন দিয়ে এ-যে কি ধরনের সৃষ্টিছাড়া কাজের লোক চাওয়া তা জানি না। তবে কেরানীগিরিতে যদি এরকম 'সৃষ্টিছাড়া' চাওয়ার কোন প্রয়োজন না থাকে, তাহলে 'ইয়ং ও সুশ্রী' কথা দুটো 'মেয়ে-কেরানীর বিজ্ঞাপন' থেকে তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। চাকরি করতে যাঁরা আসবেন, তাঁদের মধ্যে ইয়ংও থাকবেন, মধ্যবয়স্কাও থাকবেন, কর্মক্ষম বুড়ীরা থাকলেই বা ক্ষতি কি? তাঁদের মধ্যে সুশ্রী কুশ্রী বিশ্রী সকলেই থাকবেন। কাজ করার যোগ্যতা থাকাটাই আসল কথা।

এ ছাড়াও আর একটা কথা ভাববার আছে। কেরানীর কাজ মেয়েরা সব পান তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু পুরুষদের অন্য কিছু করার সুযোগ কোথায়? বিশেষ করে বাঙালীদের কথা বলছি। বাঙালী মেয়েরা যদি বেশীসংখ্যায় কেরানী হন, তাহলে পুরুষদের 'রাঁধুনী' হতে হয়, কারণ ব্যবসায়ী তো আর বাঙালীরা নন? আর কলকারখানা খুব বেশী থাকলে, পুরুষরা না হয় আরও ভারী কাজ করতে কারখানায় যেতেন। তাও তো বাংলাদেশে এখন নেই। সুতরাং আপাতত যদি বিজ্ঞাপনগুলো মেয়ে

পুরুষ উভয়ের জন্যে দেওয়া যায়, তাহলে কি হয়? পুরুষরা অন্তত দরখাস্ত তো করতে পারেন?

সেদিন এক বন্ধুর অফিসে এই ব্যাপার নিয়ে একটি মজার গল্প শুনলাম। গল্পটি বলে শেষ করি। বন্ধুটি মেয়ে-কেরানী চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। দরখাস্ত অনেক এসেছে, তার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। একজন পুরুষ দরখাস্ত করেছেন, কিন্তু গোড়াতে দরখাস্ত পড়ে বোঝবার উপায় নেই। আগের অভিজ্ঞতা ও বর্তমান বেকার জীবনের দুঃখকষ্টের কথা বলে দরখাস্তের শেষ প্যারাগ্রাফে তিনি ইংরেজীতে যা লিখেছেন তার বাংলা ভাবার্থ হল এইঃ 'স্যার! সত্যি কথা বলতে কি, আমি মেয়ে নই পুরুষ। কিন্তু স্যার, আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, তাতে আপনার কিছু ক্ষতি হবে না। আমি এমনভাবে কাজ করব এবং এমনভাবে আপনার আদেশ পালন করব যে আপনি কোনদিনই বুঝতে পারবেন না, আমি স্ত্রীলোক কি পুরুষ! পরীক্ষা প্রার্থনা করছি।'

শুনে হাসলাম বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, মেয়ে-কেরানী চাওয়ার ধুম যদি এইভাবে বাড়তে থাকে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন পুরুষরা শুধু 'দরখাস্ত' নয়, ছদ্মবেশী মেয়ে সেজে 'ইন্টারভিউও' দেবে এবং হয়ত বিজ্ঞাপনদাতাদের ঠকিয়ে দু'চারমাস চাকরিও করে নেবে। তারপর ধরা পড়ে মার খাবে, কি জেল খাটবে সে পরের কথা। সুতরাং 'মেয়ে-কেরানীর বিজ্ঞাপন' যাঁরা দেন তাঁরা হুঁশিয়ার হবেন!

ভাতের বদলে ভ্যানিশিং ক্রীম

স্বাধীন হবার পর ভারত সরকারের সমস্যার আর অন্ত নেই। শুধু কি আর ভাত-রুটির সমস্যা, বা বস্ত্র-সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামালেই চলে? ভ্যানিশিং ক্রীম, কোল্ড ক্রীম, হেয়ার ক্রীম, লোশন, এসেন্স, লিপস্টিক, ভ্রূ-পেন্সিল, রুজ পাউডার, এসব নিয়েও স্বাধীন মাথা মধ্যে ভীষণ ঘামাতে হয়। এত সব সমস্যার চাপে মাথা যদি বিগ্‌ড়ে যায় তাহলে মাথার আর দোষ কি? এতদিন জানতাম, কারখানার মজুররা তাঁদের অভাব অভিযোগ জানিয়ে আর্জি পেশ করেন শ্রম-সচিবের কাছে, আজকাল অফিসের কর্মচারীরাও করেন। বাণিজ্য-সচিবকে নিয়ে সাধারণত বড়লোক ব্যবসায়ীদের কারবার। এখন দেখা যাচ্ছে মহিলাদেরও বাণিজ্য-সচিবকে প্রয়োজন হয় এবং ভাত-কাপড়ের জন্যে নয়, ভ্যানিশিং ক্রীম ও ফেস্ পাউডারের জন্যে। সম্প্রতি আমাদের দেশের মহিলাদের মধ্যে অনেকে নাকি দলবেঁধে বাণিজ্য-সচিব শ্রীপ্রকাশের কাছে একখানি দরখাস্ত পাঠিয়েছেন। দরখাস্তের মধ্যে তাঁরা অভিযোগ করেছেন যে সম্প্রতি বিলেতী আমেরিকান বা ফরাসী প্রসাধনদ্রব্য নাকি যথেষ্ট পরিমাণে ভারতে আমদানী করা হচ্ছে না এবং বিলাস-সামগ্রী বলে এগুলির আমদানী কমিয়ে দেওয়ায় ভারতীয়-বিলাসিনীদের রীতিমত অসুবিধা হচ্ছে। কথাটা মিথ্যা নয়। এ বছর গত এপ্রিল থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে মাত্র তিন লক্ষ টাকার মতো প্রসাধনদ্রব্য এসেছে, গত বছর এই সময় প্রায় ৮৬ লক্ষ টাকার জিনিস এসেছিল। তিন লক্ষ আর ৮৬ লক্ষের মধ্যে পার্থক্যটা যে কেউ বুঝতে পারেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে আমাদের দেশের মেয়েরা উঠে পড়ে ক্রীম পাউডার মাখতে আরম্ভ করেন। প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার প্রসাধনদ্রব্য সেই সময় আমদানী হয় এদেশে। ১৯৪৮-৪৯ সালে সেটা

৪২ লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে তো আরও শোচনীয় অবস্থা। সুতরাং মহিলারা যে অভিযোগ করেছেন সেটা মিথ্যা নয়। সকলেই জানেন, বাজারে পণ্ড্স ক্রীমের দাম তিনগুণ বেড়ে গেছে এবং বিক্রি-ওয়ালারা বাড়ি থেকে চতুর্গুণ উদ্যমে খালি পণ্ড্সের কৌটা কিনতে আরম্ভ করেছে। অর্থাৎ, পণ্ড্সের কারখানা আমেরিকা থেকে কলকাতার কোন চোরাগলিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিউটিকারা পাউডারেরও এই দুর্দশা অনেক আগে থেকেই হয়েছে। এক তিনগুণ মূল্যবৃদ্ধি, তার উপর মেকী জিনিস মুখে ঘষে যদি পৈতৃক মুখটা চিরজীবনের মতো বিকৃত হয়ে যায়. তাহলে মনের অবস্থাটা কি হতে পারে বুঝতেই পারেন। জানি না যাঁরা শ্রীশ্রীপ্রকাশের কাছে দরখাস্ত করেছেন তাঁদের কারও কারও মুখের এরকম ট্র্যাজিক অবস্থা হয়েছিল কিনা। তাঁদের কারও মুখ দেখার সৌভাগ্য হয়নি কোনদিন, সুতরাং বলতে পারি না। তবে যাই হোক, তাঁদের আবেদন বা অভিযোগ কোনটাই ভিত্তিহীন নয়। প্রসাধনের প্রয়োজন আছে এবং আজ থেকে নয়, সেই আদিম কাল থেকেই মেয়েরা প্রসাধন ও অলংকরণ সম্বন্ধে সচেতন। অন্যান্য শিল্পকলার মধ্যে সৌন্দর্য-চর্চাও একটি, এবং হাজার হাজার বছর ধরে মেয়েরা (পুরুষরাও) এই রূপচর্চা করে আসছে। ভাতের প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু ভ্যানিশিং ক্রীমের প্রয়োজন তার চেয়ে কম হলেও, প্রয়োজন একেবারে নেই একথা বলা যায় না। একশ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা একথা শুনেই হয়ত বলবেন যে গরীব চাষীর ঘরে অথবা অসভ্য আদিম জাতির মেয়েরা ভ্যানিশিং ক্রীম না মেখেও কি সুন্দর নয়? কথাটা ঠিক নয়। গরীব চাষীর মেয়েরা বা আমরা যাদের অসভ্য আদিম জাতি বলি তাদের মেয়েরাও প্রসাধন-সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন, এমন কি আধুনিক নগরবাসিনীদের চেয়েও যদি বেশী সচেতন বলি তাহলেও ভুল বলা হয় না। অবশ্য তারা হয়ত বিলেত আমেরিকা প্যারিসের কসমেটিক্স ব্যবহার করে না, কিন্তু তার বদলে যেসব প্রাকৃতিক জিনিস অত্যন্ত যত্নসহকারে ব্যবহার করে, নগরবাসিনীরা তার খোঁজই রাখেন না।

আধুনিকতা সম্বন্ধে যাঁদের একটা নিউরসিস্ আছে তাঁরা মেয়েদের

মুখে সামান্য ক্রীম পাউডার দিতে দেখলেই চটে যান এবং তার উপর যদি তাঁরা ঠোঁটে বা নখে রঙ মাখেন তাহলে একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এ সবই হল তাঁদের মতে উগ্র আধুনিকতা এবং ঠোঁটে নখে রঙ লাগানো ইত্যাদি ব্যাপার হল মেমসাহেবী কায়দা। এই ধরনের মন্তব্য যাঁরা করেন, রূপকলা সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানগম্যি তো নেই-ই, নিজের দেশের ইতিহাস এবং নিজের জাতির আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও তাদের অজ্ঞতার সীমা নেই। প্রসাধনকলা সম্বন্ধে আমাদের দেশের যে ঐতিহাসিক ঐতিহ্য আছে, বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন দেশের অতটা নেই। সে ইতিহাস আলোচনা করার ক্ষেত্র এটা নয়। সামান্য ত্বু-একটা কথা বলছি। আমাদের দেশের মেয়েরা চিরকাল কপালে কাজলের টিপ (বা সিঁত্বরের), চোখে কাজল, সীমন্তে সিঁত্বর, পায়ে লাক্ষারসের আলতা পরেছেন ও ঠোঁট রঞ্জিত করেছেন। এছাড়া চন্দনের গুঁড়ো, মৃগনাভি, জাফরান ইত্যাদিও তাঁরা দেহ ও মুখমণ্ডলের জন্যে ব্যবহার করতেন। বহুকাল আগে বাৎসায়ন বলেছেন যে গৌড়ীয় পুরুষরা নাকি হাতের শোভার জন্যে লম্বা লম্বা নখ রাখতেন এবং সেই নখে রঙ লাগাতেন যুবতীদের মনোরঞ্জনের জন্যে। পুরুষরাই যখন নখে রঙ লাগাতে দ্বিধাবোধ করতেন না, তখন মেয়েরা যে নখে রঙ লাগাতেন না, এমন কথা কেউ বলতে পারেন না। সুতরাং ঠোঁটে বা নখে রঙ লাগানোটা আমাদের দেশের মেয়েরা ওদেশের মেমসাহেবদের কাছ থেকে শেখেননি, এদেশেরই প্রসাধন-কলার প্রাচীন ইতিহাস থেকে শিখেছেন। প্রাচীনপন্থীরা এর উত্তরে কি বলবেন ? সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে মেয়েরা চোখে কাজল পরছেন, কুমারীরা কপালে কুম্‌কুমের লম্বা রাধিকাটিপ্ দিচ্ছেন, খোঁপায় ফুলের মালা জড়াচ্ছেন (ফুলটা অবশ্য সত্যিকারের ফুল নয়, ম্যানুফাক্‌চার্ড ফুল—তা হোক)—এ সবই প্রাচীন রীতির নতুন প্রচলন ছাড়া কিছু নয়। নতুনত্ব এর মধ্যে কিছু নেই, আধুনিকতা তো নেই-ই। নিজের দেশের প্রসাধন-কলা সম্বন্ধে মেয়েরা যে সচেতন হয়েছেন, এটা বরং আশার কথা। প্রাচীন অলংকার তো সব একে একে ফিরে আসছে। সেই কংকন, সেই চূড়, সেই কানবালা, সেই মাকৃড়ি—সবই পুরানো, নতুন কোন্‌টা ?

সুতরাং প্রসাধন নিয়ে কথাটা ওঠা ঠিক নয়। ভাতের বদলে ভ্যানিশিং ক্রীম চাই মানে কেউ ভাত না খেয়ে যে ক্রীম মাখতে চান তা নয়। ভাতও চাই, ভ্যানিশিং ক্রীমও চাই। প্রসাধন দরকার, মেয়েদের ঠিক ভাতকাপড়ের মতোই দরকার। তবে বিলেত প্যারিসের কসমেটিকসের প্রয়োজন কি? নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। অগুরু, চন্দনের গুঁড়ো, মৃগনাভি, লাক্ষারস, কাজল—এ সব যে পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু এসব তৈরী করে প্রসাধন করার মতো সেকালের মেয়েদের অফুরন্ত সময় ছিল, একালের মেয়েদের সে অবসর বা সময় নেই। ঘরের মধ্যে থেকে কেবল রূপচর্চা করাটাই ছিল সেকালের মেয়েদের প্রধান কাজ। একালের মেয়েদের আত্মমর্যাদা ও সামাজিক মর্যাদা অনেক বেশী বেড়েছে, বাইরের সমাজ থেকে তাঁদের ডাক পড়েছে, সুতরাং ঘরের মধ্যে বন্দী থেকে পরিচারিকা বেষ্টিত হয়ে রূপচর্চা ও পরচর্চা করবার অবসর তাঁদের নেই। সেইজন্যই আজ তাঁদের ভ্যানিশিং ক্রীম, ফেস্ পাউডার, লিপস্টিক, ভ্রূ-পেন্‌সিল ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজন। এসব দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রসাধনের কাজ সেরে নেওয়া যায়, তাছাড়া এগুলি ব্যাগের মধ্যে করে কর্মক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে যেতেও অসুবিধা হয় না। এই কারণেই আজ আমাদের দেশে এইসব প্রসাধনদ্রব্যের চাহিদা বাড়ছে। মেয়েরা আজ কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গী হয়েছে বলেই আজ এর প্রয়োজন এত বেশী। সারাদিন অফিস বা স্কুল-কলেজের খাটুনির পর পুরুষরা যখন ঘরে ফেরেন তখন তাঁদের কি রকম দেখায়? খুব সুশ্রী দেখায় কি? মেয়েদের তার চেয়েও ক্লান্ত ও শ্রীহীন মনে হওয়া স্বাভাবিক। ক্লান্ত অবসন্ন চেহারা নিয়ে ঘরে ফিরলে পুরুষদের ক্ষতি নেই বিশেষ, কিন্তু মেয়েদের আছে। প্রথমত ঐ পুরুষদের জন্যেই এবং দ্বিতীয়ত ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্যে মেয়েদের 'শ্রী' সব সময় অনেক বেশী মনোরম ও প্রীতিকর হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুতরাং বাড়িতে প্রসাধন তো দরকারই, ব্যাগে করে কর্মক্ষেত্রে প্রসাধনদ্রব্য বয়ে নিয়ে যাওয়াও অন্যায় নয়। কাজকর্মের পর হাতমুখ ধুয়ে যদি সামান্য একটু প্রসাধন করে মুখচোখের ক্লান্তির ছাপটা দূর করে আসা যায়, তাহলে সেটা খুব অপরাধ হয় কি?

সুতরাং আরও ক্রীম চাই, পাউডার চাই বলে যাঁরা ভারত গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করেছেন, এই দুর্দিনেও আমি তাঁদের আবেদন সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। জানি না, বাণিজ্য-সচিব কি করবেন।
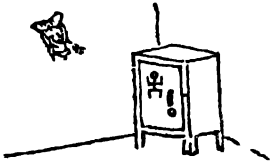
বাঙালীর দোকানদারি

'ফিলজফার—বিজ্ঞলোক, প্লাউম্যান—চাষা
পম্‌কিন—লাউ কুমড়ো, কুকুম্বার—শশা'

ইত্যাদি ইংরেজী শব্দ নামতা পড়ার মতন সুর করে আওড়ে সেকালের বাঙালীরা আধুনিক শিক্ষায় দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং তার জোরে এমন চুটিয়ে ব্যবসা করেছিলেন যে জাত-ব্যবসায়ী ইংরেজরা পর্যন্ত দেখে রীতিমত ভড়্‌কে গিয়েছিল। অথচ একটা বাজার-চল্‌তি কথা আছে যে বাঙালীরা ব্যবসা জানেন না, দোকানদারি বোঝেন না, কেবল কবিতা লিখতে আর ছবি আঁকতে জানেন। কথাটা একেবারে মিথ্যা। পরবর্তী-কালে অনেকগুলি ঐতিহাসিক কারণের যোগাযোগের ফলে বাঙালীরা ব্যবসাক্ষেত্র থেকে পিছু হট্‌তে বাধ্য হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মতন ব্যবসাক্ষেত্রেও যে বাঙালীরা এককালে ভারতবাসীকে পথ দেখিয়েছিলেন তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ইংরেজদের সঙ্গে মিশে, মুৎসুদ্দিগিরি বেনিয়ানগিরি দেওয়ানী করেই যে বাঙালীরা দিন কাটিয়েছেন তা নয়। নতুন যুগের ঐতিহাসিক সুবর্ণসুযোগ তাঁরা হেলায় নষ্ট

করেননি। স্বাধীন ব্যবসাতে তাঁরা ইংরেজকেও টেক্কা দিতে গিয়েছিলেন। আজকালকার বাঙালীদের মতন তাঁরা হয়ত ইংরেজী বিদ্যে আয়ত্ত করেননি, কিন্তু 'ইয়েস নো ভেরী ওয়েল' করে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা তাঁরা চালিয়ে গেছেন। একালের বাঙালী গ্র্যাজুয়েট দোকানদাররা তা কল্পনা করতে পারেন কি? গঙ্গার তীরে মালের জাহাজ আড় হয়ে পড়েছে দেখে যিনি তাঁর ইংরেজ প্রভুকে এসে বলেছেন—'সার, সার, শিপ্ ইজ এইট্টিওয়ান'—অর্থাৎ জাহাজ একাশি হয়ে গেছে—সেই সামান্য জাহাজের সরকারই হয়ত পরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যবসা করে কামিয়েছেন। সামান্য বেতনে কেরানীগিরি করে যিনি সাহেবের ঘোড়ার দানা চুরি করে টিফিন খেয়েছেন এবং হাতে-নাতে ধরা পড়ে সেই সাহেব মনিবের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন—'ইয়েস সার, আই টেক্ হর্স ফুড—মাই হাউস মর্ণিং এণ্ড ইভনিং টুয়েণ্টি লীভস্ ফল্, লিটিল লিটিল পে, হাউ ম্যানেজ'—তিনিই হয়ত সেই সাহেবের কোম্পানির একজন অন্যতম বাঙালী ডিরেক্টর ও পার্টনার হয়ে কলকাতা শহরের সবচেয়ে ধনী বাঙালী ব্যবসায়ী হয়েছেন। এ সব গাল-গল্প নয়, ইতিহাস। চাঁদসদাগরের যুগের ইতিহাস নয়, মাত্র একশ বছর আগেকার ইতিহাস। অথচ আজ বড়বাজার চাঁদ্নী চৌরঙ্গী ধর্মতলা প্রভৃতি অঞ্চলে হাঁটলে এ-ইতিহাস বাস্তবিকই রূপকথা বলে মনে হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রামদুলাল সরকার—এঁদের নামে কলকাতায় আজ কেবল রাস্তাগুলোই আছে, কিন্তু সেই রাস্তারই দুপাশে যাঁরা ব্যবসা করছেন তাঁদের মধ্যে শতকরা দশজন বাঙালী আছে কি না সন্দেহ। আশুতোষ দের ওরফে 'ছাতুবাবু' বাঙালী ছেলেমেয়েদের ছড়ায় 'ছাতুবাবুর বৈঠকখানা' হিসাবেই টিঁকে আছেন। ব্যবসাক্ষেত্রে দ্বিতীয় ছাতুবাবুর টিকিটি পর্যন্ত আর দেখা গেল না। হুতোমের সেই বীরকৃষ্ণ দাঁ-ই বা আজ কোথায়? বীরকৃষ্ণ দাঁ কেবলচাঁদ দাঁর পুষ্যিপুত্তুর, হাটখোলায় তাঁর গদি ছিল। দশ-বারোটা খন্দ মালের আড়ত, বেলেঘাটায় কাঠের ও চুনের পাঁচখানা গোলা, নগদ দশ বারো লাখ টাকা দাদন ও চোটায় খাটত। দাঁ মহাশয় বাংলায় ও ইংরেজীতে নাম সই করতে পারতেন শুধু এবং 'কম' এস 'গো' যাও ইত্যাদি কথার জোরে ইংরেজদের

সঙ্গেও ব্যবসা চালিয়েছেন। কিন্তু আজ ? বাঙালীদের মধ্যে কলকাতা শহরের ব্যবসাদারি দোকানদারি থেকে এইসব দে-দাঁ-শীল-মল্লিকরা পর্যন্ত আজ বিলীয়মান।

সেকালের এই 'গাড—ঈশ্বর, লাড—ঈশ্বর' ইংরেজী-শেখা বাঙালী বাবুদের মধ্যে সকলেই যে ব্যবসাদার বা দোকানদার ছিলেন তা নয়। ইংরেজী কেতার বাবুদের মোটামুটি দুটি দল ছিল। প্রথম দলের সকলেরই ইংরেজী বুলি মুখে, টেবিল-চেয়ারে মজলিশ, পেয়ালা-করা চা, চুরুট, জগে-করা জল, ডিকাণ্টারে ব্রাণ্ডি, কাচের গ্লাসে সোলার ঢাকনি সালু মোড়া—হরকরা, ইংলিসম্যান হাতে আর 'বেস্ট নিউজ অফ দি ডে' নিয়ে বিতর্ক! দ্বিতীয় দল ছিলেন সাপের চেয়েও ভয়ানক, বাঘের চেয়েও হিংস্র। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আপনার গোঁফে তেল দেওয়াই ছিল তাঁদের পলিসি, দান খয়রাত চার আনার বেশি কখন করতেন না। এই দুই দলের বাঙালী বাবুদের বংশলোচনরা আজও কালীঘাট থেকে বাগবাজারের গলি পর্যন্ত সশব্দে বেঁচে আছেন, কিন্তু মধ্যে যে একটা তৃতীয় দল ছিল তাঁরা আজ বেমালুম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছেন। অনেকে হয়ত বলবেন, কেন ? বাঙালী ব্যবসাদার কি দোকানদার কি আজ নেই ? বড়বাজারের সোনাপট্টি, লোহাপট্টি, তুলাপট্টি, মসলাপট্টি ইত্যাদি নানারকমের পট্টিতে খুঁজলে আজও কি বাঙালী পাওয়া যায় না ? নিশ্চয়ই যায়, বেশ বড় বড় বাঙালী ব্যবসায়ীদেরই দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক বীরকৃষ্ণ দাঁর মতন শ্যামবর্ণ, বেঁটে-খেঁটে রকমের মানুষ, নেয়াপাতি ভুঁড়ি, হাতে সোনার তাগা, কোমরে মোটা সোনার গোট, গলায় একছড়া সোনার হার, তাসের মতন চ্যাটালো সোনার ইষ্টিকবচ হাতে, কপালে কণ্ঠে ও কানে ফোঁটা ও তিলক, এরকম বাঙালী ব্যবসাদার ও দোকানদারদের অবশ্য আজও দেখা যায় না যে তা নয়, কিন্তু তাঁরাও 'একদা ছিলেন' গোছের হয়ে যাচ্ছেন। হালে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে দোকানদারির একটা ঝোঁক এসেছে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তাও আমাদের মজ্জাগত কাব্যিক চরিত্রের জন্যে কেঁচে যাচ্ছে, ধোপে টিকছে না। আগরওয়ালা ও পাঁড়েরা আমাদের চোখের সামনে লোটা গামছা নিয়ে এসে এই দোকানদারি করে 'ম্যানসান'

তুলছে, আর আমরা মাসে মাসে গাঁট থেকে দোকান ভাড়া দিয়ে দোকানের কড়িকাঠ গুণছি। পাঁড়ে প্রধানদের গণেশ উল্টোয় না, বছরে বছরে নতুন গণেশ বসে বিশ-পঁচিশটা পাশাপাশি একই দোকানে জমা হয়। গণেশ বছর না ঘুরতেই ঝুল-কালির ভারে আর বাহন ইঁদুরের উপদ্রবে উল্টে যায়। দোকানে দোকানে প্রত্যহ ঘণ্টা নেড়ে গণেশ পুজো করে যারা বেড়ায় তারাও বাঙালী ঠাকুর নয়, উড়ে ঠাকুর। এইরকম এক গণেশ পুজোর উড়ে ঠাকুরের মুখে একটি চমৎকার গল্প শুনলাম। এক বাঙালীর দোকানে আজ দশ বছর ধরে সে গণেশ পুজো করে। সকালের দিকে ঝোঁকের মাথায় রোজ হন্-হন্ করে আসে, ঘণ্টা নেড়ে একটু গঙ্গাজলের ছিটে গণেশের মাথায় দিয়ে, মালিকের কপালে একটা টিপ্ দিয়ে চলে যায়। এরকম সে রোজই করে, তড়িৎগতিতে, কারও দিকে চেয়ে দেখার সময় থাকে না। দোকানের মালিক যে দশ বছরের মধ্যে চারবার বদলে গেছে সেদিকে হুঁশই নেই তার। হঠাৎ একদিন মালিকের কপালে টিপ্ দিতে গিয়ে মাথায় পাগড়ি দেখে তার খেয়াল হল,—তাই তো, বাঙালীবাবুর দোকান ছিল না এটা? তখন একবার চেয়ে দেখল চারিদিকে—সেই ঘরটা আছে বটে, কিন্তু সেই দোকানও নেই, গণেশও নেই। বাঙালীর স্টেশনারী দোকান মাড়ওয়ারীর ঘিউয়ের দোকানে গণেশান্তরিত হয়েছে। পাশের দোকানে জিজ্ঞাসা করে জানল, প্রথম যিনি মালিক ছিলেন তাঁর পরে আরও দু-জন বাঙালীর হাত বদল হয়েছে, চতুর্থবারে মাড়ওয়ারীর পেটে গেছে। উড়ে ঠাকুর বিড়বিড় করে বললে, বাঙালী বাবুদের দোকানের দশা এরকম হয় কেন? বাস্তবিক সে একথা বলতেই পারে। কারণ মেড়ো বিহারীদের কথা না হয় বাদই দিলাম, কোন উড়ের দোকানও তো হাতবদল হতে দেখিনি বিশেষ। ছেলেবেলায় যে উড়ের দোকান থেকে তেলে ভাজা, মুড়িমুড়কী কিনে খেয়েছি, সে দোকান অনেক বড় হয়েছে, মালিকও বুড়ো হয়েছে, কিন্তু হাত বদলায়নি। আর যে সব বাঙালীর দোকান থেকে বিস্কুট লজেন্স খাতা পেন্সিল কিনেছি, তার কোনটা হয়েছে আজ পাঞ্জাবীর হোটেল, মাদ্রাজীর কাপড় নস্যের দোকান, বিহারীর মুদির দোকান অথবা মাড়ওয়ারীর তেলবনস্পতির আড়ৎ।

যেটাও বা টিকে আছে, সেটাও অরিজিন্যাল চ্যাটার্জির হাত থেকে ব্যানার্জি মুখার্জি ঘোষ বোস মিত্তিরের হাত পেরিয়ে কোন দত্ত বা দাশগুপ্তের হাতে ট্রায়ালের স্তরে পৌঁচেছে। বাঙালীর দোকানের এই ঘন ঘন গণেশান্তরের কারণ কি ?

অন্য যে-কোন জাতের দোকানদার ব্যবসাদারের চেয়ে বাঙালীরা অনেক বেশী শিষ্ট ভদ্র নম্র মার্জিত শিক্ষিত রুচিবান। আর সাধুতা ? ও প্রশ্ন দোকানদারিতে না তোলাই বাঞ্ছনীয়। 'অনেস্টি ইজ্ দি বেস্ট পলিসি—' সব দোকানেই লট্‌কানো থাকে, বাঙালীর দোকানেও 'চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না' দেয়ালে ঝুলতে দেখা যায়। সুতরাং সকলেই যে রকম সাধু, বাঙালীরা নিশ্চয়ই তার চেয়ে কম সাধু নন। তাহ'লে দোকানদারিতে বাঙালীর গলদ্ কোথায়, কেনই বা বাঙালীরা সবার পিছনে পড়ে আছেন ? আমার মনে হয়, আমাদের কাব্যকলাপ্রীতি ও কল্পনাতিশয্যই আমাদের সবচেয়ে মারাত্মক গলদ্। আজকাল বাঙালী ভদ্রলোকের দোকানের নাম দেখলেই সেটা বুঝতে পারা যায়। কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে, বাঙালীর দোকানের নামের বাহার ও বৈচিত্র্য যেরকম দেখা যায়, বোধ হয় প্যারিস ভিয়েনা রোম লণ্ডন নিউইয়র্কেও তা দেখা যায় না। খাবারের দোকান, স্টেশনারী দোকান, গহনার দোকান, ফার্নিচারের দোকান, রেডিও গ্রামোফোনের দোকান, বইয়ের দোকান, এমন কি মুদির দোকান ও জুতোর দোকানের পর্যন্ত চমৎকার কাব্যিক নামকরণ দেখলেই যে-কোন নীরেট বেরসিক লোকেরও একবার অন্তত দোকানে ঢুকতে ইচ্ছা করবে এবং যে-কোন পথচারীরও মনে হবে, দোকানের মালিক নিশ্চয়ই কোন আধুনিক সাহিত্যিক, কবি বা শিল্পী। দোকানদারিকে এমন নিখুঁতভাবে শিল্পকলার পর্যায়ে বাঙালীদের মতন আর কেউ তুলতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। এ-ব্যাপারে যে-কেউ নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করবেন, কিন্তু দোকানে ঢুকে কোন জিনিস কিনতে চেয়ে যদি তাঁরা উত্তর না পান, পনের মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর যদি দেখা যায় যে মালিক বা বিক্রেতা ক্যাশমেমোর পিছন দিকে কোন সাহিত্য পত্রিকার জন্যে গদ্য-কবিতা মক্শ করছেন, অথবা কোন নভেলের মধ্যে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন, তাহ'লেই তো

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঘরে ফিরতে হয় এবং সেই উড়ে ঠাকুরের হাতবদলের কাহিনী মনে পড়ে যায়। দোকানদারিতে শিল্পকলার ছোঁয়াচ লাগা নিশ্চয়ই দরকার, কিন্তু তাই বলে দোকানটাই যদি সাহিত্যের আসর, চায়ের আড্ডা, নাটকের রিহার্সাল রুম, সিনেমার প্রেক্ষাগৃহ অথবা ডিবেটিং সোসাইটি হয়ে ওঠে, তাহ'লে আর দোকানদারি চলে কি করে? দু-দিন পরে উড়ে ঠাকুর মালিকের কপালে ফোঁটা দিতে গিয়ে পাগ্‌ড়ি দেখে চমকে তো উঠবেই।

ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র গুঁই
(টিচার ও টাইপিস্ট)

কলকাতা শহরে হরেকরকমের 'নেমপ্লেট' আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন, বড় বড় সরকারী খেতাবধারী থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্‌মাওয়ালা পর্যন্ত, কিন্তু গোবিন্দ মাস্টারের নেমপ্লেটটি আপনাদের কারও চোখে পড়েনি হয়ত। অবশ্য না পড়বারই কথা, কারণ গোবিন্দ মাস্টার যে জায়গাতে বাস করেন সেটা শুধু সেখানকার বাসিন্দাদের ছাড়া আর কারও চোখে পড়তে পারে না। ঠিক গলিও নয়, একটা অসূর্যম্পশ্যা 'অলি'র মধ্যে গোবিন্দ মাস্টার থাকেন। বাড়ির বাইরের পাঁচিলের ইটগুলো দেখলে মনে হবে বাড়িটা বোধ হয় পালবংশের রাজত্বকালে তৈরি, হালে কোন প্রত্নবিদ্ খুঁড়ে বার করেছেন। তার-ওপর আবার অজন্তার ফ্রেস্কোর মতন পাড়ার ঘুঁটেওয়ালীর গোবরের প্রলেপাঙ্কিত। বাইরের দরজার কাঠগুলো পোকায় খেয়ে বাকি যা রয়েছে তাতে দরজার কোন কাজ হয় না, তবু সিংহদ্বার না হলেও গোবিন্দ মাস্টারের বাড়ির সেইটাই বহির্দ্বার। তারই ওপর নেমপ্লেটটি পেরেক দিয়ে আঁটা— আজকালকার প্লাস্টিকের নেমপ্লেট নয়, রঙকরা একটুক্‌রো ভাঙা

ক্যানেস্তারার উপর সাদা হরফে লেখা : 'ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র গুঁই—টিচার ও টাইপিস্ট।' নেমপ্লেটটার পাশেই কর্পোরেশনের পুরনো একটা মরচে-পড়া 'কমিট্ নো নুইসেন্স' লটকানো এবং তার 'নো' শব্দটি ঘষে তুলে দেওয়া। আর বাস্তবিকই নুইসেন্স ঐ জায়গাটিতে এমন প্রচণ্ডভাবে কমিট্ করা হয় যে, অন্য রাস্তা যখন শুকনো খট্‌খটে তখন ঐ গলির মধ্যে ঢুকলে মনে হবে, এইমাত্র যেন একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। গলির মধ্যে তাই বড় একটা কেউ ঢোকেন না এবং গোবিন্দ মাস্টারের নেমপ্লেটটাও কারও নজরে পড়ে না। আমার নজরে পড়ার একটা কারণ আছে। গলি দেখলেই তার মধ্যে আমি 'যা থাকে অদৃষ্টে' বলে ঢুকে পড়ি। সত্যি কথা বলতে কি, আমার একটা গলি-নিউরসিস্ আছে। যাঁরা কবি ও সাহিত্যিক তাঁদের বড় বড় জায়গা টানে, সমুদ্র টানে, তেপান্তরের মতন মাঠ টানে, আমাকে কিন্তু দুর্ধর্ষভাবে টানে গলি, বিশেষ করে কলকাতা শহরের গলি। বড় বড় রাস্তার নির্লজ্জ নগ্নতা আমার ভাল লাগে না, সবই যার দেখা যায়, বোঝা যায়, তার আবার দেখব বুঝব কি ? গলিতে ঢুকলেই মনে হয়, একটা অজানা অদৃশ্যলোকে ঢুকলাম যেন, যার প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে নূতন জগৎ আবিষ্কার করার আনন্দ পাওয়া যায় এবং সব সময় বলতে ইচ্ছে করে, 'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী!' তাছাড়া নিজেও গলিতে জন্মেছি, গলিতেই থাকি, গলিতেই মরব, গলির লোকজনকেই একান্ত চেনা আপনার জন বলে মনে হয়, বড় বড় টেরাস্ অ্যাভিনিউয়ের রাজকুমারদের চিনি না। যেমন আমাদের গোবিন্দ মাস্টারকে বাল্যকাল থেকেই আমি বিলক্ষণ চিনি, তবে তখন তাঁর প্রতিভা এমনভাবে চারিদিকে পাপড়ি মেলে ফুটে ওঠেনি, তাই নেমপ্লেট তখন ছিল না। সেদিন নেমপ্লেট দেখে তাই হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালাম। বুঝলাম, গোবিন্দ মাস্টার এখন আর কেবল মাস্টার নন, ডাক্তার ও টাইপিস্টও বটে। কিন্তু ব্যাপারটা কি ? এ রকম বিচিত্র গুণের সমন্বয়ে গোবিন্দ মাস্টারের চেহারাটা কেমন হয়েছে দেখতে ইচ্ছে করল। ঢুকলাম ভিতরে। পঁচিশ বছর পরে ঢুকছি, ভাবছি, মাস্টার মশাই চিনতে পারবেন কি না!

গোবিন্দ মাস্টার চিনতে পেরে সাদরে অভ্যর্থনা করে বসালেন। সকালবেলা তিনি রুগী-পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। হোমিওপ্যাথির বাক্সটি সামনে খোলা রয়েছে। বললাম: 'কাজ সেরে নিন, পরে কথা হবে।' ওষুধ বিলি শেষ হয়ে গেল, সিকিটা আধুলিটা করে কিছু কলেক্‌শন হল। রুগীরা বিদায় হলে গোবিন্দ মাস্টার রেজ্‌কি গুনে দেখলেন 'এক টাকা বারো আনা' হয়েছে। আমাকে সেগুলো হাতে করে দেখিয়ে বললেন: 'এই হল আজকের বাজার খরচ, বুঝলে?' জিজ্ঞাসা করলাম: 'ডাক্তারি আবার কবে থেকে করছেন?' গোবিন্দ মাস্টার বললেন: 'করছি কি আর সাধে ভাই, প্রাণের দায়ে করছি!' এতদিন জানতাম অন্যের প্রাণ বাঁচানোর জন্যেই ডাক্তাররা ডাক্তারি করে থাকেন, সেদিন জীবনে প্রথম শুনলাম, ডাক্তারের নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যেও ডাক্তারি করবার প্রয়োজন হয়। জানি না, অন্য কোথাও হয় কি না, তবে আমাদের দেশে যে নিশ্চয়ই হয় তা তো দেখাই যাচ্ছে। 'লঙ লিভ হোমিওপ্যাথি!' রাজেন ডাক্তার যখন মহেন্দ্রলাল সরকারকে হোমিওপ্যাথিতে কনভার্ট করেছিলেন তখন নাকি কলকাতা শহরে একটা তুমুল হৈ-চৈ হয়েছিল। প্রায় একশ বছর আগেকার কথা বলছি। আজ হোমিওপ্যাথরা এদেশের কতজন লোকের প্রাণ বাঁচাচ্ছেন জানি নে, নিশ্চয়ই অনেকে বেঁচে যাচ্ছেন বরাতজোরে, তা না হলে হোমিওপ্যাথির পসার বাড়ছে কেন? তবে ডাক্তাররা যে নিজে বাঁচছেন তা তো গোবিন্দ মাস্টারের স্বীকারোক্তিতেই বোঝা যায়। যাই হোক্—

গোবিন্দ মাস্টার যা বললেন তা মর্মান্তিক। পাঠশালা আজ তাঁর লোয়ার প্রাইমারী থেকে আপার প্রাইমারী স্কুল হয়েছে, কিন্তু তাতে পেট চলে না। পাঁচ সিকের বেশি ছাত্রদের মাইনে নেই, তাই নাকি তিন চার মাস করে বাকি পড়ে। সুতরাং ডাক্তারি তো করতে হচ্ছেই, তার সঙ্গে টাইপিস্টের কাজও করতে হচ্ছে। মোটামুটি কাজের রুটিন্ বা টাইম-টেবল্ যা গোবিন্দ মাস্টার্ বললেন তা বিস্ময়কর। আদর্শ ইউরোপীয়ান না হলে, ঘড়ি ধরে নিয়মিত কেউ এমনভাবে দিনের পর দিন কাজ করে যেতে পারেন না। সকালবেলা ন'টা পর্যন্ত ডাক্তারি করার সময়। তাতে

যা কলেক্‌শন হয়, সে আট আনাই হোক আর দু-টাকাই হোক, সেটা প্রাত্যহিক বাজার খরচের জন্যে নির্দিষ্ট থাকে। ঠিক ন'টার সময় গোবিন্দ মাস্টার থলে নিয়ে বাজারে চলে যান, দশটার মধ্যে বাজার থেকে ফেরেন। দশটায় স্কুল বসে। ছাত্ররা নিজেরাই মাস্টারের নির্দেশ মতন বেঞ্চিটেঞ্চি ঝেড়েমুছে চুপ করে বসে থাকে। একটি ঘর পার্টিশান করা—একদিকে স্কুল, ডাক্তারখানা ইত্যাদি, আর একদিকে মাস্টারমশায়ের পারিবারিক অন্দরমহল। বাজারের থলেটি পার্টিশনের পাশ দিয়ে গিন্নীর হাতে দিয়েই গোবিন্দ মাস্টার পুরনো টাইপরাইটার ও বেতটি নিয়ে বসেন। ছাত্রদের পড়া কিছুক্ষণ দেখিয়ে দিয়ে অথবা বোর্ডে দু-চারটে অঙ্ক দিয়ে তিনি বসে বসে টাইপ করতে থাকেন, আর ছাত্ররা নিজেরা পড়ে, তা না হলে মাস্টারের টাইপযন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। বেলা একটার সময় টিফিনের ছুটি দিয়েই তিনি ভিতরে খেতে চলে যান। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে একটু গড়িয়ে নিয়ে আসতে প্রায় তিনটে বেজে যায়, এবং টিফিনের পর ততক্ষণ ছাত্ররা বসে বসে ড্রয়িং করে। চারটের সময় স্কুল ছুটি হলে যদি কোন রুগীর বাড়ি 'কল' থাকে তো সেটা সেরে নিয়ে গোবিন্দ মাস্টার স্কুলের বকেয়া মাইনের তাগাদায় বেরোন। এই সময় দু-একটা ইন্‌সিওরেন্সের মক্কেলও খোঁজ করেন। তারপর সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত প্রাইভেট টিউশন করে বাড়ি ফেরেন রাত এগারোটায়। খেয়ে দেয়ে শুতে রাত বারোটা।

লম্বা ফিরিস্তি শেষ করে গোবিন্দ মাস্টার বললেন: 'এতেও চলে না ভাই!' মাস্টারের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। তিনি বললেন: 'এতো করে কত পাই জানো?'

স্কুলের আয়	:	৩৫৲
টিউশনির আয়	:	২৫৲
টাইপিঙের আয়	:	১৫৲
ডাক্তারির আয়	:	৩০৲
ইন্সিওরেন্স	:	১৫৲
মোট		১২০ টাকা

বলতে ইচ্ছা করছিল না তাও বললাম : 'ইনকাম ট্যাক্স তো দিতে হয় না, তা হলেই হল।' ইন্‌সিওরেন্সের কথা উঠতে বললাম—'ওটা বাইরের নেমপ্লেটে লেখেননি কেন ?' মাস্টার হেসে বললেন : 'লজ্জা করে, আর কতো লিখবো বল তো ? তা ছাড়া ওটা প্রাইভেট ব্যাপার।' 'প্রাইভেট ব্যাপার কেন ?' তা ছাড়া কি ? মাস্টার বললেন : 'আমি যে মাস্টারি করি সে তো সকলেই জানে, কিন্তু ডাক্তারিও যে করি তা তো আর জানে না, অথচ দরকার পড়লে খুঁজতে হয় বৈকি, তাই বাইরে ওটা লিখে রাখা প্রয়োজন। তেমনি এখানে যে টাইপও করা হয় তাও লোকের জানবার কথা নয়, অথচ চিঠিটা দরখাস্তটা হঠাৎ টাইপ করাতে হতে পারে। তাই ওটাও বাইরে লিখে রাখা দরকার। কিন্তু ইন্সিওর আর কেউ বাড়িতে যেচে করাতে আসবে না, তাই ওটা লিখিনি।' ব্যাপারটা বুঝলাম, একেবারে হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, এবং আর উচ্চবাচ্য করলাম না। একবার শুধু বললাম : 'আচ্ছা, এতে আপনার ছাত্রদের লেখাপড়া হয় ?' গোবিন্দ মাস্টার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন : 'পাঁচ সিকেয় এর বেশি হয় না, তাও বাকি থাকে বলে আমিও ছাত্রদের ছবি আঁকতে শেখাচ্ছি।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন : 'ভাবছি এর সঙ্গে একটা গানের স্কুল খুলে দেব, কি বল ?' কি আর বলব--বললাম : 'খুব ভাল, খুলে দিন। গান শেখাবে কে ?' গোবিন্দ মাস্টার হেসে বললেন : 'কেন ? গিন্নী এক সময় ভাল গান গাইতে পারত ভাই—চর্চা নেই, তবু এখনও যা গলা আছে, বুঝলে ?'

খুব বুঝলাম, কিন্তু আর বুঝবার ইচ্ছে নেই, বুঝতেও চাইনে। মাস্টারী জীবনের এটা একটা চরম ট্রাজিডি, কিন্তু ক্রমেই সেটা একটা হাল্কা কমিডিতে পরিণত হতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। উঠে যাচ্ছি এমন সময় জামাটা ধরে টান দিয়ে মাস্টার মিস্টিরিয়াস স্বরে বললেন : কিছু হবে ? ভাবলাম, পয়সাকড়ি চাচ্ছেন বোধ হয়। পকেটে হাত দিয়ে বললাম : বিশেষ কিছু নেই। শুনে তিনি লজ্জায় তাড়াতাড়ি বললেন : 'আরে না, না, তা বলছি না—বলছি কি, তোমরা সংবাদপত্রের লোক, অনেক কিছু তো জানো—আমাদের অর্থাৎ স্কুল-মাস্টারদের কিছু

হবে বলতে পারো ?' ভাল ব্যাপার ! আমি বলব কোথা থেকে ? হবে কি না হবে হর্তাকর্তারা জানেন। কিন্তু আশ্চর্য এই গোবিন্দ মাস্টার ! এরকম স্কচ হুইস্কি টাইপের স্কুল-মাস্টার আমি অন্তত জীবনে দেখিনি। আধ শতাব্দী কেটে গেল, তবু আশাভরসার দিক দিয়ে 'স্টিল্ গোয়িং স্ট্রঙ।'

কলকাতার বারো-ইয়ারি পুজো

আজ ষষ্ঠী। হিসেব করে করে যাঁরা হয়রাণ হয়ে গেছেন তাঁদেরও আজ নিস্তার নেই। বাজারের শেষ কেনাবেচার জন্যে তাঁরা বেরিয়েছেন, আশার আজ শেষ ভরসার দিন। অথচ কদিনের জন্যেই বা, চারটে দিন মাত্র, তারপরেই সব ভোঁ ভাঁ। কোলাকুলি না শেষ হতেই রেশন, বাজার ও ট্রামবাসের ঠেলাঠেলি শুরু হবে আবার। তা হোক, তবু আজ ষষ্ঠী, দুর্গাপ্রতিমার অধিবাস আজ শেষ হয়ে যাবে। হুতোমের কালে বাবুদের দুর্গোৎসব ও কলকাতার বারো-ইয়ারি পুজো ঠিক যেমনভাবে হত, আজও যে ঠিক তেমনিভাবে হয় তা নয়। তার কারণ সেসব বাবুরা আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছেন এবং তাঁদের বংশধররা আজ লেকের ধারে বাঁশী বাজিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। তবু দুর্গোৎসবের মূল আনুষ্ঠানিক ব্যাপারটা যা ছিল একশ বছর আগে, আজও ঠিক তাই আছে। অবশ্য তাই থাকার কথা। কারণ পুজো-পার্বণ উৎসব-অনুষ্ঠান নিয়ে যে কৃষ্টি-কঙ্কাল তা দু-এক শতাব্দীতে বদলায় না। মানুষের সমাজে এই জাতীয় পরিবর্তন প্রায় জিওলজিক্যাল পরিবর্তনের মতো।

আজ ষষ্ঠীর দিনে হুতোমকে স্মরণ করছি। হুতোমের কালে

দিনে বাবুদের বাড়ি অপূর্ব শোভা ধারণ করত। চাকর-বাকর নতুন তক্‌মা উর্দি ও কাপড়-চোপড় পরে ঘুরে বেড়াত। বাবুর বাড়ির দরজায় দুইদিকে পূর্ণকুম্ভ ও আম্রসার দেওয়া হত, ঢুলিরা মধ্যে মধ্যে রৌশনচৌকি ও সানাইয়ের সঙ্গে সংগত করত, জামাই ও ভাগ্‌নেরা নতুন জুতো জামা পরে ফর্‌রা দিতেন। বাড়ির বৈঠকখানায় কোথাও আগমনী গাওয়া হত, কোথাও নতুন তাসজোড়া পরকান হত। রাস্তায় ঢুলি ও বাজন্দারদের ভিড়ে চলা যেত না। মালীরা পথের ধারে পদ্ম চাঁদমালা বিল্লিপত্তর কুচোফুলের দোকান সাজিয়ে বসত। ক্রমে ষষ্ঠীর রাত শেষ হলে সপ্তমীর দিন আসত। কলাবউয়েরা বাজনাবাদ্দি করে স্নান করতে বেরুতেন, বাড়ির ছেলেরা কাঁসরঘণ্টা বাজাতে বাজাতে সঙ্গে সঙ্গে চলত। আগে আগে চলত কাড়ানাকাড়া ঢোল ও সানাইদারেরা বাজাতে বাজাতে, তার পেছনে নতুন কাপড় পরে লাঠিসোঁটা হাতে বাড়ির দরওয়ানেরা, তার পেছনে কলাবউ-কোলে পুরোহিত। পুঁথি হাতে তন্ত্রধারক, বাড়ির আচার্য বামুন, গুরু ও সভাপণ্ডিত, তার পেছনে বাবু নিজে চলতেন মাথায় লাল সাটিনের রুপোর রামছাতা ধরে। আশেপাশে ভাগ্‌নে ভাইপো জামাইয়েরা, পেছনে আমলাফয়লা ঘরজামাই-ভগিনীপতি ও মোসাহেবরা চলতেন এবং সবার পেছনে নৈবেদ্য পুষ্পপাত্র শাঁখ ঘণ্টাদি পুজোর সরঞ্জাম মাথায় নিয়ে মালীরা চলত। এইভাবে প্রসন্নকুমার ঠাকুর নিজে নাকি কলাবউ স্নান করাতে যেতেন। অষ্টমী নবমীর পর বিজয়াদশমী আসত এবং ইংরেজী বাজনা নিশেন তুরুকসওয়ার ও সার্জেন সঙ্গে প্রতিমারা রাস্তায় বেরুতেন। কর্মকর্তারা কেউ কেউ প্রতিমা নিয়ে বাচ্‌ খেলতেন, আমুদে ছোক্‌রারা নৌকোর উপর ঢোলের সংগতে নাচতো, শৌখিন বাবুরা খেম্‌টা ও বাই সঙ্গে করে বোট পানসি বজরার ছাতে বার দিয়ে বসতেন, মোসাহেব ও পিয়ারের চাকরেরা কবিয়ালের ভঙ্গিতে দু-চারটে রঙদার গান ধরত, তারপর ভাঙখাওয়া বাবুদের চ্যাংদোলা করে ঘরে আনতে হত। এইভাবেই বিগত শতাব্দীতে বাংলাদেশের বাবুদের দুর্গোৎসব শেষ হত কলকাতা শহরে।

বারো-ইয়ারি পুজোর ব্যাপারটা একটু অন্য ধরনের ছিল। ঠিক

কোন্ সময় বারো-ইয়ারি পুজোর উৎপত্তি হয় বলা যায় না, তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকেই হয়েছে বলে মনে হয়। শ্রীরামপুরের ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া কাগজ ১৮২০ সালের মে মাসে বারো-ইয়ারি পুজোর উৎপত্তি সম্বন্ধে লেখেন যে, শান্তিপুরের ওপারে গুপ্তিপাড়ায় প্রায় ত্রিশ বছর আগে একদল ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয় পুজোর সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সর্বজনীন পুজো প্রচলন করেন। এই হিসেব অনুসারে ১৭৯০ সাল বারো-ইয়ারি পুজোর উৎপত্তিকাল বলে ধরে নিতে হয়। মোটামুটি হিসেবটা ঠিকই আছে বলে মনে হয়, কারণ ১৮৩১ সালেই সেকালের কোন সংবাদপত্রে একজন পত্রাঘাত করে জানাচ্ছেন যে, বারো-ইয়ারি পুজোর জোয়ার অনেক কমে আসছে। তিনি লিখছেন: 'এদেশের এই এক প্রধান রীতি আছে যখন যাহা উপস্থিত হয় তখন তাহার অতিপ্রাচুর্য হইয়া থাকে, পরে ক্রমে লোপ হইয়া যায় তাহার প্রমাণ যখন প্রথম বারো-ইয়ারি পুজোর প্রথা হইল তদবধি এমন কোন গ্রাম কি শহর কি কোন গোলাগঞ্জ কি বাজার ছিল না যে, বারো-ইয়ারির ঢোলের গোল, ঢাকের ঝাঁক, পাঁঠার ডাক, গোঁয়ারের হাঁক না হইয়াছিল, তাহাতে কালাকাল বিবেচনা না করিয়া কালামুখোরা পুজোপলক্ষে ঢলাঢলি করিত। এইক্ষণে ক্রমে তাহার ন্যূনতা হইয়া প্রধান প্রধান অল্প স্থানে মাত্র আছে।' আজ থেকে প্রায় একশ কুড়ি বছর আগেকার কথা। বারো-ইয়ারি পুজোর ঢেউ জোয়ারের মতন তার আগে এসে তখনই অনেকটা থিতিয়ে ভাঁটা পড়ে গেছে। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকেই যে বারো-ইয়ারি পুজোর উৎপত্তি হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কোয়ার্টারে সারা বাংলাদেশ ও কলকাতা শহরে বারো-ইয়ারি পুজোর যে একটা প্রবল জোয়ার এসেছিল তাও বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়।

হুতোম বলছেন, বারোজন একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পুজো করার প্রথা মড়ক থেকেই সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে সেই থেকে মা ভক্তি ও শ্রদ্ধার চাপে পড়ে ইয়ারদলে গিয়ে পড়েন। মহাজন গোলাদার ও দোকানদারেরাই বারো-ইয়ারি পুজোর প্রধান উদ্‌যোগী হতেন। সম্বৎসর যার যত মাল বিক্রি ও চালান হয়, মণ পিছু এককড়া দু-কড়া পাঁচকড়া

হিসেবে বারো-ইয়ারি খাতে জমা হতে থাকে। মহাজনদের মধ্যে বর্ধিষ্ণু ইয়ারগোছের শৌখিন লোকের কাছে ঐ টাকা জমা হয়, তিনিই বারো-ইয়ারি পুজোর অধ্যক্ষ হন। চাঁদা আদায় করা, সঙ ও রঙতামাশার ব্যবস্থা করার ভার তাঁরই উপর থাকে। সেকালের বারো-ইয়ারি পুজোর চাঁদা আদায় সম্বন্ধে অনেক মজার গল্প শোনা যায়। চাঁদাসাধারা প্রায় দ্বিতীয় অষ্টমের পেয়াদা ছিলেন—ব্রহ্মোত্তর জমির খাজনাসাধার মতোন লোকের উনুনে পা দিয়ে টাকা আদায় করতেন। কৃপণ গোছের ধনী লোক যাঁরা চাঁদা দিতেন না এবং পুজোয় খরচের ভয়ে বাড়িতেও কোন উৎসব করতেন না, তাঁদের বাড়ির দরজার সামনে দুর্গাপ্রতিমা ফেলে দেওয়া হত। 'বঙ্গদেশের মধ্যে অনেক গণ্ডগ্রামে কৃপণ ব্যক্তির এতদ্রূপে অর্থদণ্ড করা যায়।' প্রতিমা বিক্রি না হলে পটুয়ারাও তাই করতেন। সাধারণত ধনী ব্যক্তিদের বাড়ির সামনেই প্রতিমা ফেলা হত। এ তো গেল চাঁদা আদায়ের ব্যাপার। সেকালে বারো-ইয়ারি পুজোয় দলাদলিও যথেষ্ট হত। চুঁচড়োর মতন বারো-ইয়ারি পুজো আর নাকি কোথাও হত না। গুপ্তিপাড়া, শান্তিপুর, উলো প্রভৃতি কলকাতার কাছাকাছি গ্রামেও খুব ধূম করে বারো-ইয়ারি পুজো হত। তাতে টেক্কাটেক্কিও যথেষ্ট চলত। একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে এক বারো-ইয়ারি পুজো করেন—সাত বছর ধরে নাকি তার উদ্‌যোগ হয়, প্রতিমা ষাট হাত উঁচু হয়েছিল, শেষে বিসর্জনের দিন প্রত্যেকে নাকি পুতুল কেটে বিসর্জন দেন। তাতে গুপ্তিপাড়াওয়ালারা মার অপঘাতমৃত্যু হয়েছে রটিয়ে দিয়ে গণেশের গলায় কাছা বেঁধে এক বারো-ইয়ারি পুজো করেন। চুঁচড়োর বারো-ইয়ারি পুজোরও নামডাক ছিল খুব। একবার দেখা যায়, চুঁচড়োর দুর্গাপ্রতিমা ঝড়-বৃষ্টিতে গলিতাবস্থায় রাস্তায় পড়ে রয়েছেন। শোনা যায়, দলাদলির ফলেই নাকি ভাগের মা গঙ্গা পান নি শেষ পর্যন্ত। যাঁরা পুজো করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দুটো দল ছিল—একদল তাঁতি, তারা বৈষ্ণব, আর একদল শুঁড়ি, তারা শাক্ত। পুজোতে বলিদান নিয়ে গণ্ডগোল বাধে। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করা হয়। তিনি প্রথমে বোষ্টম তাঁতিদের, পরে শাক্ত শুঁড়িদের পুজোর হুকুম দেন। বোষ্টমরা

পুজো করে ঘট বিসর্জন দিয়ে দেয়, পরে শুঁড়িরা পুজো করে। গণ্ডগোল বাধে বিসর্জন নিয়ে। তাঁতিরা আগে ঘট বিসর্জন দিয়েছে বলে খরচ করতে রাজী হয় না। তাই নিয়ে দুই দলে লাঠালাঠি হয় এবং শেষ পর্যন্ত মা রাস্তায় গড়াগড়ি যান।

সেকালের বারো-ইয়ারি পূজোর আমোদ-প্রমোদও অন্য ধরনের ছিল। সং ছিল সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। ভীষ্মের শরশয্যা, নবরত্ন সভা, রাজসূয় যজ্ঞ, রাম রাজা, বাইরে কোঁচার পত্তন—ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন, ভাল করতে পারব না—মন্দ করব, বুক ফেটে দরজা, ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, খেঁদা পুতের নাম পদ্মলোচন, মদ খাওয়া বড় দায়—জাত থাকার কি উপায়, বকধার্মিক, ক্ষুদে নবাব ইত্যাদি সব নানারকমের পৌরাণিক ও সামাজিক বিষয়ে সং তৈরি করা হত। কে কি রকম সং তৈরি করল, কারটা ভাল হল কি, মন্দ হল, দেখার জন্যে নানা জায়গা থেকে লোক আসত শহরে। সামাজিক ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক সং ছাড়া সেকালে সুস্থ আমোদ-প্রমোদ আর বিশেষ কিছু ছিল না। সপ্তমী পুজোর দিন হয়ত দুই দলের মধ্যে হাফ-আখড়াইয়ের লড়াই হত। দেড় মণ গাঁজা, দু-মণ চরস, বড় বড় সাত গামলা দুধ ও বারোখানা বেণের দোকান ঝেঁটিয়ে ছোট-বড়-মাঝারি এলাচ কর্পূর দারুচিনি আসত, মিঠেকড়া ভ্যালসা অম্বুরি ও ইরাণী তামাকের গোবর্ধন তৈরি হত। অষ্টমীর দিন পাঁচালী ও যাত্রা। পাঁচালী আরম্ভ হত, প্রথম দল গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, দ্বিতীয় দল মহীরাবণের পালা ইত্যাদি। তারপর যাত্রার আসরে অধিকারী নামতেন। অধিকারীর বয়স ৭৬, বাবরি চুল, উল্কি ও কানে মাক্‌ড়ি। গুটি বারো বুড়ো বুড়ো ছেলেকে সখি সাজিয়ে নিজে দূতী সেজে তিনি যখন আসরে নামতেন তখন ইয়ারগোছের ছোক্‌রারা শিশ্‌ আর হুইস্‌ল দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাত। নবমীর শেষ পুজোর দিন ওস্তাদরা শেষ মার মারতেন—বাই খেমটার আসর বসত। শহরের নুন্নী মুন্নী খন্নী সন্নী ডিগ্রিমেডেলধারী বাইয়েরা, গোলাপ শ্যাম বিন্দু খুদু মণি চুনী খেমটাওয়ালীরা আসরে নামতেন। বাবুরা সব তাকিয়া ঠেস দিয়ে নেশায় শিবের বাবা সেজে মৌতাত করতেন। দশমীর দিন গঙ্গার ঘাটে বাচ খেলে এসে পিপে পিপে ভাং টেনে বারোইয়াররা

চিংপটাং হয়ে পড়তেন, অনেকে মাতাল হয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি যেতেন। সেকালের বারো-ইয়ারি পুজো এইভাবেই শেষ হত।

সেকালের বারো-ইয়ারি পূজোর সঙ্গে একালের বারো-ইয়ারির এমন কিছু পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। ছেলেবেলায় আমরা বিশপঁচিশ বছর আগে কলকাতার বারো-ইয়ারি পুজোমণ্ডপে তরজাখেউড়, কবি পাঁচালি যাত্রা হতে দেখেছি। সং তৈরির প্রথাও তখন পর্যন্ত একেবারে লোপ পায়নি। মধ্যে কিছুদিন বারোইয়ারি দুর্গোৎসবের সঙ্গে 'স্বদেশপ্রেম' মেশাবার একটা ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা হয়েছিল, তারপর আবার তাতে ভাঁটা পড়েছে। এবছরে দেখেছি অনেক বারো-ইয়ারি পুজোয় 'সাজাহান' 'পোষ্যপুত্র' 'বিল্বমঙ্গল' ইত্যাদি অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে আবার। 'মা' এখন স্বাধীন হয়েছেন, সুতরাং সন্তানদের বারো-ইয়ারির প্রোগ্রামও যদি কিছু বদলায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে এবারের পুজোয় সেকালের মতন যদি কোন উদ্‌যোগী তরুণের দল সামাজিক সং তৈরির আয়োজন করতেন, তাহ'লে পুজোটা জমতো ভাল এবং শুধু আমি বা আমার মতন যাঁরা তাঁরা নন, 'মা' নিজেও খুব খুশি হতেন।

এবারে মা আসছেন বাংলাদেশে নয়, 'পশ্চিম বাংলায়'। সপরিবারে আসছেন বটে, কিন্তু থাকার জায়গা নেই। কলকাতার আশেপাশে খোলা জায়গায় বাস্তুহারারা নীড় বেঁধেছেন, সেখানে স্বচ্ছন্দে তাঁর স্থান হতে পারে, কিন্তু বাস করতে পারবেন না। কৈলাসে যাঁর থাকা অভ্যেস, তিনি বাস্তুহারা ক্যাম্পে থাকবেন কি করে? কলকাতার ভেতরে কোন বাড়িতে যে থাকবেন তারও উপায় নেই। বাড়িওয়ালারা এমন ভাড়া, সেলামী বা অ্যাডভান্স চাইবেন যে স্বয়ং অন্নপূর্ণা হয়েও তিনি তা ম্যানেজ করতে পারবেন না। তাছাড়া রেশনের সমস্যা আছে। চাল আটা যদি তিনি কৈলাস থেকে নিয়ে আসেন তো ভালই, না হলে তাঁর অন্ন জোটাই মুশকিল হবে। কাপড়ের সমস্যা তিনি নিজে বল্কল বা ব্যাঘ্রচর্ম পরে হয়ত সমাধান করতে পারেন, কিন্তু লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশের রেশনের কাপড়ে মন উঠবে না, তাও কিন্তু যথেষ্ট শর্ট আছে এবং কালোবাজার থেকে কিনতে হবে। ঘিয়ের তৈরি ভোগনৈবেদ্যর আশা

করলেও চলবে না, বনস্পতিতেই সেরে নিতে হবে। তবে তাতে কোন ভয়ের কারণ নেই। যদি পেট ছেড়ে দেয়, তাহ'লে সাল্‌ফা-গুয়ানিডাইন খেলেই সেরে যাবে। তবে টি. বি ইনফেক্‌শন থেকে 'মা' যেন এবার ছেলেমেয়েদের সাবধান রাখেন। অবশ্য 'স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন' ও 'প্যারা আমিনো সালিসিলিক এ্যাসিড' আছে. কিন্তু পার্মিট নিয়ে যোগাড় করতে করতেই টেঁসে যাবার সম্ভাবনা। এছাড়া বাংলার আর কোন সমস্যা নেই। এইটুকু মানিয়ে নিয়ে 'মা' যদি ক'টা দিন আমাদের মধ্যে থেকে যান, তাহ'লেই আমরা বেদম খুশি।

বাংলার হাল দেখে মা যেন হাল না ছেড়ে দেন। কালে কালে দেশের হাল বদলায়, তাতে মনঃক্ষুণ্ণ হবার কিছু নেই। মা যদি দেখেন তাঁর সোনার বাংলায় আজ গণেশ উল্টে রয়েছেন, তাহ'লে তাকে সোজা করার বৃথা চেষ্টা যেন তিনি না করেন। যদি তিনি দেখেন বাঙালীর লক্ষ্মীর আসনে মাড়ওয়ারী গিন্নী বসে আছেন, তাহ'লেও যেন ভড়কে না যান। সরস্বতী যদি অবস্থাগতিকে টাইপিস্ট হয়ে থাকেন, তাতেই বা কি? কার্তিক যদি ট্রাউজার বুশশার্ট পরে পাইপ মুখে দিয়ে বেড়ান, তাতেও তাঁর ক্ষুব্ধ হবার কিছু নেই, কারণ সেক্সপীয়র বলেছেন,—'এ্যাপেরেল অফ্‌ট প্রক্লেম্‌স দি ম্যান্'—'পোশাক দেখলেই মানুষটাকে চেনা যায়।' মহিষাসুরকে কালোবাজারে দেখে মা যেন না চম্‌কে ওঠেন। এইসব দেখলেই তিনি বাংলার হাল বুঝতে পারবেন। বাংলা বা বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যদ্বাণী তাঁর না করলেও চলবে। আমাদের ভবিষ্যৎ আমরা জানি, কারণ ইদানীং বাংলাদেশে (পশ্চিম বাংলায়) গণৎকারের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে গেছে এবং তাঁরা হস্তরেখা ও রাশিচক্র দেখে আমাদের ভবিষ্যৎ বলে দিয়েছেন। সকলেই একবাক্যে বলেছেন, আমাদের ভবিষ্যৎ ভাল, সুদিন আসছে, বর্তমানে রাহু আর শনির দশা চলেছে, কেটে গেল বলে, বেশি দেরী নেই। তাই বলছিলাম, যদি কোনদিন রাহুর দশা কাটে আমাদের (কাটবেই একদিন) তাহ'লে আবার তোমার পুজো করব সেদিন। সেদিন 'মা' তুমি আমাদের পুজো দেখে ব্যোম্‌কে যাবে। কোথায় লাগে সেকালের বাবুদের দুর্গোৎসব আর বারো-ইয়ারি পুজো! পৃথিবীর সমস্ত

নাচওয়ালীকে নিয়ে এসে নাচাব বাংলাদেশে। আর বলিদান? শুধু বাংলায় নয় মা, সারা ভারতবর্ষে যত পাঁঠা আর ভেড়া আছে, সব নিয়ে এসে তোমার সামনে বলিদান দেব। আশীর্বাদ করো, সেদিন যেন তাড়াতাড়ি আসে।

ফুটপাতের ভাগ্যবিধাতা

যে যেখানে আছেন, বাংলার সুদূর চিংড়ীপোতা গ্রাম থেকে কলকাতা শহর পর্যন্ত, সকলে কালপেঁচার বিজয়াদশমীর আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। শুভ কামনা জানিয়ে লাভ নেই, কারণ আমার কামনা শুভই হোক আর অশুভই হোক তাতে আপনাদের যায় আসে না কিছু, শুভাশুভ সবই গ্রহ-উপগ্রহের চক্রান্ত রাশিচক্র এবং হস্তরেখার বিন্যাসের উপর নির্ভর করে। গণৎকাররা তো তাই বলেন। আর একদিন যা দেখলাম তাতে মনে হল যেন স্বয়ং ভগবানের চেয়েও এই মহানগরের ফুটপাথের ভাগ্যবিধাতারা শক্তিমান বেশি। আপনাদের মতন আমিও দুর্গোৎসবের কদিন মানুষের অমানুষিক ভিড়ের মধ্যে কলার ভেলার মতন ভেসে বেড়িয়েছি শুধু ভাসার আনন্দে। ফরাসী কবি বোদ্‌লেয়ার বলেছেন: The pleasure of being in crowds is a mysterious expression of sensual joy in the multiplication of Number— সত্যিই তাই। ভিড়ের মধ্যে অসংখ্য নরমুণ্ডের উত্থান-পতনের দিকে চেয়ে চেয়ে জীব হিসেবে যেন প্রজননের একটা নিদারুণ জৈবিক আনন্দ পাওয়া যায়, মনে হয় 'এক' আমিই কি এই 'বহুতে'

পরিণত হয়েছি? মনে হয় বলেই নির্জনতার মতন জনতাও ভালবাসি আমি। উৎসবের ক'দিন ভিড় দেখলাম কালীঘাটে, গঙ্গার ঘাটে আর বারোয়ারী পূজা-মণ্ডপে। কিন্তু তার চাইতেও ভিড় দেখলাম জমেছে বেশি পথের ধারে ফুটপাথের গণৎকারদের সামনে। দেখলাম, লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গাস্নান সেরে, কালী দর্শন করে, ফুটপাথের গণৎকারদের কাছে হাত দেখিয়ে ভবিষ্যৎ জেনে নিচ্ছে, তারপর খাবারের দোকানে কিছু পুরি-মিঠাই খেয়ে সোজা বাসে-ট্রামে চড়ে হৈ হৈ করে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় যাচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটাকে চোখ বুঁজে র‍্যাশানালাইজ করবার চেষ্টা করলাম। দেবীর মন্দিরে যারা স্বর্ণময় ভবিষ্যতের জন্যে সকাতর প্রার্থনা জানিয়ে আসছে প্রণামী দিয়ে, তারাই আবার কেন ঠিক পরমুহূর্তে গণৎকারের সামনে এসে যথাসাধ্য দক্ষিণা দিয়ে ভবিষ্যৎ জানবার অদম্য আগ্রহ নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে? কে বড়ো, মন্দিরের ভাগ্যবিধাতা, না ফুটপাথের? কার উপরেই বা লোকের বিশ্বাস বেশি? একবার দেবীদর্শনের জন্যে যারা ভিড়ের মধ্যে চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে মন্দিরের দরজায় ও উৎসব-প্রাঙ্গণে, তারাই আবার চিড়িয়াখানায় গিয়ে জানোয়ার দেখার জন্যে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে ভিড়ের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করছে কেন? সবরকম দর্শনের কি একই অনুভূতি? আরও একটা বিচিত্র ব্যাপার দেখে কি জানি কেন যেন চমকে উঠলাম। দেখলাম, কালীমন্দির থেকে বিপুল জনস্রোতের একাধিক ধারা দক্ষিণদিকে কেওড়াতলার শ্মশানের দিকে চলেছে, উদ্দেশ্য শ্মশান-দর্শন। শারদীয় উৎসবের হাসিহল্লার মধ্যে একই মানুষের এই শ্মশানঘাটের অগ্নি ও অশ্রুর উৎসব দেখার আগ্রহ কেন? কেন—কেন—কেন? অসংখ্য 'কেন' মাথার মধ্যে একসঙ্গে কিল্‌বিল্ করে উঠলো, এখনও শুধু করছে যে তা নয়, রীতিমত বোলতার মতন হুল ফোটাচ্ছে, কিন্তু কোন 'কেন'-রই উত্তর পাচ্ছিনে খুঁজে। ছ'কোটি বছরের ক্রমবিকশিত এই মনুষ্যমস্তিষ্ক লাট্টুর মতন বন্ বন্ করে ঘুরছে, কোন হদিশ পাচ্ছি না উত্তরের।

লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই, ইদানীং কলকাতা শহরে গণৎকারের সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছে। বড় বড় টাইটেলধারী, আফিস কাউন্টার ও

টাইপিস্টওয়ালা রাজজ্যোতিষীদের কথা বলছি না, ফুটপাথের গণৎকারদের কথা বলছি। সংখ্যায় এইভাবে বাড়তে থাকলে এবং শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির ফুটপাত জুড়ে বসলে, অল্পদিনের মধ্যেই ফিরি-ওয়ালাদের মতন কর্পোরেশনকে 'এস্ট্রলজার্স কর্ণার' তৈরি করে দিতে হবে। অবশ্য ফুটপাথের গণৎকাররা অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারী গোছের লোক, কোন জোরজুলুম হাঁকডাক নেই, কোন ভড়ং গলাবাজি বা স্লোগানও নেই তাদের। চুপ করে মুখটি বুজে কপালে তিলক কেটে ফুটপাথের ধারে তারা বসে থাকে। রাজপথে ফুটপাথে অসংখ্য মানুষ হেঁটে চলে যায়, কাউকেই তারা ডাকে না বা অকারণে কিছু বলে না। এই দুর্দিনে এরকম পর্বতপ্রমাণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে রোদে-বৃষ্টিতে-শীতে-গরমে ফুটপাথের উপর বসে থাকা আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি? উকিলের মক্কেলের অভাব, ব্যবসাদারদের ক্রেতার অভাব, লেখকদের পাঠকের অভাব, শিল্পীদের সমঝদারের অভাব, অভাব আজকাল সকলেরই, কিন্তু গণৎকারের ক্লায়েন্টের অভাব নেই। গণৎকারের মক্কেলের সংখ্যা প্রতিদিন অসংখ্য বেড়ে যাচ্ছে এবং সেইজন্যেই গণৎকারের সংখ্যাও বাড়ছে। গণৎকারের সংখ্যা বাড়ছে এরিথমেটিক গতিতে, আর তাদের মক্কেলের সংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক গতিতে। হাত দেখানোর আর 'ভবিষ্যৎ' জানার যেন একটা হিড়িক এসেছে কলকাতায়। 'ভবিষ্যৎ' জানার এই আগ্রহ বাড়ছে কাদের এবং কেন বাড়ছে? যাদের 'ভূত' ভয়ঙ্কর, 'বর্তমান' মারাত্মক এবং 'ভবিষ্যৎ' হয় অন্ধকার, না হয় কেবল ছলনাময়ী আলেয়া, তারাই হাতের তেলোতে ভবিষ্যতের ছবি দেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব। ফুটপাথের ভাগ্যবিধাতাদের কাছে তাদেরই ভিড় বাড়ছে দিন দিন। অর্থাৎ দেশের লোকের বর্তমান টলমল, ভবিষ্যতের ভরসা নেই। শুধু তাই নয়, নিজের উপরেও সমস্ত বিশ্বাস যেন মানুষের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নিজের উপর তো যাচ্ছেই, মানুষের উপর, সমাজের উপর মানুষের আর আস্থা থাকছে না। তবু তো সকলকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে এবং বাঁচতে হলে একটা কিছু ভরসা না পেলে মানুষ বাঁচে কি করে? তাই বার বার গণৎকারের কাছে যেতে হচ্ছে। বক্তৃতা বিবৃতি, প্ল্যান, আইনকানুন, সদিচ্ছা বা মহান্ আদর্শ, কোন কিছুরই

উপর মানুষের আর বিশ্বাস নেই, তাই সমস্ত বিশ্বাসটা আজ মানুষের সমাজ ও মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে গ্রহলোকে বৃহস্পতি, শুক্র, রবি, মঙ্গলকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। মনে হয় যেন একটা কূলকিনারাহীন অনিশ্চয়তার মহাসমুদ্রে আমরা সকলে ডুবে যাচ্ছি এবং ডুবে একেবারে তলিয়ে যাবার আগে ঢেউ-এর উপর দিয়ে শুধু হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছি বাঁচার শেষ আশায়। সেই হাতখানাই গণৎকার দেখছে।

ফুটপাথের গণৎকারদের কোন দোষ নেই, তাদেরও ঐ একই সমস্যা। বাঁচতে তাদেরও হবে, তাই ভাগ্যবিধাতা না হয়ে তাদের উপায় কি? মন্দিরের দেবতারা প্রণামী ও পূজা পান কেন? পুরুত পাণ্ডারা দক্ষিণা পায় কেন? ঐ একই কারণে নয় কি? সেখানে রাস্তার গরীব গণৎকাররা যদি দুটো পয়সা পায় তাতে ক্ষতি কি? দেবতারা কথা বলেন না, তাঁদের কাছে কেবল প্রার্থনা জানিয়ে চলে আসতে হয়, তাও আবার সব সময় ভয় থাকে যে, যদি তিনি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হন তাহলে আর রক্ষে নেই। মন্দিরের ভাগ্যবিধাতার কাছে মানুষের ভাগ্য সব সময় যেন অনিশ্চিত। ফুটপাথের ভাগ্যবিধাতার সেসব কোন বালাই নেই, তিনি কথা তো বলেনই, এমন কি সামান্য পাঁচটা পয়সা দিলেই সমস্ত ভবিষ্যৎটা স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দেন। মন্দিরের ভাগ্যবিধাতার কাছে আমরা পুজো দিই, মানত করি, কিন্তু তার ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি না, সবসময় যেন মনটা খুঁৎখুঁৎ করে, মনে হয় সবটাই একটা 'স্পেকুলেশন', কি হবে না-হবে তা আমি আপনি না, তিনিই জানেন। ফুটপাথের ভাগ্যবিধাতাকে সামান্য প্রণামী দিয়েও ফলাফলটা হাতেনাতে জানা যায়, মনে একটা বল পাওয়া যায়, কি হবে না হবে তিনি জানেন এবং আমাকে আপনাকে তা খোলাখুলি বলেও দেন। স্পেকুলেশনের সময় কোথায় আমাদের, বিশেষ করে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে? গণৎকাররাই আমাদের এই ভবসাগরের একমাত্র কাণ্ডারী। তাই মহানগরের গণৎকারদের উদ্দেশ্যে কবির অনুকরণ করে বলতে ইচ্ছে করে—

মহানগরের পথের ধারে
গণৎকারের আসনটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙ্গা জাহাজের ভীড়!

মাল বয়ে বয়ে ঘাল হল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই ভাগ্যের নীড়।
—(প্রেমেন্দ্র মিত্র অনুসরণে)

শারদীয়া দুর্গোৎসবের মধ্যেও গণৎকারের কাছে মানুষের ভিড় দেখেছি, তার কারণ শক্তির পূজা করেও যেন আমরা নিজেদের মধ্যে শক্তি খুঁজে পাচ্ছি না, নিজেদের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। হাতের চিৎ করা তেলোর উপর বিশ্বাস আমাদের বাড়ছে, মুষ্টিবদ্ধ হাতের জোরের উপর নয়। অথচ আমরা শক্তির উপাসনা করছি, উৎসব করছি। তাই বলছি, উৎসবের গোণা দিন কেটে গেলেও শক্তির সাধনা আমাদের শেষ হয়নি। সমস্ত জাতটার মেরুদণ্ড যেন পাটকাঠির মতন হয়ে গেছে। সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে নিজের পায়ে ভর দিয়ে চলবার শক্তি যেন আমরা হারিয়ে ফেলছি, বিশেষ করে আমরা বাঙালীরা। আমাদের আরও একাগ্রচিত্তে আজ আত্মশক্তির সাধনা করতে হবে। নিজেদের পায়ের উপর ভর দিয়ে এগিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে, হাতের তেলোয় ভর দিয়ে নয়। জানি, এসব জোরালো বচন বা বাণী শুনিয়ে লাভ নেই, তবু বলছি। এইভাবে চললে দু-দিন পরে দেখবেন, এদেশের রাস্তাঘাট গণৎকারে ভরে গেছে, তাও বাঙালী গণৎকারে নয়, অবাঙালী গণৎকারে, এবং তাদের কাছে আমরা বাঙালীরা হাত দেখাচ্ছি। ভাগ্যবিধাতারা তখন ভাগ্যের ব্যবসার জন্যে বাংলার বাইরে থেকে এসে কলকাতার ফুটপাথে বসবেন, রাস্তায় রাস্তায়, বাড়ি বাড়ি ঘুরবেন এবং শহরের কোন অঞ্চলে তুলাপট্টির ডালপট্টির মতন 'ভাগ্যপট্টি' খোলা হবে। সেদিনের আর বেশি দেরী নেই।

চৌরঙ্গীর ইয়ং চার্বাক

জ্যান্ত লোককে বাঘে টেনে এনে ঘাড় মুটকে রক্তপান করত চৌরঙ্গী অঞ্চলে এককালে। চৌরঙ্গী আর চোরবাগানের জংলা জায়গায় তখন চোর-ডাকাতের আড্ডা ছিল। প্রাচীন কলকাতার ইতিহাসে তাই দেখা যায়। এখন আর সেই চৌরঙ্গী নেই। সেই সব সেকালের চোর-ডাকাতদের বংশধররা আছে কি না লালবাজারের লোকেরা জানেন, তবে সেই খাল বিল জঙ্গল কিছুই নেই এখন। চৌরঙ্গী এখন রঙ্গভরা, অভিজাতদের অমরাবতী। নাচ-গান-পান-হল্লা, জুয়া-জালিয়াতির জাঁক-জমক নিয়েই এখন চৌরঙ্গী রঙ্গরসে ভরপুর। সব সময় একটা ওমরখৈয়মী আবহাওয়া যেন ঝক্‌মক্‌ করছে সেখানে। চার্বাক মুনি যেন চৌরঙ্গীর রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। মনটা সেদিন মোটেই ভাল ছিল না—একটা চিন্তাতেই যেন সমস্ত মনপ্রাণ মেঘাচ্ছন্ন হয়েছিল—'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ'। সমস্ত দেহটা যখন ভস্মে পরিণত হল তখন আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা কোথায়? পরলোক বা আত্মার অস্তিত্ব কোথায়? চৌরঙ্গীতে গড়ের মাঠের কোল ঘেঁষে নিজের মনে একা চলতে চলতে সেদিন এরকম অনেক কথাই মনে হচ্ছিল। আশপাশের ব্যস্তবাগীশ জনতা সম্বন্ধে বিশেষ কোন হুঁশ ছিল না, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের মতন তাদের আবির্ভাব হচ্ছিল চেতনার আকাশে। কিন্তু মন ও চেতনা সবটাই যেন তখন চলচ্চিত্রের পর্দা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনটা মুছে যাচ্ছে, কোনটা মিলিয়ে যাচ্ছে, কোনটা হঠাৎ বিরাট আকারে চমকে উঠছে, কোনটা বা দূর থেকে যেন ক্রমে স্পষ্টতর হচ্ছে। মানসিক চিত্রপটে সমস্ত পরিপার্শ্বটা দ্রুত দৃশ্যান্তরিত হয়ে চলেছে। আমি চলেছি একা একা চৌরঙ্গীর রাস্তায় হৈমন্তিক সন্ধ্যায়। উল্টো ফুটপাথের এক ফ্ল্যাট

থেকে রবীন্দ্র-সংগীতের একটা লাইন রেকর্ড থেকে ছিট্‌কে এসে কানে বাজল—'শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল'। অত্যন্ত প্রিয় গান, মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালাম। ভাল লাগল না, লাগবে কোথা থেকে ? মনটা সেদিন তার-ছেঁড়া তানপুরোর মতন বেসুরো হয়ে আছে, সুর ছিঁড়ে কথাগুলো তাই কাঁটার মতন বিঁধতে লাগল। একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে চললাম। পাশ থেকে অকস্মাৎ এক কুষ্ঠরোগীর কাত্‌রানিতে মুহূর্তের জন্যে যেন সম্বিৎ ফিরে এল। দূরে গাছতলায় ওরকম জ্যামিতিকে রম্বাসের মতন সিঁট্‌কে শুয়ে রয়েছে কে ? চৌরঙ্গীর এক পরিচিত ভিখারী। 'শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল'—কথাগুলো তখনও কাঁটার মতন বিঁধে আছে, সুরটা মিলিয়ে গেছে চৌরঙ্গীর আকাশে। চৌরঙ্গীর সেই আকাশ থেকে কে যেন লাউডস্পীকারে বলছে—

'শ্যামলে শ্যামল নাই, নীলে নাই নীল,
বিস্বাদ বিবর্ণ জীর্ণ প্রাচীন নিখিল।'

শাক্যবংশজাত সিদ্ধার্থ নই আমি—বিংশ শতাব্দীর মেটিরিয়ালিস্ট হোমো স্যাপীয়েন্স। টিকি মাথায় যত বড়ই থাকুক না কেন, ট্যাঁক সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন—বুলি মুখে যতই কপ্‌চাই না কেন, থলির কথা কখনও ভুলি না। বৈরাগ্য আমার নেই, কবিত্বও নেই। সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, নদীর কলতান, গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, এ সব দেখে সত্যিই মনে হয়—'ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাবকবি', কিন্তু 'তেলে সিন্দুর-এ সৌন্দর্যে ভবি ভুলিবার নয়।' হোটেলের জ্যাজ্‌, ক্যাবারে ভেসে আসছে কানে, ভাল লাগছে না, কারণ বিঠোফেনের সিম্‌ফনির মতন কুষ্ঠরোগীর সেই কাত্‌রানি আমার কানে বাজছে। চৌরঙ্গীর হোটেলের বারান্দায় বাবুর্চিরা গ্লাসে মদ ঢালছে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু রম্বাসের মতন যে ভিখিরীটা মরে সিঁট্‌কে পড়ে রয়েছে, তার কথা ভুলতে পারছি কৈ ? তবু আমি সিদ্ধার্থ নই।

বৈদ্যুতিক আলোয় চৌরঙ্গীর বিজ্ঞাপনগুলো ঝল্‌কে উঠছে। আলোকিত শো-কেসের লোভনীয় সব জিনিস ঝলমল করছে। দোকানের নাম চারিদিকে যেন দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে। কে বলবে, একদিন এই

চৌরঙ্গীতেই সন্ধ্যাবেলা বাঘের ভয়ে লোকে পথে বেরুত না। আজ বাঘ নেই, মানুষ আছে। তাই তো কেমন নিশ্চিন্তে একা একা আপন মনে হেঁটে চলেছি, কোন ভয়ডর নেই। চৌরঙ্গীতে আজ চার্বাক দর্শনের জয়জয়কার। বৈদ্যুতিক হরফে চারিদিকে যেন বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে—'যাবজ্জীবেত্ সুখং জীবেদ্'। কিন্তু 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেত' কি করে সম্ভব? চার্বাকের আমলে ঋণ পাওয়া যেত, কিন্তু এখন ঋণ দেবে কে! তা ছাড়া ঋণ পেলেও ঘি পাব কোথায় যে খাব? চার্বাকের আমলে ঋণ করে ঘি খাওয়াটাই সুখে থাকার মানদণ্ড ছিল, এখন সুখে থাকার মালমশলাই বদলে গেছে। সুখ কোথায়? তার স্বরূপটাই বা কি? আমার মনে হয়—

'…অতল দুঃখ-সিন্ধু,
হাল্কা সুখের তরঙ্গ তাহে নাচিয়া ভাঙ্গিছে ইন্দু।
তাই দেখে যারা হয় মাতোয়ারা তীরে ব'সে গাহে গান,
হায় গো বন্ধু, তোমার সভায় তাহাদেরি বহু মান।
দিগন্তপারে তরঙ্গ আড়ে যারা হাবুডুবু খায়,
তাদের বেদনা ঢাকে কি বন্ধু তরঙ্গ-সুষমায়?
বজ্রে যে জনা মরে,
নবঘন শ্যাম শোভার তারিফ, সে বংশে কেবা করে?
ঝড়ে যার কুড়ে উড়ে,—
মলয়ভক্ত হয় যদি বলো, কি বলিব সেই মূঢ়ে?'

সুতরাং সুখবাদ, না দুঃখবাদ? দুঃখবাদী কি বৈরাগী? কখনই নয়। তাহ'লে সুখবাদী কি সংসারী? নিশ্চয়ই নয়। কোনটাই সত্য নয়। এই সব ভাবতে ভাবতে চলেছি, মধ্যে চৌরঙ্গীর সেই মৃত ভিখিরীর রম্বাস মূর্তিটা মনে পড়ছে শুধু। এমন সময় পাশের অন্ধকার থেকে কার যেন স্বগতোক্তি শুনতে পেলাম—'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমান শরীরে'—লায়ার। ড্যাম্ লায়ার! থমকে দাঁড়ালাম। চেয়ে দেখি চিরপরিচিত চৌরঙ্গীর সেই ইয়ং চার্বাক। রুক্ষসুক্ষ চুল, মুখে একটা বিশ্বাস ও বিরক্তির ভাব, বুদ্ধির দীপ্তি চোখে, উদারতার আভাস কপালে।

আমার সঙ্গে তার অনেকদিনের পরিচয়। চৌরঙ্গী অঞ্চলেই একটা গ্যারেজের উপরে থাকে, রীতিমত সুশিক্ষিত। এর বেশি কিছু জানবার চেষ্টা করেও জানতে পারিনি। স্বগতোক্তি শুনে তাকিয়ে দেখেই বললাম ঃ 'এই যে কেমন আছেন? কি যেন বলছিলেন নিজের মনে? কাকে যেন গালিগালাজ দিচ্ছিলেন?' হেসে তিনি বললেন ঃ 'দেখুন না ব্যাপারটা! অর্জুন বলছেন, পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণকে কি করে হত্যা করব? গুরুজনকে হত্যা করা অপেক্ষা ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়। তার উত্তরে, হত্যাকে সমর্থন করার জন্যে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আত্মা জন্মহীন নিত্য অক্ষয় অনাদি, শরীর হত হলেও আত্মা হত হয় না। কি যুক্তি? মিথ্যা ধাপ্পা নয়? সাধে কি আর চার্বাক বলেছেন যে, ভণ্ড ধূর্ত আর নিশাচররা শাস্ত্র আর বেদ সৃষ্টি করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, হঠাৎ ভড়কে গেলাম। কিছু বলবার আগেই আমার বেশ-ভূষার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন ঃ 'এ আবার কি? এ তো কখনও দেখিনি?' আমি বললাম ঃ 'কি করে দেখবেন?' কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে তিনি বললেন 'বদ্ধ পাগল আর কি! আর শ্রাদ্ধে যদি মৃতের তৃপ্তি হয়, তাহলে নিভে যাওয়া প্রদীপে তেল দিলে জ্বলে না কেন? স্বর্গের লোককে যদি মর্ত্যে পিণ্ডি দিলে তৃপ্তি হয়—রাস্কাল! তাহ'লে চারতলার লোককে একতলায় খাবার দিলে খাওয়া হবে' না কেন? চার্বাক বলেছেন বলে নয়, যে কোন ইডিয়টও তো এটা বুঝতে পারে।' বেশী ঘাঁটালাম না, 'এখন আসি, পরে আবার দেখা হবে' বলে কেটে পড়লাম।

চলে যাচ্ছি, পিছন থেকে দেখি তিনি বলছেন ঃ 'ধূর্তদের কথায় ভুলো না বন্ধু! ইহলোকই সব, মৃত্যুই শেষ!' হন্ হন্ করে জোরে হেঁটে যাচ্ছি। কথাগুলো ভাল লাগল। চৌরঙ্গীর ইয়ং চার্বাককে তাই আমি ভালবাসি, অনেকদিন থেকে। রাত হয়েছে—ঘরে ফিরছি—আর কার কণ্ঠস্বরের যেন প্রতিধ্বনি শুনছি কানে—

'শুনহ মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।'
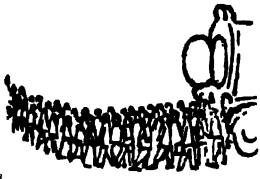
ডেলি প্যাসেঞ্জার ও ক্যানভাসার

মিঞা তানসেনের যুগ কেটে গেছে অনেকদিন, কিন্তু তানসেন-গুলির মাহাত্ম্য আজও কাটেনি। বাল্যকাল থেকে সেই তানসেন-গুলির ঐন্দ্রিজালিক শক্তির কথা শুনে আসছি, আজও শোনার পর্ব শেষ হল না। সর্দি, কাসি, গলা খুস্‌খুস্‌, গলা ব্যথা, গলাভাঙা—এসব যাবতীয় গলার ব্যাপার দু-চারটে গুলি ঠুকে দিলে সেরে তো যাবেই, উপরন্তু পানের সঙ্গে খান, মস্‌লার বদলে খান, শুধু জিবের উপর দু-একটা ছেড়ে দিন, সমস্ত মুখ-গহ্বর একেবারে গলা পর্যন্ত একটা বাদ্‌শাহী আবহাওয়ায় ভুরভুর করে উঠবে। অতএব 'চাই তাইসেন-গুলি' যখন ছায়ানট রাগিনীতে কানের কাছে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠবে, তখন সারাদিনের প্রচারক্লান্ত ক্যানভাসারের কণ্ঠস্বরটা ঠিক তানসেনের মতন কি-না সে কথা একবারও না চিন্তা করে দু-এক প্যাকেট 'গুলি' কেনার চেষ্টা করবেন। অবশ্য যদি সত্যিই আপনি ট্রেনের ডেলি প্যাসেঞ্জার হন, তাহলে তাতেই যে আপনি মুক্তি পাবেন তা নয়। হঠাৎ হয়ত হাম্বীর কণ্ঠে 'ভাস্কর লবণে'র ঝংকার শুনবেন পিছন থেকে। 'ভাস্কর লবণ আছে, ভাস্কর লবণ!' আপনাদের সেই বহু পুরাতন ভাস্কর লবণ, ভদ্রমহোদয়গণ!' এমনিতে লবণ যাঁরা খান তাঁরা লবণের গুণগান করুন আর নাই করুন, ভাস্কর লবণের গুণকীর্তন না করে তাঁদের উপায় নেই। কারণ ভাস্কর লবণের গুণের শেষ নেই এবং তার সমাদর না করে নিস্তার নেই। পাঁচ দশ পনের বিশ বছর ধরে সকাল সন্ধ্যায় ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে সারাদিন ধরে আফিসের হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে, কি-ই বা আছে আর শরীরে? তার উপর তেল ঘি চাল ডাল আটা কোনটাই আর খাঁটি নয়, সবতাতেই ভেজাল দিয়ে মুনাফাখোররা টাকা করছে, আমার আপনার মতন নিরীহ লোকের পাঁজরাগুলো ঝাঁজরা

হয়ে যাচ্ছে। হাড়ভাঙা খাটুনির পয়সায় যা কিনে খাচ্ছি তাতে হাড়-গুলোয় ঘুণ ধরে যাচ্ছে। তবু সেই ভেজাল আটা আর তেলঘিয়ের পোঁটলা বয়ে কর্মক্লান্ত অবসন্ন দেহটা টেনে নিয়ে যখন ট্রেনে ওঠেন, তখন পেটটা কার না অন্তত ছু-একবার মোচড় দিয়ে কন্‌কন্‌ করে ওঠে! পেটের যন্ত্রণা, পেটের ব্যথা, পেটের অসুখ, পেট ফাঁপা, অজীর্ণ, অম্বল, আমাশা,—এ তো আমার আপনার মতন গরীব গৃহস্থ লোকদের নিত্যসঙ্গী! এমন সময় যদি 'ভাস্কর লবণওয়ালা' পেটের যাবতীয় অসুখের একটা সুদীর্ঘ ক্যাটালগ্‌ আবৃত্তি করে বলেঃ 'বেশী কথা আমি বলব না ভদ্র-মহোদয়গণ! একটি কথা বলব! আজ আপনাদের কিনতে হবে না পয়সা দিয়ে, এক চামচ ভাস্কর লবণ আমি এমনিতে দিচ্ছি, জল দিয়ে বা শুধু মুখে ট্রেনে বসে খেয়ে নিন, বাড়ি পৌঁছবার আগেই পেটের ব্যথা সেরে যাবে, দেখবেন ক্ষিদেয় নাড়ী জ্বলছে, যা খাবেন হজম হয়ে যাবে, সকালে উঠে পেট ঝেড়ে খোলসা হয়ে যাবে!'—তাহলে কেউ চুপ করে বসে থাকতে পারেন কি? নিজের একলার সমস্যা নয়, পরিবারের সকলেরই ঐ পেটের সমস্যা। ডাক্তার বৈদ্য ছেলেমেয়েদের দেখিয়েই কুল পাওয়া যায় না, নিজেদের দেখাব কোথা থেকে? সুতরাং ছেলে-মেয়েদের যদিও নাই বা খাওয়াই, নিজের বা গৃহিণীর জন্যে একশিশি ভাস্কর লবণ কিনলে ক্ষতি কি? সারাদিনের খাটুনির পর ঘরে ফিরে হয়ত দেখতে হবে, রুগ্না স্ত্রী বিছানায় শুয়ে সেই পেটের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, ছেলেমেয়েরা ঘুমুচ্ছে, কিন্তু তিনি শুয়ে শুয়ে ছু-হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে সেই আটটার ট্রেনের চাকার শব্দ শুনছেন আর স্বামীর প্রতীক্ষা করছেন। টানাটানির সংসারে পেটেণ্ট ওষুধ কিনে খাওয়ানো সম্ভব হচ্ছে না। তবু একেবারে খালি হাতে না এসে যদি একশিশি 'ভাস্কর লবণ'ও নিয়ে আসা যায়, তাহ'লেও অন্তত মনস্তাত্ত্বিক কারণে তো রুগ্না স্ত্রী চাঙ্গা হয়ে ওঠে! আরও একজন বেঁচে যায়, সে ঐ 'ভাস্কর লবণে'র ক্যানভাসার। 'ভাস্কর লবণ' পেটে পড়ে যদি ম্যাজিকের মতন কাজ না করে, তাহলে তার নিজের পেটটাও তো চলে না। বেচারী ভাস্কর লবণ ফিরি করে করে মুখ দিয়ে ফেণা তুলে ফেললে, তবু তাকে দেখলেই বোঝা যায় তার নিজেরই

পেটের জ্বালাযন্ত্রণা ব্যাধির অন্ত নেই। কিন্তু নিরুপায় সে! এবং শুধু সে কি? 'মোদকওয়ালা' আছে—গম্ভীর ভাবে গাড়ির মধ্যে ঢুকে যে নির্লিপ্ত কণ্ঠে অভিবাদন জানিয়ে বলবেঃ 'একটা আবেদন আমি আপনাদের কাছে করতে চাই, মাননীয়গণ!' আবেদনটি হল যৌন-জীবনের যাবতীয় ব্যাধির মহৌষধ যে 'মোদক' তারই আবেদন। বিক্রি করা তার উদ্দেশ্য নয় তখন, কারণ অনেক রাতও হয়েছে, তাছাড়া তার কাছে মাত্র একটি শিশিই আছে একশ চুয়াল্লিশটার মধ্যে। একথা জানিয়ে দিয়ে সে 'মোদকে'র ঐন্দ্রজালিক মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে শুরু করেছে, এমন সময় সেই ভাঙা গলায় 'শনির পাঁচালী, লক্ষ্মীর পাঁচালী, মেয়েদের ব্রতকথা', ইত্যাদির সাহিত্যিক ক্যানভাসিং আরম্ভ হয়ে গেল। একটার পর একটা স্টেশন ছেড়ে ট্রেন চলেছে, একদল ক্যানভাসার নেমে যাচ্ছে, আর একদল উঠছে। প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সেই বিলম্বিত একটানা একঘেয়ে সুর, ভিতরের ডেলি প্যাসেঞ্জারদের সেই প্রতিদিনের অভাব অভিযোগের কথা, আর তারই মধ্যে ক্যানভাসারদের সেই একসুরের আবেদন ও মিনতি যেন করুণ বিলাপের মতন শোনায়। ডেলি প্যাসেঞ্জার, ক্যানভাসার, আর লোকাল ট্রেন—মনে হয় এ যেন চিরদিনের অবিচ্ছেদ্য 'ত্রয়ী'। জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন আশ্চর্য ঐক্য আর কোথাও সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্যাসেঞ্জার ট্রেনের ক্যানভাসার আগেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু ইদানীং ক্যানভাসারের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য যথেষ্ট বেড়েছে বলে মনে হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, ছোট ছোট কিশোর বালকরাও চলন্ত ট্রেনে দৌড়ে উঠে নেমে জিনিস ফিরি করে বেড়াচ্ছে। এমন কিছু না, সামান্য ঘরের তৈরি লজেন্স বা চানাচুর হয়ত। বেশ বোঝা যায়, এরা পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু কিশোর ছেলে। পেটের দায়ে আজ এরা প্রাণ হাতে করে ট্রেনে ট্রেনে ফিরি করে বেড়াচ্ছে। চলন্ত ট্রেনে এক কামরা থেকে আর এক কামরায় বাইরের হ্যাণ্ডেল ধরে তারা চলে যাচ্ছে—যদি দু-এক প্যাকেট লজেন্স বা চানাচুর কেউ কেনে। তাদের আবেদনে নতুন শৌখিন যাত্রী দু-একজন বিরক্ত হয়ে মধ্যে মধ্যে 'নুইসেন্স' বলে নাক সিঁটকান, কিন্তু

লক্ষ্য ব রে দেখেছি সত্যিকারের হাজার হাজার ডেলি প্যাসেঞ্জার যাঁরা, তাঁদের এই অসহায় ফিরিওয়ালাদের প্রতি গভীর সমবেদনার অন্ত নেই। তাদের সমস্ত আবদার, আবেদন, একঘেয়ে বক্তৃতা, চীৎকার, সবই তাঁরা অসীম ধৈর্য ধরে শোনেন, পারলে কিছু কিনে সাহায্যও করেন এবং নির্মম দারিদ্র্যের মর্মান্তিক আত্মপ্রকাশকে কখনও ভুলেও বিদ্রূপ করেন না। ডেলি প্যাসেঞ্জারদের এই গভীর মমত্ববোধ, মানবতাবোধ ও উদারতা একটা দেখবার জিনিস, অনুভব করবার জিনিস, শিখবার জিনিস। মাছওয়ালার হাঁড়ি, সব্‌জিওয়ালার ঝুড়িঝাঁপি ও ধোপার মোটের গুঁতো খেয়ে যেমন তাঁরা একটুও বিব্রত হন না, তেমনি ক্যানভাসারদের কাতরানিতে তাঁরা একটুও বিরক্ত বা অস্বস্তি বোধ করেন না। সহস্রটি মন অভাবের একসূত্রে গাঁথা থাকে, লোকাল-ট্রেন আপন মনে ঝিমুতে ঝিমুতে পথ চলে, ট্রেনের কামরায় প্যাসেঞ্জারদের রঙ্গরসিকতাও চলতে থাকে।

লাস্ট্‌ ট্রেনে রাত্রি দশটায় বাড়ি ফিরছি। কিশোর বালক তখনও দু-চারজন লজেন্স চানাচুর ফিরি করছে। শীতের রাতে, কন্‌কনে হাওয়ায় কামরা বদলাচ্ছে চলন্ত ট্রেনে। গায়ে ময়লা ছেঁড়া জামা, হাতে চানাচুর, লজেন্সের থলি। একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'এত রাত পর্যন্ত বিক্রি করছ কেন? বাড়ি যাবে কখন?' ছেলেটির চোখ দু'টো ছল্‌ ছল্‌ করে উঠলো। সারাদিনে মাত্র আট আনা পয়সা বিক্রি হয়েছে, তাতে চলবে কি করে? বাড়িতে মা, দুই বোন, আর ছোট একটি ভাই আছে, তারাই এসব তৈরি করে, আর সে ট্রেনে বিক্রি করে বেড়ায়। অন্তত এক টাকার না বিক্রি হলে দু-বেলা দু-মুঠো ভাতও তো খাওয়া চলে না! কদিন নাকি এই রকমই বিক্রি হচ্ছে, আর তারা একবেলা খাচ্ছে। ছেলেটির চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে জল ঝরে পড়ল। তার দিন চলে না। কিন্তু চানাচুর আর লজেন্স কিনলে তো আমারও চলে না। স্টেশন এসে গেল, নামতে হবে। আট আনা পয়সা ছেলেটির হাতে দিয়ে নেমে পড়লাম। ছেলেটি ছুটে এসে বললে: 'লজেন্স নিয়ে যান!' বললাম: 'তোমরা ভাইবোনে মিলে খেও!' ভিড়ের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: 'নিয়ে যান, মা বকবে তা না হলে!'

এই তো ক্যানভাসারের জীবন। আর ঐ তানসেনগুলিওয়ালা, ঐ ভাস্করলবণ বা মোদকওয়ালা? একই নয় কি? ডেলি প্যাসেঞ্জাররা? তাও কি ঐ একসুরে গাঁথা নয়? যা চাই তা ভুল করে চাই, যা পাই তা চাই না—আমাদের জীবন এই মধুর কাব্যের সুরে ধ্বনিত নয়। আমরা হলাম প্রতিদিনের ডেলি প্যাসেঞ্জার, ক্যানভাসার! আমরা—

'যাহা চাই তাহা পাই না, যা পাই
হারাই কপাল-দোষে।
মুঠা করে যত চেপে ধরি এই
জীবনটাকে,
পথের ধূলায় ছিটাইয়ে যায়
হাতের ফাঁকে।
চাই ধন জন স্বাস্থ্য শান্তি,
অভাবে পাই—
রুগ্না পত্নী, মূর্খ পুত্র,
গোঁয়ার ভাই।' (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

পার্ক স্ট্রীটের আত্মকথা

আমি পার্ক স্ট্রীট। কলকাতার কসমোপলিটান কালচার, স্নবারি, আরিস্তক্রাসি, মাই ডিমোক্রাসি পর্যন্ত যা কিছু সব আমাকে ঘিরে বেঁচে রয়েছে। আমি নন্দনবাসিনী উর্বশী নই, অমরাবতীর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি আমি কলকাতার সবচেয়ে অভিজাত রাজপথ 'পার্ক স্ট্রীট'। উষার

উদয়সম আজ আমি অনবগুণ্ঠিতা ঠিকই, কিন্তু বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি আমি বিকশিত হয়ে উঠিনি। আমার একটা ইতিহাস আছে। আজ আমি যৌবনে গঠিতা, পূর্ণ প্রস্ফুটিতা, কলকাতার অনন্ত-যৌবনা রাজপথ পার্ক স্ট্রীট হতে পারি, কিন্তু ভুলে যাইনি আমি আমার জন্মের কথা, ভুলে যাইনি আমার শৈশবের কথা। একদিন যে আমিও মুকুলিকা বালিকাবয়সী ছিলাম সেকথা আজকে 'বিশ্বের প্রেয়সী' হয়ে ভুলে যাওয়া যায় কি? জানি, আমার এই আত্মকথা শুনে ছাতুবাবু লেন, ছাতাওয়ালা গলি, চাষাধোপাপাড়া স্ট্রীট, গুলু ওস্তাগর, পগেয়াপট্টি বা ছকুখানসামা লেনের মতন অনেকেই হিংসায় ফুটিফাটা হয়ে যাবে, কিন্তু কি করব, তাদের জরাজীর্ণ বার্ধক্যের জন্যে কি আমি দায়ী? রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, হরি ঘোষ স্ট্রীট, বনমালী সরকার স্ট্রীট, হিদারাম ব্যানার্জি বা দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের মতন আরও অনেকে আছে, যাদের প্রাচীন ঐতিহাসিক আভিজাত্য হয়ত আমার তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু তাহলেও আজ সকলেই আমাকে হিংসা করে, কারণ আজ আমার বুকের উপর দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতের নরনারী আত্মহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কলকাতা শহরের অভিজাতশ্রেণীর গাঢ় নীল রক্তধারা আমারই শিরায় শিরায় নেচে ওঠে। যখন বৃটিশ, মার্কিন, ফরাসী, জার্মান, ইরানী, মিশরী, 'কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতারা' তাঁদের কটাক্ষঘাতে, চলার বিলোল-হিল্লোল ভঙ্গিতে আমার পিচঢালা চক্‌চকে বক্ষস্থলকে সুরসভাতল করে তোলেন, তখন হয়ত রাজা রাজবল্লভ বা নবকৃষ্ণের খোয়াওঠা বুকের উপর উৎক্ষিপ্ত বাঙালী বাস্তুহারার কাতরানি শোনা যায়, অথবা কোন রুগীর আর্তনাদ। হরি ঘোষের রকে যখন জমাট আড্ডা জমে, হিদারাম ব্যানার্জি বা পগেয়াপট্টি যখন তাকিয়া আর কল্‌কেতে মশগুল, দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন লোহালক্কড়ের হিসেবে ব্যস্ত, ছাতাওয়ালা গলিতে যখন আফিমের ঝিমুনি ধরে, আমি পার্ক স্ট্রীট তখন ছয় আউন্স স্কচ্ হুইস্কির সপ্তম মার্গে চড়ে থাকি, দেশ-বিদেশের কাল্‌চারস্নব কন্‌ওয়েশূয়োর ও বুজরুকরা তখন আমার বুকের উপর বসে মৌতাত করে। আমি যে কি বিচিত্র 'চীজ' যদি বুঝতে চান,

তাহলে শুধু কলকাতা শহরের এ-গলি সে-গলিতে থাকলেই চলবে না, আমার বুকের উপর নেমে আসতে হবে, বিকেল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত চলাফেরা করতে হবে। আমাকে ভাল করে না চিনলে কলকাতা শহরকে চেনা হয় না এবং শুধু কলকাতার কালচার বা ন্যাশনাল কালচার নয়, ইন্টারন্যাশনাল কালচারেরও কিছুই জানতে পারবেন না, আমাকে না জানলে। তবে হুঁশিয়ার হয়ে চলবেন পার্ক স্ট্রীটে। বাসট্রাম চাপা পড়বার ভয় নেই, ছ্যাকরা গাড়ির ঠোক্কর খাবারও সম্ভাবনা নেই। বেহুঁশ হয়ে হাঁ করে পথ চললে কখন কোন্ স্ট্রীমলাইন্‌ড বুইক, ফোর্ড, স্টুডিবেকার, পন্টিয়াকের তলায় পড়ে একেবারে নিঃশব্দে গুঁড়ো হয়ে যাবেন, তার ঠিক নেই। সাধারণ সংস্করণের লোব্রাউ লোক হলে হাঁ করে চলবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, কারণ আশপাশে এত সব বিচিত্র বাহারে মূল্যবান জিনিস আছে যা জীবনে সে কোনদিন দেখেনি, তাছাড়া দেখলেও আশ মেটেনি দেখার। রাস্তায় চলতে চলতে চেয়ে দেখবেন না, বিশাল শানবাঁধানো ফুটপাথের উপর চিড়িয়াখানার যাত্রীদের মতন ভিড় করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শো-কেসের দিকে দেখবেন, চাপা পড়ার ভয় থাকবে না। পার্ক স্ট্রীটে চলতে হলে হাইব্রাউদের মতন হাইহিল বা ক্রেপ্‌সোলের জুতো পায়ে দিয়ে, ঘাড় স্টিফ্ করে নাকের সোজা তাকিয়ে গট্‌গট্ করে চলতে হবে। লোব্রাউদের লেপ্‌টা-লেপ্‌টি বা চটির চটর-পটর পার্ক স্ট্রীটে বেসুরো শোনায় মনে রাখবেন। ধুতি পাঞ্জাবি আমার কাছে অচল, ট্রাউজার বুশশার্টে কোনরকমে চলতে পারে। আমার বুকের উপর দাঁড়িয়ে দেশী বাংলাভাষায় আলাপ-আলোচনা করাটা আমি মোটেই পছন্দ করি না, হলামই বা বাংলার রাজধানীর সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপথ বা রাজমহিষী! টিপিক্যাল 'ক্যালকাটা কালচার' বলতে যা বোঝায়, আমি হলাম তারই প্রতিমূর্তি—অর্থাৎ বহু শতাব্দীর 'স্লেভ্‌কালচারে'র প্রতীক আমি পার্ক স্ট্রীট। তাই বাংলাদেশে বাঙালীর কৃষ্টিকেন্দ্রের মধ্যমণিরূপে বিরাজ করেও বাঙালীর সমাজসংস্কৃতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার। তার মানে বাঙালীর স্থান নেই যে আমার বুকে তা নয়, যথেষ্ট বঙ্গসন্তান এখানে বিরাজ করেন, এখানেই তাঁদের আনাগোনা,

কানাকানি, ঢলাঢলি। ভারতীয়ের তো অভাব নেই। তবু পার্ক স্ট্রীটে চললে চারিদিকের বাড়িঘরের স্থাপত্য, লোকজনের চলাফেরা, কথাবার্তা, চালচলন, পোশাকপরিচ্ছদ, এমনকি খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত কোনটাই আপনার 'ভারতীয়' বলেই মনে হবে না। প্যারিস, ভিয়েনা, বার্লিন, লণ্ডন, ওয়াশিংটন, এমন কি পিকিং, টোকিও, কায়রো, তেহারান, অনেক কিছু আপনার পার্ক স্ট্রীটে এসে মনে হতে পারে, কিন্তু ভুলেও কখনও মনে হবে না বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের কথা। মনে হলেও দেখবেন, দেশী কালচারের এমন বিচিত্র বর্ণসঙ্কর ভারতবর্ষের আর কোন রাজধানীর রাজপথে ঘটেনি, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, কোথাও না। কেন এমন ঘটল জানতে হলে পার্ক স্ট্রীটের জীবনী জানতে হয়।

গ্রাম থেকে যেমন সমস্ত শহর গড়ে উঠেছে, কলকাতা শহরও তেমনি গ্রাম থেকে শহর হয়েছে ধীরে ধীরে। ডিহি কলকাতার পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে সূতানটি, পুবে নোনা জলাভূমি শিয়ালদহ, দক্ষিণে গোবিন্দপুর গ্রাম ছিল। এই সব গ্রামের মধ্যে মধ্যে ধানের ক্ষেত ছিল এবং এইরকম একটি ক্ষেত হয়ত আজও ধানহীন 'গড়ের মাঠ' হয়ে আছে। শহর বড়ো হয়েছে যেমন, লোকে তেমনি ধানের ক্ষেতে পুকুর খুঁড়ে বাস্তুভিটে তৈরি করেছে। পশ্চিমে ভাগীরথী থাকার জন্যে, পুকুরগুলো শহরের পুবদিকেই খোঁড়া হয়েছিল বেশি। এখনকার সবচেয়ে অভিজাত চৌরঙ্গী তখন গভীর জংগলে পূর্ণ ছিল। তার ভেতর দিয়ে একটা খাল কালীঘাট আর একটা হেস্টিংস স্ট্রীটের ভেতর দিয়ে ক্রীক রো হয়ে বেলেঘাটা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখনকার কলকাতার চারিদিকে কাঠের বেড়া দেওয়া ছিল, এবং তার মধ্যে মধ্যে আসবার পথ বা ফটক ছিল। আজকের ফ্যান্সী লেন ও ওয়েলেস্‌লি প্লেসের মোড় থেকে আরম্ভ হয়ে লার্কিন্স লেনের কাছ দিয়ে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, সেখান থেকে বারেটো লেন, ম্যাঙ্গো লেন, মিশন রো এবং সেখান থেকে লালবাজার, রাধাবাজার আমড়াতলা, আর্মিনিয়ান স্ট্রীট, হাম্মামগলি, মুর্গীহাটা, দরমাহাটা, বনফিল্ডস লেন, রাজা উদমন্ত স্ট্রীট দিয়ে গঙ্গার ধার পর্যন্ত বেড়া দেওয়া ছিল তখন। তখন মিডলটন রো'র কাছে হরিণেরা খেলা করত বলে তার নাম ছিল 'ডিয়ার

পার্ক'। অনেকে বলেন, এই ডিয়ার পার্ক থেকেই নাকি পরে আমার 'পার্ক স্ট্রীট' নামকরণ করা [illegible] পারে [illegible]; আমি জানিনে। তবে জংগলের ভেতর দিয়ে লোকে পায়ে চলে চলে যেমন পথ কেটে তৈরি করে, পৃথিবীর সব পথেরই যেমন ভাবে জন্ম হয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবেই আমি জন্মেছি। পায়ে হাঁটা মেঠো পথ হয়েই আমার জন্ম হয়েছিল। আজকের পিচঢালা শানবাঁধানো বুকের নিচে যে মাটির স্তর আছে আমার, তার অনেক গভীরে হয়ত আজও সেই মেঠো পথের চিহ্ন আছে। আজকের বুইক হাম্বার পন্টিয়াকের পথ নয়, হাই-হিল বা ক্রেপ্‌সোলের হাঁটা পথ নয়, জংলা চৌরঙ্গী অঞ্চলের চোরডাকাতের ত্রস্ত পায়ের চিহ্ন আঁকা পথ, কালীঘাটের গ্রাম্য যাত্রীদের পায়ে-হাঁটা পথ, আর বিদেশী সাহেবদের কবরখানায় যাবার নির্জন নিস্তব্ধ পথ। গোরস্তানে যাবার পথ বলে এককালে নাকি 'বেরিয়েল গ্রাউণ্ড রোড' নাম ছিল আমার। স্মিতহাস্যে সন্ধ্যাদীপ হাতে নিয়ে কোন গ্রামের বধূ যে সেদিন আমার বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যায়নি একবারও, তাই বা আজ কোন্ লজ্জায় বলি। একটা বন্য গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে এইভাবে আমার বাল্যকাল কেটেছে। চৌরঙ্গী অঞ্চল ধীরে ধীরে সাহেবদের বসবাসকেন্দ্র হয়ে উঠেছে, তখন নতুন ইংলিশ কাল্‌চারে দীক্ষিত বাঙালীরাও অনেকে আমার আশেপাশে এসে বসবাস করেছেন। তারপর আমার বুকের উপর দিয়ে গরুর গাড়ি, একাগাড়ি, ছ্যাক্‌রাগাড়ি ঘরঘর করে উঠেছে, পাল্কী বেহারার গান শুনেছি আমি। কৈশোর এই ভাবেই কেটেছে, মোটরের হর্ন শুনিনি তখনও। তারপর যৌবনের জোয়ারে ধীরে ধীরে ফেঁপে উঠলাম, পানক্ষেত গ্রাম পানাপুকুর পচানর্দমা জলাজংগল সব নিশ্চিহ্ন হয়ে ভেসে গেল। আজ আমার পূর্ণ জোয়ার, মনে হয় অনন্তযৌবনা আমি। সেই বিদেশী কাল্‌চারের প্রাধান্য আজও তাই আমার মধ্যে আছে। বাঙালী যাঁরা আছেন ক্যামাক বা হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে, হ্যারিংটন ষ্ট্রীট বা মিডলটন রো-তে অথবা ভারতীয়, তাঁরাও সেকালের মতন আজও 'দেশী'র 'বিদেশী'ই বেশি। বাংলার সমাজ, বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ নেই, যদিও তাঁরা সমাজের হবুচন্দ্র রাজা সব এবং কালচারের

গবুচন্দ্র মন্ত্রী। এইসব হবুগবুদের এক বিচিত্র 'হিং টিং ছট—কাল্‌চারের' সৃষ্টি করেছি আমি, পার্ক স্ট্রীট।

আবার বলছি, ফ্যাশন বা কাল্‌চারের গর্ব করা আমার কাছে চলবে না। চৌরঙ্গী থেকে আমার প্রবেশপথের ডাইনে চূড়ান্ত ফ্যাশনের চটকদার কারবার ঝলমল করছে, আর বাঁয়ে কালচারের প্রাচীন মন্দির এসিয়াটিক সোসাইটিতে উইলসন রাজেন্দ্রলালের প্রস্তরমূর্তি ঝিমুচ্ছে। আমার পিঠের উপর মিউজিয়াম এবং ঘোড়দৌড়ের মাঠও একদৌড়ের পথ। সুতরাং সব মিলিয়ে আমার যে-কাল্‌চার তা একেবারে কলকাতার নিজস্ব, আমি পার্ক স্ট্রীট তার একমাত্র ধারক ও বাহক, ছকুখানসামা লেন বা হরি ঘোষ স্ট্রীট নয়।
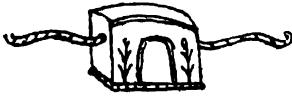
হরি ঘোষ স্ট্রীটের উত্তর

পার্ক স্ট্রীটের আত্মকথা পড়লাম। পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। এমন অপূর্ব কনফেশন বোধ হয় রুশোও করেননি। কিন্তু ফ্যাশন ও কাল্‌চারের বাগাড়ম্বরের মধ্যেও যিনি স্লেভ বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নিজে, হঠাৎ হরি ঘোষ স্ট্রীটের উপর সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করবার দুঃসাহস তাঁর হল কি করে ভেবে অবাক হয়ে যাই। আমি হরি ঘোষ স্ট্রীট, একেবারে খাঁটি বাঙালী হরি ঘোষ, ইঙ্গবঙ্গের অমরাবতী পার্ক স্ট্রীট বা হাঙ্গারফোর্ড ক্যামাক রাসেল স্ট্রীট নই। গুলু ওস্তাগর, ছিদাম মুদি বা ছকু খানসামাদের কথা আমি জানি নে, তাদের হয়ে ওকালতিও আমি করছি নে। কলকাতার শ্রেষ্ঠ রাজপথ পার্ক স্ট্রীটের মতন আমারও একটা ইতিহাস আছে, তবু আত্মকথা লেখার ইচ্ছা হয়নি কোনদিন। কিন্তু কালকের

যোগী পার্ক স্ট্রীটের আত্মম্ভরিতা যদি আকাশ ছুঁতে চায়, যদি কংক্রীটের মানসন থেকে তার গর্বোদ্ধত উক্তির প্রতিধ্বনি হরি ঘোষ স্ট্রীটের চুন-বালিখসা ভাঙা বাড়ির জীর্ণ ইটের পাঁজরে এসে আঘাত করে, তাহলে আত্মকথা না লিখলেও উত্তর একটা দিতে হয় নিশ্চয়ই। পার্ক স্ট্রীটের সেই হরিণচরার পার্ক নেই যেমন, হরি ঘোষ স্ট্রীটেও তেমনি সেই হরি ঘোষ নেই আজ। তবু হরি ঘোষের নামের এবং হরি ঘোষের হাড়ের আজও যে শক্তি আছে, পার্ক স্ট্রীটের আশেপাশের খালবিল জলাজঙ্গলে ইঙ্গবঙ্গ দস্যুদের তা ছিল না কোনদিন। হতে পারে, হরি ঘোষ স্ট্রীটে হয়ত পন্টিয়াক, প্লিমাউথ, ডিসোটো, হাডসন, বুইকের ক্যারাভান চলে না, চলে ঠেলাগাড়ি, রিক্শ আর থার্ড ক্লাশ ছ্যাকরাগাড়িই বেশি। হরি ঘোষ স্ট্রীটে হয়ত হাইহিল বা ক্রেপসোলের কন্টিনেন্টাল চলার শব্দ শোনা যায় না, বিদ্যাসাগরী বা তালতলার চটির চটরপটর শব্দই শোনা যায় অহরহ। পার্ক স্ট্রীটের মতন নিওন ফ্লুরোসেন্ট আলো ঝলমল করে না সেখানে, তার বদলে এখনও হয়ত কেরোসিনের আলো কিংবা ঘোলাটে বিজলী বাতি টিমটিম করে। চীনে রেস্তোরাঁ বা বোম্বাই বার-হোটেলের লোভনীয় ঠুংঠাং শব্দ বা কর্ক খোলার আওয়াজ শোনা যায় না সেখানে, বাঙালীর চায়ের দোকানের নরক-গুলজার-করা আড্ডার হল্লা শোনা যায়, অথবা কেরুবিলাসী কোন নাককানকাটা মাতালের আবোল-তাবোল প্রলাপ। পার্ক স্ট্রীটের মতন ঘন ঘন আর্ট এক্জিবিশন হয় না, আর্ট গ্যালারিও নেই হরি ঘোষ স্ট্রীটে, সেখানে জগন্নাথ রাধাকেষ্ট বা মা কালীর ঝুলকালি মাখা পট ঝুলতে থাকে অথবা চিৎপুরের ছাপাখানায় ছাপা স্বামী বিবেকানন্দ। স্বীকার করছি ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, মার্কিন মহিলারা হরি ঘোষ স্ট্রীটে চলে না এবং সেদিক দিয়ে আন্তর্জাতিক বৃন্দাবন হয়ে উঠতেও সে পারেনি, কিন্তু উড়েনী খোট্টানীদের নিয়ে তার যে আন্তপ্রাদেশিক উদারতা আছে তাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। পার্ক স্ট্রীটের মতন জাতীয়তাবোধ উচ্ছন্নে দিয়ে আন্তর্জাতিকতার বড়াই করে না হরি ঘোষ স্ট্রীট। হরি ঘোষ নিজে বাঙালী, তাই বাঙালী জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়েই সে বেঁচে আছে। তাতেই তার আনন্দ। দেশীয় কালচার, যে রকমই হোক, সেটাই তার

গর্বের বস্তু, দোয়াঁসলা কালচার তার ত্রিসীমানায় নেই। হরি ঘোষ স্ট্রীটের এই বৈশিষ্ট্য হরি ঘোষের জীবনেই আছে, স্বার্থপর ব্যবসায়ী পার্ক স্ট্রীট যা কল্পনা করতেও পারে না। আত্মপ্রচারের জন্যে নয়, একটা দরকারী নীতিশিক্ষা দেবার জন্যে পার্ক স্ট্রীটকে সেই জীবনের কথা বলছি, দয়া করে শুনুন।

আমি হরি ঘোষ, সাদাসিধে বনেদি বাঙালী। আমার চোদ্দপুরুষের কথা শুনে পার্ক স্ট্রীটের কোন দরকার নেই, তবু তিনি কলকাতার 'রাজমহিষী' বলে সে-কথা একটুখানি তাঁকে না শুনিয়ে পারছিনে। বাংলার রাজধানী গৌড় থেকে কলকাতা পর্যন্ত আমার আত্মবিকাশের ইতিহাস বিস্তৃত। অর্থাৎ বাংলাদেশ ও বাঙালীর জীবনের বিচিত্র ইতিহাসের সঙ্গে আমার পারিবারিক ইতিহাস জড়িত। গোরস্তানে যাবার ইংরেজদের সামান্য পায়ে হাঁটা পথ নই আমি। গৌড়ের মকরন্দ ঘোষের কথা ছেড়েই দিলাম। আমার পিতৃপুরুষ মনোহর ঘোষ আকবর বাদশাহের আমলের প্রতিপত্তিশালী গোমস্তা। মানসিংহের সঙ্গে যখন আফগানদের লড়াই বাধে তখন তিনি চিত্রপুরে অর্থাৎ কলকাতার চিৎপুর অঞ্চলে পালিয়ে আসেন। চিত্রেশ্বরীর মন্দির তাঁরই তৈরি, পার্ক স্ট্রীটের ইংরেজরা যাকে চিৎপুরের কালী বলত। পার্ক স্ট্রীটের জংগলে যে-সব ডাকাত লুটপাট করত, তারাই চিত্রেশ্বরীর মন্দিরে নরবলি দিয়ে কালীপুজো করত। মনোহরের ছেলে সন্তোষ ঘোষ রীতিমত পণ্ডিত ছিলেন এবং ইংরেজ ডাচ ফরাসীদের ফ্যাক্টরীতে সত্তর বছর পর্যন্ত কাজ করেছেন। তাঁর ছেলে বলরাম ঘোষ, সেকালের বিখ্যাত স্বাধীন বাঙালী ব্যবসায়ী ছিলেন—ফরাসী গবর্নররা পর্যন্ত চন্দননগর থেকে যাঁর ব্যবসায়ী বুদ্ধি দেখে ব্যোম্‌কে গিয়েছিলেন। যে বছর অন্ধকূপ হত্যা হয়, সেই বছর তিনি মারা যান। উত্তর কলকাতার বলরাম ঘোষ স্ট্রীট তাঁরই স্মৃতি বহন করছে। এই বলরাম ঘোষেরই পুত্র আমি দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষ। বাগবাজার কাঁটাপুকুরে এসে আমি বসবাস করতে আরম্ভ করি। কাঁটা-পুকুরে প্রায় বিশ বিঘে জায়গার মধ্যে বাগান, পুকুর ইত্যাদি নিয়ে আমার রাজপ্রাসাদ ছিল, পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে কোন ইংরেজ বা ইঙ্গবঙ্গেরই যা ছিল

না তখন। সেই রাজপ্রাসাদ আজ বাগবাজারের পথের ধূলোয় মিশে গেছে। তা যাক, যাবেই তো, কত রাজারাজড়া বাদশাহের গেল, হরি ঘোষের যাবে না কি থাকবে? তবে কেউ যদি অনুমান করতে চান তাহলে বলতে হয়—উত্তরে বোসপাড়া লেন, দক্ষিণে কাঁটাপুকুর লেন, পশ্চিমে গৌরচন্দ্র বোস লেন, পূর্বে গোপালচন্দ্র বোস লেন ও অন্যান্য ঘরবাড়ি নিয়ে যে বিরাট এলাকা—যে-সব জায়গায় আজ 'যুগান্তর' 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র আফিস বাড়িঘর উঠেছে—তার প্রায় সবটা জুড়ে একদিন এই হরি ঘোষের বাড়ি ছিল। সেই বাড়ির নাম কি ছিল জানেন? ঠিক নাম নয়, সমস্ত কলকাতার লোকের ডাকনাম? কলকাতার লোকের কাছে আমার সেই বাড়ির নাম ছিল 'হরি ঘোষের গোয়াল'। কেন এই নাম তারা দিয়েছিল তাও বোধ হয় জানেন না। এমন কেউ ছিল না তখন, আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব পাড়াপ্রতিবেশী বা দেশের লোক, যে আমার বাড়িতে এসে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ না পেত। বস্তা বস্তা টাকা মোহর যেমন ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে বাড়ি এনেছি, তেমনি মুঠো মুঠো করে তাকে বিলিয়েও দিয়েছি। বিলিয়ে দিতে বাঙালী জানে, পার্ক স্ট্রীটের ইংরেজ বা ইঙ্গবঙ্গের মতন হিসেবীবুদ্ধি তার নেই। বাপের শ্রাদ্ধ, বিয়ে, লেখাপড়া, চাকরি খোঁজা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার দেশের লোকের, সব আমার বাড়িতে এসে থেকে না করলে যেন তারা স্বস্তি পেত না। আমার বাড়িটাকে তাই লোকে 'হরি ঘোষের গোয়াল' বলত। তা বলুক, তবু সেটাই আমার ভাল লাগত। পয়সাটাকে হাড়পাঁজরের মতন মনে করিনি কোনদিন, তাই বাড়িটাকে গোয়াল ত করেছিলামই, যা কিছু অর্জিত ধনসম্পত্তি ছিল সব শেষ পর্যন্ত দান করে দিয়ে কাশীবাসী হয়েছিলাম।

তাই বলছিলাম, আমার বংশে আজ কেউ বাতি দিতে থাকুক বা না থাকুক, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, হরি ঘোষ স্ট্রীট, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট আছে উত্তর কলকাতায় এবং সেখানকার বাসিন্দারা আছে। তাদের অনেকেরই আজ আমার মতন ধনদৌলত নেই এবং চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ করে তারা পার্ক স্ট্রীটের হবুচন্দ্রদের মতন পরবর্তীকালে রাজাও হতে পারে নি।

তবু তারা আপস্টার্ট স্নব নয়, হাইব্রিড হিংটিংছট্ কালচারের প্রতিমূর্তি নয় পার্ক স্ট্রীটের মতন। তারা সব খাঁটি বাঙালী, বাঙালী জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি দোষগুণ নিয়েই তারা বাঙালী। বদান্যতা মহানুভবতা আলস্য-বিলাসিতা নিয়ে যে খাঁটি বাঙালী কালচার, তারই উত্তরাধিকারী তারা—হরি ঘোষ স্ট্রীটের বাসিন্দারা। তারাও 'কলকাতা কালচারের' একটা বিরাট অধ্যায় জুড়ে রয়েছে, পার্ক স্ট্রীট একা নয়।

ছাতুবাবুর বৈঠকখানা

দেখুন, আমাদের পূর্বপুরুষরা রঙ্গভূমি তৈরি করে মল্লযুদ্ধ দেখে আমোদ-আহ্লাদ করতেন, নাটক ত্রোটকের অভিনয় দেখতেন, বিশুদ্ধ সঙ্গীত ও সাহিত্যের উৎসাহ দিতেন। আজকাল আমরা হয় বারোইয়ারিতলায়, নয় বাড়িতে বেদেনীর নাচ ও 'মদন আগুনে'র তানে পরিপুষ্ট হচ্ছি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অনুরোধ উপলক্ষ করে পুতুল নাচ, পাঁচালি ও পচা খেউড়ে আনন্দ প্রকাশ করছি। মল্লযুদ্ধের তামাশা আজ বুল্‌বুল্ ফাইটে ও ম্যাড়ার লড়াইয়ে পর্যবসিত হয়েছে। আর আমাদের এরকম অধঃপতন হবেই বা না কেন? আমরা হামা দিতে আরম্ভ করেই ঝুমঝুমি চুসি ও সোলার পাখিতে বর্ণপরিচয় করে থাকি, কিছু পরে ঘুড়ি লাটিম লুকোচুরি ও বৌ-বৌ খেলাতে আমাদের যুবত্বের এণ্ট্রান্স কোর্স হয়, শেষে তাসপাশা ও বড়ে টিপে মাত্ করে ডিগ্রী নিয়ে বেরুই। সুতরাং এগুলো সব পুরনো পড়ার মতন চিরকাল আওড়ে আসতে হয়।

কালপেঁচার ভাষায় এগুলো হুতোমপেঁচার কথা, এক সময় তিনি অনেক দুঃখ করে বলেছিলেন। কথাগুলো সেকালের কলকাতার নব্যবাবুদের উদ্দেশ করে বলা। আর একজন লেখকের ভাষায় এই বাবুদের একটা বর্ণনা দিচ্ছি: 'এই সময়ে শহরের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র-গৃহস্থদিগের গৃহে 'বাবু' নামে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা দিয়াছিল। তাহারা পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ধর্মে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগসুখেই দিন কাটাইত। ইহাদের বহিরাকৃতি কি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব? মুখে ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোণে নৈশ অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমা রেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরিধানে ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু বগ্‌লস সমন্বিত চীনে বাড়ির জুতো। এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার এসরাজ বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া কবি হাফ আখড়াই পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া···গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত।'

এই যাঁদের বর্ণনা পড়লেন এঁরাই ছিলেন 'কলকাতার বাবু'—পাড়াগেঁয়ে লোক আজও কলকাতা শহরের ধোপদুরস্ত লোক দেখলেই যা বলে থাকে। সেকালের কলকাতার বিভিন্ন পাড়ায় এইসব বাবুদের মশ্‌করা ভাঁড়ামি রসিকতা করবার এক-একটা বারোইয়ারি বৈঠকখানা ছিল। যে কোন বাবুর বাড়িতে বৈঠকখানা থাকা সম্ভব ছিল না। হাফবাবু, ছোটবাবু, মেজবাবুদের একটা বৈঠকখানা মেন্‌টেন্ করবার মতন ক্ষমতাই ছিল না। হাতে গোণা যায় এরকম দু-চারজন 'বড়বাবুদের'ই বৈঠকখানা ছিল এবং তার মধ্যে সারা কলকাতা শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত বৈঠকখানা ছিল 'ছাতুবাবুর বৈঠকখানা', সবচেয়ে নামজাদা বাবুও ছিলেন আশুতোষ দে, ওরফে 'সতুবাবু' অপভ্রংশে 'ছাতুবাবু।' এই আশুতোষ দের ছোটভাই প্রমথনাথ দে, ওরফে 'লাটুবাবু।' দুই ভাই-ই ছিলেন কলকাতা শহরের সেরাবাবু, বড়বাবু বা ফুলবাবু, আর সব বাবু তাঁদের তুলনায় হাফবাবু। এঁদের বৈঠকখানার এমনই নামডাক ছিল যে, আমাদের দেশের ছেলেদের ছড়াতে পর্যন্ত তা ঢুকে গেছে—

'ছাতুবাবুর (বা লাটুবাবুর) বৈঠকখানা—
আজ বলেছে যেতে,
পানসুপারি খেতে—'

বৈঠকখানায় যেতে এবং পানসুপারি খেতে বলার ব্যাপারটাও শিশুমনের কল্পনা নয়, বাস্তব ইতিহাসের একটা টুকরো। ছাতুবাবুর বৈঠকখানা মুসব্বর মেশানো ইরানী তামাকের খোসবাইয়ে মাৎ হয়ে থাকত, বাবুদের দলও সব সময় ভিড় করে থাকতেন। পানসুপারি তো চলতই, নাচগান পান হল্লারও বিরাম থাকত না। প্রিসাইডিং বাবু সামনে বড় বড় আয়না ঝুলিয়ে বৈঠকখানায় প্রায় দেড় ফুট উঁচু একটা গদির উপর বসে থাকতেন। হুঁকোবরদার তামাক রেডী করে বসে তো থাকতই, গদির কিছু দূরে দু-একজন বাবুর অবশ্যপোষ্য খোট্টাও সিদ্ধির মাজুম, হজমিগুলি ও 'পালং-তোড়' প্রভৃতি 'কুয়ৎ কি চীজ' নিয়ে বসে থাকত। বিস্তর বাই, কথক ও গানওয়ালীর সঙ্গে খাতির থাকার জন্যে এইসব খোট্টারা বাবুদের দক্ষিণহস্ত হয়ে উঠতেন।

ছাতুবাবুর বৈঠকখানা ছিল কলকাতার 'বাবু কালচারে'র হেড-কোয়ার্টার। ছাতুবাবুর নামে আজও একটা রাস্তা উত্তর কলকাতায় আছে—নাম তার 'আশুতোষ দে লেন।' ছাতুবাবুর বাবা ছিলেন কলকাতা শহরের সেকালের একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী—রামদুলাল দে। রামদুলাল ছেলেবেলায় নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন, তাঁর ঠাকুমা ছিলেন হাটখোলার দত্তদের বাড়ি রাঁধুনী। তিনি নিজে বিখ্যাত জাহাজের ব্যবসায়ী মদনমোহন দত্তের কাছে শিপ্‌সরকারের কাজ করতেন। তারপর নিজের চেষ্টায় বোধহয় বাঙালীদের মধ্যে সেকালের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী হয়েছিলেন। লাখ লাখ টাকা তিনি রোজগার করেছেন, খরচ করেছেন, দানধ্যানও করেছেন। রামদুলালের মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধতেই প্রায় লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। আশু-বাবুও ব্যবসায়ে বাবাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর 'আশুতোষ দে অ্যাণ্ড কোম্পানী' বোধহয় কলকাতার শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান ছিল সেকালে। র‍্যালি ব্রাদার্স, চার্লস ক্যাণ্টর অ্যাণ্ড কোং, চার্লস ফরেস্টার,

এডমিস প্রভৃতি বিদেশী কোম্পানীর বেনিয়ানগিরি করাই ছিল তাঁর কাজ। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যবসাতে তিনি নিজে যা আয় করেছেন তা বাবুগিরিতেই ফুঁকে দিয়েছেন। উচ্ছৃঙ্খলতা, বিলাসিতা ও বদান্যতা—বাঙালী চরিত্রের যা প্রধান গুণ, ছাতুবাবু লাটুবাবু দুই ভাইয়ের মধ্যেই তা যথেষ্ট ছিল। লোটাকম্বল বা ছাতুরুটির নীতি মেনে চললে সাতপুরুষেও তাঁদের পয়সা খেয়ে শেষ হত না এবং শুধু দালালি বেনিয়ানি না করে কলকারখানার দিকে মন দিলে তাঁরা স্বচ্ছন্দেই আরও অনেক আগে বাঙালী 'টাটা বিড়লা' হতে পারতেন। কিন্তু বাঙালী ব্যবসা বলতে বোঝে 'দালালি' আর টাকা হাতে পেলে চরম বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়। এই বেপরওয়া বেহিসেবী চরিত্রের জন্যেই বাঙালী আর্থিক ক্ষেত্রে সকলের পিছনে পড়ে রয়েছে।

দালালি ও বেনিয়ানির পয়সা ছাতুবাবু দু-হাতে উড়িয়েছেন। কলকাতা শহরের সিম্‌লে অঞ্চলের দে-সরকারের বৈঠকখানাতে তাই সেকালের বাবুদের আড্ডা বসত এবং সিম্‌লেই ছিল কলকাতার 'বাবু কালচারে'র প্রাণকেন্দ্র। হাফ-আখড়াই, তরজা খেমটা খেউড় গান, যাত্রা পালাগান, চড়কের গাজন, রামলীলা, বাইজী নাচ, বুলবুলির লড়াই, বারোইয়ারি পুজো-পার্বণ—সর্ব-ব্যাপারে কলকাতার সেরাবাবু, শহরের বড়বাবু ছাতুবাবু ছিলেন প্রধান পাণ্ডা ও পৃষ্ঠপোষক। তাঁর বৈঠকখানাতে এসব তো হতই, তা ছাড়া কলকাতার যেখানেই এই জাতীয় ব্যাপার যা কিছু হক না কেন, ছাতুবাবু লাটুবাবু না থাকলে তা সুসম্পন্ন হত না, জমতও না! ছাতুবাবু নিজেও ভাল গানবাজনা জানতেন, তাঁর বৈঠকখানায় গাইয়ে-বাজিয়েদের জল্‌সা প্রায়ই হত, শহরের মোসাহেব গোছের হাফবাবু ও ছোটবাবুরা এসে জড়ো হতেন। ছাতুবাবুর সঙ্গীতানুরাগ সম্বন্ধে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'তাঁহার ন্যায় সঙ্গীত-বিদ্যানুরাগী অধুনা প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে সকল উত্তমোত্তম গায়ক সময়ে সময়ে নগরে আসিয়াছেন তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করিয়াছেন…।' তখনকার দিনে ছাতুবাবুর বৈঠকখানার আমোদ-প্রমোদের সংবাদ খবরের কাগজে নিয়মিত বেরুত,

যা আজকাল বোধহয় লাটের বাড়িতে হলেও বেরোয় না। তাই বলছিলাম—

এর আগে পার্ক স্ট্রীট ও হরি ঘোষ স্ট্রীটের কথা আপনারা শুনেছেন, কলকাতা কালচারের এক-একটা দিকের প্রতিনিধি তারা। কিন্তু 'আশুতোষ দেলেন'ও কম নয়, তারও একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস ছাতুবাবুর বৈঠকখানার ইতিহাস, অর্থাৎ কলকাতার সেকালের বাঙালীর 'বাবু কালচারে'র ইতিহাস। আজও তার ঐতিহ্য বাঙালী ভোলেনি বা ছাড়েনি। উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতায় হয়ত কোন আধুনিক ছাতুবাবুর ড্রয়িং-রুমে সেই একই 'বাবু কালচারে'র নয়াসংস্করণের রিহার্সাল চলছে। বাবু কালচার বিলুপ্ত হয়ে যায় নি আজও।
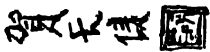
কলকাতার চীনাপল্লী

চীনের ব্যাপার নিয়ে শহরময় যখন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, তখন চট্ করে একদিন মনে হল, কলকাতার 'চীনাপল্লীতে' চলে যাই। ভাবলাম চীনাদের মধ্যে চাঞ্চল্যটা নিশ্চয়ই চরমে উঠেছে। সঙ্গে আমার একজন শিল্পীবন্ধু ছিলেন, তিনি বললেন, চলুন যদি চীনে তুলি আর কিছু কাগজ-কালি পাওয়া যায়। ঢুকলাম চীনাপল্লীতে, আসল মহাচীনে কোনদিন যাবার সুযোগ হবে না জানি, তাই 'ক্ষুদে চীন' দিয়েই শখটা মিটিয়ে নিলাম। চীনা পল্লীতে ঢুকে দেখলাম, সন্ধ্যার আগে সকলেই প্রায় চপ্-স্টিক্ নিয়ে খেতে বসেছে, চাঞ্চল্যের কোন নামগন্ধও নেই, সমস্ত চীনাপল্লীটা শহরের বুকের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে যেন আফিং খেয়ে ঝিমুচ্ছে। একজন চিয়াং, আর একজন মাওয়ের নাম জপ করতে আরম্ভ করলাম, মুখে একটি

কথাও বললাম না। রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনের খবর শুনে কিছু হয়েছে কিনা জানি না, তবে হঠাৎ চটাপট্ চপেটাঘাতের শব্দ শুনে আমরা দুজনেই রীতিমত ভড়কে গেলাম। একজন চিয়াং, আর একজন মাওয়ের নাম জপ করতে আরম্ভ করলাম, মুখে একটি করে বর্মী চুরুট ধরালাম। দেখলাম, চড়ের চোটে সেই চ্যাঙদোলায়িত চীনেটা সোজা উঠে দাঁড়িয়েছে, একপাল 'ডুশে' টাইপের চীনে চ্যাঙব্যাঙ তাকে ঘিরে ধরেছে, আর অনর্গল চকারান্ত চীনে ভাষার তোড় বয়ে চলেছে চারিদিক থেকে। রহস্যটা যে কি তা কেউ ভেদ করতে পারলাম না, চীনে পাজ্‌লের মতন দুর্ভেদ্যই রয়ে গেল। অবশেষে অনেক কষ্টে মনে মনে সাহস সঞ্চার করে শুক্‌নো গলা দুটোকে একটু ভিজিয়ে নেবার জন্যে দুজনেই একটা চীনে রেস্টুরেণ্টে ঢুকলাম। জনৈকা চীনে তরুণী এসে বিশুদ্ধ ভারতীয় রাষ্ট্রভাষায় আপ্যায়ন করে বললে—কি চায় ? আমার শিল্পীবন্ধুটি হিন্দী হিন্দুস্থানী কথ্যভাষায় ওস্তাদ। তিনিই সেটা ম্যানেজ করে নিয়ে চ্যাপ্টা গোছের কি একটা চপ্‌ আর চায়ের অর্ডার দিলেন। খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চীনা পল্লীর ঝিমুনির ঘোর না কাটলেও, একটু যেন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে বলে মনে হল। লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়েছে। বিচিত্র সব লোকজন। সাধারণত দিনের আলোয় এসব চীজ দেখা যায় না। রাতের অন্ধকারে এদের পাখ্‌না গজায়, আবার ভোরের আলোয় খসে পড়ে যায়। চীনা পল্লীটিরও ঠিক তাই। দিনের বেলায় যেন কি রকম ফ্যাকাশে, প্রাণহীন বলে মনে হয়, রাতে একেবারে আসল নানকিং-চুংকিং-পিকিঙের মতন জমজমাট হয়ে ওঠে। রাতের যাত্রীদের মধ্যে দু-চারজন বাঙালীকে যে দেখা যায় না তা নয়, তবে ঠিক চেনা যায় না। ফিরিঙ্গী আর পশ্চিমে মুসলমানদেরই আনাগোনা বেশি। সন্ধ্যার পরে প্রত্যেকটি দোকান যেন মন্ত্রণাসভায় পরিণত হয়। বাঙালীর দোকানের আড্ডা বলতে যা বোঝায়, চীনা পল্লীর কোথাও সে-রকম আড্ডা নেই। চিৎপুরের পরেই কলকাতার সবচেয়ে বিখ্যাত অলিগলি দিয়ে এই চীনাপল্লী ঘেরা। এদিকে ফিয়ার্স লেন, ওদিকে ব্ল্যাকবার্ন লেন, ছাতাওয়ালা গলি আর টেরেটি বাজার—পিঠের উপর লালবাজার, কলকাতার পুলিশ

হেডকোয়ার্টার। ফিরার্স লেনের প্রচণ্ড ফেরসিটির কথা দাঙ্গার সময় নিশ্চয়ই সকলে শুনেছেন। যদি একবার এই লেন দিয়ে ভেতরে ঢোকেন, তাহলে অন্তহীন অলিগলির গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলবেন, আর মনে হবে যেন করাচী থেকে কোয়ানটুং পর্যন্ত অনেকটা পথ চলে গেছেন, বাংলাদেশের কলকাতা শহর অনেকটা পিছনে পড়ে রয়েছে। এই হল কলকাতার বিখ্যাত 'চীনাপল্লী' যেখানে ঢুকলে মনে হবে শহরের এক আজব পাতালপুরীতে প্রবেশ করেছেন এবং দিন-দুপুরেই হোক আর রাত্রেই হোক, সব সময় গা ছম্ ছম্ করবে। আশেপাশে বিচিত্র বেশধারী মানুষের আনাগোনা, ফিস্‌ফাস্, কাণাকাণি আর ছত্রিশ রকমের দুর্বোধ্য ভাষায় আলাপ আলোচনা শুনলে কেমন যেন একটা আন্‌ক্যানি ব্যাপার বলে মনে হবে। কলকাতার পুলিশ হেডকোয়ার্টার বা লালবাজারের পাশে মনে হবে এ যেন একটা 'ক্রাইম ও ক্রিমিনালে'র হেডকোয়ার্টার, একটা বিচিত্র কালোবাজার, অথচ এখানে খাঁটি ব্যবসায়ী ও গৃহস্থ পরিবারেরও অভাব নেই। এপাশে ওপাশে দোকানগুলোরও একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। হোটেল আর চা-খানার প্রাচুর্যই প্রধান বৈশিষ্ট্য, তারপর জুতো আর ডেন্টিস্টের দোকান, চীনদেশের নানারকমের শৌখিন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস-পত্তরের দোকান, আধুনিক কায়দায় চীনে যুবকদের কিছু স্টেশনারী দোকান, আর খাবারের দোকান। খাবারের দোকান মানে মিঠাইমোণ্ডার দোকান নয়, রোস্ট-করা হাঁস-মুর্গী-শুয়োরের দোকান। মিষ্টি রসের ব্যাপার বিশেষ কিছু নেই, সবই শুঁটকো আর পচার ব্যাপার, দোকানের সামনে সব আস্ত আস্ত ঝুলছে, দেখে চীনেদের জিবে নিশ্চয়ই লালা ঝরছে, কিন্তু আমাদের হেঁচ্‌কি ওঠার উপক্রম। তবু যেন নান্‌কিঙের লোভ সামলানো যায় না। চতুর্দিকের চৈনিক পরিবেশের মধ্যে নান্‌কিঙের যে একটা নির্জন আভিজাত্য আছে তা পার্ক স্ট্রীট বা চৌরঙ্গীর চটকদার চীনা রেস্টুরেণ্টে অনেকের কাছেই দুর্লভ মনে হবে।

যাই হোক, আমরা দুজন চা-খানা পেরিয়ে একপাক ঘুরে একটি চীনা সেলুনে চুল কাটতে ঢুকে পড়লাম। চুল কাটার যে খুব দরকার ছিল তা নয়, সময় কাটাতে হবে তাই চুলকাটা। তাছাড়া আমরা ঠিক করলাম

সেদিনের সব ব্যাপারটাই চৈনিক পদ্ধতিতে সেরে নেব, মায় শেষকালে নান্‌কিঙে রাতের খাওয়াটা পর্যন্ত।

চীনে হাতের কাঁচি চুলের ওপর চলোর্মির মতন চলেছে, তালুতে সুড়সুড়ি লাগছে, মনটা চুলবুল করছে। চুল কাটাচ্ছি আর ভাবছি, রাষ্ট্রসঙ্ঘের চীনা প্রস্তাবের কথা নয়, কলকাতার এই আজব চীনাপল্লীর কথা! সেলুনের দেয়ালে চিয়াং-কাই-সেক, মাও-সে-তুঙের ছবি আছে, সান-ইয়াৎ-সেন আছেন, চীনা তরুণীদের বাহারে ছবির মধ্যে স্বয়ং বুদ্ধদেবও আছেন। চীনের ইতিহাসটা যেন ছবি দিয়ে লেখা রয়েছে দেয়ালে। চীনে অক্ষরগুলো ছবি ছাড়া আর কি? ভাবছিলাম, চীনেরা কলকাতা শহরে এলো কবে ও কেন, কি করে এই কিম্ভুত-কিমাকার 'চীনে পল্লী' শহরের বুকের ওপর এমনভাবে গজিয়ে উঠল? সেই বৌদ্ধযুগ থেকে চীনা শ্রমণরা এ-দেশে আসা-যাওয়া করছেন, ফা হিয়েন, য়ুয়ান চোয়াঙ, ইৎসিঙ, সেঙ-চি সকলেই বাংলাদেশে এসেছেন। ইৎসিঙ তো ছাপ্পান্ন জন চীনা পরিব্রাজকের নাম করেছেন। চতুর্থ শতকের গোড়া থেকেই দেখা যায়, চীনা শ্রমণেরা বাংলাদেশে, বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গে যাতায়াত করতে থাকেন। ইৎসিঙ বলেছেন যে, চীনা শ্রমণদের জন্যে মহারাজ শ্রীগুপ্ত (খুব সম্ভব গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠাতা) একটি 'চীনা মন্দির' তৈরি করে দিয়ে তার সংরক্ষণের জন্যে চব্বিশটি গ্রাম দান করেছিলেন। মন্দিরটি ছিল মৃগস্থাপন স্তূপের কাছে, বোধহয় বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গের কোন জায়গায়। সুতরাং চীনেরা ইংরেজদের অনেক আগে থেকেই, এমন কি মুসলমানদের আগেও, আমাদের দেশে যাতায়াত করছে, কিন্তু দেশ জয় করবার মতলব নিয়ে তারা কখনও আসেনি, এসেছিল সংস্কৃতির লেনদেনের জন্যে আর বাণিজ্যের জন্যে। ছুঁচ হয়ে ঢুকে অন্যান্য বিদেশীদের মতন চীনেরা এদেশে কোনদিন ফাল হয়ে বেরোয়নি, বেরুবার চেষ্টাও করেনি। একটা শান্তি ও মৈত্রীর সম্পর্ক চীনেদের সঙ্গে আমাদের চিরদিনই ছিল। চীনেরা বাংলাদেশে প্রায় গুপ্তযুগ থেকেই কিছু কিছু বসবাস করতে আরম্ভ করেছে বললে ভুল হয় না। তারপর অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার প্রাধান্য বাড়তে থাকায় চীনেরাও শহরমুখো হতে থাকে।

ব্যবসার জন্যে অনেকে নতুন করে কলকাতাতে এই সময় আসে। আগেকার দিনে কলকাতার পুলিস সুপারিণ্টেডেণ্ট শহরের লোকসংখ্যা গণনা করতেন। ১৮৩৭ সালের একটি গণনায় দেখা যায়, সেই সময় কলকাতার প্রায় সওয়া দুই লক্ষ লোকের মধ্যে ৩৬২ জন চীনে ছিল। এরা অধিকাংশই ছিল ব্যবসায়ী এবং ভিন্‌দেশীয় বলে এক জায়গায় বসবাস করবার ঝোঁক নিশ্চয়ই গোড়া থেকেই চীনেদের মধ্যে ছিল। তখন থেকেই কলকাতার এই চীনা-পল্লীর গোড়াপত্তন হয়েছে বলা চলে। ক্রমেই চীনেদের সংখ্যা বেড়েছে, এখন তো রীতিমত বেড়েছে। চীনা ভাষায় দৈনিক সংবাদপত্র কলকাতায় চলছে, সাপ্তাহিক মাসিকের অভাব নেই। চীনে স্কুলও কলকাতায় আছে। চীনে মন্দির, চীনের নানারকম সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও চীনে পল্লীতে দেখা যায়। মধ্য-কলকাতার বড় বড় হোটেল, রেস্টুরেণ্ট, হেয়ারকাটিং সেলুন আর দুদিন পরে চীনেদের একচেটে হয়ে যাবে বলে মনে হয়। চীনে ছুতোরের আর জুতো-ব্যবসায়ীর সংখ্যা যে কত তা বেণ্টিক স্ট্রীট থেকে আরম্ভ করে 'চীনা-পল্লী' ঘুরে এলেই বুঝতে পারবেন। আর সব চেয়ে বড় কথা, চীনেরা অসম্ভব পরিশ্রমী, ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সকলেই মেহনত করছে, কাজ করছে দেখতে পাবেন। বাবা যদি ডেণ্টিস্ট হয়, মা দাঁত সেট্ করতে জানে, ছেলে দাঁত সাফ্ করা শেখে। বাবা ছুতোর হলে, মা ফিনিশ করে, ছেলে পালিশ করে। বাবার জুতোর দোকানে মা ছেলে মেয়ে ভাইবোন, সকলে মিলে কাজ করে। বাবার রেস্টুরেণ্টে মা রান্না করে, ছেলেমেয়েরা 'সার্ভ' করে। চীনাপল্লীর এইটাই সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস, দেখবার মতন, শিখবার মতন। জীবিকা, কাজকর্ম আর পারিবারিক জীবনের এমন চমৎকার সমন্বয় আর কোন জাতের মধ্যে দেখা যায় না। কি মধ্যবিত্ত, কি মজুর, সকলেরই জীবনযাত্রার ঐ একই প্যাটার্ন চীনা-পল্লীতে দেখতে পাবেন। কলকাতার চীনাপল্লীর রহস্যটা চোখে পড়ে, নোংরা ঘিন্‌জি অলিগলিগুলো চোখে পড়ে আফিং ও চরোসের ঝিমুনিটা সহজেই দেখা যায়, কিন্তু তাদের জীবনের এই দিকটা কারও চোখে পড়ে কি?

যে চীনে নাপিত আমাদের চুল কেটে দিল, তারই মেয়ে বোধহয় মাথা মাসাজ করে চুল আঁচড়ে দিল, আর তার পাকাপোক্ত গিন্নীর কাছে আমরা দক্ষিণা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। এখানেও সেই পারিবারিক ম্যানেজমেণ্ট। কোন জড়তা বা ন্যাকামি নেই, অত্যন্ত সহজ সরল শান্তিপ্রিয় জীবনযাত্রা। গোল হয়ে সকলে মিলে খেতে বসা আর চুং চাং করে আলাপ করাটাও ভাল লাগে। চুল কেটে এইকথা ভাবতে ভাবতে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। চ্যাংফোর দোকান থেকে কিছু চীনে কাগজ, বাঁশের তূলি, কালি আর চীনে মাটির চমৎকার কয়েকটা খেল্‌না কিনে, 'নানকিঙে' সান্ধ্যভোজন সেরে নিতে ঢুকে পড়লাম।

গো-জ্যোতিষীর ভাগ্যগণনা

সাতপেয়ে গরু বাজারে ঘর ভাড়া করলেন, দর্শনী দু-পয়সা রেট হল। গরু দেখবার জন্যে অনেক গরু একত্র হলেন—বাকি গরুদের ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকা হতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যে সাতপেয়ে গরু বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করে দেশে চলে গেলেন।—এ কথা হুতোম নিজে তাঁর নক্‌শায় লিখে গেছেন, হুতোমের আমলের কথা। কালপেঁচার আমলে 'সাতপেয়ে গরু' বা 'দরিয়াই ঘোড়া' যে নেই তা নয়, রথযাত্রা বা রাসলীলার মতন কিছু একটা পার্বণ হলেই এখনও সেই সাতপেয়ে গরু, তিনঠেঙে মানুষ সব এসে কলকাতা শহরে জড়ো হয় এবং দেখবার জন্যে যথেষ্ট দু-পেয়ে

লোকের ভিড়ও হয়। কিন্তু হুতোমের আমল কেটে গেছে অনেকদিন, তারপর আদিগঙ্গায় জোয়ার-ভাঁটা এসেছে অনেকবার, গঙ্গার বুকে মাটিও জমেছে অনেক। সাতপেয়ে গরুর বদলে চারপেয়ে গরুর যুগ এসেছে এখন। একালে আর এক্সট্রা তিনখানা পায়ের দরকার হয় না, চারখানা পা থাকলেই যথেষ্ট। সেটা ছিল ঊনবিংশ শতাব্দী, এটা বিংশ শতাব্দী, আমরা কালের যাত্রাপথে এগিয়ে গেছি অনেকটা। আজ তাই সাতপেয়ে গরুর বদলে চারপেয়ে আসল গরুতেই আমাদের কৌতূহল মেটে। কালপেঁচার যুগ হল খাঁটি গরুর যুগ। কেন, সেই কথাটা শুনুন।

কলকাতার মতন বিরাট শহরে সেদিন একটা সাধারণ চারপেয়ে খাঁটি গরু যে কি ভয়ানক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, তা বোধহয় অনেকেই জানেন না। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা হয়ত ব্যবস্থাপরিষদে বাজেট অধিবেশন নিয়ে ব্যস্ত, তাই তাঁরাও খবর পাননি। রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আমার আর কোন কাজ নেই বলেই আমার সেদিন ঐ সাধারণ গরুর অসাধারণ ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। কলকাতার কোন্ অঞ্চলে দেখেছি সে কথা বলব না, কারণ আমরা অত্যন্ত সেন্টিমেন্টাল জাত, যথেষ্ট রসিক হয়েও অনেক সময় সামান্য রসিকতা বুঝি নে। সুতরাং গরুর কথাটাই বলি, মানুষের কথা চাপা থাক। কালপেঁচার নক্শা অন্তত গরুরা পড়বে না, সুতরাং গো-সমাজের কেউ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে না।

যে-গরুর কাহিনী বলছি তাকে ঠিক 'গরু' বললেই সব বলা হয় না। সঠিকভাবে বলতে গেলে তাকে প্রথমেই বলতে হয় 'ষাঁড়', সুন্দর নাদুশ-নুদুশ ষাঁড়, স্বাস্থ্য মানবসমাজের অনেকের চেয়ে তো নিশ্চয়ই ভাল, গো-সমাজেও দুর্লভ। গরুর পদবী না থাকলেও, নাম আছে। ষাঁড়টির নাম 'বিশ্বনাথ', 'বাবা বিশ্বনাথ' বলেই সকলে ডাকে। বিশ্বনাথ নাকি গো-সমাজের একটি বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ, মৌন থাকলেও মধ্যে মধ্যে 'হুম-বাঁ' করে কথার জবাব দিতে দেখা যায়। এরকম শান্তশিষ্ট অহিংস প্রকৃতির ষাঁড় সচরাচর দেখা যায় না। সেদিন দেখলাম 'বিশ্বনাথ' সেজেগুজে কলকাতার এক জনবহুল

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে, আর বিশ্বনাথকে ঘিরে কয়েকশ লোকের একটা ভিড় জমেছে। ভিড় দেখে আমিও তার মধ্যে ভিড়ে গেলাম। বিশ্বনাথের গায়ে কড়ি-বসানো চাদর, দুই শিঙে দুই ত্রিশূল, কপালে ও গায়ে সিঁদুরের সব প্রতীকচিহ্ন, পিঠের সুডোল কুঁজের উপর বেশ বড় করে একটি 'ওঁ' লেখা, গলায় ঝুমুর আর ঘণ্টা বাঁধা। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বনাথ, নির্লিপ্ত নিস্পৃহের মতন, মধ্যে মধ্যে ধ্যাননিমীলিত চোখ দুটো পিট্ পিট্ করছে শুধু সমাগতদের দেখবার জন্যে নয়, কোলাহল শুনে। বিশ্বনাথের একজন পার্শ্বরক্ষী আছেন, তিনি অবশ্য মানুষ এবং বাংলাদেশের মানুষ নন, মনে হয় বিহার অঞ্চলের ছাপরা বা আরা জেলার। পার্শ্বরক্ষী যখনই 'বিশ্বনাথ' বলে হাঁক দিচ্ছেন, তখনই সুস্থির বিশ্বনাথের মধ্যে যেন চেতনার সঞ্চার হচ্ছে, বিশ্বনাথ দাঁড়িয়ে দুলতে আরম্ভ করছে। রুমঝুম রুমঝুম গলার ঝুমুর বাজছে, দোলনের বেগ বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাটাও টুংটাং করে উঠছে। শিঙের ত্রিশূল দুলছে, কুঁজের ওঁ দুলছে, লেজ দুলছে, পিঠের কড়িবসানো চাদর দুলছে, বিশ্বনাথ দুলছে, মনে হচ্ছে যেন পাশের পরিবেষ্টিত জনতাও দুলছে। সকলেই 'ইন্ মোশন', এমন সময় পার্শ্বরক্ষী বললেন: 'এক বাবু জিজ্ঞাসা করছেন তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে কি না! বলে দাও বাবুকে, বিশ্বনাথ হবে, কি হবে না।' বলামাত্রই একটা চাপা কমোশনের সৃষ্টি হল, বিশ্বনাথ ঘণ্টা বাজিয়ে চলতে আরম্ভ করল। জনতাকে কয়েকবার চক্রাকারে বেড় দিয়ে ঘুরে বিশ্বনাথ ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে যা করল, আশ্চর্য। ঠিক সেই লোকটির সামনে গিয়ে বুকের কাছে মুখ দিয়ে দাঁড়াল, ঘাড় দোলাতে থাকল। এতে বুঝতে হবে, বিশ্বনাথ সম্মতি জানাচ্ছে। শোনা গেল, 'না' উত্তর দিতে হলে বিশ্বনাথ নাকি কাছে গিয়ে হাম্বা ধ্বনি করে।

রেট এক আনা করে। যার খুশী ভাগ্য গোণাতে পারেন। বিশ্বনাথের দৈবশক্তির গভীর রহস্য মধ্যে মধ্যে পার্শ্বরক্ষী ব্যাখ্যা করে গভীরতর করে দিচ্ছেন। বলব কি, একটি চুবড়ি দেখতে দেখতে আনিতে ভর্তি হয়ে গেল। প্রশ্নের যেন জোয়ার এল জনতার ভেতর থেকে। অসুখ সারবে কিনা, ব্যবসায়ে উন্নতি হবে কিনা, চাকরি হবে কি না ইত্যাদি। দু-একজন

প্রৌঢ়া গোছের মহিলা বিবাহের কথাও জিজ্ঞেস করলেন, বোধহয় অবিবাহিতা কন্যাদের। বিশ্বনাথ সকলের কথারই প্রায় সম্মতিসূচক উত্তর দিলে। দু-একজনের ক্ষেত্রে হাম্বা ধ্বনিও যে শোনা গেল না তা নয়। কেউ কেউ অত্যন্ত গোপন প্রশ্ন জানালেন নীরবে, সেটা মনে মনে চিন্তা করে। গোপন প্রশ্ন জানাবার পদ্ধতি এই, নীরবে সেটা ধ্যান করা। তারপর বিশ্বনাথ ঠিক কাছে গিয়ে তার জবাব দেবে।

নীরব প্রশ্নই হঠাৎ বেশী মাত্রায় শুরু হল। বুঝলাম, সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ সকলেই প্রায় অত্যন্ত সিরিয়াস হয়ে উঠেছেন। এই সময় হঠাৎ একটা বেয়াড়া ব্যাপার ঘটল। এক ভদ্রমহিলা নীরবে কি প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁর কাছে বিশ্বনাথ হেলতে দুলতে গিয়ে হঠাৎ 'হাম্বা' করে উঠলো। যেমনি করা অমনি মহিলাটি 'ওগো, আমার কি হবে গো, আমার কি সর্বনাশ করে গেলে গো—' বলে চীৎকার করে কেঁদে উঠে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। জনতা হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল তাঁর উপর, চারিদিকের লোক ছুটে এল। ব্যাপার কি ? সঙ্গে তাঁর আরও যে দু-একজন মহিলা আছেন তাঁরা বললেন, মহিলাটির স্বামীর নাকি খুব অসুখ। বোঝা গেল, তিনি তাঁর স্বামীর অসুখ সারবে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিশ্বনাথ হাম্বাধ্বনি করে কেলেঙ্কারী করেছে। পার্শ্বরক্ষী ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি ম্যানেজ করে নিলে, তা না হলে তারই ক্ষতি। কিছু ফুল বিল্বপত্র নিয়ে গিয়ে তাঁকে দিয়ে বললে, হাম্বার জন্যে ভয়ের কারণ নেই, এইটি ধারণ করাবেন, অসুখ সেরে গেলে একবার স্বামীর সঙ্গে কাশী গিয়ে বিশ্বনাথের পুজো দেবেন। যাই হোক, কোনরকমে তিনি ঠাণ্ডা হয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বিশ্বনাথের চারপায়ের ধূলো নিয়ে চলে গেলেন।

ভাবলাম, ব্যাপারটা চুকলো বুঝি। কিন্তু এরই মধ্যে যে আরও একটা ব্যাপার তলে তলে দানা বাঁধছিল তা কে জানে! আশেপাশে কয়েক ডজন ফুটপাথের গণৎকার ছিলেন। তাঁরা এসে একে একে ভিড়ের মধ্যে কখন দাঁড়িয়েছেন তা কেউ টের পায়নি। হঠাৎ তাঁরা বিশ্বনাথের পার্শ্ব-রক্ষীর উপর চড়াও হলেন। বললেন—জোচ্চুরির জায়গা পাও না, নিজের

দেশে যাও, কেটে পড় শীগ্‌গির ! জিনিসটা আমার খুব ভাল লাগল না। এটা প্রাদেশিকতা নয় কি ? আসলে ফুটপাথের গণৎকারদের গোঁসার কারণ হচ্ছে, তাঁদের সেদিন এক পয়সাও রোজগার হচ্ছে না, চারপেয়ে ষাঁড় বিশ্বনাথ সব লুটে নিচ্ছে। এই হিংসে আর প্রাদেশিকতা, দুটোই বর্তমান অবস্থায় আমার ভাল লাগল না। বুঝলাম আর নিস্তার নেই। ঠিক তাই হল। দেখতে দেখতে গণ্ডগোল জমে উঠল। দুই দলে ভাগ হয়ে গেল জনতা। একটি গো-জ্যোতিষী বিশ্বনাথের দল, আর একটি নর-জ্যোতিষীদের দল। সেই 'গো' আর 'নর'—যার শব্দরূপ বিদ্যাসাগরের উপক্রমণিকা থেকে মুখস্ত করতে প্রাণ বেরিয়ে গেছে স্কুলে। আজ বুঝি তারই ঠেলায় রাস্তাতেই প্রাণ যায়।

প্রচণ্ড বচসা, তর্কবিতর্ক থেকে হাতাহাতি শুরু হল। ভিড়ের ভিতর থেকে বিশ্বনাথের একজন ভক্ত জোর গলায় বলছেন: 'ভারী রওয়াব দেখাচ্ছেন যে! কি জানেন মশাই। আমাদের দেশে যে সব গরু ছিল তারা কি না করতে পারত? গরুর ইতিহাস আপনি কি জানেন?' একজন বক্তৃতা শুনে বললে খুব সিরিয়াস্‌লি, 'তা ঠিক! সে যুগ নেই, সে সব গরুও নেই, মানুষ তো নেই-ই!' আরও একজন বললেন: 'খুব যে গো-বিশারদ মশাই?' উত্তেজনা চড়তে লাগলো। তারপর যা হয়ে থাকে তাই হল। ঠেলাঠেলি ধাক্কা-ধাক্কি থেকে মারামারি রীতিমত আরম্ভ হয়ে গেল। কে একজন ছোক্‌রা কোথা থেকে একটা বাঁশ নিয়ে এসে 'মার ব্যাটাকে' বলে মারবি তো মার সোজা এক ঘা বাঁশের বাড়ি বিশ্বনাথের পিঠের উপর বসিয়ে দিলে। বিশ্বনাথ শূন্যে একটা লাফ দিয়ে হাম্বা করে উঠে সেই যে শিঙ নিচু করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করল, কার সাধ্য তাকে থামায়!

বাঁশ পর্যন্ত গড়িয়েছে দেখে আমি অবশ্য আগেই ছুটতে আরম্ভ করেছিলাম। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ পিছন ফিরে দেখি, বিশ্বনাথ শিঙ নিচু করে আমারই পিছনে ছুটছে। বিশ্বনাথের মাহাত্ম্যের কথা যাঁরা জানতেন, অথচ পরের ঘটনার খবর তখনও পাননি, তাঁরা অনেকেই দূরে ছিলেন। আমার এই অবস্থা দেখে তাঁরা ভাবলেন, নিশ্চয়ই আমি কোন প্রশ্ন করে

ছুটে পালাচ্ছি, বিশ্বনাথ তার জবাব দেবার জন্যে আমাকে তাড়া করেছে। শুনতে পাচ্ছি, তাঁরা চীৎকার করে বলছেন—দৌড়চ্ছেন কেন, দাঁড়ান মশাই! এক গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে রেহাই পেলাম। বিশ্বনাথ তখনও দৌড়চ্ছে।

ভাগ্যগণনার ভাগ্যফল শেষে এই হল ভেবে হতাশ হলাম। অবাঙালীরা যদি গরু নিয়ে এসেও বাঙালীর ভবিষ্যৎ ভাগ্যগণনা করে, তাতে গরুর কি দোষ? বেচারী বিশ্বনাথ!

ভূতনাবানো

মানুষের চেয়ে ভূত সম্বন্ধে মানুষের চিরদিনই কৌতূহল বেশি। বাবা ছেলেবেলায় কি করেছিলেন তা শোনার চেয়ে, ঠাকুরদাদা ভূত হয়ে কি সব তাজ্জব ব্যাপার করেছিলেন তা শুনতে আমাদের অনেক বেশি ভাল লাগে। মানুষ 'ভূত' হবার আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে ইন্টারেস্টিং হয় না। বাপ-মা যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকেন ততদিন তাঁদের প্রতি যেটুকু ভক্তিশ্রদ্ধা থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি ভক্তিশ্রদ্ধা তাঁরা পান মরে গিয়ে ভূত হলে। জ্যান্ত বাপকে থোড়াই কেয়ার করেন এরকম স্বাধীনচেতা ছেলেপিলের অভাব নেই আজকাল, কিন্তু মৃত বাপের প্রেতাত্মাকে ভয় করেন না, এরকম দুরাত্মার সংখ্যা আজও আমাদের দেশে বিরল। এ-দেশে আজও মানুষের আদর নেই, ভূতের আদর বেশি। মানুষ হয়ে মানুষের সমাজ সম্বন্ধে কোন উৎসাহ আমাদের নেই, অথচ ভূতপ্রেতের ভৌতিক সমাজ সম্বন্ধে সবকিছু জানবার ও বুঝবার আগ্রহ আমাদের অদম্য। তাই মধ্যে মধ্যে মনে হয় যদি মানুষ না হয়ে ভূত হতাম! তাহলে খাওয়া-পরার ভাবনা তো থাকতই না, লোকের কাছ থেকে সমাদরও পেতাম বেশি

আপনি সম্পাদক শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক, গায়ক, অভিনেতা যাই হন না কেন, যতদিন না 'ভূতপূর্ব' হচ্ছেন, অর্থাৎ ভূত হচ্ছেন ততদিন আপনি লুকানো মানিকের মতো সমুদ্রের তলায় তলিয়েই থাকবেন। সুতরাং সেইদিনই অপেক্ষা করুন যেদিন আপনি ভূত হবেন। মনে করবেন না, ভূতের শুধু ভূতই আছে, কোন বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নেই। ওটা আপনার ভুল ধারণা। ভূতের মতো উজ্জ্বল 'ভবিষ্যৎ' মানুষের নেই, কোনকালে ছিল না। যা কিছু জীবনে ভোগ করবার তা মানুষ একপুরুষ ভোগ করে, ভূত ভোগ করে সাতপুরুষ থেকে চোদ্দপুরুষ পর্যন্ত। তা ছাড়া মানুষ মরে, কিন্তু ভূত মরে না। মানুষ যেদিন থেকে সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যত মানুষ জন্মেছে তারা অধিকাংশই মরে ভূত হয়েছে। মানুষের সংখ্যা আজ যদি দু'শ কোটি হয়, তাহলে ভূতের সংখ্যা অন্তত ধরুন দশ হাজার কোটি। আমাদের দেশে সেই অনুপাতে যদি চল্লিশ কোটি মানুষ হয়, তাহলে ভূতের সংখ্যা অন্তত দু-হাজার কোটি। অবশ্য 'লোক-গণনার' মতো 'ভূতগণনা' কখনও করা হয়নি, তাহলেও এ হিসেবটা খুব বেশি নয়। ভূত আজ পর্যন্ত কতজন লোকের স্কন্ধে চেপেছে বা ঘাড় মুটকেছে তারও কোন হিসেব নেই ; তবে এইটুকু বোঝা যায় যে সাধারণত ভূতেরা যদি শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রকৃতির না হত, ভূত আর মানুষের মধ্যে যদি কাঁধে চাপাচাপি, ঘাড় মোট্কামুট্কি লেগেই থাকত, তাহলে মানুষের পক্ষে বসবাস করা মুশকিল হত। মানুষের তুলনায় ভূতের সংখ্যাধিক্যের কথা ভাবলেই সেটা যে কেউ বুঝতে পারবেন।

সুতরাং আমাদের দেশে ভূতের সমস্যা বলে একটা সমস্যা আছে এবং সেটা মানুষের সমস্যার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেইজন্যই মানুষের ডাক্তারের চেয়ে এদেশে ভূতের ওঝা একসময় বেশি ছিল। রোগব্যাধির ব্যাপারটাই ছিল ভূতে পাওয়া, সুতরাং ডাক্তারের চেয়ে ওঝা বেশি তো থাকবেই। আজ অবশ্য ডাক্তার কিছু হয়েছে, রোগেরও নামকরণ হয়েছে অনেক, কিন্তু ভূত বা ওঝা কোনটাই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। ভূতনাবানো বা ভূতচালা একসময় আমাদের দেশের লোকের একটা মস্তবড় পেশা ছিল, অথচ কোন সেন্সাস রিপোর্টে তার কোন রেকর্ড নেই।

এবারের লোকগণনাতে এর মধ্যেই গণনাকারীরা নানারকমের সব বিচিত্র 'পেশা' বা অকুপেশনের খবর পাচ্ছেন। ভূতনাবানোও যে একটা বড় পেশা এদেশে, সেকথা যেন তাঁরা গণনার সময় ভুলে না যান। 'কি করেন?' প্রশ্ন করলে অনেকে হয়ত ভয়ে বলবে 'ডাক্তারী' করি, কিন্তু সবক্ষেত্রেই যেন তাঁরা 'ডাক্তার' না লিখে নেন। তাতে ডাক্তারের সংখ্যার একটা ভুল হিসেব নেওয়া হবে। একটু জেরা করলে এবং অভয় দিলেই দেখবেন অনেকে 'কি করেন' প্রশ্নের উত্তরে বলবে 'ভূত নাবাই।' পেশা বা বৃত্তি হিসেবে সেটা লিখে নিতে কোন সংস্কার বা সঙ্কোচ থাকা উচিত নয়! ভূত যখন আছে এবং ভূত ঘাড়ে চেপে যখন বাস্তবিকই নাস্তানাবুদ করে, তখন ঘাড় থেকে সেই ভূত নাবানোর জন্যে লোকও তো থাকার দরকার। ভূতের সংখ্যা এমনিতেই অনেক বেশি, ইচ্ছে করলে তারা দু-চারজন করে এক একটা মানুষের ঘাড়ে চাপতে পারে এবং যদি চাপে তাহ'লে গোটা দেশটার অবস্থা কি হবে একবার কল্পনা করুন। সকলেই আমরা নাকী সুরে কথা বলব, মৃগী রুগীর মতো মুখ থুবড়ে পড়ে হাত-পা খেঁচবো, আঁচড়াব, কামড়াব, ভেঙেচুরে তছ্‌নছ্‌ করব। পুলিশে লাঠি চালিয়েও অত ভূত ঝাড়াতে পারবে না। সুতরাং ভূতনাবানো ওঝার দরকার বৈ কি! অকুপেশন হিসেবে সেটা মন্দ কি? যথেষ্ট পেইং, অন্তত অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা, গবেষণা বা চাকরিবাকরির চেয়ে তো নিশ্চয়ই ভাল। সুতরাং ভূতনাবানোও যে একটা অনরেবল পেশা এবং সে-পেশা আমাদের দেশের অনেকের আছে, সেকথা যেন সেন্সাসকর্মীরা মনে রাখেন।

ভূতনাবানোর একটা গল্প বলি। গল্পটা আমার নয়, হুতোমপেঁচার। কলকাতার এক অবস্থাপন্ন লোকের বাড়িতে একজনের একবার কঠিন অসুখ হয়। তিন বছর ধরে ডাক্তার, বৈদ্য হাকিম সকলে চেষ্টা করেও কিছু করতে পারলে না। অসুখ বেড়ে যাচ্ছে দেখে বাড়ির মেয়েরা তুলসী দেওয়া, কালীঘাটে সস্তেন, কালভৈরবের স্তব পাঠ, তুক্‌তাক সাফরিদ নারাণ, মুলপুর হালুমপুর প্রভৃতি বিখ্যাত জায়গায় চন্নামেত্তো ও মাদুলি ধারণ, তারকেশ্বরে হত্যে—সব দিতে ও করতে আরম্ভ করল। শেষে একজন ভূতচালা আনা হল। ভূতনাবানো ওঝা চণ্ডীমণ্ডপে বসলেন,

ভূত আসবার প্রোগ্রাম স্থির হল। ওঝার সঙ্গে দুটি চেলা মাত্র, ঘরে প্রায় জনচল্লিশ ভূত দেখবার জন্যে উপস্থিত। ভূত প্রথমে আসতে অস্বীকার করল। শেষে ঘরের আলো নিবিয়ে দেওয়া হল, মিঠাইমোণ্ডা সাজানো খাবারের থালা দেওয়া হল, তবে ওঝা ভূত আনতে রাজী হলেন। চেলারা খাবার থালা ঘেঁষে বসলেন, দরজায় হুড়কো পড়ল, ওঝা কোশাকুশি ও আসন নিয়ে শুদ্ধাচারে ভূত ডাকতে বসলেন, বাকি দর্শকরা ভূতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। ওঝা খানিকক্ষণ ডাকতে ডাকতে ভূতের আসার পূর্বলক্ষণ দেখা গেল—গোহাড়, ঢিল, জুতো, ভাঙা হাঁড়ি চারিদিকে পড়তে লাগলো, ঘরের ভেতর কে যেন গুম্‌গুম্ করে নাচতে শুরু করল। হঠাৎ মড়াস্ করে একটা শব্দ হতেই দেখা গেল ভূতের বসবার জন্যে যে পিঁড়িখানা ছিল সেটা চৌচির হয়ে ভেঙে গেছে। ওঝা গম্ভীর স্বরে বললে—শ্রীযুক্ত ভূত এসেছেন। ভূত এসেই খোনা কথা কইতে লাগলেন, দু-একজনের নাম ধরে ডেকে গালগাল দিলেন, ভয় দেখালেন। তারপর ফলার খাবার হাপুরহুপুর শব্দ হতে থাকল। ভূত জলযোগ সেরে তামাক খাচ্ছেন, এমন সময় ভীষণ বমির শব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে দেখা গেল ওঝা ও তাঁর চেলা দু-জন অনর্গল বমি করছেন। কে একজন মেডিকেল কলেজের ছাত্র নাকি সকলের অগোচরে ভূতের খাবারের মধ্যে 'টারটামেটিক' মিশিয়ে দিয়েছিল। ব্যাপারটা দেখে সত্যিই শেষ পর্যন্ত ভূত নেবে গেল, একজন ভূতেপাওয়ার ঘাড় থেকে নয় শুধু, সকলের ঘাড় থেকে।

এ আজ অনেক দিনের কথা। কিন্তু বিশ-পঁচিশ বছর আগেও কলকাতা শহরে অসংখ্য ভূত নাবানো দেখেছি, এক-আধটা নয়। তখনও কলকাতা শহরে ভূতে পাওয়ার যেন একটা মরশুম ছিল। ইদানীং ভূতের দৌরাত্ম্য একটু কমেছে বলে মনে হয়, কিন্তু সেটা বাইরে থেকে। কলকাতার আনাচেকানাচে অলিগলিতে এখনও ভূতের সংখ্যা অল্প নয়। এখনও অনেক জায়গায়, অনেক বাড়িতে ভূত নাবানো হয়, তবে আমরা খবর পাইনে। ভূতনাবানো পেশা আজও কলকাতার মতো শহরেই অনেক লোকের আছে, গ্রামাঞ্চলে তো কথাই নেই। লোকগণনার সময় এর

একটা হিসেব করলে আপত্তি কি ? মানুষের চেয়ে ভূতের, ডাক্তারের চেয়ে ওঝার সংখ্যা আমাদের দেশে এখনও অনেক বেশি, অথচ সেন্সাসের সময় তাদের উপেক্ষা করা হয় কেন ?

ডাকপিওন
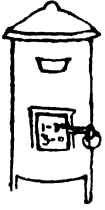
'প্রভাতে ছুটিয়া আসি অপরাহ্ণে ছুটে যাই আমি, পুলিন্দা বহিয়া'—তারই ডাকনাম হল ডাকপিওন, না ডাকতেই যে রোজ আপনার দরজা দিয়ে ঘুরে যায়, প্রায়ই ডাক দিয়ে যায় আপনাকে, যার নাম আপনি জানেন না, জানবার দরকারও বোধ করেন না, অথচ আপনার নাম জপ করে যার সারাদিন, সারাটা জীবন হয়ত কেটে যায়, আপনারই বোঝা কাঁধে নিয়ে দীর্ঘ দগ্ধ রাজপথে যার 'দুর্ভর পদক্ষেপ পড়ে অবিরত', যার ব্যস্ত ত্রস্ত ছোটাছুটি দেখে আপনি হয়ত জানলার পাশে বসে পথের দিকে চেয়ে ভাবেন, 'কে ছুটে রে, কী আশার টানে ?' এবং কথা বলবার সময় নেই, তবু যে মনে মনে বলে 'আমার সময় নাই, ভেবে নিতে—কেন ছুটে যাই, কিসের সন্ধানে !' তারই নাম ডাক-হরকরা, কলকাতা শহরের পিওন, আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী বিরাট ডাকবিভাগের অতি ক্ষুদ্র নগণ্য পদাতিক। আপনি কি চেনেন তাকে ? বোধহয় চেনেন না, নাকেমুখে গুঁজে আফিস যাবার তাড়ায় চিনবার সময়ই বা কোথায় আপনার ? কিন্তু জিজ্ঞাসা করুন বাড়ির প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে, মা মাসি পিসি স্ত্রীকে,

তারা সকলেই তাকে চেনে, একান্ত আপনার জনের মতন ভালবাসে, না দেখলে উন্মনা হয়। তিনশ তেত্রিশ মাইল দূরের এক পল্লীগ্রাম থেকে আপনারই কোন প্রিয়জন কতদিনের গুমুরে থাকা কত কি মনের কথা ইনিয়েবিনিয়ে হিজিবিজি অস্পষ্ট অক্ষরে লিখে দিল ছোট্ট এক টুক্‌রো কাগজের উপর পান্‌সে কালিতে। তারপর লেখক নিশ্চিন্ত. লেখা চলল খানা ডোবা নদী ডিঙ্গিয়ে, ডাকহরকরার পিঠের উপর ঘুমিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম, মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে। পদাতিক পথ চলে বোঝা নিয়ে, গ্রাম্য পথ, 'মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু উড়ায় বিদগ্ধ বালুকণা', তবু বটের ছায়ায় বিশ্রাম নেবার সময় নেই, অনর্গল ধারায় ঘাম ঝরে পড়ে, দুই হাত পিঠের বোঝায় মুষ্টিবদ্ধ, কপালের ঘাম মুছে ফেলার তৃতীয় আর কোন হাত নেই। ছুটে গিয়ে কালকের ভোরের মেইলে বোঝা নামিয়ে দিতে হবে। শুধ্ 'রাত্রি যেথা ছেয়ে আসে একটানা লয়ের মতন ছন্দতাল হীন, পুলিন্দা নামায়ে সেথা একবার' হয়ত মুছিবে ললাট ঘর্মাক্ত মলিন।' তারপর সেখানে যে নতুন বোঝা বাঁধা পড়ে রয়েছে সেটা আবার কাঁধে তুলে নিয়ে, ভোর রাতে নৌকা খুলে নদী পার হয়ে মেইল ধরতে ছুটে যাবে। চিঠি আসবে কলকাতা শহরে। লক্ষ লক্ষ চিঠির সঙ্গে কলকাতার পিওনের ঝোলায় গিয়ে পড়বে সেই চিঠি। তারপর কত 'বাবাজীবন দীর্ঘজীবেষু', কত 'প্রাণের প্রিয়তম' বিরাট কলকাতা শহরের আনাচে-কানাচে, কত গলিঘুপ্‌চিতে কোথায় মাথা গুঁজে পড়ে আছে কে জানে? কেউ জানে না, পৃথিবীর আর কেউ না, শুধু একজনই জানে, ডাকবিভাগের ঐ অক্লান্ত পদাতিক, কলকাতার পিওন। পিচ্‌তাতা খোয়াওঠা রাজপথে হেঁটে হেঁটে গলির গোলকধাঁধায় ঘুরে ঘুরে মুখথুবড়ানো মাঠকোঠায়, সেই কুঁজওঠা কদাকার বস্তির কোন উনপঞ্চাশ বর্গফুট ঘরে, অথবা কোন্ নিম্নমধ্যবিত্ত পাড়ায় কোন ভাড়াটে বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, কার 'বাবাজীবন' আর কার 'প্রিয়তম' থাকে না থাকে, সেই খুঁজে বার করবে। খুঁজতেও হবে না, সবই তার খোঁজ জানা, সবই তার নখদর্পণে। এদের সবারই জীবনের সুরের সঙ্গে তার জীবনটাও যেন একসুরে বাঁধা! তাই কি সে সবাইকে চেনে? কে জানে! কিন্তু তাকে তো জানে না কেউ।

যে বোঝা সে বয়ে নিয়ে আসে, শুনেছি তার মধ্যে কত নূতন বারতা, 'কত বিরহের শাস্তি, হৃদয়ের কত না স্পন্দন, মিলনের কথা', কত কি আছে! কতজনের মনের বোঝা সে হাল্কা করে দিয়ে চলে যায়, কিন্তু সেই বোঝার ভারে তার মনটা ভারি কি না, কই কেউ তো তার মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখে তা বুঝতে চায় না! শহরের লোকের সময় নেই চেয়ে দেখবার, পিওনেরও সময় নেই ছু-দণ্ড দাঁড়াবার; ব্যস্ত হয়ে চলে যায়। কিসের ব্যস্ততা, কার জন্যে ব্যস্ততা? সে বলবে 'জানি না—শুধু জানি, যেতে হবে।'

রাধানাথ এমনি হাজার পিওনের মধ্যে একজন, এ-পাড়ায় সে আজ থেকে নয়, বাবা-খুড়োর আমল থেকে পিওনগিরি করছে। বাবাখুড়োদের যখন যৌবন ছিল, যখন প্রথম তাঁরা কলকাতা শহরে আসেন, তখন থেকে তাঁদের জীবনের অনেক 'রোমান্স', অনেক 'অ্যাডভেঞ্চারে'র কাহিনীর আদানপ্রদান করছে রাধানাথ। তারপর বাবাখুড়োদের বিয়ে হয়েছে, বরানুগমন না করলেও মিষ্টিমুখ করেছে রাধানাথ, আমরা জন্মেছি, রাধানাথ সন্দেশ খেয়েছে, চিঠির থলের মধ্যে করে ঝুম্‌ঝুমি কিনে এনেছে। সেই ঝুম্‌ঝুমি বাজিয়ে আমরা বড় হয়েছি, আমাদেরও যৌবন এসেছে, রোমান্স করার সময় হয়েছে, বারান্দায় পায়চারী করে রাধানাথের প্রতীক্ষায় দিন কাটিয়েছি, মনের বোঝা রাধানাথ হাসিমুখে এক চিঠিতে হাল্কা করে দিয়েছে। দেখেছি রাধানাথ সকলেরই সমান আত্মীয়, আপনার জন। রাধানাথের আসবার সময় হলেই ছেলেমেয়েরা, বাড়ির মহিলারা সকলেই দরজায় বা জানলার ধারে এসে দাঁড়াত, হাসিমুখে যার যার চিঠি বিলি করে, কুশল জিজ্ঞাসা করে রাধানাথ চলে যেত। তারই মধ্যে সে যেন চোখ বুলিয়ে দেখে নিত কার খবর এল না, কার মনে কিসের ছুশ্চিন্তা জমে রয়েছে। কোন বয়স্কা মহিলা হয়ত ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করেছেন: 'কোন খবর নেই বাবা?' চিঠি না, একেবারে খবর, রাধানাথ যেন সকলের সব খবরও জানে। খবর না থাকলে রাধানাথ বলেছে: 'না মা, খবর নেই। তাতে কি, কিচ্ছু ভাববেন না, ভাল খবরই আসবে মা—' বলে চলে গিয়েছে। কারও

নতুন নাতি হবার সংবাদ, কারও বিয়ের শুভ-সংবাদ, কারও চাকরির সংবাদ, কারও আরোগ্যের সংবাদ, কারও পরীক্ষায় পাসের সংবাদ, ইত্যাদি বহন করে এনেছে রাধানাথ, মা মাসিরা যত্ন করে ডেকে দুটো নারকেলের নাড়ু দিয়ে এক গেলাস জল খেতে দিয়েছেন, রাধানাথ সেই একই হাসি-মুখে খেয়ে চলে গেছে। পাড়ায় কারও বাড়িতে অন্নপ্রাশন হোক, বিয়ে হোক, পুজো হোক, নিমন্ত্রিতের মতন না এলেও রাধানাথের বরাদ্দ খাবার ভাঁড়ার ঘরে ঠিকই মজুত থাকে, পরের দিন রাধানাথ ঘড়ির কাঁটা ধরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা বিলি হয়ে যায়। একদিন দু-দিন নয়, ক্রমাগত ত্রিশ বছর ধরে রাধানাথের আনাগোনা এ-পাড়ায়। এতগুলি মানুষের সংসারের সুখদুঃখ, হাসিকান্নার সঙ্গে রাধানাথ এমনভাবে জড়িত ছিল যে, পেন্সন নেবার পরেও মধ্যে মধ্যে এসে সকলের কুশল শুধিয়ে না গেলে রাধানাথের যেন রাতে ঘুম হত না। শহরের বড়লোক যাঁরা, বাড়ির বাইরে তাঁদের নাম ডিগ্রী খেতাব পদবী খোদাই করা 'লেটার বক্স' আছে। সে সব বড় বড় বাড়িতে কাঠের সেই চিঠির বাক্সের সঙ্গেই রাধানাথের সম্পর্ক, ভেতরের মানুষের সঙ্গে নয়। ছোট ছোট হাজার বাড়ির অভাবগ্রস্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের ডাকপিওন রাধানাথ, বাইরে যাদের চিঠি ফেলার কাঠের বাক্স নেই, কাঠখোট্টা দারোয়ানও নেই দাঁড়িয়ে। নিজেরাই যারা উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দরজা খুলে বা জানলার ধারে, রাধানাথের পায়ের শব্দ, গলার স্বর, আর আসার সময়ের সঙ্গে তাদের নাড়ির যেন যোগাযোগ রয়েছে। কোথায় কার দরজার তলা দিয়ে, জানলার ফাঁক দিয়ে চিঠি গলিয়ে দিতে হবে, কোন্ অসহায় গৃহস্থের ছেলেমেয়ের নাম ধরে ডেকে হাতে দিতে হবে চিঠি, সবই তার জানা। এ চিঠি হারাবার উপায় নেই। সে জানে এই হিজিবিজি আঁচড় টানা একখানা পোস্টকার্ডের মূল্য কি, লেটার বক্সের চিঠির সঙ্গে এ-চিঠির তফাৎ কোথায়? তাই একখানা কালি-লেপা, ভুল ঠিকানা লেখা পোস্টকার্ড নিয়ে ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে গেলেও সে হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত না হয়ে যাবে না। ছোট ছেলেমেয়ের হাতে দিয়েও 'মাকে দাও গে' 'বাবাকে দাও গে' বলে দিতে সে ভোলে না।

এই হল আমাদের পিওন, ডাকবিভাগের পদাতিক। ভুলেও এর উপর রাগ করবেন না কোনদিন, কোন অভিযোগ করবেন না এর বিরুদ্ধে। সততা ও নিষ্ঠার এ রকম প্রতিমূর্তি জীবনের আর কোন ক্ষেত্রে সচরাচর দেখতে পাবেন না। ভুল করে সে যদিও বা কোনদিন আপনার চিঠি অন্যের জানলায় গলিয়ে দিয়ে যায়, তাহলেও তার ওপর মেজাজ দেখিয়ে খুশি হবেন না। ভুল ঠিকানা লেখা আপনারই চিঠি যখন সে শুধু নামটি দেখে আপনাকেই ঠিক পৌঁছে দিয়ে যায়, তখন কি তার জন্যে কোনদিন তাকে একটা ভাল কথা বলেছেন? বোধহয় না। মাগ্‌গীভাতার জোরেও আপনার সংসারের রথ ঠেলা সম্ভব হচ্ছে না বলে হয়ত আপনার মেজাজ খারাপ, মন খারাপ, সবই বুঝি। কিন্তু তবু ঐ যে পিওনটি আপনাদেরই বোঝা কাঁধে করে রোজ আনাগোনা করে, ওরও যে একটা সংসার আছে, পরিবার আছে, সে কথা জানেন কি? আপনার চাকা যদিও বা চলে তার চাকা চলে না, আপনার বোঝা যদিও বা কখন হাল্কা হয়, তার বোঝা প্রতিদিনই বাড়ে। এই আমাদের পিওন—সকলের সংবাদ যে বুকে করে বয়ে নিয়ে যায়, অথচ যার কোন সংবাদ কেউ কোনদিন রাখে না, কেউ কোনদিন জানে না।
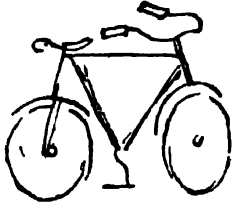
বাইসাইক্লিক জীবন

সকালে বিকেলে
শোভি 'বাই-সিকেলে' !
আমি কভু তার 'পরে
সে কভু আমাতে চড়ে,
রাখি এ জীবনটারে এ ওরে ঠেলে !

'The world is divided into two classes. Those who ride bicycles and those who don't—'

এটা ইংরেজদের ঘরোয়া কথা ছিল এককালে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের কথা বলছি। ঠিক কোন্ সময় থেকে আমাদের দেশে বাইসাইকেলের চড়া চালু হয় বলতে পারব না, মনে হয় বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে। গত শতাব্দীর শেষ দিকে 'সেফ্‌টি' বাইসাইকেল তৈরি হয় এবং তারপর এই সাইকেল, জনৈক বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিকের মতে—

'It took its place as an instrument of the new freedom as we glided forth in our thousands into the country, accompanied by our sisters and sweethearts and wives, the great novelty was the woman cyclist, the new woman rampant···'

অর্থাৎ একসময় ইংলণ্ডের মতন দেশে এবং সেটা বেশিদিনের কথা নয়, মাত্র বছর ষাট-সত্তর আগে, বাইসাইকেলই নূতন স্বাধীন জীবনের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। কল্পনা করুন, হাজার হাজার ইংরেজ তাদের প্রিয়তমাকে সাইকেলের পিছনে বসিয়ে স্বাধীন জীবনের মুক্ত ফুরফুরে

হাওয়া খাবার জন্যে বেরিয়েছে—মেয়েরা বেরিয়েছে পুরুষদের কেরিয়ারে নিয়ে—

দো-চাকা দাঁড়ে,
ওরা ঘাড় নাড়ে,
পন্ পন্ চ'লে যায়,
পড়ে-পড়ে সামলায়,
সাইক্লিক জীবনের সুখে শিশ্ মারে!

বাস্তবিকই, মোটরই হোক, আর বিমানই হোক, বাইসাইকেলের মতন মানুষের জীবনের এমন নিখুঁত গতিশীল প্রতিমূর্তি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। আমার মোটর নেই এবং বিমানে কোনদিন উড়বার আশা নেই বলে একথা বলছি না। চলতে শিখেছিল মানুষ পা চালিয়ে এবং হাত দুলিয়ে। ওরাং শিম্পাজীরা খুব বেশি মাত্রায় হাত দোলাত দেহের ভার রাখার জন্যে। আমাদের অতটা দোলাতে হয় না, কারণ মেরুদণ্ড সোজা হওয়ার ফলে আমরা সহজেই ব্যালান্স রাখতে পারি। তবু আমাদের হাত একটু নাড়তেই হয়, পা তো চলেই। দু-চারজন স্থূলকায় বক্রগর্দান ব্যক্তিকে আজও যখন আমাদের মধ্যে হুবহু শিম্পাজীর মতন চলতে দেখা যায়, তখন এক মুহূর্তে চোখের সামনে গোটা ইভলিউশন ও লোকোমোশনের ইতিহাসটা ভেসে ওঠে। মানুষের লোকোমোশনের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো, অর্থাৎ পা চালানো, হাত নাড়া ইত্যাদি, সম্পূর্ণ বজায় রেখে, মানুষকে যতখানি চলমান ও গতিশীল করা যায়, বাইসাইকেল তাই করেছে। মোটরে পা অচল, বিমানেও তাই, কিন্তু বাইসাইকেলে পা চলে তাই, মানুষও চলে। মোটরে ও বিমানে তাই অহম্-বোধ লুপ্ত হয়ে যায়, মনে হয় আমি চলছি না, যন্ত্র চলছে, যন্ত্র উড়ছে, যন্ত্রকে চালাচ্ছি, নিজেকে চালাচ্ছি না। সাইকেলে তা মনে হয় না, কারণ সেই সনাতন পা চলে তাই সাইকেল চলে, অথচ চলার গতি শতগুণ বেড়ে যায়। সুতরাং মুক্ত জীবনের প্রতীক সাইকেল তো হবেই! সেই দু'খানা পায়ের মতন দু'টি চাকা, মানুষের পায়ের সঙ্গে তার সবসময় যোগাযোগ রয়েছে, পা চলছে বন বন করে তাই সাইকেলের পিঠে

মানুষও চলছে হাওয়ার বেগে। 'ইন্‌ডিভিডুয়াল ইন্‌ মোশান' এই হল বাইসাইকেল। সুতরাং সাইকেলই মানুষকে জীবন্ত ও চলন্ত ব্যক্তি হিসেবে মুক্তি দিয়েছে এবং মাটির উপর সাইক্লিক জীবনের থ্রিল আকাশপথে বিমানকেও হার মানিয়েছে।

সাইক্লিক জীবন সম্বন্ধে এই দার্শনিক লেকচারটা সেদিন ভজহরিবাবু আমাকে শুনিয়ে দিলেন। জন্ম থেকে এই কলকাতা শহরে ভজহরিবাবুকে দেখছি, কিন্তু সাইকেল ছাড়া কোনদিন তাঁকে দেখিনি। বাইরের সাইকেল দেখলেই বোঝা যায় ভজহরিবাবু কোন রেস্টুরেন্টে, ডাক্তারখানায় বা কারও বাড়িতে ঢুকেছেন কি না! বাজারের থলিটি হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে রোজ তিনি সাইকেল করে বাজার থেকে ফেরেন। ঝড় বাদল যাই হোক, আফিসেও ঐ সাইকেল করেই আসা চাই। শহরের রাজপথে ট্রাফিকের জোয়ারের মধ্যে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন তাহ'লে তার মধ্যে রিক্‌শা ঠেলাগাড়ি বাস ট্রাম মোটর ইত্যাদির ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে হঠাৎ দেখবেন ভুস করে সাইকেলের পিঠে ভজহরিবাবুর মাথাটা একবার ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে গেল। সাইকেল নেই, ভজহরিবাবু আছেন, এ রকম কোন অবস্থা কল্পনা করা যায় না। বিয়ের বরযাত্রী হলেও, সকলেই জানেন সাইকেলে যাবেন তিনি। বিপন্ন কোন প্রতিবেশীর শ্মশানযাত্রী হবেন, তাও ঐ সাইকেলে। নিজে জীবনে ট্রামে বাসে যা চড়েছেন তা বউ ছেলেমেয়েদের জন্যে বাধ্য হয়ে, তাও অবশ্য প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে পাঁচবার কিনা সন্দেহ। হোক না শ্বশুরবাড়ি, তবু সাইকেলে যাওয়া কোনরকমে ম্যানেজ করতে পারলে তিনি বাসে ট্রামে বা চাকায় কিছুতেই যাবেন না। জীবনে প্রথম 'ডিফীট' তিনি স্বীকার করেন তাঁর নিজের বিয়ের দিনে। আগে থেকে সাইকেল ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে ভজহরিবাবু ভেবেছিলেন যে, কোল-বরকে কেরিয়ারে চাপিয়ে নিয়ে তিনি সাইকেলেই বিয়ে করতে যাবেন এবং তার পিছনে পিছনে জন কুড়ি বন্ধুবান্ধব প্রত্যেকে কেরিয়ারে ও সীটের সামনের রডের উপর দু-জন করে যাত্রী নিয়ে বরানুগমন করবে। পুরুত ও নাপিতকে বরের সঙ্গে যেতে হয় বলে যখন কথা উঠলো, তখন ভজহরিবাবু বললেন:

'কুছ পরওয়া নেহি! হ্যাণ্ডেলের মাথায় বাচ্চা কোল-বর, সামনের রডে পুরুত এবং পিছনের কেরিয়ারে নাপিতকে বসিয়ে নিয়ে আমি স্বচ্ছন্দে যেতে পারব। পাঁচজনকে চাপিয়ে নিয়ে যদি কলকাতা থেকে বর্ধমান যেতে পারি, তাহ'লে তিনজনকে নিয়ে এক পাড়া থেকে আর-এক পাড়ায় বিয়ে করতে যেতে পারব না?' এটা যে ভজহরিবাবুর পাগলামি তা নয়, এটা তাঁর লাইফের প্রিন্সিপ্‌ল। তিনি বলেন: 'ও একদিনের মোটরচড়া আমি চড়তে চাই না! যা জন্ম থেকে চড়ে আসছি, এবং মৃত্যু পর্যন্ত চড়তে হবে, তাই চড়েই বিয়ে করতে যাব।' কিছুই বলবার নেই, তর্ক করেও কেউ তাঁকে কন্‌ভিন্স করাতে পারেন না। শেষকালে মা যখন কান্নাকাটি করতে আরম্ভ করলেন তখন তিনি মত বদলালেন। এই তাঁর সাইক্লিক জীবনের প্রথম পরাজয়। তারপর বহুবার তিনি নববিবাহিত বৌকে ফীটনে চড়িয়ে, নিজে সাইকেলে চড়ে 'ফলো' করেছেন এবং বুক ফুলিয়ে এইভাবে শ্বশুরবাড়ি গেছেন। সকলেই তাই জানেন যে, ভজহরিবাবুর সাইক্লিক জীবন সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত কড়া প্রিন্সিপ্‌ল আছে।

আমার সঙ্গে অনেকদিন পর ভজহরিবাবুর দেখা। দেখা হতেই বললাম: 'আপনার সেই সাইকেলটা ঠিক আছে তো!' তিনি বললেন: 'তা থাকবে বৈ কি! আমি যতদিন আছি, সাইকেলও আছে। Friends may come. and friends may go, but my cycle goes on for ever!' বলে একটু হেসে তিনি আমাকে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত ডেকে নিয়ে গেলেন। তাঁর ঘরে বসে আছি, আর তিনি সাইকেলের সেবা করছেন। সমস্ত সাইকেলটা ধুয়ে মুছে সাফ্‌ করে, বসে বসে চেনটা পরিষ্কার করছেন আর বলছেন: 'সাইকেলটা উঠে যাচ্ছে ভাই! এই সাইকেল যখন প্রথম কিনি তখন আশপাশের লোক ভিড় করে দেখতে এসেছিল। রাস্তা দিয়ে গেলে সাইকেলের পিছন পিছন ছেলেপিলেরা ছুটত। স্কুল-কলেজ সভাসমিতিতে গেলে সকলে রীতিমত খাতির করত সাইকেল-ওনার বলে। এখন কেউ ফিরেও তাকায় না, সকলে ভাবে বোধহয় হকার না হয় পিওন। আজকাল শুনেছি, মোটর না থাকলে নাকি তোমাদের লভ্‌টভ্‌

জমে না। আমাদের সময় বাইসাইকেলই ছিল 'লভে'র প্রধান বাহন। সাইকেল চড়ে যেতে যেতে কত বাড়ির সামনে গ্যাসপোস্ট ধরে দাঁড়িয়ে কত গোপন কথা জানলার ধারে বলে গিয়েছি, কত চিঠিপত্র বিলি করেছি, তার ঠিক আছে। মোটরে এ সব সম্ভব নয়, মোটর চোখে পড়ে, সাইকেল কারও নজরে পড়ে না। সাইকেলের একটা ব্যক্তিত্ব, একটা ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে, যা তোমাদের মোটরের নেই।' বলে তিনি হেসে ফেললেন। তারপর সাইকেলের চাকাটা হাত দিয়ে ঠেলে তুলে ধরে, প্যাডলটা জোরে ঘুরিয়ে দিয়ে, হাসতে হাসতেই বললেন: 'তা ছাড়া তোমার বউদিকেই জিগ্যেস করে দেখ না ভাই, বিয়ের আগে স্কুলে পড়ার সময় কতদিন এই সাইকেলের পিছনে বসে স্কুলে গেছে এসেছে....বলেই তিনি ক্রীং ক্রীং করে সাইকেলের বেল বাজালেন, বউদি এলেন। তাঁর দিকে চেয়ে ভজহরিবাবু বললেন: 'মনে পড়ে তোমার সেই ইংরেজী কবিতাটা, যেটা তোমায় মুখস্থ করার জন্যে উপহার দিয়েছিলাম?'

I'm half crazy all for the Love of you!
It won't be a styliysh marriage,
I can't afford a carriage,
But you'll look sweet,
Upon the seat
Of a bicycle made for two!'

বউদি লজ্জা পেলেন। আমি বুঝলাম, তাঁর কৈশোর জীবনে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, এই কলকাতা শহরেও লণ্ডনের মতন একটা সাইক্লিক যুগ ও বাই-সাইক্লিক মুক্ত জীবনের জোয়ার এসেছিল, আজ তাতে ভাঁটা পড়েছে। বাই-সাইকেলের বদলে এখন এসেছে 'জীপে'র যুগ, অটোমোবিলের যুগ।

ঘুমিওপ্যাথি

জীবন্ত লোক অনেক রকমের আছে, কিন্তু ঘুমন্ত লোক কতরকমের আছে জানেন কি? জীবন্ত লোকের চেয়ে ঘুমন্ত লোক অনেক বেশি উপভোগ্য, বৈচিত্র্যও তার বেশি, বিশেষ করে কলকাতার মতন বড় শহরে। জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত কলকাতায় যে কত রকমের ঘুম দেখেছি তার ঠিক নেই। ঘরে-বাইরে, রাস্তা-ঘাটে, বাসে-ট্রামে, আফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে, ছ্যাকরা গাড়িতে, রিক্‌শায়, এমন কি সাইকেলে পর্যন্ত সময়ে অসময়ে এতরকম ভঙ্গিতে ঘুম দেখেছি যে, তার একটা মোটামুটি বর্ণনা দেওয়াও এখানে সম্ভব নয়। একদিন দুপুরবেলা দেখি রাস্তার ফুটপাথের ধারে সাইকেলের উপর বসেই এক ভদ্রলোক গ্যাসপোস্টে হেলান দিয়ে বেশ দিব্যি ঘুমুচ্ছেন। গাড়ি-ঘোড়া লোকজন সবই চলেছে, অথচ ভদ্রলোকের কোন হুঁশ নেই দেখে কিছুক্ষণের মধ্যে দু-একজন করে কয়েকজন লোক জমে গেল। চাপা গণ্ডগোলে ভদ্রলোকের ঘুম ভেঙে যেতেই হঠাৎ ঝট্ করে সাইকেলটা ঘুরিয়ে রেসিং স্টাইলে এমনভাবে বোঁ করে তিনি বেরিয়ে গেলেন যে, সকলেই মুখচাওয়াচাওয়ি করে হতভম্ব হয়ে রইল। প্রকাশ্য রাজপথের উপর এই যে সাইকেলের পিঠে ঘুম দেখলাম, এই আমার ফার্স্ট ঘুম দেখা, ঘুমের মতন ঘুম এবং এর পর থেকে ঘুম সম্বন্ধে সচেতন হলাম। ঘুম এর আগে অনেক দেখেছি, কিন্তু সে সব হল 'ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসি'র ঘুম, 'ছেলে ঘুমুলো, পাড়া জুড়লো' ধরণের ঘুম, এরকম বাইসাইকেলী বনেদী ঘুম নয়। ঘুম সম্বন্ধে কৌতূহল জাগল, ঘুমন্তদের সন্ধানে রইলাম।

দেখলাম, ব্যক্তি হিসাবে প্রত্যেক জ্যান্ত মানুষের যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনি প্রত্যেক ঘুমন্ত মানুষের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। 'এক

কাতে ভোরওয়ালা' যাঁরা তাঁরা সুখী লোক, তবে তাঁদের সংখ্যা লাখে একটা কিনা সন্দেহ। সাধারণত ঘুমিয়ে পড়া মাত্রই ফর্মের একটা ইভলিউশন দেখা যায়, কাৎ থেকে চিৎ, চিৎ থেকে উপুড়, উপুড় থেকে কুকুরকুণ্ডলি, কুণ্ডলি থেকে কুমড়ো-গড়ানি, তারপর খাটে থাকলে মেঝেয়, আর মেঝেয় থাকলে দেওয়ালের গায়ে কুঁকড়ে একেবারে লেপ্‌টে যাওয়া—এই ধরনের একটা স্তরভেদ থাকে। এসব অহিংস প্রকৃতির ঘুম, এতে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই। হিংস্র প্রকৃতির কয়েকরকমের ঘুম আছে যা এত মারাত্মক যে তার আশেপাশে, কাছাকাছি, এমন কি ঘরে পর্যন্ত থাকাও রীতিমত রিস্কি। যেমনি ঘুম এল অমনি দমাদম্ হাত পা ছোড়া আরম্ভ হল, সোজা কিল, চড়, ঘুষি, লাথি একেবারে। দাম্পত্য জীবনে এই ধরনের ঘুমের জন্যে শুনেছি ইয়োরোপে নাকি ডিভোর্স পর্যন্ত হয়ে যায়। এখানে তা হয় না বলে অনেককে সারাজীবন কিল-ঘুষি খেয়েই কাটিয়ে দিতে হয়। এই ধরনের ঘুমওয়ালা দু-একজনকে জানি, হাত-পা বেঁধে শোধরাবার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কোন ফল হয়নি। তবে একটা ঘটনার কথা এখানে না বলে পারছি না। বাড়িতে অতিথি এসেছেন, স্থানাভাবে এই শ্রেণীর এক গৃহস্থের সঙ্গে শুয়েছেন রাতে। প্রথম দফা কিল-চড় খেয়ে তিনি হজম করেছেন, দ্বিতীয় দফা ঘুষি-লাথির সময় জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন, তৃতীয় দফা ব্লোয়িং আরম্ভ হতেই তিনি সোজা উঠে ঘুমন্ত ভদ্রলোককে হ্যাঁচকা টানে তুলে দাঁড় করিয়ে সজোরে কয়েকটা ঘুষি দিয়েছেন। তারপরেই 'মারলেন কেন', 'বেশ করেছি' বলে দু-জনে প্রচণ্ড মারামারি আরম্ভ হয়ে গেল, পাড়ার লোক জাগল, মারামারি থামল না। দরজার খিল ভেঙে ঢুকে তাঁদের আধমরা অবস্থায় টেনে বার করা হল এবং দু-জনেই থানায় যেতে উৎসাহী দেখে শেষ পর্যন্ত থানায় চালান দেওয়া হল। রাত দুপুরে ঘুমের দৌড় যে থানা পর্যন্ত হতে পারে তা আগে জানা ছিল না। ঘটনাটির কথা দু-একজনকে বলতে তাঁরা বললেন যে, এরকম তাঁরা অনেক দেখেছেন। আর একরকমের বেঘোর ঘুমওয়ালা আছেন যাঁদের ঘুমন্ত অবস্থায় চ্যাংদোলা করে তুলে চৌবাচ্চায় ফেলে দিলে মিনিট দুয়েক পরে তবে নাকি ঘুম

ভাঙে। স্বচক্ষে ঠিক এই ধরনের জীব দেখিনি, তবে এই জাতেরই একজনের কাহিনী শুনেছি, তিনি নাকি ঘুমন্ত অবস্থায় তুফান মেইলে কলকাতা থেকে পাটনা চলে গিয়েছিলেন, কিছুই টের পাননি। সকালে ঘুম ভাঙতে পাটনায় আছেন শুনে একটু ভড়কে গিয়েছিলেন। ঘর থেকে ঘাড়ে করে মোটরে তোলা হয়েছিল, মোটর থেকে ট্রেনের কামরায় কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন স্বপনচারীর মতন, তারপর আবার পাটনা স্টেশন থেকে ঘাড়ে করে মোটরে তুলে বাড়ি নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরই উল্টো সংস্করণ হল ক্ষণিকের ঘুমবিলাসীরা। তাঁরা প্রতি মুহূর্তে ঘুমুচ্ছেন, আবার জাগছেন, অবশ্য রাতে ঘুমের সময় এঁরা বেঘোরপন্থী। কাজ করছেন ঘুমুচ্ছেন, কথা বলছেন ঘুমুচ্ছেন, বাসেট্রামে চলছেন ঘুমুচ্ছেন, সিনেমা দেখতে গেছেন সীটে বসে ঘুমুচ্ছেন, এরকম লোক বেশ কয়েকজন দেখেছি। একজন ছাপাখানার মালিকের কথা বলি। যখনই কাজের জন্যে যান, 'এই যে আসুন' বলে অভ্যর্থনা করবেন, বসতে বলবেন, 'প্রুফ দিয়ে যা' বলে চেঁচাবেন। বসে দু-চার লাইন প্রুফ দেখেছেন এমন সময় ঘোঁৎ করে শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখবেন তিনি ঘুমুচ্ছেন, নিজেরই নাক ডাকার শব্দে তাঁরও ঘুম ভেঙে গেছে এবং তিনি আপনার দিকে একগাল হেসে চেয়ে জিজ্ঞাসা করছেন, 'চা খাবেন ?' অতঃপর 'চা নিয়ে আয়' বলেই আবার ঘুম, এই রকম অনবরত চলছে। অথচ সব কাজই তিনি করছেন। এই ভদ্রলোককে মেশিন-রুমে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুতে দেখেছি—সামনের দিকে ঘাড়টা একটু ঝুঁকে গেছে, নাক ডাকছে, ফ্ল্যাট মেশিনের শব্দ ছাড়িয়ে তা শোনা যাচ্ছে। কলকাতার একটি বিখ্যাত ছাপাখানার মালিক ছিলেন ইনি, এখন কাপড়ের দোকান করে ব্যবসা বদলেছেন, কিন্তু অভ্যাসটা বদলাননি। খদ্দের যতক্ষণ কাপড় পছন্দ করে ততক্ষণ তিনি ঘুমিয়ে নেন, তারপর গজ মেপে দিয়ে সহকারীকে মেমো লিখতে বলেই আবার ঘুম দেন। এই জাতেরই আর-একজনকে দেখেছিলাম বিয়ের সময় পিঁড়িতে বসে ঢুলতে। পুরোহিত মন্ত্র পড়ছেন, আর তিনি ঘুমের ঘোরে বারবার ঢুলে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! দেখেছি চোখে, বাড়িয়ে বলছি না।

নেপোলীয়ন ঘোড়ার পিঠে ঘুমিয়ে নিতেন, কলকাতার অনেক বাবু আফিসে যাতায়াতের পথে ট্রামে ঘুমিয়ে নেন। খাবার পর তাঁদের একটু না ঘুমুলে চলে না এবং সেটা সময় অভাবে ট্রামেই সেরে নিতে হয়। ডিপোয় ট্রামে উঠে যুৎ করে বসেন, বসে ঘুম দেন, ভিড়ের হট্টগোলে রাস্তার মধ্যে মোটেই ঘুম ভাঙে না, অথচ ডালহৌসি স্কোয়ারে এলেই ঘুম ভেঙে যায় ঠিক, কাউকে ডাকতে হয় না। ট্রেনের ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে এরকম অনেককে দেখেছি। তর্কাতর্কি, ক্যানভাসারের চীৎকার, হল্লাহট্টগোলের মধ্যে দিব্যি রেশনের থলেটি হেলান দিয়ে অকাতরে ঘুমুচ্ছেন, ট্রেন স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে, কোন সাড়া নেই। কিন্তু নিজের নামবার স্টেশনটি আসার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ঘুম ভেঙে গেল এবং টুক্ করে নেমেও গেলেন। এঁদের ঘুমটাও অত্যন্ত 'কন্‌ডিশণ্ড', নেপোলীয়নের চেয়ে এঁদের কৃতিত্বও কম নয়। তা ছাড়া ঘুমের ব্যাপারে নেপোলীয়নের কৃতিত্ব থাকলেও তাঁর ঘোড়ার বিশেষ কোন কৃতিত্ব ছিল বলে মনে হয় না। কলকাতা শহরের গরু-মহিষ তার চেয়ে অনেক বেশি ডিসিপ্‌লিণ্ড, গাড়োয়ানরাও ঘুমের ব্যাপারে নেপোলীয়নের গুরুদেব। মাঝরাতে কলকাতার পথে সব্‌জি মাল বা খড় বোঝাই গরু মহিষের গাড়ি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই একথা স্বীকার না করে পারবেন না। পর্বতপ্রমাণ মাল বোঝাই গাড়ি চলেছে, টিম্ টিম্ করে একটা কেরোসিনের বাতি তলায় জ্বলছে, গাড়িতে কোন লোকজন নেই, গাড়োয়ানও না। হঠাৎ যদি নজর পড়ে দেখা যাবে সেই মালের বোঝার উপরে গাড়োয়ান সটাং শুয়ে ঘুম দিচ্ছে, পড়ে যাবার কোন ভয় নেই, বলদ মহিষরা নিজের মনেই চলেছে, মনে হবে যেন মহাকালের পথযাত্রী। কিন্তু মহাকাল নয়, ঠিক গন্তব্য বাজারটির কাছে গিয়ে গাড়ি আপনি থামবে, গাড়োয়ান ঘুমুক তাতে ক্ষতি নেই। রাস্তা দিয়ে অন্যান্য গাড়ি ঘোড়া যাক আর যাই হোক, তাতে গাড়োয়ানেরও ঘুম ভাঙবে না, বলদও বিচলিত হবে না। কলকাতার বলদ নেপোলীয়নের ঘোড়ার চেয়ে অনেক বেশি লয়াল, মাস্টারের ঘুম সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতন। শুধু বলদ কেন কলকাতার যাযাবর কুকুর ও ষাঁড়গুলোরও একটা জীবত্ববোধ আছে। আমি আপনি জ্যান্ত অবস্থায়

রাস্তায় চললে হয়তো রাতে তারা তাড়া করবে, চীৎকার করবে, কিন্তু কলকাতার ফুটপাথে যে হাজার হাজার লোক ঘুমিয়ে থাকে তাদের আশে-পাশে তারাও ঘুমিয়ে থাকে, নিঃশব্দে চলাফেরা করে, কোন বিরক্ত করে না। কলকাতার আরও কতকগুলো বারোয়ারী ঘুমের জায়গা আছে যেমন মনুমেণ্টের নিচে, কার্জন পার্কে, ইডেন গার্ডেনে, মিউজিয়মে, চিড়িয়াখানায়, গড়ের মাঠের গাছতলায়, কালীঘাটের ধর্মশালায়। বেকার জীবনে দিনদুপুরে যাঁদের বাড়িতে ঘুমুবার উপায় নেই তাঁরা দিনের বেলা এই সব জায়গায় চাকরি খোঁজার নাম করে বেরিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেন, রাতে উস্কোখুস্কো হয়ে বাড়ি ফেরেন। শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশনেও অনেককে সারাদিন ধরে রাত দশটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে বাড়ি ফিরতে দেখেছি। ওয়েটিং-রুমে ফ্যানের তলায় আরামে ঘুমিয়ে, সন্ধ্যার পর উঠে হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে এঁরা বাড়ি যান, গিয়ে বউ বা মাকে বলেন যে, সারাদিন আফিসে আফিসে ঘুরে হয়রান হয়ে গেছেন। ভেবে দেখেছি, এঁদের উপর রাগ করে কোন লাভ নেই। এঁরা বুঝেছেন, 'সবার উপরে ঘুমই সত্য।' যা দিনকাল পড়েছে তাতে এ সত্য না বুঝেই বা উপায় কি? জেগে ঘুরেই বা কি হবে? সুতরাং এঁদের বক্তব্য হল—

'চারিদিক দেখে চারিদিকে ঠেকে
বুঝিয়াছি আমি তাই,
নাকে শাঁক বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া
অন্য উপায় নাই।
জারি করো তবে খ্যাতি,
এ ভবরোগের নব চিকিৎসা
আমার 'ঘুমিওপ্যাথি'।'

ঘুমের ওপর এইজন্যেই অনেক কবি অনেক কবিতা লিখে গেছেন। ঘুমন্ত যাঁরা তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকুন। দাঁড়িয়ে ঘুমোন আর বসেই ঘুমোন, ঘুমিয়ে গড়ান বা ঘুষি মারুন, ঘুমিয়ে দাঁত খিঁচোন, বক্‌বক্‌ করুন বা নাক ডাকিয়ে ঘুমোন, যেভাবে খুশি এবং যেখানে খুশি ঘুমোন, কোন চিন্তার কারণ নেই। ঘুমই আজকাল বাঁচার একমাত্র পথ। সমস্ত ঘুমবিলাসীর

হয়ে তাই আমাদের বাঙালী কবি যতীন্দ্রনাথের ভাষায় আমিও ঘুমকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ঃ

> 'ঝুম ঝুম নিঃঝুম—
> মেঘের উপরে মেঘ জমে আয়—
> ঘুমের উপরে ঘুম!
> ঝিম্ ঝিম্ নিশ্চিন্ত—
> নাকের ডগায় মশাটা মশাই
> আস্তে উড়িয়ে দিন ত!'
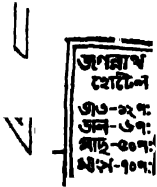
জগন্নাথ হোটেল

> 'অম্বরে সম্বরা-যবে দিলা শম্ভুমালী
> ওড্র-কুলোদ্ভব মহামতি, বঙ্গধামে
> ······মধ্যাহ্ন সময়ে আহা!
> তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লঙ্কা সঙ্গে সযতনে
> উচ্ছে আর ইক্ষু গুড় করি বিড়ম্বিত
> অপূর্ব ব্যঞ্জন, মরি রান্ধিয়া সুমতি
> প্র-পঞ্চ-ফোড়ন দিলা মহা আড়ম্বরে;
> আম্বা করি' পুনঃ ঢালিল জাম্বাটি ভরি'
> 'জগন্নাথ' বলি;···

'গ্র্যাণ্ড বা গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের গোয়ানীজ কুকের বার্কেশতাগেনী রান্না নয়, ওয়াশিংটনী বা কেলিফোর্নিয়ান পদ্ধতিতে ষ্টীমবয়েল করে,

ইয়েনানী বা ইশপাহানী রীতিতে সম্বরা দেওয়া নয়। সে সব খাওয়ার নাম হল 'লাঞ্চ' বা 'ডীনার'—তা খেয়ে হজম করার মতন স্টমাক নিয়ে সকলে জন্মগ্রহণ করেন নি। তা খেলে বিশুদ্ধ পানীয় জল পানে তেষ্টা মেটে না, ভেতরটা এমন ডেজার্টের মতন ড্রাই হয়ে যায় যে, মার্কিন রেফ্রিজারেটারের বৃটিশ বা জার্মান কোল্ড বীয়ার সেবন না করলে যে কেউ তেষ্টাতেই কেষ্ট পাবেন। তারপর লাঞ্চেতে ষ্ট্রীমলাইণ্ড মোটরের বক্স স্প্রিং সীটের উপর উদরটাকে এলিয়ে দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে আফিসে না ফিরতে পারলে গোয়ানীজ বা চৈনিক রান্নার কেলোরিক ভ্যালু শরীরে অ্যাবজর্ব করা সম্ভব হয় না। এত নিয়ম পালন করার ক্ষমতা সকলের নেই, অতএব 'লাঞ্চ' বা 'ডীনার' সকলের অদৃষ্টে জোটে না। যাদের জোটে তা তাদের মনমেজাজ খুবই উদার এবং সেটা নিয়মিত খাদ্যের কুকিং ও কেলোরিক ভ্যালু দুয়েরই জন্যে।

কলকাতা শহরে তিন রকমের খাওয়া আছে—লাঞ্চ-ডীনার, ভোজন ও গিলন। এটা কলকাতা শহরেই আছে, মফঃস্বল শহরে বা গ্রামে নেই। অন্যত্র প্রধানত দু-রকমের খাওয়াই প্রচলিত, ভোজন ও গিলন। তিন রকমের খাওয়া কলকাতায় সাধারণত তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখা যায়। লাঞ্চ-ডীনার খাওয়া উচ্চশ্রেণীর বড়-চাকুরে বা অফিসার ক্লাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আধা-জমিদার ক্লাসের আমিরী ভাবাপন্ন যাঁরা, জীবিকার দুশ্চিন্তা বিশেষ নেই, অবসর যথেষ্ট আছে, তাঁরাই 'ভোজন' করে থাকেন। আর বাকি আমাদের মতন অধিকাংশ লোক, জীবিকার জন্যে যাঁদের দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াতে হয় ন-টার মধ্যে, গলদঘর্ম হয়ে বাসে-ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে আফিস যেতে হয়, তাঁরা ঘরেই খান আর বাইরেই খান, বঙ্গদেশীয় গৃহিণীর হাতে খান বা ওড্রদেশীয় শম্ভুমালীর হোটেলে খান, তাঁদের সেই খাওয়ার নাম হল 'গিলন'। অর্থাৎ তাকে 'খাওয়া' বলে না, 'ভোজন' তো বলেই না, 'গেলা' বলে। যাঁরা লাঞ্চও খান না, ভোজনও করেন না, কেবল গেলেন, তাঁদের জন্যেই কলকাতার শত শত পাইস হোটেল। জগন্নাথ হোটেল তার মধ্যে একটি। 'পাইস' বিশেষণের ভেতর দিয়ে হোটেলের প্রোলেটারিয়েন রূপটা স্পষ্ট ফুটে ওঠে। কিন্তু

তাহলেও জগন্নাথ হোটেলের যে একটা পাইসী আভিজাত্য আছে, তা যাঁরা সেখানে খান ও খান না, তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন। সাইন-বোর্ডের টপে মা অন্নপূর্ণার মূর্তি, তার তলায় বড় বড় অক্ষরে লেখা 'জগন্নাথ হোটেল,' নিচে লেখা 'বিশুদ্ধ হিন্দু ভোজনালয়' (লেখা উচিত অবশ্য 'হিন্দু গিলনালয়')। হোটেলের দরজার দু-পাশে দুটি বড় বড় টিনের বোর্ডে খাদ্যের তালিকা লেখা। যেদিন যে যে পদ রান্না হয়, সেদিন তার পাশে পাশে সাদা খড়ি দিয়ে দাম লেখা থাকে। যার পাশে দাম লেখা থাকে না, বুঝতে হবে সেদিন সেটা রান্না হয়নি, অথবা ফুরিয়ে গেছে। বোর্ড দুটোই হল জগন্নাথ হোটেলের পার্মানেণ্ট মেনুকার্ড। আগে খাবার ঘরেই টাঙানো থাকত, পরে অসংখ্য খুচরো কাস্টামারদের অনুরোধে বাইরে লট্কানো হয়েছে। তাতে নাকি উঠকো খদ্দেরদের তহবিল মিলিয়ে হোটেলে ঢোকার সুবিধে হয়। বাইরে দাঁড়িয়ে বোর্ডের দিকে চেয়ে অনেককে বিড়বিড় করে হিসেব করতে দেখেছি। আইটেম্-বাই আইটেম্ হিসেব করে, কি গিলবেন না গিলবেন ('খাওয়া' বা 'ভোজন করা' ক্রিয়াপদ এক্ষেত্রে ইচ্ছা করেই বর্জন করছি) মনে মনে ছক্ কেটে নিয়ে, রেডী হয়ে, তবে তাঁরা হোটেলে ঢোকেন। পাইস হোটেলের এই বাইরের মেনুবোর্ড ও মূল্যতালিকাকে যাঁরা আগে বিদ্রূপ করতেন, ইনসাল্টিং মনে করতেন, তাঁরা আজকাল নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন, রীতিমত সব নামজাদা হোটেল-রেস্তোরাঁর বাইরে এরকম মূল্য তালিকা, বিশেষ করে দৈনিক লাঞ্চ-ডীনারের মেনু ও দক্ষিণা, লট্কানো থাকে। তার কারণ, তথাকথিত লাঞ্চপন্থী উপরতলার অবস্থা ক্রমেই যত সঙ্গীন হয়ে আসছে, ততই আর্য-অনার্যের মতন 'পাইস' হোটেল ও 'গিনি' হোটেলের মধ্যে একটা দৃষ্টিভঙ্গীর বা আদর্শের সমন্বয় ঘটছে। অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, জগন্নাথ হোটেলের মতন কলকাতার কয়েকটি প্রাচীন পাইস হোটেলেই এই প্রথার প্রথম প্রবর্তক।

১২৬৮ সনে, অর্থাৎ যে বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন, সেই বছর 'জগন্নাথ হোটেলের'ও জন্ম হয়। তারপর ১৩৩০ সনে জগন্নাথ হোটেলের অরিজিনাল প্রপ্রাইটার বনমালী মারা যায়, ১৩৪৮ সনে

রবীন্দ্রনাথ মারা যান, কিন্তু জগন্নাথ হোটেলের জগন্নাথ তবু উল্‌টায়নি। রবীন্দ্রযুগে জগন্নাথ হোটেল ছিল 'হাফ-পাইস হোটেল,' পাইস হোটেল নয়। তখন বাইরের বোর্ডে লট্‌কানো থাকতো 'পাঁচ পয়সায় ফুল খাওয়া।' পকেটে ছ'টা আধলা থাকলে দিব্যি ঝোল ভাত খাওয়া হয়ে যেত, আর আটটা আধলা খরচা করলে চর্ব্যচোষ্য মাংসভাত তো হতই। ঠেকা-বে-ঠেকায় চারটে আধলায় ডালভাত তরকারী খেয়েও অনেকের দিন চলে যেত। নবাবী আমল অস্ত গেলেও তখনও যেন তার বর্ণচ্ছটা বাংলার আকাশ থেকে যায়নি। তখন থেকেই সকলে জানেন, জগন্নাথ হোটেলে খাওয়াদাওয়ার পর অম্বল ফ্রি। ফ্রি বলে যে অম্বল অখাদ্য ছিল তা নয়, প্রত্যেকটি তরকারীর মতন অম্বলও অপূর্ব ব্যঞ্জন ছিল। খেয়ে সত্যিই বলতে ইচ্ছে করত—

'কহ দেবী তাম্বুরা-বাদিনী!
কোন্ জাম্ববান হৈল মুগ্ধ তার ঘ্রাণে
আচম্বিতে? জম্বুদ্বীপ হৈল হরষিত!
কম্বুরবে অম্বুনিধি মহাতম্বি করি
আইলা অম্বল-লোভে লোভী...'

হাফ-পাইসের পর পাইস হোটেলের যুগ এসেছে। পাঁচ পয়সার জায়গায় বোর্ডে লেখা হয়েছে 'ন'পয়সায় ফুল খাওয়া।' দু-পয়সার ভাত, এক পয়সার ভাজা বা তরকারী, এক পয়সার ডাল আর দু-পয়সার মাছের ঝোল, এই ছয় পয়সার গিললেই পেটটা ভরে যেত, তার সঙ্গে অম্বল তো ফ্রি ছিলই। এরই মধ্যে যাঁরা একটু গিলনবিলাসী গোছের ছিলেন, তাঁরা দু-পয়সার দইয়ের একটা ভাঁড় হাতে করে নিয়ে আসতেন। অনেকে কলাপাতায় মুড়ে দু-পয়সার মাখনও নিয়ে ঢুকতেন। মোট দু-গণ্ডা পয়সায় বেশ সাপ্টা খাওয়া হয়ে যেত, একটা মাঝারি রকমের ঢেঁকুরও উঠতো। তারপর একটা পান চিবুতে চিবুতে ছ্যাক্‌রাগাড়ি বা ঘোড়ার ট্রামে চড়ে আফিসে যেতে খুব যে খারাপ লাগত তা নয়। তাছাড়া বনমালীর আদর-যত্নেরও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। বনমালীর আমলে যাঁরা জগন্নাথ হোটেলের বাঁধা খদ্দের ছিলেন, শুধু রান্নাবান্না পরিবেশনের দিক থেকে নয়, আদর-যত্নের দিক থেকেও তাঁরা যে কোনদিন ঘরের গিন্নীর

বিশেষ অভাব বোধ করতেন না, একথা তাঁদের বলতে শুনেছি। গ্রামে পরিবার ছেড়ে শহরে চাকরি করতে এসেও তাঁরা বেশ বহাল তবিয়তে থাকতেন, জগন্নাথ হোটেলে গেলার জন্যে। জগন্নাথ হোটেলের নাম এই জন্যেই সুদূর গ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল। শহর দর্শন করতে যাঁরা আসতেন তাঁরা পাঁচটা টাকা খরচ করে এক সপ্তাহ কলকাতায় জগন্নাথ হোটেলে থেকে খেয়ে, কালীঘাটের কালী, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, পরেশনাথ সব দেখে, মনের আনন্দে গাঁয়ে ফিরে গিয়ে শহরের গল্প করতে পারতেন। এই সেদিন পর্যন্ত এই পাইসের যুগ ছিল এবং জগন্নাথ হোটেলের অম্বলও ফ্রি ছিল। দু-পয়সার ভাত, এক পয়সার দাল, এক পয়সার তরকারী আর এই ফ্রি অম্বল খেয়ে কত ছাত্র যে বড় বড় বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, উকিল হয়েছেন তার ঠিক নেই। আজও তাঁদের অনেকের কাছে জগন্নাথ হোটেলের ফ্রি অম্বলের কথা শোনা যায়।

কিন্তু তারপর কি যে হল জগন্নাথই জানেন! পাইসের যুগ কেটে গেল, রেশনিং-এর যুগ এল। সেইসব তেল, ঘি, মশলাপাতি কোথায় যে উবে গেল কে জানে! স্বাধীনতা পেয়ে আমাদের যেন সশরীরে স্বর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা হল। এখন আর দু-আনার কম ভাতই পাওয়া যায় না, তাও পাইসের যুগের দু-পয়সার অর্ধেক এবং ঢেঁকুর তোলা দূরের কথা, মোটামুটি চলে-ফিরে বেড়াবার মতন খেতে হলেই খুব কম করেও আট গণ্ডা পয়সা দরকার। যে রান্নার ঘ্রাণে একদিন সমস্ত জম্বুদ্বীপ হরষিত হয়ে উঠতো, সে ঘ্রাণও আর নেই। তেল মশলা সব কিছুর যেন ভোল্‌ই পাল্টে গেছে। কাস্টমাররা কম্‌প্লেন করে, শম্ভুমালী শোনে, উত্তর সে দিতে পারে, কিন্তু দেয় না। প্রায় একশ বছর ধরে তার হোটেলে লোক খাচ্ছে, কোনদিন কোন নালিশ সে শোনেনি, অথচ আজ আর নালিশের চোটে হোটেল চালানো যায় না। ফ্রি অম্বলটুকু পর্যন্ত উঠে গেছে। সেটা কি জগন্নাথ হোটেলের দোষ? দেশের ঠুঁটো জগন্নাথরাই জানেন। তবে সর্বশেষে সংবাদ হল জগন্নাথ হোটেল উঠে গেছে। ওড্রদেশীয় শম্ভুমালী কটকে চলে গেছে। আর কলকাতায় ফিরবে না। *

* ১৯৬৭ সালে অবশ্য এই 'রেটে' খাওয়া অসম্ভব।

সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কলকাতা

সেকেণ্ডহ্যাণ্ড শহরের সত্যিকারের পরিচয় দেওয়া কঠিন, বিশেষ করে 'সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কলকাতা'র, কারণ কলকাতার আসল সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জগৎ এত বিরাট ও বিচিত্র যে, কেবল বাইরে থেকে তার সামান্য পরিচয় পাওয়াও সম্ভব নয়। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড শহরের আসল পরিচয় পেলে মনে হবে 'ফার্স্টহ্যাণ্ড' তার তুলনায় কিছুই নয় এবং শহরের মানুষ, বাড়ি গাড়ি, আসবাবপত্র যা কিছু দেখেন তার কোনটাই যেন ফার্স্টহ্যাণ্ড নয়, সবই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড। এ-হেন সেকেণ্ডহ্যাণ্ড শহরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পনের বছর আগে এবং যার মারফৎ হয়েছিল তিনি এই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কলকাতার মুকুটহীন 'সম্রাট' একজন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা-কিছু সেকেণ্ডহ্যাণ্ড তার প্রতি এমন গভীর মমতা ও ভালবাসা এবং যা-কিছু নতুন ও ফার্স্টহ্যাণ্ড তার প্রতি এমন প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা ও বীতশ্রদ্ধা, জীবনে আর কারও মধ্যে এমন উগ্রভাবে ফুটে বেরুতে আমি দেখিনি। জীবনের এত বড় একজন 'সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ফিলজফার' আজ পর্যন্ত আর চোখে পড়েনি। পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত জগদীশদা'র সব কিছুই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড, মুখেও চব্বিশ ঘণ্টা সেকেণ্ডহ্যাণ্ডের কথা, কাজ-কারবারও সেকেণ্ডহ্যাণ্ড নিয়ে। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড শহরের কথা বলবার আগে তাই আমাদের সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড জগদীশদা'র কথা আগে বলতে হয়।

কলকাতার শহরে জগদীশদাকে চেনেন না, এ-রকম লোক খুব কমই আছেন। যাঁরা বাস্তবিকই তাঁকে চেনেন না তাঁরা শহরের নবাগত 'ফার্স্টহ্যাণ্ড' লোক। 'সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জগদীশদা' কথাটা কিন্তু ঠাট্টা নয়। জগদীশদা নিজেই একদিন তাঁর বিচিত্র কেরিয়ারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐ কথা বলে স্টার্ট করেছিলেন যে তিনি নিজেই সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড। কথাটা শুনে প্রথমে আমার বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছিল।

এতদিন সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মালের কথা শুনে এসেছি, মানুষের কথা শুনি নি কখনও। জগদীশদা'র ব্যাখ্যার অপেক্ষায় রইলাম। ব্যাপারটা এই! জগদীশদা জন্মাবার আগেই পিতৃহীন হয়েছিলেন, আর ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে হয়েছিলেন মাতৃহীন। তারপর কতজনের হ্যাণ্ড থেকে হ্যাণ্ডে ঘুরে ঘুরে যে তিনি মানুষ হয়েছেন তার হিসেব নেই। তাই জগদীশদা নিজের জীবনটাকে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মনে করেন।

স্কুল-কলেজে পড়া বিদ্যে জগদীশদা বেশি অর্জন করেন নি, যেটুকু করেছেন তাও সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বই কিনে। ব্যবসার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি এবং ঐ সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ব্যবসা। মাত্র বারো আনা পয়সা নিয়ে তিনি তাঁর কেরিয়ার স্টার্ট করেন। আট আনা দিয়ে একটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গড়্‌গড়ার নল কিনে, এক টাকায় সেটা বাজারে বেচে দেন। পরদিন বারো আনা দিয়ে একটা অ্যালুমিনিয়ামের গামলা কিনে সেটা এক রেস্টুরেণ্টে দু-টাকায় বেচে দেন। তারপর দু-টাকায় কিছু ছুরি কাঁটা কিনে চার টাকায় সেগুলো বেচেন। চার টাকায় একটা টেবল্ কিনে সেটাকে পালিশ করে বেচেন দশ টাকায়। প্রায় ছ-জোড়া পুরনো জুতো কিনে সেগুলো রিসোল করে বিক্রি করেন এবং টাকা কুড়ি মুনাফা হয়। এইভাবে প্রায় মাসখানেক বিক্রি-ওয়ালাদের আড্ডায় এবং সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারে ঘুরে ঘুরে, এটা-ওটা টুকিটাকি জিনিস কেনা-বেচা করে, জগদীশদা বারো আনা থেকে পঞ্চাশ টাকা 'ক্যাপিটাল' সঞ্চয় করেন। সেই পঞ্চাশ টাকা নিয়ে সোজা তিনি কলকাতার বিভিন্ন অক্‌শন হাউসে নিয়মিত ঘোরাফেরা করতে আরম্ভ করেন। অক্‌শনে জিনিস কিনে টাকা ডিপোজিট দিয়ে তিনি সাত দিনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে খদ্দের যোগাড় করে সেগুলো বেচে দেন। এতে লাভ হয় এই যে নিলেম-ঘর থেকে জিনিস-গুলো ডেলিভারী নিয়ে কোন দোকানে বা গুদামঘরে সেগুলো জমা করে রাখবার দরকার হয় না, জগদীশদার তখন দোকান বা গোডাউন কোনটাই ছিল না। তাই পরের সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে নিলেম হবার আগে তাঁকে ঘুরে ঘুরে কেনা মালগুলো বিক্রি করে ফেলতে হত। কিছুদিন এইভাবে চালানোর পর জগদীশদার মুনাফা বেড়ে প্রায় শ'পাঁচেক টাকা হল এবং

অকৃশন হাউসে তাঁর ক্রেডিটও বাড়লো। এখন আর তাঁকে ডিপোজিট দিতে হয় না, কেনা মাল সপ্তাহের মধ্যে ক্লিয়ার করতে পারলেই হল। এই সময় তিনি বৈঠকখানার সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারে একটা দোকান ভাড়া করেন। এই দোকানঘরেই তাঁর বসবাস ও ব্যবসা দুই-ই চলতে থাকে। বেশ স্বচ্ছলভাবেই দিন কেটে যায়, কিন্তু হঠাৎ অসহযোগ আন্দোলনের দমকা হাওয়ায় জগদীশদার সেকেণ্ডহ্যাণ্ড-নীড় যায় উড়ে। যাবেই তো! এই চোরাবাজারের ছোট্ট সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দোকানটিকে তিনি আত্মগোপন-কারী বিপ্লবীদের একটা চোরাই আড্ডাখানা করে তোলেন। জগদীশদা ধরা পড়ে জেলে যান, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড দোকানও তাঁর উঠে যায়। আট বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে আবার ঐ ধরনের গড়্গড়ার নল, গামলা, ঘটি-বাটি, জুতো-ছাতি, চেয়ার-টেবল্ কেনা-বেচা থেকে শুরু করে তিনি দোকান গড়ে তোলেন, কিন্তু আবার সেটা উঠে যায় জেল খেটে। বছর সাত-আট পর জেল থেকে ফিরে সেই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মাল কেনা-বেচা কাজ আজও তিনি করছেন, তবে এখন বয়স হয়েছে, এনার্জিও অনেক কমে গেছে বলে দোকানপত্র আর করেননি।

জগদীশদার সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জীবনের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গেলে এক মহাভারত রচনা করতে হয়। ভুলেও যদি কেউ তাঁর সামনে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জিনিসের বিরুদ্ধে কিছু বলেছেন তাহলে আর রক্ষে নেই। জগদীশদার নিজস্ব ব্যবহারের জামা-কাপড়, জুতো, কলম, ঘড়ি ইত্যাদি যা-কিছু সবই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড। তাই দেখে আমি একদিন বলেছিলাম, পরবার জামা-কাপড়টা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ব্যবহার করাটা কি ঠিক? শুনে হঠাৎ তিনি এমন ক্ষেপে গিয়েছিলেন যে, নেহাৎ কপালের জোরে সেদিন তাঁর হাতে মার খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছি আমি। জগদীশদা বললেনঃ 'কলকাতা শহরের কত বড় বড় হোম্‌রা-চোম্‌রা লোক সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জামা-কাপড়, দামী স্যুট, কোট, ওভারকোট, চেস্টারফিল্ড ইত্যাদি পরে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মোটরে চড়ে নবাবি করে বেড়ায় যদি তা দেখতে চান তাহলে সন্ধ্যার পর আসবেন, দেখিয়ে দেব। দেখবেন, হাইকোর্টের নামকরা ব্যারিস্টার এটর্নিরা পর্যন্ত চোরাবাজারের দোকানে

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্যুট ট্রায়াল দিচ্ছেন ঘুরেফিরে।' তারপর আর কোনদিন কিছু বলিনি, বলবার সাহসও হয়নি। জগদীশদা বলেছেন : 'তা ছাড়া সবই যে সত্যিই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড তাই বা আপনাকে কে বললে ? তা যদি হত তাহলে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারের ডাকনাম 'চোরাবাজার' হত না। আর চোরাবাজার বলে মনে করবেন না যে শুধু প্রফেশানাল চোরদের মাল বিক্রির বাজার এটা! কলকাতার কত বড় বড় অভিজাত বংশের উড্ডীয়মান বংশধরদের দেখিছি কত মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য জিনিস জলের দরে এই চোরাবাজারে বেচে দিতে। কত ফার্স্টহ্যাণ্ড দোকানের কত মাল কত হ্যাণ্ডের কারসাজিতে যে এই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারে এসে হাজির হয় তা শুনলে অজ্ঞান হয়ে যাবেন। তা ছাড়া কত সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জিনিস যে ফার্স্টহ্যাণ্ড মনে করে আমরা নিশ্চিন্তে ব্যবহার করি তার ঠিকানা নেই। শ্রাদ্ধের খাট তো হরদম বিয়ের দানে যাচ্ছে, বড়লোকের মরার খাট-বিছানাতেও নব-বিবাহিতের ফুলশয্যা হতে দেখেছি। কই, কিছুই তো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি তাতে। আসলে সবই হল মনের কুসংস্কার, চেতনার ব্যাধি, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারে এই সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া যায়। জীবনের আসল রূপটা চোরাবাজারের অলিগলিতে অন্ধকারেই ফুটে ওঠে, সত্যিকারের রিয়েলিটির সঙ্গে মুখোমুখী পরিচয় হয়, নতুন বাজারের সবকিছুই একটা ইলিউশন ছাড়া কিছু নয়।'

ঠিক চার্বাকও নয়, কণাদও নয়, কার্লমার্ক্সও নয়, অথচ জীবনের এই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ফিলজফির মধ্যে মেটিরিয়ালিজমের একটা উৎকট গন্ধ আছে। মেকানিক্যালও নয়, ডায়েলেকটিক্যালও নয়, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জীবনের এই ফিলজফি কতকটা যেন 'ডায়াবলিকাল্'। সত্য, কিন্তু ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সত্য, সহ্য করা যায় না। জগদীশদার এই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জীবন-দর্শন আপনি গ্রহণ করুন আর নাই করুন, নগদ কোন জিনিস কিনতে হলে কলকাতার সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারের কথা ভুলবেন না, আর যদি অবশ্য ধারে পান তাহলে 'ফার্স্টহ্যাণ্ড' বাজারের লাক্ ট্রাই করতে পারেন। শুধু তাই নয়, জগদীশদার বিচিত্র কেরিয়ার থেকে একটা টিপ্‌সও গ্রহণ করতে পারেন। চাকরির জন্যে না ঘুরে, শেয়ার বাজারে

বা ঘোড়দৌড়ের মাঠে না গিয়ে যদি চোরাবাজারের আনাচেকানাচে দৈনিক দু-চার ঘণ্টা ঘুরে টুকিটাকি জিনিস অল্পস্বল্প কেনা-বেচা করেন, তাহলে স্বচ্ছন্দে দৈনিক পাঁচটা টাকা থেকে বরাতজোর থাকলে দশ পনের টাকা পর্যন্ত রোজগার করতে পারবেন এবং তার জন্যে ইন্‌কামট্যাক্স দিতে হবে না। ইন্‌স্পিরেশন না পেলে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জগদীশদার কথা সবসময় স্মরণ করবেন।

জগদীশদা যে শুধু সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ব্যবসা করেন বা জামা-কাপড় জুতো পরেন, তা নয়। তিনি যা খেয়ে জীবনধারণ করেন তাও সেকেণ্ডহ্যাণ্ড। সকালে ফলমূলাদি ভক্ষণ করেন এবং সেটা পাইকারী বাজারের উদ্বৃত্ত কুড়নো মাল, পচাগলা, চ্যাপ্‌টানো, থ্যাত্‌লানো আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, শসা, পেঁপে, যা বাইরের ফুটপাথে বিক্রি হয়, তাই কিনে খান। রাত্রে আহার করেন এক রেস্টুরেন্টে, এগারোটা বাজার পর, কারণ তখন রেস্টুরেন্টের অবিক্রীত উদ্বৃত্ত চপ্‌ কাট্‌লেট মাংস প্রায় হাফ-প্রাইসে পাওয়া যায় এবং জগদীশদার সঙ্গে সে রকম পাকাপাকি বন্দোবস্তও আছে দু-চারটে রেস্টুরেন্টের। সর্বশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় হল, জগদীশদা সম্প্রতি প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ করেছেন, কিন্তু আশ্চর্য, তাও সেকেণ্ডহ্যাণ্ড। একদিন দেখি রাস্তায় জগদীশদা একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা ও দুটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে চলেছেন। দেখা হতেই বললেন: 'এই যে, আলাপ করিয়ে দিই—আমার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে।' অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, এমন সময় আমার অবস্থা বুঝে তিনি বললেন: 'মনে করবেন না, আমার জীবনের প্রিন্সিপ্‌ল আমি ব্রেক্‌ করেছি—এও সেকেণ্ডহ্যাণ্ড, অর্থাৎ সপুত্র বিধবা বিবাহ করেছি, বুঝলেন তো?' তারপর একটু হেসে বললেন: 'তাছাড়া আমার লভও তো সেকেণ্ডহ্যাণ্ড, কারণ ছেলে-বেলায় যে মেয়েটার সঙ্গে প্রেম করেছিলাম, সে একদিন জামরুল গাছে উঠতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে মরে গেল। তারপর এই আমার দ্বিতীয় বা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড প্রেম।'

মনে মনে জগদীশদাকে শতকোটী প্রণাম জানিয়ে বিদায় হলাম।

ঠিক সন্ধ্যার ঝোঁকে যদি বৈঠকখানাবাজার অথবা মল্লিকবাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাহলে এমন অনেক অচিন্তনীয় দৃশ্য দেখতে পাবেন যা কলকাতার শ্রেষ্ঠ বাজার নিউ মার্কেটে কোনদিন দেখতে পাবেন না। বাজারে ঢোকার অলিগলির অন্ত নেই, সমস্ত দিক ও সমস্ত কোণ দিয়েই গা-ঢাকা দিয়ে ঢোকা যায়। কলকাতা শহরের অনেক নিষিদ্ধ অঞ্চলে নতুন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা যেমন দিনদুপুরে ও রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে মুখ বাঁচিয়ে ঢোকার চেষ্টা করেন, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারের বিক্রেতা ও ক্রেতাদেরও কতকটা সেই ধরনের ভঙ্গী দেখা যায়। অবশ্য সকলের মধ্যে সে রকম দেখা যায় না। আত্মগোপন করবার তাঁরাই চেষ্টা করেন যাঁরা আভিজাত্যের মুখোস খসিয়ে হয়ত বিয়ের সওদা করতে আসেন সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারে, কারণ তাঁদের মনে সব সময় একটা ভয় থাকে, যদি বরপক্ষের কেউ দেখে ফেলে দেয়! অথচ ভয় করবার কোন কারণই নেই। তবু একদল লোককে কতকটা যেন ক্রিমিনালের মতন এই সব চোরাবাজারে ঢুকতে দেখা যায়। যাঁরা এইভাবে অপরাধীর মতন ঢোকেন তাঁরা সকলেই যে ক্রেতা তা নন, তাঁদের মধ্যে বিক্রেতাও আছেন। এই বিক্রেতারাই সবচেয়ে ইণ্টারেস্টিং। ক্রেতাদের মধ্যে নতুনত্ব বিশেষ কিছু নেই, কারণ পুরনো ফার্নিচার, গ্রামোফোন, ঘড়ি ইত্যাদি চোরাবাজার থেকে কিনে দানোৎসর্গ করবার রীতি এই কলকাতা শহরে জোব চার্নকের আমল থেকে চলে আসছে। দেখবার মতন তাজ্জব বস্তু হল বিক্রেতারা। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারে এঁদের ঢোকা থেকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত এমন একটা রহস্যাবৃত নিঃশব্দতা বিরাজ করে, আনাচে-কানাচে আলো-অন্ধকারে দোকানদার ও আগন্তুক বিক্রেতাদের ফিস্-ফিসানির মধ্যে এমন একটা গোপন চক্রান্তের ভাব ফুটে ওঠে, যা দেখলে রীতিমত আপনার গা ছম্ছম্ করবে। মনে হবে, কলকাতা শহরের আর এক বিচিত্র পাতালপুরীতে আপনি প্রবেশ করেছেন। ক্রেতারা নন, এই বিক্রেতারাই হলেন সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

সেকেণ্ডহ্যাণ্ড শহরের নায়ক হলেন এঁরাই। সকলের অন্তরালে এঁরা বেঁচে আছেন বলেই, প্রকাশ্য বাজারের অন্তরালে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজার জমজমাট হয়ে আছে।

বিক্রেতা এক রকমের নয়, নানা রকমের আছেন। কেউ কেউ আছেন যাঁরা সংসার একেবারে অচল হয়ে গেলে চোরাবাজারে আসেন। সোনার গহনা যখন বন্ধক দেওয়া বা বিক্রি করবার মতন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, তখন এমন সব সংসারে প্রয়োজনীয় জিনিসের শরণাপন্ন হতে হয়, যখন চোরাবাজারে যাওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না। এই সময় দেখা যায় কেউ একমাত্র শখের জিনিস গ্রামোফোন নিয়ে, কেউ স্ত্রীর একমাত্র সম্পত্তি একটা সেলাইয়ের কল নিয়ে, কেউ বা কিছু ছবি, বই ও কাচের জিনিসপত্তর নিয়ে চোরাবাজারের দোকানীদের দরজায় দরজায় ঘুরছেন। জিনিসগুলো প্রকাশ্যে বাইরের ক্রেতাদের সামনে কেনা-কাটা হচ্ছে না, চোরাবাজারে কোনকালেই তা হয় না, সব সময়ে আড়ালে আবডালে কাজ চলছে। অনেক সময় দেখেছি, বাইরের ক্রেতাদের মধ্যে অভিজ্ঞ ঘুঘু যাঁরা, তাঁরা এই সব বিক্রেতাদের চিনতে পেরে বাজারের মধ্যেই হয়ত আড়ালে, অথবা বাজারের বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে, দোকানীদের টেক্কা দিয়ে, সোজাসুজি এ সব জিনিস কেনবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড বাজারের দোকানীদের এমনই সংগঠন যে সাধারণত তাদের চোখ এড়িয়ে কিছু করবার উপায় নেই। দোকানীদের নিজেদের দালালরা বাজারের মধ্যে টহল দিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং তাদের এমনই শ্যেনদৃষ্টি যে বাজারের মধ্যে কোন বিক্রেতা ঢুকলেই তার মুখ দেখে তারা চিনতে পারে, তারপর তার পিছু নিয়ে যথাস্থানে গিয়ে নিজেদের কাজ সেরে নেয়। যাই হোক, বিক্রেতাদের কথা বলি। সত্যিকার অভাবগ্রস্ত বিক্রেতাদের মধ্যে চরম অন্নভক্ষ্য স্তরের যাঁরা—তাঁদের শার্ট, কোট, প্যাণ্ট, জামা, কাপড়, ট্রাঙ্ক, সুটকেস, স্টোভ, বাসনকোসন পর্যন্ত নিয়ে এসে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারে বেচে দিতে দেখেছি। এরই ঠিক বিপরীত সংস্করণ আর একদল বিক্রেতা আছেন, যাঁরা সংসারী কতটা জানিনে, তবে নেশাখোর বা জুয়াড়ী যে নিশ্চয়ই তাতে কোন সন্দেহ নেই। নেশার টাইম হয়ে আসছে, রেগুলার

হাই উঠছে হয়ত, অথচ ট্যাঁক একেবারে গড়ের মাঠ—অথবা রেস খেলার দিন এসে গেছে, অব্যর্থ টিপ্‌সগুলো সব রেডী, কিন্তু শূন্য পকেটে আরশুলা ঘুরঘুর করছে হয়ত। এমন সময় শহরের সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। অতএব হাতের কাছে যা গৃহিণীর অগোচরে পাওয়া গেল, সস্‌প্যান্‌ ফ্রাইপ্যান্‌ থেকে ইলেকট্রিক হীটার, স্টোভ, আইরন, নিদেনপক্ষে স্ত্রীর বৌভাতের দু-চারখানা উপহার পাওয়া শাড়ি, তাই বগলে করে বৈঠকখানা, মল্লিকবাজার বা আলিপুরের চোরা-বাজারে চট করে চলে আসতে হয়। যাই হোক, তবু সেদিনকারের মতন সন্ধ্যার ঝোঁকে নেশার মৌতাতটা জমে এবং রেসের মাঠে ফেভারিট ঘোড়াটাও দৌড়য়।

এছাড়া সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারের আর একদল 'ফীডার' বা বিক্রেতা আছেন যাঁরা চোর-ছ্যাঁচোড় নন, রীতিমত ভদ্রলোকের ছেলে এবং শুধু ভদ্রলোকের ছেলে নন, অনেকে শহরের বনেদী বংশের বংশধর, জিজ্ঞাসা করলেই হয়তো বলবেন যে তাঁর ঠাকুরদার ঠাকুরদা লর্ড ক্লাইভের মুনশী ছিলেন। এঁরা কেউ বাপমায়ের ছেলে, কেউ শ্বশুর-শাশুড়ীর ঘরজামাই, কেউ যুধিষ্ঠিরের ছোট ভাই, কেউ মামার ভাগনে, কাকার ভাইপো, পিসিমার ভাইপো অথবা জামাইবাবুর শালারূপে কলকাতা শহরে বিরাজ করেন। অর্থাৎ কেউ সংসারী বা আত্মনির্ভর নন, সকলেই বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ী, দাদা, কাকা, পিসি বা শাঁসাল জামাইবাবুর গৃহে বাস করে—হয় লেখাপড়া, গানবাজনা, ছবি আঁকা শিখছেন, না হয় কোন চাকরি বা বিবাহের যোগ্য পাত্রীর সন্ধান করছেন। হাতখরচ ওরফে হোটেল-রেস্টুরেণ্ট-সিনেমা-আড্ডার খরচ চাওয়াও যায় না, যোগাড় করাও সম্ভব নয়, সুতরাং উপায় কি? দামী দামী জিনিসপত্তর যে সব বাপ, কাকা, দাদা, মামা, শ্বশুর জামাইবাবুদের আছে সেগুলি তাঁদের ছেলে, ভাইপো, ভাই, ভাগনে, জামাই ও শালারা একে-একে সরিয়ে চোরাবাজারে সাফ করে দেন। যাঁদের দামী জিনিস নেই তাঁদেরও রেহাই নেই। লীলা চিট্‌নীশ ও অশোককুমারের 'হিট' ফিল্ম দেখবার জন্যে বৃদ্ধ বাবার এক-জোড়া বুট জুতো পর্যন্ত পুত্রকে চোরাবাজারে বেচে দিতে দেখেছি। আর

যা যা দেখেছি, যে দামে বেচতে তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দিচ্ছি, ব্রাকেটের ভেতরের নাম দেখে বিক্রেতা ও জিনিসের মালিকের মধ্যে সম্পর্কটাও বোঝা যাবে—

বুট জুতো (বাবার)	:	২॥০
গড়গড়ার নল (দাদামশাইয়ের)	:	১৸০
র‍্যালির ছাতা (কাকার)	:	২৲
পার্কার কলম (জামাইবাবুর)	:	৫৲
পকেট ঘড়ি (শ্বশুরের)	:	১৫৲
পোর্টফোলিও (দাদার)	:	৪৲
পিতলের শিবমূর্তি (মার)	:	১॥০
ঢাকাই শাড়ি (শাশুড়ীর)	:	৫৲
তসরের থান ধুতি (পিসিমার)	:	৬৲

তালিকা অনেক বাড়ানো যায়, তবে বাড়িয়ে লাভ নেই। অনেকে হয়তো তালিকা দেখে ভাবলেন যে আমি বড্ড বাড়িয়ে বলছি, কিন্তু তা নয়। সেদিনও দেখেছি, জুতো চুরির জন্যে ক্রুদ্ধ পিতা তাঁর পুত্রকে ধরে জুতোপেটা করছেন, জুতো জোড়াটা কাগজে মুড়ে নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় ছেলেটা হাতেনাতে ধরা পড়েছিল। তা ছাড়া বাবার উপর ভক্তি থাকলেও বাবার জুতোর উপরও যে ভক্তি থাকবে, এমন কোন কথা নেই, তার চেয়ে অনেক বেশী ভক্তি পদ্মা দেবী, রেবা, অরুণা, প্রতিমা, রাজলক্ষ্মীর অ্যাক্টিং-এর উপর স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারে। সুতরাং চোরাবাজারে যেতেই হয়। আমার কথা যাঁরা অবিশ্বাস করবেন, তাঁরা যাচাই করে দেখতে পারেন। জুতো, ছাতি, কলম, ঘড়ি ইত্যাদি যাঁদের নিয়মিত চুরি যায়, তাঁরা পরের দিন সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারে খোঁজ করলেই সেগুলো দেখতে পাবেন।

সেকেণ্ডহ্যাণ্ড শহরের দ্বিতীয় কেন্দ্র হল 'অক্‌শন হাউস' বা নিলাম ঘরগুলো। এ বেশ চমৎকার ব্যবসা, কতকটা ব্যাঙ্কের পরের ধনে পোদ্দারির মতন। কলকাতায় কয়েক শো নিলেম ঘর আছে, অধিকাংশ মধ্য-কলকাতায় ডালহৌসি থেকে পার্ক স্ট্রীট-চৌরঙ্গীর মধ্যে। নামকরা বড় বড় 'অক্‌শন হাউস' আছে গোটা ছয়েক। সব হাউসেই সাধারণত

সপ্তাহের কোন নির্দিষ্ট দিনে নিলেম হয়। শহরের অনেক লোক, বিশেষ করে বিদেশীরা ও বড় বড় লোকেরা, জিনিসপত্র বিক্রি করেন এইসব অক্‌শন হাউসের মারফতে। জিনিস পৌঁছে দিয়ে আসতে হয় এবং বিক্রি হলে নিলেমীরা তাঁদের কমিশন ও ভাড়া কেটে নিয়ে প্রাপ্য মূল্য দিয়ে দেন। ইচ্ছা করলে আপনি নিজের বাড়িতেও কোন অক্‌শনীয়ারকে ডেকে জিনিসপত্র নিলেম করাতে পারেন, তার জন্যে আলাদা ফি দিতে হয় একটা। এইভাবে কলকাতায় অনেক বড় বড় লোকের, অনেক বিদেশীদের মূল্যবান জিনিস সব প্রায়ই নিলেম হয়ে যায়, খবরের কাগজে তার বিজ্ঞাপনও লক্ষ্য করলে প্রায় দেখতে পাবেন। নিলেমে গেলেই যে জিনিস সস্তায় কেনা যায় তা নয়, রীতিমত বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা না থাকলে অধিকাংশ সময় বেশী দামে জিনিস কিনে ঠকে আসতে হয়। প্রথমত সমস্ত ডিলার বা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ব্যবসায়ীরা, এমনকি নতুন (বিশেষ করে ফার্নিচার) ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত অক্‌শনে জিনিস কেনেন, তাঁদের সঙ্গে অক্‌শনীয়ারদের যোগাযোগ থাকে এবং বাইরের লোক কিনতে গিয়ে পাত্তা পায় না। তাছাড়া অনেক সময় বিক্রেতাদের নিজেদের লোক অক্‌শনে উপস্থিত থেকে 'ডাক' দিয়ে 'দাম' বাড়াতে থাকে এবং বাইরের অনভিজ্ঞ লোক ফাঁদে পড়ে বেশি দামে কিনতে বাধ্য হয়। সুতরাং অক্‌শনে হঠাৎ একলা কোন জিনিস কিনতে যাওয়া বিপজ্জনক। কিছুদিন ঘুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তারপর কেনা ভাল ব্যবসায়ী, অথবা কোন ডীলারের সঙ্গী হয়ে যাওয়া সবচেয়ে ভাল।

শুধু অকশনে নয়, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারেও জিনিস কেনা ভয়ানক শক্ত। যদি বৈঠকখানায় বা মল্লিকবাজারে কখন গিয়ে থাকেন, দেখবেন বড় বড় দোকানদার থেকে ক্ষুদে হকারশ্রেণীর খুচরো দোকানদাররা পর্যন্ত অত্যন্ত চালাক ও বুদ্ধিমান। কোন্ জিনিস নতুন বাজারে দুষ্প্রাপ্য, এ তাদের নখদর্পণে। তাছাড়া তারা ক্রেতার হাবভাব দেখলেই বুঝতে পারে, কার কোন্ জিনিসটার কি রকম দরকার, সেই বুঝে সাধারণত সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারে জিনিসের দাম হয়, জিনিস হিসেবে নয়। নতুন বাজারে কোন হাঙ্গামা নেই, কিন্তু চোরাবাজার রীতিমত মনোবিদ্যার

একটা ল্যাবরেটরী বলা চলে। চোরাবাজারে সব সময় নিস্পৃহ হয়ে জিনিস কিনবেন, হাঁকপাক করবেন না, আগ্রহের আতিশয্য, ওটা না হলে চলবে না, এ রকম ভাব দেখাবেন না। যদি দেখান, তাহলে নির্ঘাৎ আট আনার জিনিস আট টাকায় কিনে নিয়ে আসবেন, আর যদি দোকানদারকে ঠিকমতন ট্যাক্‌ল করতে পারেন, তাহলে আট টাকার জিনিস স্বচ্ছন্দে চার টাকায় কিনতে পারেন।

ফুটপাথের বই

স্বনামধন্য বা উদীয়মান লেখকদের আজও অবশ্য কলকাতা শহরে ফুটপাথে বসে ভিক্ষে করতে দেখিনি, তবে তাঁদের বই বহুদিন আগে থেকেই ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতে তাঁদের আসার পথ সুগম করছে। বই এসেছে অথচ লেখক আসেন নি, এটা নেহাতই ভাগ্যের কথা। ফুটপাথের এপাশে প্রকাশক, ওপাশে প্রকাশিত বইয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কলেজ স্ট্রীটে যেরকম দেখা যায়, এরকম আর কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। জন্মালেই যেমন মানুষকে একদিন মরতেই হবে, তেমনি লিখলেই একদিন সেই বই ফুটপাথে আসবেই। ব্যাপারটা একটা বৈজ্ঞানিক নিয়মের মতন ক্রমেই এমন অকাট্য হয়ে উঠছে যে, অনেক গ্রন্থোন্মাদকে পর্যন্ত এই নিয়ম অনুযায়ী আমি বই কলেক্ট করতে দেখেছি। কলকাতা শহরে যে কয়েকশ্রেণীর 'উন্মাদ' বা 'বাতিকগ্রস্ত' লোক আছেন তার মধ্যে গ্রন্থোন্মাদরা অন্যতম। ফুটপাথের বইয়ের প্রধান ক্রেতা তাঁরাই। সমস্ত

কলকাতা শহরের অলি-গলি, রাস্তাঘাট তাঁরা টহল দিয়ে বেড়ান, ফুটপাথের বইয়ের সমস্ত সেণ্টার তাঁদের নখদর্পণে। সিনেমা থিয়েটার বা কোন আড্ডাতেই তাঁরা যান না, যাবার সময় নেই, মাথার মধ্যে সব সময় ফুটপাথের বই ঘুরছে এবং তার সন্ধানে তাঁরা অবসর সময়টুকু ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রায়ই দেখবেন তাঁরা ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছেন এবং যেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন সেখানেই দেখবেন কতকগুলো বই ফুটপাথে ছড়ানো আছে এবং তাঁরা ক্ষ্যাপার পরশপাথর খোঁজার মতন তার মধ্যে কি খুঁজছেন। বাস্তবিকই তাঁদের উন্মাদ ছাড়া কিছু বলা যায় না। আমি নিজে একজন এই ধরনের অর্ধোন্মাদ বলে দু-চারজনের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হয় এবং পরিচয়ও আছে। স্ত্রীর শাড়ি কিনতে বেরিয়ে ফুটপাথ থেকে একপাঁজা বই কিনে বাড়ি ফিরছেন, এরকম লোকও দেখেছি। একজনকে জানি, তাঁর সংসার অচল, কিন্তু প্রথম সংস্করণের বাতিক দুর্দমনীয়। অর্থাৎ শুধু পুরনো বই নয়, নামকরা বইয়ের 'প্রথম সংস্করণ' সংগ্রহ করার একটা বাতিক আছে তাঁর। ঘরেতে তাঁর সম্বল বলতে বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু একটা ভাঙা আলমারিতে 'প্রথম সংস্করণ' বই ঠাসা আছে। তাছাড়া বই সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক নিয়মের কথা বলেছি—লিখলেই বই একদিন ফুটপাথে আসবে—সে সম্বন্ধেও অনেকের অবিচলিত বিশ্বাস দেখেছি। জীবনে তাঁরা কখনও নতুন বই দোকান থেকে কেনেন না, অথচ সমস্ত নতুন ভাল বইয়ের খোঁজ রাখেন। যদি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন ঃ 'অমুক বইটা কিনেছেন, নতুন বেরিয়েছে, খুব ভাল বই'—তাঁরা নিঃসঙ্কোচে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, বেরিয়েছে জানি, এই মাস দুয়েক হল বাজারে বেরিয়েছে। এখনও কিনিনি, কিনবো, আরও মাস তিন চার পর আশা করছি, তার মধ্যেই বইটা ফুটপাথে পাওয়া যাবে।' আদার ব্যাপারী হলে এই উত্তর শুনে হয়ত আঁৎকে উঠবেন, যদি নতুন লেখক হন তাহলে হয়ত মর্টালি উণ্ডেড্ হবেন। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই তাই। উত্তরের উদাসীন ভঙ্গী দেখলেই বুঝবেন, ভদ্রলোকের কি অগাধ বিশ্বাস, যেন সমস্ত লেখক ও তাঁদের বইয়ের 'রাজজ্যোতিষী' তিনি। কোন্ বইয়ের কি 'ডেস্টিনি' সবই যেন তাঁর জানা। বাস্তবিকই বইয়ের

ভাগ্যগণনা করতে এঁদের মতন ওস্তাদ আর কাউকে দেখা যায় না। এই শ্রেণীর দু-একজন বইয়ের গণৎকারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। কোন্ বিষয়ের বই, কোন্ লেখকের বই কতদিনের মধ্যে 'হাফ্' দামে ফুটপাথে বিক্রির জন্যে আসবে, তা তাঁরা যেন বই দেখেই বা বইয়ের নাম শুনেই বলে দিতে পারেন। এইভাবে মোটামুটি বইয়ের একটা ঠিকুজী বা কোষ্ঠী আমি তাঁদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। সেই কোষ্ঠীটা আমি এখানে উল্লেখ করছি এবং সেটা দেখলেই বুঝবেন কোন্ শ্রেণীর বই আন্দাজ কতদিনের মধ্যে ফুটপাথে 'হাফ প্রাইসে' পাওয়া যাবে।

কবিতা	২ সপ্তাহ
গুরুগম্ভীর বিষয়ের বই	১ মাস
ইতিহাস, রাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, সমালোচনা	৩ মাস
ভাল উপন্যাস	৬ মাস
ফিল্ম উপন্যাস	১ বছর
ডিটেকটিভ্	২ বছর
অশ্লীল বা যৌন-বিষয়ক উপন্যাস	৫ বছর
ধর্মগ্রন্থ	৫ দিন

এই গ্রন্থকোষ্ঠীর ফলাফল পরে আমি আরও কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে মিলিয়ে নিয়েছি, মতের বিশেষ কোন তারতম্য লক্ষ্য করিনি। বইয়ের এই হরস্কোপ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকলে, নতুন বই বিক্রি সম্বন্ধেও জ্ঞান হবে। কোন্ বই নতুন অবস্থায় কিরকম বিক্রি হতে পারে, ফুটপাথের বই-এর কোষ্ঠীবিচার থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। বই সম্বন্ধে যে অকাট্য বৈজ্ঞানিক নিয়মের কথা বলেছি—অর্থাৎ লিখলেই বই ফুটপাথে আসবে—তার একটা করোলারিও উপরের ক্যাটালগ থেকে বেরিয়ে পড়ে। করোলারিটা এই : যে বই যত অল্পদিনের মধ্যে ফুটপাথে আসে, সেই বই তত অল্প বিক্রি হয় নতুন এবং যে বই যত বেশি দিনের মধ্যে আসে সেই বই বিক্রি হয় তত বেশি। দ্বিতীয় করোলারিটাও এর

থেকে সোজা টানা যায়ঃ ক্রেতার সঙ্গে বিশেষ বিষয়ের বইয়ের সম্পর্কের ভেতর দিয়ে সমাজের মনোভাবটা ধরা যায়, বেশ বোঝা যায়, বর্তমান সমাজে মানুষের মন ধর্ম বা কাব্যিক কল্পনার খোরাক চায় না, গম্ভীর বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার মতন সময় বা প্রবৃত্তি নেই মানুষের, এমন কি একখানা ভাল উপন্যাসও ধৈর্য ধরে পড়বার অবসর নেই। মানুষের জীবন ও মন চাঞ্চল্যপ্রবণ হয়ে উঠেছে, আনন্দ ক্রমেই ক্ষণস্থায়ী রোমাঞ্চে পর্যবসিত হচ্ছে, বলিষ্ঠ কল্পনার চাইতে দিবাস্বপ্নের মনোমৈথুন অনেক বেশি উপভোগ্য বোধ হচ্ছে, তাই ফিল্ম আর ডিটেকটিভ কাহিনীর চাহিদা বাড়ছে বেশি এবং খাঁটি সাহিত্যের মূল্য কমছে। ফুটপাথের বই থেকে এই কথাই মনে হয়। বাংলার ও বাঙালীর কালচারের কি হাল হচ্ছে তা কলকাতার ফুটপাথে দাঁড়ালেই বোঝা যায়।

কলকাতার এই ফুটপাথের বইয়ের রহস্যটা জানা দরকার। এর একটা বিরাট জটিল অর্গানাইজেশন আছে যা অনেকেই জানেন না, কারণ পুরনো বইয়ের ব্যবসায়ীদের সেটা ট্রেড-সীক্রেট। বহুকাল ধরে এই মহলে ঘোরাফেরা করে যেটুকু জানতে পেরেছি, তাই জানাচ্ছি। ব্যবসাটা প্রধানত একটা বিশেষ সম্প্রদায়েরই একচেটে। উপরের কয়েকজন বড় বড় ব্যবসায়ী আছেন, তাঁদের কলেজ স্ট্রীট, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, ওয়েলেসলি, নিউমার্কেট অঞ্চলে দোকানও আছে। কিন্তু তাঁরা বই সংগ্রহ করেন কি করে জানেন কি? কোন বই বিক্রি না হলে বেশীদিন, প্রকাশকরাই সস্তা করে এঁদের কাছে বেচে দেন। এটা অবশ্য খুবই নগণ্য সোর্স। বই ছাপা হলে দপ্তরীর বাড়ি ফর্মাগুলো থাকে, দপ্তরীরাও একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক, পুরনো বইয়ের কারবারীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রীতিমত ঘনিষ্ঠ। ফর্মা গোলমাল করে অনেক নতুন বই তারা কাগজের মলাট দিয়ে সস্তা দামে বিক্রি করে দেয় এদের কাছে। প্রকাশকরা যখন লালবাতি জ্বালেন তখন তাঁদের বই যা দপ্তরীর বাড়ি থাকে, তা সোজা পুরনো ব্যবসায়ীদের কাছে চলে যায়। বড় বড় লাইব্রেরির (যেমন ন্যাশনাল বা এসিয়াটিক সোসাইটি ইত্যাদি) বেয়ারারাও একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক, তারাও অনেক সময় অনেক মূল্যবান ও

দুষ্প্রাপ্য বই ব্যবসায়ীদের কাছে পাচার করে দেয়। ছাপমারা এরকম দু-একখানা বই আমি দেখেছি। এছাড়া কলকাতায় বা নানা জেলাতে পর্যন্ত অনেক বই-কলেক্টর আছেন, যাঁদের খুব ভাল প্রাইভেট লাইব্রেরি আছে। তাঁদের জীবদ্দশাতেই সাধারণত তাঁদের বংশধররা দু-চারখানা করে বই পাচার করতে থাকেন হাতখরচের জন্যে। তাঁদের মৃত্যু হলে তো কথাই নেই, পিতার সারাজীবনের সংগ্রহ, বা পারিবারিক সংগ্রহ সব তাঁরা এই ব্যবসায়ীদের কাছে উজাড় করে দেন। আশ্চর্য হল এই যে, ব্যবসায়ীরাও এঁদের খোঁজখবর রাখেন, কোথায় কার কি রকম বইয়ের কলেক্‌শন আছে তা জানেন এবং কে কবে মরছে, অথবা কোন্ সুধী বিদ্যোৎসাহী পিতার গুণধর পুত্র উড়তে শিখে সেই সব বই বেচছে, তার সব খোঁজ এঁদের মুখস্থ। মধ্যে মধ্যে দেখেছি, কলকাতার ফুটপাথে অনেক নামজাদা লোকের বইয়ের কলেক্‌শন বিক্রি হচ্ছে, সেগুলো এই-ভাবেই যোগাড় করা। অনেক সময় প্রকাশ্যে নিলেমঘরে অনেক লাইব্রেরি নিলেম হয়ে যায়, সেখান থেকেও ব্যবসায়ীরা কেনেন। তাছাড়া বিক্রিওয়ালা যারা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে পুরনো শিশিবোতল থেকে কাগজ-পত্রিকা-বই পর্যন্ত কিনে বেড়ায়, তারা সেগুলো নিয়ে এসে এক জায়গায় জড়ো করে। এরকম দু'টি কেন্দ্রের একটি আছে আলীপুরে আর একটি অপার সার্কুলার রোডে। এখান থেকে বইগুলো আলাদা বেছে নিয়ে ব্যবসায়ীরা চলে যায়। এইসব জায়গা থেকে আমিও নিজে কয়েকখানা অত্যন্ত মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ কিনেছি, যা ব্যবসায়ীদের হাতে পড়লে অন্তত বিশগুণ মূল্যে কিনতে হত। এইভাবে নানাস্থান থেকে নানা উপায়ে বই সংগ্রহ করেন ব্যবসায়ীরা, তারপর সেগুলো বেছে বড় মাঝারি ছোট দোকান থেকে ফুটপাথ পর্যন্ত বিক্রির জন্যে দিয়ে দেন। পুরনো বইয়ের ব্যবসায়ীদের এই সংগঠন নতুন বইয়ের প্রকাশকদের চাইতে অনেক বেশি বিস্তৃত রহস্যময় ও ইণ্টারেস্টিং, বিশেষ করে কলকাতা শহরে। বই যাঁরা সংগ্রহ করেন তাঁরা নিশ্চিত জানবেন যে, তাঁদের বংশধররা সেটা বেচে দেবেন এবং ব্যসায়ীরা সে ব্যাপারে আরও বেশি নিশ্চিন্ত। এক বৃদ্ধ ঝানু ব্যবসায়ীর মুখে শুনেছি, একই 'মহাভারত' তিনি তিনবার এক

টাকা হারে কিনে কুড়ি টাকায় বিক্রি করেছেন। প্রথম যাঁর কাছে বিক্রি করেছেন তিনি মারা যাবার পর আবার সে বই ব্যবসায়ীর হাতে এসেছে—তারপর আবার তা বিক্রি হয়েছে। দ্বিতীয়বার চোরাই অবস্থায় তাঁর হাতে এসেছে, তৃতীয়বার আবার সেইভাবেই বেচেছেন। মহাভারতের মতন সমস্ত বইয়ের সার্কুলেশন এইভাবে পুরনো বাজারে হয়।

ফুটপাথের বইয়ের এই হল রহস্য। সুতরাং আপনি যত স্বনামধন্য লেখকই হন না কেন, আপনার বই ফুটপাথ পর্যন্ত পৌঁছবেই এবং পৌঁছেচে দেখে আপনি একটুও বিচলিত হবেন না। এই হল বইয়ের নিয়তি বা ডেস্টিনি। সুতরাং লেখক হিসাবে কোন ভ্যানিটি থাকা আপনার উচিত নয়। দ্বিতীয় কথা আপনি যত বড় বইয়ের কলেক্টর হন না কেন, আপনার পাঠাগার আপনার বংশধররা নিশ্চয়ই বেচে দেবে জানবেন। সুতরাং যক্ষের ধনের মতন বই না আগলে, বই যারা পড়তে চায় তাদের পড়তে দেবেন, অথবা মরবার আগে যা কিছু বই জীবনে সংগ্রহ করেছেন সব কোন জাতীয় সাধারণ প্রতিষ্ঠানে দান করে যাবেন মনে করে। ফুটপাথের বই থেকে এই নৈতিক শিক্ষা, আশা করি, সকলেই গ্রহণ করবেন।

ভোরের কলকাতা

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।

এই অমর কবিতা যিনি লিখেছিলেন তিনি কলকাতার কবি নন, এমন কি একশ' বছর আগেকার কলকাতারও নন। গির্জার ঘড়িতে যখন টুং টাং ঢং করে রাত চারটে বেজে গেল, তখনই জানা গেল কলকাতায় ভোর হয়েছে। বড়মানুষদের বাড়িতে কাকাতুয়া ডাকছে। বার-ফট্‌কা বাবুরা ঘরমুখো হয়েছেন। উড়ে বামুনরা খাবারের দোকানে ময়দা পিষতে আরম্ভ করেছে। রাস্তায় আলোর আর তত তেজ নেই। ফুরফুরে হাওয়া উঠেছে। বারবনিতাদের বারান্দায় কোকিলেরা ডাকতে আরম্ভ করেছে। দু-একবার কাকের ডাক, কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ রব ভিন্ন এখনও এই মহানগর যেন লোকশূন্য। ক্রমে 'রামের মা চলতে পারে না', 'ওদের ন' বউটা কি বজ্জাত, মা' ইত্যাদি নানা কথার আলাপ করতে করতে দু-একদল মেয়েরা গঙ্গাস্নান করতে বেরিয়েছেন। পুলিশের সার্জেন্ট, দারোগা, জমাদার রাতের ডিউটি সেরে মস্‌মস্‌ করে থানায় ফিরে যাচ্ছেন। গুপুস্‌ করে তোপ পড়ে গেল। কতকগুলো কাক 'কা' 'কা' করে বাসা ছেড়ে উড়বার উজ্জুগ করল। দোকানীরা দোকানের ঝাঁপতাড়া খুলে গন্ধেশ্বরীকে প্রণাম করে দোকানে গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক খাবার ব্যবস্থা করছে। ক্রমে ফরসা হয়ে এল। মাছের ভারিরা দৌড়ে আসতে লেগেছে, মেছুনীরা ঝগড়া করতে করতে তাদের পিছু দৌড়েছে। বাজ্‌রা বাজ্‌রা আলু বেগুন আসছে বাজারে। টুলো পুজুরি ভট্‌চাজ্জিরা কাপড় বগলে করে গঙ্গাস্নান করতে চলেছেন, যজমানের বাড়ি সকাল সকাল যেতে হবে। আধবুড়ো বেতোরা মর্নিং ওয়াকে বেরুচ্ছেন। 'উড়ে

বেহারারা দাঁতন হাতে করে স্নান করতে দৌড়েছে। ইংলিশম্যান, হরকরা, ফিনিক্স, এক্সচেঞ্জ গেজেট গ্রাহকদের দরজায় উপস্থিত হয়েছে। এদিকে দেখতে দেখতে ক্রমে সূর্য উদয় হলেন।

প্রায় একশ বছর আগে হুতোমপেঁচার আমলে কলকাতায় এইভাবে ভোর হত। এখনও ভোর হয় আগেকার মতন, কিন্তু হুতোমী আমলের ভোর কলকাতায় আর হয় না। হুতোমেরও কোকিলের ডাক শোনার সৌভাগ্য হয়েছে কিন্তু কালপেঁচার হয়নি। কালপেঁচার রাত ভোর হয় কাকের কর্কশ 'কা' 'কা' ডাক শুনে, কোকিলের 'কুহু' 'কুহু' ডাকে নয়। বীরকৃষ্ণ দাঁ বা প্যালানাথবাবুর মতন যে সব বাঙালী বড়মানুষ হুতোমের আমলে ছিলেন, 'বন্ কি চিড়িয়ার' মতন মন ছিল তাঁদের, শখ করে তাঁরা অনেক কিছু পাল্‌তেন—মোসাহেব, মেয়েমানুষ, বনমানুষ, বাঁদর, ঘোড়া, কুকুর, বনবিড়াল,—বাড়ির ভেতরে হলঘরে, বারান্দায়, দরজার মাথায় অসংখ্য খাঁচা ঝুলত, খাঁচার ভেতর থাকত টিয়া ময়না হরবোলা কোকিল কাকাতুয়া লালমোহন। সুতরাং ভোর হলে বড়মানুষের বাড়ির কাকাতুয়ার ডাকে পাশের বাড়ির গরীব মানুষদের ঘুম ভাঙত সেকালের কলকাতায়। এখন কলকাতার শান বাঁধানো ইস্পাতের কংক্রীটের মূর্তির মতন শহরের বড়মানুষদের মনের চেহারাটাও বদলেছে, রসকস কিচ্ছু নেই। তাছাড়া বাঙালী প্যালানাথবাবুরা অনেকদিন হল পটল তুলেছেন। এখন যেসব অবাঙালী ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালারা আছেন তাঁদের গুদাম-ঘরে কাকাতুয়ার জায়গা হয় না, 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্, শিব শঙ্কর' শব্দে তাঁদের ঘুম ভাঙে। ঘুম ভাঙা মাত্রই মাথার পাশের টেলিফোনটা তুলে যথাস্থানে বাজারদর জেনে নিয়ে তাঁরা ভুঁড়ি খুলে তেল মাখতে বসেন। তারপর দলে দলে তাঁরা সগৃহিণী বড়বাজারের গঙ্গার ঘাটমুখো রওনা হন, হাতে ঝক্‌ঝকে লোটা, মুখে ব্যোম্ ব্যোম্ আওয়াজ। অনেকে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মালিশওয়ালাকে দিয়ে তৈলমর্দন করান। সে একটা দেখবার মতন দৃশ্য। ভোরের কলকাতার এ অনুপম দৃশ্য যদি আজও কেউ না দেখে থাকেন, দোহাই তাঁর, একবার যেন তিনি বেঁচে থাকতে দেখে নেন্। ওপারে হাওড়া, এপারে কলকাতা, মধ্যে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা। এপারের

গঙ্গাতীরে ঝুনঝুন্‌ওয়ালারা জলহস্তীর মতন বিশাল বপুটাকে প্রায় অনাবৃত করে, কেউ চিৎ, কেউ বা উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন, তার ওপর নীট্‌ তিন মণ ওজনের বিহারী মালিশওয়ালারা চড়াও হয়ে ময়দা ডলার মতন তেল দিয়ে গা ডলছে, গঙ্গার বুক থেকে সমবেত আজমীরী-যোধপুরী কণ্ঠের ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ আওয়াজ উঠছে আকাশের দিকে, মা গঙ্গা বড়বাজারের সমস্ত গুদামজাত পাপ ধুয়ে নিয়ে সাগরাভিমুখে রওনা হচ্ছেন। এ কিন্তু সেই হুতোমের আমলের ন'বউদের ভোরের গঙ্গাস্নান নয়, একালের নবাবদের গঙ্গাস্নান। তাই বলছি, কাকাতুয়ার ডাকে কলকাতায় আর ভোর হয় না, শোভাবাজারে বা শ্যামবাজারেও না। বৃষভের মতন ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ শব্দে কলকাতায় ভোর হয় এখন, সব বাজারের আগে বড়বাজারে। কলকাতার এই ভোরের দৃশ্যই সবচেয়ে উপভোগ্য। কলকাতার সিংহদ্বার বড়বাজার, সিংহদ্বারে সূর্যোদয় হল। গঙ্গাস্নান করে পাপমুক্ত হয়ে এসে কলকাতার যোধপুরী-মাড়ওয়ারী মহাদেবরা কপালে আর ভুঁড়িতে তিলক কেটে তাকিয়া ঠেস দিয়ে সিন্দুকের চাবি নিয়ে বিভিন্ন পট্টির গদিতে বসলেন। তারপর হুতোমী আমলের কুকুরের 'খেউ খেউ' শব্দে নয়, কেবল ভুঁড়িওয়ালাদের 'ভাও' 'ভাও' শব্দে জেগে উঠলো কলকাতা।

কলকাতার বাঙালী বাবুরা তখন কিন্তু ঘুমুচ্ছেন, জাগেননি। সাত-পুরুষের ঘুমের ঘোর একপুরুষে কাটিয়ে ওঠা সহজ ব্যাপার নয়। মোটা মাইনের সরকারী চাকরি যাঁরা করেন তাঁরা পার্ক স্ট্রীট, চৌরঙ্গীর তিন তলার ফ্লাটে 'ফ্ল্যাট্‌' হয়ে ঘুমুচ্ছেন, ফ্যানের তলায় নাক ডাকছে উপরে, নিচে রাস্তার উপর একদল গরুও হয়ত তখনও ঝিমুচ্ছে। ঘুম যাঁদের ভেঙেছে তাঁরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে আড়ামোড়া ছাড়ছেন, হাই তুলছেন, 'ব্যোই' কখন 'বেড টি' নিয়ে আসবে তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। বাঙালী মধ্যবিত্ত পাড়ায়, শ্যামবাজারে ও ভবানীপুরে, কেরানীবাবুরা তখনও ঘুমুচ্ছেন, আফিসের হাড়ভাঙা খাটুনি, সংসারের দুশ্চিন্তা, মশা ও ছারপোকার কামড়ে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম কিছুতেই হয় না বলে ভোরের দিকে ঘুমটা জমে উঠেছে। গৃহিণীরা উঠে আঁচ দিয়েছেন, উনুনে,

কলকাতার বাঙালী পাড়ার ভোরের আকাশ ভরে গেছে ধোঁয়ায়। তার মধ্যে ছেলেপিলেরা কেউ হাঁচছে, কেউ কাসছে, কেউ কাঁদছে, বুড়ী আর বিধবারা ঘর ধুচ্ছে, কেউ বা ঘটি গামছা নিয়ে গঙ্গামুখো যাচ্ছে। হেঁচে, কেসে, কেঁদে, হাই তুলে আর ধোঁয়ায় চোখ ঝল্‌সে ভোর হল শ্যামবাজারে আর ভবানীপুরের বাঙালী পাড়ায়। বড়বাজারে তখন রোদ উঠেছে, ভাউও চড়েছে। রিটায়ার্ড বাঙালীরা বাতে আর ডায়েবিটিসে ভুগছেন বলে আরও কিছুদিন পেন্সন ভোগের আশায় মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছেন। একদল প্রৌঢ় বৃদ্ধ বাঙালী ভোরে গঙ্গাস্নানে যান বটে, কিন্তু কালীঘাট বা বাগবাজারের গঙ্গার ঘাটে কোন তৈল দলাইমলাইয়ের দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না।

বাঙালী ব্যবসায়ী যাঁরা তাঁরা অধিকাংশই দোকানদার, ভোর হতে তাঁদেরও দেরী আছে। বিহারী মিঠাইকচুরির দোকান অনেক আগেই দরজা খুলে ভিয়েন্‌ বসিয়ে গরম গরম কচুরি আর হালুয়া রেডী করে রেখেছে, দু-একজন খদ্দের ঢুকে খাচ্ছেনও। পাঞ্জাবীর দোকানে বড় বড় মগে করে চা ফাঁটা হচ্ছে। এমন কি কলসী মাথায় মোবাইল্‌ বিহারী 'রেস্তোরাঁরা'ও পথে বেরিয়ে ধাঙ্গড় মুটেদের ঘিরে জমিয়ে বসেছে। কিন্তু যত জনপ্রিয়ই হোক, বাঙালী চায়ের দোকান তখনও ঝাঁপ খোলেনি, অন্য দোকান তো দূরের কথা। বাড়িতে সব কিছুর ব্যবস্থা করে দোকানে আসতে তাঁদের দেরী হয়ে যাচ্ছে। অন্যদের দোকানে গন্ধেশ্বরী যখন বাতাসা আর গঙ্গাজল ব্রেকফাস্ট করে বিশ্রাম নিচ্ছেন, বাঙালীর দোকানে বন্ধ ঘরে ঘুমন্ত গন্ধেশ্বরীর মাথায় তখন ছুঁচো লাফাচ্ছে।

ভোর হয়েছে কেবল বাঙালী জেলে মেছুনী আর চাষীদের। পিল্‌ পিল্‌ করে লোকাল ট্রেনে তারা শিয়ালদহতে এসে জমছে, সেখান থেকে হন্‌ হন্‌ করে ছুটছে কোলেবাজারের দিকে। হল্লা আর চীৎকারে বৌবাজারের মোড় সরগরম। মাছের দুর্গন্ধ, নিলামের ডাক, সব্‌জির বজরার ছড়াছড়ি, আবর্জনার স্তূপ, ঠেলাগাড়ির ঠেলাঠেলি। এই হল বৌবাজারে বাঙালীর ভোর। এই ভোরের সঙ্গে কলকাতার বড়বাজারের ভোরের অনেক তফাত নয় কি? কলকাতা শহরে এই দু-রকমই 'ভোর'

আছে—এক বড়বাজারী ভোর, আর এক বউবাজারী ভোর। ভবানীপুর বা শ্যামবাজারে যে আরএক রকমের ভোর দেখা যায়, তার মধ্যে এক-আধদিন বাসি বিয়ের নহবতের সুর আর লাল নীল বাতি ছাড়া নতুনত্ব বিশেষ কিছু নেই। মনে হয় যেন যোধপুরী আর বিহারী কলকাতায় ভোর হয়, বৃটিশের কলকাতাতেও সূর্য ওঠে গড়ের মাঠে, কিন্তু বাঙালীর কলকাতায় ভোর হয় কদাচিৎ।

দ্বিপ্রহরের কলকাতা

সকাল সন্ধ্যা নয়, দ্বিপ্রহরই কলকাতা শহরে সবচেয়ে বেশি রোমান্টিক। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক, দিক্‌ভ্রান্ত বেকার ও বিভ্রান্ত দালালের দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকার সময় দ্বিপ্রহর। তা সত্ত্বেও সকাল-সন্ধ্যার কবি কলকাতায় কিল্‌বিল্‌ করছে, কিন্তু দ্বিপ্রহরের কবি নেই।

দশটা বেজে গেল। সেকেলে আশমানি দোলদার ছক্কড় দু-দশখানা খিদিরপুর ভবানীপুর কালীঘাট আর বারাসতের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। 'কেরাঞ্চি গাড়ির' গাড়োয়ানরা শৌখিন সুরে 'চার আনা, চার আনা', 'লালদীঘি' 'তেরজারী' 'ছোট আদালত' বলে চীৎকার করছে, নবদ্ধাগমনের বৌয়ের মতন দুই একজন কুঠিয়াল গাড়ির মধ্যে বসে আছেন, হয়ত সঙ্গী জুটছে না। দু-চারজন গবর্নমেণ্ট আফিসের কেরানী গাড়োয়ানদের সঙ্গে দর কষাকষি করছেন, অনেকে চটে গিয়ে হেঁটেই চলেছেন, গাড়োয়ানরা হাসি টিট্‌কিরির সঙ্গে 'তবে ঝাঁকা মুটেয় যাও, গাড়ি চড়া কম্ম নয়' বলে কমপ্লিমেণ্ট দিচ্ছে। ছেলেরা বই হাতে করে রাস্তায় চলছে হো-হো করতে করতে। মৌতাতি বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁধে

করে ক্রমে আফিমের দোকান ও গুলির আড্ডায় জম্‌ছেন। হেটো ব্যাপারীরা বাজারে বেচাকেনা শেষ করে বাজ্‌রা নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। কলকাতা শহর বড়ই গুলজার হয়ে উঠেছে—ছ্যাক্‌রার হর্‌রা, সহিসের পৈস পৈস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নর্মাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কাঁপছে। একশ বছর আগে হুতোমের কালে ধীরে ধীরে দুপুর হচ্ছে কলকাতায়। এখন আর 'লালদীঘি' 'ছোট আদালত' বলে গাড়োয়ানদের 'দোলদার ছক্কড়' নিয়ে চেঁচাতে হয় না, চটে গিয়ে কোন কেরানী হেঁটেও আফিস যান না। দু-চারজন যাঁরা যান তাঁরা গাড়োয়ানের উপর রাগ করে যান না, সংসার ব্যাপারে গৃহিণীর সঙ্গে ঝগড়া করে হয়ত যেতে পারেন। কয়েক শ' বাস ট্যাক্সি মোটর রিক্‌শ, 'রাষ্ট্রীয় পরিবহন' কয়েক লক্ষকে ঊর্ধ্বশ্বাসে বহন করে নিয়ে যায়। কুঁদো কুঁদো ওয়েলার নর্মাণ্ডির টাপে নয়, বড় বড় শেভ্রলেট্‌ ও লেল্যাণ্ডের চাপে কলকাতা শহরে দ্বিপ্রহর নেমে আসে। সূর্যদেব গড়ের মাঠে ঠিক 'সেণ্টারে' দেখা দেন।

সকাল নয়, সন্ধ্যা নয়, কলকাতার দ্বিপ্রহর! সবচেয়ে 'ইণ্টারেস্টিং' ও সবচেয়ে 'রোমাণ্টিক'। দশটা-পাঁচটার আফিস-বন্দী কেরানী বা চাকরি-জীবীদের জন্যে নয়, ঘড়ি ও ঘরমুক্ত অসংখ্য তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতী ও কেরিয়ার-হাণ্টারদের জন্যে। কলকাতায় যাঁরা জন্মেছেন ও মানুষ হয়েছেন তাঁরাই জানেন, হাজার হাজার একঘেয়ে সকাল-সন্ধ্যার চেয়ে তাঁদের জীবনে অন্তত দু-চারটে তাপদগ্ধ 'দ্বিপ্রহর' কতদিক দিয়ে কত বেশি 'স্মরণীয়'। রেস্টুরেণ্টের টেবিলে মাছি ভন্‌ভন্‌ করছে, বড় বড় আফিসের ঘরে কেরানী কর্মচারীদের মাথার উপর ফ্যান্‌ ঘুরছে বন্‌ বন্‌ করে, কাটা-ফল আর সোডা-সরবৎ বিক্রির ধুম পড়ে গেছে আফিস-আদালতে, মক্কেল-প্রত্যাশী উকিলরা ট্রাউজারটা হাঁটু পর্যন্ত টেনে তুলে বটগাছের তলায় 'ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে' ভঙ্গীতে বসে আছেন, রাস্তার বাস-ট্রাম কিছুটা ফাঁকা, ধূ ধূ করছে চৌরঙ্গীর উপর আকাশ, সূর্যের ভেতর থেকে যেন আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে। এমন সময় কলকাতা শহরের 'রোমান্স' শুরু হল। হঠাৎ শুনে হয়ত অনেকে চম্‌কে উঠবেন, কিন্তু কলকাতার সবই আজব ব্যাপার, পিলে চমকাবার কোন

কারণ নেই। কলকাতার তরুণ-তরুণীদের 'ফার্স্ট লভ্' বা 'প্রথম প্রেম' নিবেদন করার প্রশস্ত সময় হল দ্বিপ্রহর, অর্থাৎ সেই প্রেম, যে-প্রেম সম্বন্ধে কবি বলেছেন—

'LOVERS SURRENDER
REGARDLESS OF GENDER'

'প্রথম প্রেমে' পড়বার সময় জীবনে সকলেরই একবার আসে, কারণ রসিকশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী জেরোম কে. জেরোমের ভাষায় 'Love is like the measles. We all have to go through it.'—প্রেম কতকটা 'হামের মতন, একবার-না-একবার হামে ভোগা'র মতন, একবার প্রেমে অন্তত সকলকেই পড়তে হবে। সুতরাং কলকাতার প্রেমিক-প্রেমিকাদের কোন অপরাধ নেই। আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রেমে পড়েছেন, আমরা প্রেমে পড়েছি, ভবিষ্যৎ বংশধররাও প্রেমে পড়বে। তার জন্যে চোখ রাঙিয়ে বা শাস্ত্র পড়িয়ে কোন লাভ নেই। যুগে যুগে প্রেমের 'টেক্‌নিক' বদলায়, প্রেম বদলায় না। তা ছাড়া জায়গা বিশেষে প্রেমের রূপ বদলায়, অর্থাৎ 'লভে'র উপর 'জিওগ্রাফি'র প্রভাবটাও অস্বীকার করা যায় না। পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ী প্রেম, মরুভূমির বেদুইনী প্রেম আর শহরে শহুরে প্রেম 'এক' নয়। তেমনি কলকাতার প্রেমেরও একটা নিজস্ব প্যাটার্ন আছে। দুপুর ছাড়া তা নিবেদন করার সময়ই বা কখন? সকালে গার্ডিয়ানরা গার্ড দিয়ে থাকেন, সন্ধ্যায় ঘরের বাইরে থাকা ট্যাবু, সুতরাং দ্বিপ্রহরই একমাত্র সমস্ত বন্ধনমুক্ত। কর্তারা আফিসে যান, নিজেদেরও স্কুল-কলেজে যাবার নাম করে ঘরের বাইরে বেরুবার সময় হয়, অতএব ইশারায় বা চিরকুটে যোগাযোগ করে নিলে 'নিবেদনে'র অসুবিধা হয় না। তাই কলকাতার 'ফার্স্ট লভ্' যদি কেউ দেখতে চান তাহলে তাঁকে ঠিক ভর দুপুরবেলা প্রথম যেতে হবে ঢাকুরিয়া লেকে, তারপর লেক থেকে চিড়িয়াখানায়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লে, ইডেন গার্ডেনে, গড়ের মাঠে। মোটামুটি এই কটা জায়গায় নিরীহ পাড়াগেঁয়ে লোকের মতন দুপুর রোদে ছাতি মাথায় দিয়ে একবার ঘুরে এলেই 'ফার্স্ট লভে'র একটা আইডিয়া হবে। দেখবেন, এখানে-ওখানে গাছতলায়

বেঞ্চের উপর, মাটিতে জোড়ায় জোড়ায় বসে আলাপ চলেছে—স্কুল-কলেজে অবশ্য প্রক্সির ব্যবস্থা আছে। দুপুরবেলা ফ্যানের তলায় বসেও কলম পিষতে পিষতে যখন গলদঘর্ম হয়ে উঠেছেন কলকাতার কেরানীরা তখন তাঁদেরই পুত্র-কন্যারা লেকে, চিড়িয়াখানায়, গড়ের মাঠে বা ইডেন গার্ডেনে গাছতলায় বসে হয়ত বলাবলি করছে ঃ

'WE WILL RULE PASSION'S
KINGDOM FOR A DAY,
FOR THAT'S THE BOHEMIAN WAY.'

দুপুরের কলকাতার এই প্রেমের তীর্থস্থানগুলি ছাড়া, আরও দু-একটা জায়গা আছে উল্লেখযোগ্য। তার মধ্যে অক্টর্লোনি মনুমেণ্ট একটি। গড়ের মাঠের গাছতলায় বেকার যুবককে কাগজ পেতে শুয়ে থাকতে দেখা যায় দুপুরবেলা, কিন্তু মনুমেণ্টের পায়ের তলায় শুয়ে-বসে, হাই তুলে, চীনে বাদাম খেয়ে সময় কাটাবার মধ্যে একটা 'রোমান্স' আছে। তাই শুধু বেকাররা নয়, রেস্‌ুড়ে, জুয়াড়ী সকলেরই ভিড় হয় মনুমেণ্টের তলায়, অনেকে বসে ক্রস্‌ওয়ার্ড পাজ্‌লও করে। তারপর বিকেলে যদি কোন মিটিং থাকে, তাহলে মিটিং-এ খাদ্য-বস্ত্র সমস্যার গরম গরম লেক্‌চার শুনে তারা বাড়ি ফেরে। বেকার ভাবে চাকরির কথা, রেস্‌ুড়ে ভাবে ঘোড়ার কথা, জুয়াড়ী ভাবে জুয়ার কথা—অর্থাৎ জীবন নিয়ে জুয়া-খেলার যত খেলোয়াড় সকলেই এসে মনুমেণ্টের তলায় জমা হয়, ভবিষ্যতের দিবাস্বপ্নে নিদারুণ মশ্‌গুল হয়ে থাকে, 'ইষ্ট সিদ্ধ অক্টর্লোনি' মনে মনে হাসে, আর 'অম্বরে অঙ্গুষ্ঠ উঠায়ে' উদাস হয়ে চেয়ে থাকে।

দ্বিপ্রহরে কলকাতায় আর একটি দ্রষ্টব্য স্থান হল 'স্টক এক্সচেঞ্জ'। কলকাতার সমস্ত বাজার যখন ফাঁকা, ব্যাপারীরা চলে গেছে, স্টলওয়ালারা ঘুমুচ্ছে, তখন দুপুরের মাছের বাজারের মাছির মতন মানুষ ভন্‌ ভন্‌ করছে শেয়ার বাজারে। এমন কি বড়বাজার, চীনাবাজার, রাধাবাজারকে পর্যন্ত হার মানিয়েছে দুপুরের শেয়ার বাজার। সমস্ত প্যাশানটা বুকপেট থেকে উঠে গলার শিরার মধ্যে ফুলে উঠেছে, দালালরা 'ভাউ, ভাউ' 'তেজী হুয়, মন্দা হুয়' বলে চীৎকার করছে, স্পেকুলেটাররা 'গেল, গেল,' 'এল, এল'

দ্বন্দ্বের মধ্যে ক্ষ্যাপাপাগলের মতন ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন, ডাব-সরবৎ-চা গ্যালন্ গ্যালন্ উজাড় হয়ে যাচ্ছে। দেখলে মনে হয়, মাথার উপরে সূর্যদেব দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেও এদের টাকার প্যাশান বোধহয় নিভবে না। টাকার হিস্টিরিয়া যদি দেখতে চান, দুপুরবেলা কলকাতার স্টক্ এক্সচেঞ্জে যাবেন।

ঢাকুরিয়া লেক থেকে স্টক্ এক্সচেঞ্জ পর্যন্ত দ্বিপ্রহরের কলকাতার এই যে নক্শাচিত্র আঁকা হল, এর একদিকে 'প্রেম' আর একদিকে 'টাকা'। এই 'প্রেম' আর 'টাকা'ই জীবন-নাট্যের 'সেণ্ট্রাল থীম্' নয় কি? মধ্যে কেবল ইণ্টারলিউডের মতন অক্টর্লোনি মনুমেণ্টের তলায় ক্রশ্ওয়ার্ড আর রেসের টিপ্ নিয়ে একটু মজা করা। দুপুরবেলা ছাড়া কলকাতা শহরের এই জীবন-নাট্যের অভিনয় দেখার সুযোগ কোথায়? সুতরাং দ্বিপ্রহরের কলকাতায় একদিকে 'ঢাকুরিয়া লেক' আর একদিকে 'স্টক্ এক্সচেঞ্জ', মধ্যে 'ইষ্টসিদ্ধ অক্টর্লোনি'। প্রেম ও টাকার মধ্যে জুয়াখেলা। ক্রমে কলকাতার চেহারা বদলাচ্ছে। শুধু লোক বাড়ছে আর অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা যে উৎকট হয়ে উঠছে তা নয়, প্রেমের চাইতে টাকার দিকে টানটা বেশি হচ্ছে দিন দিন। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, টাকাই প্রেম, প্রেমই টাকা। দুপুর রোদে ক্রমেই এটা যেন স্পষ্ট হচ্ছে। সুতরাং ঢাকুরিয়া লেকের ভিড় কমছে, স্টক্ এক্সচেঞ্জের ভিড় বাড়ছে। যে ঢাকুরিয়া লেকের মাধ্যাহ্নিক প্রেম একদিন সারা পৃথিবী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, প্রেমের জন্যে মাসে যেখানে অন্তত একটা 'সুইসাইড্' কেস্ নিশ্চয়ই হত সেখানে গত কয়েক বছরের মধ্যে একটাও 'সুইসাইড' হয়নি। দুপুরের কলকাতা ক্রমেই নীরস 'মেটিরিয়ালিস্ট' হয়ে উঠছে, সব আইডিয়ালিজম্ তার টাকার ধাক্কায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আফ্সোসের কথা!

রাতের কলকাতা

কলকাতায় সন্ধ্যা হচ্ছে। হুতোমের কলকাতায়। গয়লারা দুধের হাঁড়া কাঁধে করে দোকানে যাচ্ছে। মেছুনীরা আপনাদের পাটা-বঁটি-চুবড়ি ধুয়ে প্রদীপ সাজাচ্ছে। গ্যাসের আলো জ্বালতে মু্টেরা মই কাঁধে করে দৌড়চ্ছে, থানার সামনে পাহারাওয়ালাদের প্যারেড হয়ে গিয়েছে। ব্যাঙ্কের ভেতো কেরানীরা ছুটি পেয়েছেন। কোন শৌখিন বাবুর বাড়িতে হয়তো হাফ্-আখ্ড়াইয়ের দল বসেছে, শহরের এ-লেন সে-লেন থেকে অন্যান্য বাবুরা বগিতে চড়ে নৈশ আড্ডায় চলেছেন। দোয়াররা রাত্রি দশটার পর এসে জমবেন। নৈশ আড্ডার অধ্যক্ষ হয়তো মল্লিকদের বাড়ির ছোটবাবু। কারণ ছোটবাবু ইয়ারের টেক্কা, বাগানবাড়িতে বাইজীর কাছে চিড়িয়ার গোলাম নেশায় শিবের বাবা। শরীর অবশ্য ডিগ্ডিগে, দাঁতে মিশি, প্রায় আধ হাত চেটালো কালা ও লালপেড়ে চক্র-বেড়ের ধুতি পরনে। দেড় ভরি আফিম, দেড়শ ছিলিম গাঁজা ও এক কলসি মদ রোজ্কী মৌতাতের উট্নো বন্দোবস্ত। শনি-রবিবারে একটু বেশি মাত্রায় চড়ান। কলকাতার বাবুদের নৈশ আড্ডার অধ্যক্ষ হবার উপযুক্ত ব্যক্তিই বটে! ক্রমে আড্ডা জম্ছে। চারডেলে দেয়ালগিরিতে বাতি জ্বলছে, মজলিশ জক্ জক্ করছে। পান, কলাপাতার এঁটো নল ও থেলো হুঁকোর কুরুক্ষেত্র, থেকে থেকে ফক্কুড়ি মশ্করা টপ্পাটা চলেছে। বাইজীর আসরে নামতে দেরি হচ্ছে দেখে ধর্তা দোয়ার বিরক্ত হয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নাকী সুরে 'মনালে বঁদিয়া পিয়ারে'! জিক্কুর টপ্পা ধরেছেন, হুঁকো একবার এ-থাকের পাশ মেরে ও-থাকে যাচ্ছে। ক্রমে মজলিশে দু-একটা ঝাড় লণ্ঠন জ্বেলে দেওয়া হল, নিম্কী বাই আসরে নামলেন। বাবুরা সব চিতিয়ে উঠে পান চিবুতে চিবুতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলেন, হুঁকোর কল্কে ফিরিয়ে নল্টা মুখে ধরলেন। নাচ শুরু হল। 'হোল্ নাইট' প্রোগ্রাম!

এক শতাব্দী আগের কলকাতার নৈশ মূর্তি অনেকটা এই ধরনের ছিল। বাবু ও তাঁদের মোসাহেবরা সাধারণত হোল্ নাইট আড্ডা জমাতেন। ফরসা হয়ে গেলে, কুঁচের মতন চক্ষু লাল করে, কানে তুলোয় করে আতর গুঁজে তাঁরা যখন বাড়ি ফিরতেন, গিন্নীরা তখন ঠাণ্ডা ঘোলের সরবৎ খাইয়ে তাঁদের পায়ের গুল টিপে দিতেন। এখন সেসব গৃহও নেই, গৃহিণীরাও নেই। এখনকার গিন্নীরা ঐ অবস্থায় পায়ের গুল্ টিপে দেওয়া তো দূরের কথা, পারলে বেড়িয়ে গুল ফাটিয়ে দেন। দেবেনই তো! সেটা ছিল 'অটোক্রাসি'র যুগ, আর এটা হচ্ছে 'ডেমোক্রাসি'র যুগ। স্বামী যদি 'হোল নাইট' প্রোগ্রাম করতে বেরিয়ে যান, স্ত্রীও গণতান্ত্রিক দাবি খাটিয়ে পাল্লা দিতে পারেন। কিছুই বলবার নেই, কারণ বললে ব্যাপারটা 'সুপ্রীম কোর্ট' পর্যন্তও গড়াতে পারে এবং সেখানে 'ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটে'র দিক থেকে সমস্ত ব্যক্তিগত অভিযোগ স্বচ্ছন্দে বাতিল হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া তখন দেওয়ানী-দালালী-মুচ্ছুদ্দিগিরির টাকা লাখে লাখে আসত, সিন্দুক বোঝাই টাকার হাঁড়া থাকত, তামাকের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজও গুল্লি পাকিয়ে রাখা হত, খাঁটি টাকায় মাকু চালিয়ে (সুদ খাটিয়ে) যা রোজগার হত তাতেই দু-দশটা হাফ্-আখড়াইয়ের নৈশ আড্ডার খরচ চলে যেত। এখনকার 'মাগ্গী ভাতা'র যুগে বাইজী নাচানো দূরের কথা, সামান্য একটা বিয়ে করা এবং বউ নিয়ে মাসে একবার বায়স্কোপ দেখাই সম্ভব হয় না। ক্রমে তাই নৈশ কলকাতার চেহারা বদলে যাচ্ছে। সেকালের রাতের রয়াল কলকাতা একালের কস্মোপোলিটান্ কলকাতায় পরিণত হচ্ছে, বাগানবাড়ি ও বৈঠকখানার ব্যক্তিগত আভিজাত্য হোটেল-রেস্টুরেণ্টের কলেকটিভ বিশ্বমানবিকতায় রূপান্তরিত হচ্ছে। গণতন্ত্র ও পকেটশূন্যতন্ত্রের অনিবার্য পরিণতি।

কালপেঁচার কলকাতায় সন্ধ্যা হল। সাবেক আমলের দু-চারটে গ্যাস্ চৌরঙ্গীতে জ্বলে উঠলো বটে, কিন্তু বৈদ্যুতিক আলোয় ও বিজ্ঞাপনে যেন ঝলসে উঠলো কলকাতা। দিনে সূর্যের আলোয় যা কলকাতায় দেখা যায় না, রাতে বৈদ্যুতিক আলোয় তা বাধ্য হয়ে দেখতে হয়, চোখ বুজেও

রেহাই নেই। গ্র্যাণ্ড হোটেলের 'গ্র্যাণ্ড' থেকে 'লেট্‌স গো টু ফার্পোস্‌' এর 'হোয়াইট লেবেল স্কচ হুইস্কি'র বিজ্ঞাপন পর্যন্ত সব একে একে চোখের সামনে ঝলমল করে ওঠে। পয়লা বৈশাখের রাত, কিন্তু মাইনে পাওয়া যায় ইংরেজী মাসের পয়লা, অতএব বাংলা নববর্ষে পকেটে মাত্র ধার করা পাঁচটা টাকা নিয়ে বেরিয়েছি। এদিক দিয়ে পয়লা জানুয়ারি এখনও অনেক ভাল, কিন্তু তবু 'স্বদেশী' মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল বলে ইংরেজী পনের তারিখের 'থ্রেট' উপেক্ষা করে পাঁচটা টাকা হাওলাৎ করেই বেরিয়ে পড়লাম। যা থাকে অদৃষ্টে! চৌরঙ্গী-পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে নেবে ভাবলাম, কোন একটা ক্লাবে ঢুকে 'হাউসি' খেলে পাঁচকে পঁচিশ করে নেব কিনা! কিন্তু যদি হাতের পাঁচও চলে যায়! ঘাবড়ে গিয়ে ভাবছি, কোন একটা কাফে-টাফেতে, পিপিং-সাংহাই-অলিম্পিয়ায়, কোথাও ঢুকে পড়ব কিনা! পাঁচ টাকায় পার্ক স্ট্রীটের কোথাও ঢোকা যায় না ভেবে, ধর্মতলায় মতিশীল স্ট্রীটের দিকে হাঁটা আরম্ভ করলাম।

একেবারে গলস্টন ম্যানসন থেকে গ্র্যাণ্ডের আর্কাদে চলে এলাম। চারিদিকে চোখের সামনে দপ দপ করে সব জ্বলে উঠছে—'প্রিন্সেস', 'ক্যাথে', 'ক্যাসানোভা'—দিনের বেলা কিছুই না, রাত্রে যেন ইন্দ্রপুরী। পাঁচ টাকা পকেটে নিয়ে 'প্রিন্সেসে'র সামনে দাঁড়ালেও 'পেনাল্টি' দিতে হতে পারে ভেবে একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালাম। রাতের কলকাতার দৃশ্য দেখছি—প্যালানাথ বাবুরা সব বগির বদলে বুইক হাঁকিয়ে নিঃশব্দে রো করে ঢুকে যাচ্ছেন, কস্‌মোপোলিটান লেডিরা সব কেউ একা, কেউ সঙ্গীসহ ডভ্‌টেইলড হয়ে চলেছেন, ক্যাবারে নাচতে, জ্যাজ্‌ পল্‌কা দেখতে শুনতে, শেরীতে একটু চুমুক লাগাতে। সকলেই যে ফিরিঙ্গি বা ইঙ্গবঙ্গ মহিলা তা নন, আজকাল বেশ দু-চারজন বাঙালীনীকেও দেখা যায়। তাঁদের শ্রীমুখের কথা শোনার সৌভাগ্য হয়ত অনেকেরই হয় না, কিন্তু দূর থেকে পল্‌কা ছন্দে দম্‌কা হাওয়ার মতন চলার ভঙ্গী দেখলেই বোঝা যায় যে, যিনি চলছেন তিনি কলকাতার একজন কস্‌মোপোলিটান লেডি, একালের কস্‌মোপলিটান কালচারের মূর্তিমতী ডার্লিং। চলায়

ফেরায়, হাবভাবে তাঁর গড়ের মাঠের মতন উদার প্রাণটা যেন উপ্‌চে পড়ছে, চোখেমুখে যেন কবির ভাষা ধ্বনিত হচ্ছে :

I'm a Cosmopolitan lady,
With a Cosmopolitan eye,
I am cheered by the passers-by.
When the men by love are blinded,
I try hard to be broad-minded
In a Cosmopolitan way.

পাঁচ টাকা যদি পকেটে থাকে তাহলে পার্ক স্ট্রীট চৌরঙ্গীর নৈশ কস্‌মোপোলিটানিজম দূর থেকে দাঁড়িয়ে উপভোগ করতে হবে, প্রত্যক্ষভাবে পার্টিসিপেট করতে হলে অন্তত পাঁচশ-টাকা চাই। মনটা দমে গেল, তবু এগিয়ে চললাম। 'লেট্‌স গো টু ফার্পোস্‌'! তাও সম্ভব নয়। তারই তলায় হোয়াইট লেবেলের বৈদ্যুতিক বিজ্ঞাপন। অসম্ভব—পাঁচ টাকায় হোয়াইট বা ব্ল্যাক কোন লেবেলই সম্ভব নয়, একমাত্র 'মা কালী' বা 'জয় মা তারাই' সম্ভবপর! অথবা তালের রস।

রাতের কলকাতার বিশ্বমানবিক মূর্তি শুধু চৌরঙ্গীতে নয়, ফিরিঙ্গীপাড়ার 'নাইট ক্লাবে'ও দেখেছি, সত্যিই দেখবার মতন। দু-চার টাকা প্রবেশদক্ষিণা দিয়ে ঢুকে যান, তারপর রাত দুটো পর্যন্ত পান করুন, খানদান, জুয়া খেলুন, অর্কেস্ট্রা শুনুন, সোফায় সটাং চিৎপটাং হয়ে নিদ্রা যান, কেউ বাধা দেবে না, দফায় দফায় বিল-টিপ্‌স পে করলেই হল। এখানেও কস্‌মোপোলিটান লেডিরা ভীড় করেন, দল বেঁধে বা সঙ্গীসহ বা একা একা উদাসীর মতন ক্লাবঘরে এখানে ওখানে বসে থাকেন, ডাকতে হয় না কাউকে, দু-চারবার তাকালেই তাঁরা নিজেরাই উঠে আসবেন, আপনার টেব্‌লের কাছে এসে অনুমতি চেয়ে বসে পড়বেন, তারপর অবশ্য আপনারই পয়সায় খানাপিনাটা সেরে নেবেন, আর বার বার আবদার করে জুয়ো খেলতে চাইবেন। ক্লাবের মালিকরাই এটা শিখিয়ে রাখেন, যাতে একবার ঢুকে পকেটে কিছু নিয়ে না ফিরতে পারেন। অর্কেস্ট্রা, পানোন্মত্ত নাচগান, হাসিহল্লায় ক্লাবঘর গুলজার হয়ে থাকে। রাত্রি শেষ

প্রহরে সব ভোঁ-ভাঁ। সেকালের কলকাতার হাফ-আখড়াই আড্ডার একেলে সংস্করণ এই নাইট-ক্লাব। তথাকথিত সভ্য শহরে এটা একটা অসভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

এর প্রয়োজন কি? পাঁচ টাকা নিয়ে এঁদোগলির এক আড্ডায় জমে গেছি, রীতিমত আফিংখোর চীনাদের মতন ঝিমুচ্ছি আর ভাবছি, নৈশ কলকাতার এই কস্‌মোপোলিটান কালচারের পরিণতি কোথায়? একজন হঠাৎ টেব্‌লের সামনে মৌতাতের মাথায় উঠে দাঁড়িয়ে বললে বন্ধু!

Girls of the domestic kind
Nowadays are hard to find.
Happy little homes are few,
Politics have claimed their due.
Wives who try to regulate the nations,
Devastate their conjugal relations.

বুঝলাম তাঁর বক্তব্য কি! এই বিচিত্র ডেমোক্রাসির যুগে চতুর্দিকের ক্রাইসিসের মধ্যে সুখী পরিবারের নীড় সব ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং নারী-পুরুষ সকলেই যাঁরা এতদিন ডোমেস্টিক ছিলেন তাঁরা ক্রমেই কস্‌মোপোলিটান হতে বাধ্য হচ্ছেন। অভিশপ্ত সমাজে মানুষের ঘর ভেঙে যাচ্ছে, সংসার কারাগার হয়ে উঠছে, মনের ভারসাম্য থাকছে না, ভবিষ্যৎ ধূ ধূ করছে। ঘরের মানুষ তাই বাইরের হোটেল-ক্লাবে ভিড় করছে, ডোমেস্টিক মানুষ তাই কস্‌মোপোলিটন হচ্ছে—রাতের কলকাতায়।

মহানগরীতে রজনীগন্ধা

বৌবাজারের মোড়ে—
যেখানে ফুলের দোকানের পাশে
কসাই-এ মাংস থোড়ে,
পৌঁছিয়া সেথা সহসা দেখিনু,
ঝুড়ির উপরে উচ্চ
মালীর মাথায় কুড়ি দুই দেড়
রজনীগন্ধার গুচ্ছ।
আছি কাছাকাছি ওরই মাঝে বাছি
কিনে ফুল তাড়াতাড়ি
বর্ষার সাঁঝে আগাগোড়া ভিজে
খুসিমনে এনু বাড়ি।
শয়নঘরের ঢুকে
(জানি না) কার বাগানের রজনীগন্ধা
দুলিল মনের সুখে।

আমি কবি নই, সুতরাং 'কেতকী'র কবি ক্ষমা করবেন। বনকেতকীর গন্ধও নয়, বুকের কোন ব্যথাও নয়, বর্ষার সন্ধ্যার প্যাচপেচে শহুরে (গ্রাম্য নয়) আবহাওয়ায়, মিটমিটে অন্ধকারে করুণ কণ্ঠের আর্তনাদ (আর্তনাদই তো!)—'রজনীগন্ধা, বাবু! সস্তায় রজনীগন্ধা! সস্তায় রজনীগন্ধা!' ডাস্টবিনের ভেসেযাওয়া আবর্জনার পচা দুর্গন্ধে রজনীগন্ধার সুগন্ধ আমার নাসিকারন্ধ্র পর্যন্ত পৌঁছয়নি। দৃষ্টিশক্তি প্রখর বলে অন্ধকারের মধ্যেও একগোছা রজনীগন্ধার ঝক্‌ঝকে শুভ্রতার দিকে হঠাৎ নজর পড়েছিল শুধু। ঠিক সেই সময় কানে এল 'সস্তায় রজনীগন্ধা'!

কলকাতা শহরে, বিশেষ করে তার ওপর আজকালকার দিনে, সকলেই জানেন, 'সস্তা' কথাটার একটা প্রচণ্ড আকর্ষণশক্তি আছে, প্রায় 'জাদুকরী' বলা চলে। তা ছাড়া আমার কাছে সেদিন এমনিতেই সস্তার অনেক জিনিস ছিল। হাতের থলে দুটি সস্তার আলুপটলের ভারে প্রায় ছেঁড়ে ছেঁড়ে অবস্থা। তাই হাতে ঝুলিয়ে পিছল পথে পা টিপে টিপে ব্যালান্স বজায় রেখে চলছিলাম, বৌবাজারের মোড় থেকে শিয়ালদহের দিকে। সেখানে আরও কিছু সস্তায় পাওয়া যায় কিনা তার শেষ চেষ্টা করে ঘরমুখো রওনা হবো, এই ছিল উদ্দেশ্য। এমন সময় কানে এল—'সস্তায় রজনীগন্ধা!' প্রথমে 'সস্তা' কথাটাই কানে এল, আসা মাত্রই কান দুটো কুকুরের মতন খাড়া হয়ে উঠলো, কিন্তু পরক্ষণেই 'রজনীগন্ধা'র কথা শুনে বড্ড দমে গেলাম, ভেবেছিলাম অন্য কিছু হবে, মনে মনে ইচ্ছা ছিল যদি ল্যাঙড়াই আম হয়। কিন্তু হায়! কোথায় 'ল্যাঙড়াই' আর কোথায় রজনীগন্ধা! যাই হোক, তবু তো সস্তা! সস্তার টানে রজনীগন্ধার কাছে গেলাম। কলকাতার কোন শানবাঁধানো 'ফ্লাওয়ার স্টলে'র রজনীগন্ধা নয়, জনৈক বৃদ্ধের ভাঙা ঝুড়িতে বোধহয় অবশিষ্ট রজনীগন্ধার একটা গুচ্ছ। সস্তার রজনীগন্ধা আরও সস্তায় পাওয়া যায় কিনা তাই নিয়ে দর কষাকষি করবার সময় বৃদ্ধ মালী যে কত কথাই আমাকে বললে তার ঠিক নেই। কষাকষি করলে মালীর চলে না জানি, কিন্তু আমার তো অচল এদিকে, তার ওপর আলু পটল নয়, কিনছি ফুল। গিন্নীর মনটা তবু একটু কাব্যিক ধাঁচের বলে কিনতে সাহস পেলাম—বিশেষ করে রজনীগন্ধার ওপর তার একটু টানও আছে। তা না হলে শেষ পর্যন্ত বারো পয়সা দিয়ে রজনীগন্ধার গুচ্ছটা কিনে ঘরে ফিরতে সাহস হত না।

বাড়িতে ঢুকতে রজনীগন্ধা খুব যে সাদর সম্ভাষণ পেল তা নয়, তবু অনাদরও পায়নি। কিন্তু থাকবে কোথায় রজনীগন্ধা? একখানা চৌকো ঘর, ঠিক দশ বাই দশ, তার মধ্যে গোল চৌকো লম্বা তেকোনা নানারকমের জিনিস এমনভাবে ঠাসা যে কোথাও রজনীগন্ধার থাকার একটুও জায়গা নেই। ফুলদানি তো নেইই, তবু না হয় কাচের গ্লাসে সে

কাজ চলে যেত। কিন্তু জলভরা গ্লাস বসিয়ে রাখবার জায়গা নেই। এমন কি দেয়ালে পর্যন্ত একটুও ফাঁক নেই। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, শ্রীকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ সকলে সেখানে ভর করে তো আছেনই, অসংখ্য পেরেকের গায়ে রথের ও চড়কের মেলায় কেনা 'মাটির পাখি পুতুল' ঝুলছে। দেয়ালের বাকি জায়গায় তাক বসানো হয়েছে টুকিটাকি কৌটোবাটার জন্যে। রজনীগন্ধার থাকার জায়গা হয় না, এমনকি সিলিং-এ পর্যন্ত না। যাবতীয় ছেঁড়া কাঁথা থেকে শীতের লেপ পর্যন্ত সেখানে ঝুলছে। অবশেষে দেখা গেল মশারি টাঙাবার চারটে হুকের মধ্যে একটি মাত্র খালি আছে, বাকি তিনটের কোনটায় থলে, কোনটায় খেলনা বেলুন ইত্যাদি ঝোলানো। সেই হুকটিতেই ঝুলিয়ে দিলাম রজনীগন্ধার গুচ্ছটিকে। কলকাতা শহরের বাসগৃহে ফুল—একটা পি-টি-আই-এর মতন সংবাদ ছাড়া কি, বিশেষ করে শহরের সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘরে!

গলায় দড়ি বেঁধে হুকের গায়ে ঝুলোনো রজনীগন্ধার দিকে চেয়ে চেয়ে করুণা হল মনে, নিজের উপর নয়, রজনীগন্ধার উপর! ভাবলাম, তিলজলা থেকে মধুপুর পর্যন্ত কোন ফুল-ব্যবসায়ীর নার্সারীতে ফুটে যদি নিউমার্কেটের অভিজাত ফুলের স্টলে, নেহাত কর্পোরেশন বাজারের কোন স্টলে যদি এই রজনীগন্ধা থাকত, তা হলে তার এমন দুর্দশা হত না নিশ্চয়ই। লাটসাহেবের বা মন্ত্রীদের বাড়ি, অথবা শহরের অন্য সব হবুগবুদের বাড়ি গিয়ে, বেডরুমে বা ড্রয়িংরুমে, তিব্বতী চীনা বা জয়পুরী 'ভাসে'র উপর পরম নিশ্চিন্তে রজনীগন্ধার তন্দ্রা আসত এতক্ষণে। কিন্তু কলকাতার সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘর ফুলের গন্ধে ও শোভায় উজ্জ্বল করবার জন্যে রজনীগন্ধার এ ব্যর্থ চেষ্টা কেন? শহরের মধ্যবিত্তের অন্ধকার ঘর তাতে যে কিছুতেই আলোকিত হয়ে উঠবে না, সে খবর তার জানা নেই। এসে তো লাভ হয়েছে এই, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে হচ্ছে দেয়ালের হুকের গায়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ময়লা জীর্ণ মশারির আচ্ছাদনে সমস্ত শুভ্রতাও ঢেকে যাবে। তার চেয়ে কোন মৃতদেহের ঠাণ্ডা বুকের উপর চেপে কলকাতার রাজপথের উপর দিয়ে আমার রজনীগন্ধার শ্মশানে যাওয়াও ভাল ছিল না কি?

কিন্তু আমার ঘরে রজনীগন্ধা আজ নেহাতই দায়ে পড়ে এসেছে। বৃদ্ধ মালীর চলে না তাই। মালীর কথাগুলো মনে পড়ল। আমরা চিনি শহরের বড় বড় ফুলের ব্যবসায়ীদের, যাদের কলকাতার বাজারে বড় বড় ফুলের স্টল আছে, শহরের আশেপাশে দূরে বড় বড় ফুলবাগান আছে, কিন্তু আমরা চিনি না আরও অসংখ্য লোককে যারা ফুল বেচে পেট চালায়, অথচ যারা ঠিক ফুলের ব্যবসায়ীও নয়, বড় বড় স্টলও যাদের নেই। কলকাতার সব বাজারেই সাধারণ চাষীর মতন এরা রোজই আসে, শাকসব্‌জির বদলে কিছু ফুল বেলপাতা নিয়ে। তার মধ্যে গোলাপও আছে, বেল মল্লিকা যুঁইও আছে, রজনীগন্ধা আছে, পদ্মও আছে, জবাও আছে, শিউলীও আছে, হয়ত ডালিয়া নেই। শেষরাতে ঘুম থেকে উঠে, ছেলেমেয়ে সকলে এর-ওর বাগান থেকে ফুল সংগ্রহ করে বেড়ায়, তারপর সকালে সেগুলো কলকাতার বাজারে নিয়ে আসে বিক্রি করতে। বিক্রি করে যা পাওয়া যায় তাতেই পেট চালাতে হয়। এই রকম অসংখ্য ফুলওয়ালার মধ্যে আমার সেই বৃদ্ধ মালী একজন। দুটি বিধবা কন্যা, আর চারটি নাতি-নাতনী নিয়ে বৃদ্ধের পরিবার, চালাবার ভার বৃদ্ধের উপর। আগে বৃদ্ধ শহরের এক বড়বাবুর বাগান-বাড়িতে মালীর কাজ করত। কিন্তু সংসারের এই ভার চাপবার পর এবং কাজ করার শক্তি কমে যাওয়ায় এখন আর কাজ করা চলে না। শহরতলীতে একটু দূরে বৃদ্ধের বাসা, তারই আশেপাশে আনাচে-কানাচে দু-চারটে জবা, শিউলী, বেল, রজনীগন্ধার গাছ বৃদ্ধ নিজের হাতে তৈরি করেছে। বৃদ্ধের কাছে শুনেছি, গড়পড়তা দৈনিক টাকাখানেকের ফুল এই গাছগুলোতে হয়। নাতি-নাতনীরা ভোর রাতে আশপাশের বাগান থেকে চুরিচামারি করে কিছু সংগ্রহ করে আনে। তাই মাথায় করে বৃদ্ধ রোজ সকাল সন্ধ্যায় শহরের বাজারে আসে। আমাদের দেশের গরীব মানুষ সাধারণত ফুল কেনে দেবতার জন্যে বা মৃতের জন্যে, জীবন্ত মানুষের জন্যে নয়। শহরে দেবতার অভাব নেই, মৃতের তো নেই-ই। শহুরে জীবনের ঘানির চাপে পড়ে জীবন্ত অবস্থায় যাদের একটি দিনের জন্যেও ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করবার সুযোগ হয় না, যাই হোক্, তবু মৃত্যুর পর তাদের ভাগ্যে

কিছু না কিছু ফুল জোটে। তা ছাড়া দেবতারা আছেন, আর বিবাহের বর-কনেরা আছে। জীবন্ত মানুষের অন্তত দু'টো দিন ফুল জোটে ভাগ্যে—বিবাহের দিন ও মৃত্যুর দিন। সুতরাং ফুল শহরে বিক্রি হয়। আমার ঐ বৃদ্ধ মালীও রোজ এক টাকা থেকে দেড় টাকা ফুল বেচে রোজগার করে এবং তাই দিয়েই সে সংসার চালায়। সেদিন তার রজনীগন্ধার গোছাটা আর বিক্রি হয়নি, বোধ হয় বৃষ্টি বাদ্‌লার জন্যে। বাদ্‌লায় শহরে তেলেভাজার দাম বাড়ে, ফুলের দাম কমে যায়। তাই সেদিন রজনীগন্ধার দাম কমলো এবং সস্তা রজন্ধীগন্ধা দর কষে আরও সস্তায় কিনে আমি ঘরে ফিরলাম। ঘরে শেষ পর্যন্ত কেন রজনীগন্ধা দেয়ালে মশারির হুকের গায়ে গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলতে বাধ্য হল, তা তো আগেই বলেছি। গভীর রাতে মশারির আড়ালে রজনীগন্ধা আত্মগোপন করল, আমিও গিন্নীর সঙ্গে 'কাপড় কেনা' নিয়ে বচসা শেষ করে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই স্ত্রীর সঙ্গে সরষের তেল নিয়ে বেধে গেল এক রাউণ্ড। তেল আনতে হবে শুনেই তেলে-বেগুনে চটে উঠলাম! গিন্নী বললেন ঃ 'সংসার চালাতে কত তেল লাগে তার হুঁশ নেই, লম্বা-চওড়া লেক্‌চার ঝাড়ছ যে ?' কিছুই ঝাড়ছিনে, ঝাড়বার ক্ষমতাও নেই, শুধু ভাবছি, সামান্য কিছু একটা করতেই কলকাতা শহরে যে পরিমাণ তেল ঢালতে হয় তাতে সংসার চালাতে তেলের কল না হলে চলে না। কিন্তু বাইরে তেল, ঘরে তেল, এত তেল আমি যোগাবো কোথা থেকে ? অতএব তেল নিয়ে শেষ পর্যন্ত একদফা হেভী আর্টিলারী বাকযুদ্ধ হয়ে গেল। অ্যাটমস্‌ফিয়ার একটু ঠাণ্ডা হলে ঘরে ঢুকলাম। রজনীগন্ধা! এতক্ষণ পর মনে পড়ল রজনীগন্ধার কথা। চম্‌কে উঠে হুকের দিকে চেয়ে দেখলাম—এ কি ?

'—ঝুলিছে সর্বনাশী
নিজের অঙ্গে নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায় ফাঁসি।
কসিয়া কোমর বাঁধা,
অলকগুচ্ছে আধঢাকা মুখ অস্বাভাবিক সাদা!'

কলকাতার বিয়ে

ডিম্-ডিমা-ডিম্
ডিম্-ডিমা-ডিম্
কিসের বাদ্যি বাজে ?
চাঁদের বেটা লখিন্দর
বিয়ে করতে সাজে !
আগে যায় গাড়ি ঘোড়া
পিছে যায় হাতি,
সঙ্গে সঙ্গে চলে ব্যাঙ,
কাঁধে ধরে ছাতি ।

এই ছড়াটার সঙ্গে যদি অন্য একটা ছড়ার আর চারটে লাইন যোগ করে দেওয়া যায়—

কুকুরে বাজায় টুম্‌টুমি
বানরে বাজায় ঢোল,
টুনটুনিয়ে টুনটুনালো,
ইঁদুরে বাজায় খোল ।

তাহ'লেই সেকালের কলকাতার বিয়ের একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়। সেকালের 'চাঁদের বেটা লখিন্দর'দের বিয়ে বাস্তবিকই এই ধরনের ছিল। কিছুদিন আগে একালের এক লখিন্দরের বিয়েতে গিয়ে এই কথা মনে পড়ল। রীতিমত বড়লোকের ছেলে অথচ বিয়েতে খরচ করল মাত্র ৬০৲ একালের পুরোহিত হলেন 'রেজিস্ট্রার', তিনি পেলেন গোটা ২৫৲ টাকা, আর বাকি টাকায় সাক্ষীসামন্তদের একটু 'টি' খাওয়ানো হল। 'রেজিস্ট্রার' রসিক লোক, তাঁকে অনেকদিন ধরেই আমি চিনি, কারণ এরকম অনেক

বিয়ের ঘটকগিরি করে শেষ পর্যন্ত পুরুতগিরি করার জন্যে তাঁর দ্বারস্থ হতে হয়েছে আমাকে। আমার জানাশুনার মধ্যে বিয়ের রেকর্ড খরচ হয়েছে দু-টাকা বার আনা মাত্র। দু-টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি, আর বার আনা হল সাক্ষীদের যাতায়াতের ট্রাম ভাড়া। সহৃদয় রেজিস্ট্রার এক কাপ করে চা সকলকে নিজেই খাইয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি সেদিন বলেছিলেন: 'দেখুন তো, মাত্র টাকা আড়াই খরচ করলেই হয়ে যায়, তাও নিতান্ত ঠেকে গেলে আমি নিজেই না হয় দিয়ে দিতে পারি—এরকম দু-একজনকে দিয়েছি। আমি তাদের সৎসাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু তাও কেউ ভেবে দেখে না। অকারণে ছেলেমেয়েরা আত্মহত্যা করে, তবু আমার কাছে আসে না।' বছর পনের আগেকার কথা বলছি। তখন কলকাতা শহরে 'ইমোশানাল প্রেমে'র তুফান উঠেছে, প্রেমিক-প্রেমিকারা লেকে ডুবে অনবরত আত্মহত্যা করছে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে প্রেমের ধারাটা যেন কি রকম পাল্টে গেল, 'ইমোশানাল প্রেম' একেবারে খাঁটি 'প্র্যাক্‌টিক্যাল প্রেমে' পর্যবসিত হল। রেশন, কণ্ট্রোল, কিউ ও কালোবাজারের চাপে প্রেমের 'কাব্যিক' দিকটা একেবারে কর্পূরের মতন উবে গেল। এখন আর আত্মহত্যার খবর বড় একটা পাওয়া যায় না, যা দু-চারটে পাওয়া যায় তাও নিতান্ত আর্থিক কারণে, প্রেমিক কারণে নয়। এত বড় একটা বিপ্লব চোখের সামনে ঘটে গেল দেখলাম, কিছুতেই ঠেকানো গেল না। সেদিন দেখলাম এক ভদ্রলোক একেবারে বরবেশে সদলবলে স্টেটবাসে চড়ে বিয়ে করতে যাচ্ছেন—ট্যাক্সি পর্যন্ত নয়, কল্পনা করুন বাসসুদ্ধ প্যাসেঞ্জার উলুধ্বনি দিচ্ছে, তাতেও ভদ্রলোকের হুঁশ নেই, তিনি দিব্যি হাসছেন এবং বলছেন—'যতই উলু দাও, আর শাঁক বাজাও বাবা, ছ-পয়সায় যা হয় তার জন্যে ছ-টাকা খরচ করতে রাজী নই। বিয়ে তো আজ হলেই কাল পুরনো হয়ে যাবে, তখন এই টাকা কটা অনেক কাজে লাগবে মশাই।' ভদ্রলোক 'ম্যাস্-লীডার' হবার উপযুক্ত, এমন নির্ভীক ম্যাস্‌মাইণ্ডেড্ লোক কদাচিৎ আমার নজরে পড়েছে। এ ছাড়া, আর একটি সাম্প্রতিক বিয়ের খবর জানি, যা আরও চমকপ্রদ। যে বন্ধুর বিয়ের কথা বলছি সে

রীতিমত অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। একদিন ভর দুপুরবেলা, স্টেট ডবলডেকারে করে যাচ্ছে এমন সময় ছাখে, তার সামনের সীটে তার প্রেমিকাটি বসে আছে চুপ করে। পিছন থেকে বিনুনি ধরে টান দিয়ে সে জিগ্যেস করল 'কোথায় যাচ্ছ?' মেয়েটি বললে: 'ইউনিভার্সিটিতে—ক্লাশ আছে।' বন্ধুটি বললে: 'ভাবছিলাম কি, তোমার সঙ্গে দেখা হলে বলব বিয়ের ব্যাপারটা মিথ্যে পোস্টপোন্ করে রেখে লাভ কি? ওটা সেরে ফেললে হয় না? কোথা থেকে আবার কি হয়ে যায় কবে—লাইফ্ ইজ্ আফ্‌টার অল—।' মেয়েটি বলল: 'আশ্চর্য, আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম।' তাহলে 'নেমে পড়ো' বলে দুজনেই ওয়েলিঙটন্ স্কোয়ারের কাছে নেমে পড়ল। জানাশুনো চমৎকার ভদ্রলোক রেজিস্ট্রার, ব্যাপারটা সেরে নিতে যথেষ্ট সাহায্য করলেন। খরচ হল দু-জনের কাছে যা ছিল তাই, অর্থাৎ ৬৲+৪৲=১০৲ টাকা। রাত দশটার সময় নববিবাহিত বধূকে নিয়ে বাড়ি ফিরে, বাবা মাকে প্রণাম করে, বন্ধুটি জানিয়ে দিল যে, সে আজই বিয়েটা সেরে ফেলেছে। বাবা মা অদ্ভুত উদার চরিত্রের মানুষ, তাঁরা বললেন: 'বেশ করেছ, এখন দু-জনে খেয়েদেয়ে ঘুমোও গে যাও, অনেক রাত হয়েছে!'

কলকাতার বিয়ে আজকাল এই স্তরে এসে পৌঁছেছে। ধনীদরিদ্রের বিশেষ তারতম্য নেই—দু-টাকা বারো আনা থেকে ষাট টাকার মধ্যে অধিকাংশ বিয়েই সেরে ফেলা যায়। অর্থাৎ আজকালকার বিয়েটা কোন রকমে 'সেরে ফেলা'র ব্যাপার হয়েছে। অনেক ধনীর দুলালের বিয়েও দেখেছি, একেবারে গোঁড়া হিন্দুমতে, কিন্তু তাও ঐ 'সেরে ফেলা'র ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। সেকালের কলকাতার বিয়ে কিন্তু এই সেরে-ফেলা গোছের ছিল না, বিশেষ করে বড়লোকদের বিয়ের কথা বলছি। গরীব লোকের বিয়ে সব কালেই প্রায় সমান, সুতরাং তার কথা বলে লাভ নেই। সেকালে কলকাতা শহরে কোন ধনীর দুলালের বিয়ে হলে শহর সুদ্ধ লোক জানতে পারত যে হ্যাঁ, বিয়ে একটা হচ্ছে বটে। একালের বড়লোকদের বিয়ে কেবল খবরের কাগজের মারফত জানা যায়, বেশি বড়লোক হলে হয়ত বরবধূর ছবিও ছাপা হয় কাগজে। তার বেশি

আর কিছু জানবার উপায় নেই। কিন্তু সেকালের কলকাতার বিয়ের দু-একটা বিবরণ পড়লেই বুঝবেন, বিয়ে কাকে বলে। মনে হবে, বিয়ে যা হবার তা যেন সেকালেই হয়েছে, বিয়ের মতন বিয়ে, একালের বিয়ে তার তুলনায় বিয়েই নয়।

রামদুলাল দে সরকার কলকাতার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও ধনী লোক ছিলেন। তাঁর নামে আজও কলকাতার একটি রাস্তা আছে, সকলেই জানেন। কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে তিনি তাঁর দুই পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন। বিবাহের আগে তিনি রীতিমত 'ইশ্‌তেহার' ছেপে দিয়েছিলেন। কোথায় জানেন? কোন খবরের কাগজে নয়, একেবারে 'গবর্নমেণ্ট গেজেটে'। ইশ্‌তেহার এই মর্মে ছাপা হয়: 'শ্রীযুক্ত বাবু রামদুলাল দে সরকার ৭ ও ১১ই ফাল্গুন (১২২৬ সন) তারিখে দুই পুত্রের বিবাহ দিবেন—তাহাতে ইংলণ্ডীয় সাহেবদের কারণ ১।২ ফাল্গুন এই দুই দিন নিরূপণ করিয়াছেন যে তাঁহারা ঐ দুই দিনে তাঁহার শিমলের বাটীতে গিয়া নাচ প্রভৃতি দেখেন ও খানা করেন। এবং আরব ও মোগল ও হিন্দু লোকেরদের কারণ ১৩।১৪।১৫।১৬ তারিখ নিরূপিত হইয়াছে তাঁহারাও উপযুক্ত মতো আমোদ প্রমোদ ও খানা করিবেন।' গেজেটে নোটিশ দিয়ে ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন করা, ইংরেজ, মুসলমান ও হিন্দু নিমন্ত্রিতদের জন্যে বিশেষ দিন ধার্য করা, বিলেতি আরবী মোগলাই ও হিন্দু খানা এবং নাচগানের ব্যবস্থা করার কথা আজকালকার ধনীরা নিশ্চয় কল্পনাও করতে পারেন না। গেজেটে নোটিশ দিয়ে নিমন্ত্রণ মানে ঢালাই নিমন্ত্রণ, সুতরাং খরচের বহরটাও অনুমানসাপেক্ষ।

কলকাতার বিখ্যাত 'মল্লিক' পরিবারের রামরতন মল্লিকও পুত্রের বিবাহেতে সাত আট লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। 'গত শুক্রবার ৩০ মাঘ (১২২৬ সন) তারিখে শ্রীযুক্ত বাবু রামরতন মল্লিক আপন পুত্রের বিবাহ যেরূপ দিয়াছেন এমন বিবাহ শহর কলকাতার কেহ কখনও দেন নাই। এই বিবাহে যে যে রূপ সমারোহ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে সাত-আট লক্ষ টাকার ব্যয় ব্যতিরেকে এমত মহাঘটা হইতে পারে না।'

জনাইয়ের বিখ্যাত মুখুয্যেদের কথা অনেকেই জানেন। মুখোপাধ্যায়

পরিবারের কনিষ্ঠ তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিয়ে হয় ১২২৮ সনের ২৮শে মাঘ। সংবাদপত্রের মতে 'তাহাতে যেমত সমারোহ হইয়াছিল এরূপ গঙ্গার পশ্চিম পারে সংপ্রতি প্রায় হয় নাই।' বিয়ের দিনে কাশীপুরের শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ বসুজার বাগানের কাছ থেকে বরাহনগরে গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি পর্যন্ত এক ক্রোশ পথে বাঁধা রোশনাই হয়েছিল। মজলিসের ঘর ডাকের সাজ ও মোমের সাজ দ্বারা সুশোভিত এবং অপূর্ব বিছানাতে মণ্ডিত ও শ্বেত নীল পীত রক্তবর্ণ ঝাড় ও লণ্ঠন ও দেওয়ালগিরি প্রভৃতি নানাবিধ রোশনাই হইয়া বিবাহের পূর্ব চারি দিবস নাচ ও গান হইল। তাহাতে বড় মিঞা ও ছোট মিঞা ও নেকী ও কাশ্মীরি প্রভৃতি প্রধান প্রধান গায়ক আর আর অনেক তয়ফাও আসিয়াছিল।'

কাশীপুরের রামনারায়ণ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে কলকাতার শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রীর বিবাহ হয় ১২৩১ সনের ৯ই বৈশাখ। বিয়ের পাঁচদিন আগে থেকে কাশীপুরে মজ্‌লিশ হয়েছিল, প্রথম তিন দিন হয়েছিল কেবল ইংরেজদের মজ্‌লিশ, শহরের সমস্ত সাহেব লোক ও বিবিলোক তাতে যোগদান করেছিলেন। শহরের সমস্ত নর্তক-নর্তকীরা মজ্‌লিশে এসে জমেছিল। শেষের দুদিন হয়েছিল বাঙালী মজ্‌লিশ, দুদিন দুরাত ধরে নাচগান হয়েছিল। এ ছাড়া চিৎপুর, কাশীপুর ও বরাহনগরের সমস্ত ব্রাহ্মণের বাড়িতে কাপড়, গহনা, শঙ্খ, তেল, হলুদ পাঠানো হয়েছিল। বরযাত্রার সময় কারিগরদের তৈরী কৃত্রিম পাহাড়, জন্তু-জানোয়ার, বাগান-বাগিচা, নৌকা, ছবি ইত্যাদি নিয়ে প্রায় দুই ক্রোশব্যাপী এক শোভাযাত্রা হয়েছিল।

কলকাতার কয়েকটি মাত্র সেকালের বনেদী বংশের বিয়ের বিবরণ পড়েই বুঝতে পারছেন যে এককালে বাঙালীরা সত্যিই বিয়ে করতে জানত, এবং বিয়ে করা কাকে বলে তা তারা দেখিয়ে দিয়েছে। ইংরেজ আমলে বাঙালীরা যে বিপুল 'মূলধন' সঞ্চয় করেছিলেন, তার কতকটা অংশ এইভাবে পুত্রকন্যার বিবাহে ও বাপমায়ের শ্রাদ্ধে ফুঁকে দিয়েছেন তার হিসেব না পাওয়া গেলেও, আন্দাজ করা যায়। গড়পড়তা বিয়ে ও শ্রাদ্ধের খরচ (ধনীদের) ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ এখনকার টাকার

মূল্যে প্রায় এক কোটি টাকা! আপনারা হয়ত বলবেন যে, সেইজন্যেই তো বাঙালী বড়লোকদের বারোটা বেজে গেছে, সব ফুঁকে দিয়ে আজ তাঁরা অবাঙালীর টাকার দাস হয়ে বসে আছেন। কথাটা হয়ত মিথ্যা নয়, কিন্তু বিয়ের খরচ এক কোটি থেকে ২৮০ পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়াটা কি যুক্তিসঙ্গত? তাতে যদি আমাদের 'মূলধন সঞ্চয়' হয় তাহলে অবশ্য বলার কিছু নেই। কিন্তু তা যদি না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে যাঁরা বিয়ে করবেন তাঁরা কথাটা একবার ভেবে দেখবেন। সামান্য আরও একটু বেশি খরচ করলে দোষ কি? হাজার হোক, বিয়ে তো?

কলকাতার গান

সিন্ সিনা সিন্ বুব্‌লা বু
নিচে হাম্, উপর তু।

সম্প্রতি কলকাতা শহরে এই গানের একটা গুমরানি শোনা যাচ্ছে, স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে ছাত্র-ছাত্রীদের কণ্ঠে, যৎকিঞ্চিৎ ঢাকুরিয়া লেকে, সিনেমার পথে, বাসে, ট্রামে ও লোক্যাল প্যাসেঞ্জার ট্রেনে। আশা করা যাচ্ছে, অল্পদিনের মধ্যে কলকাতার পথঘাট ময়দান গুন্‌গুনিয়ে উঠবে এই গানে এবং তারপর দু-কূল ছাপানো জোয়ারের শব্দতরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠবে কলকাতা। আপনি যেখানেই যান বা থাকুন, সর্বত্র এবং সব সময় হরিনামের মতন শুনতে পাবেন—'নিচে হাম্, উপর

তু'। শুনেছি (সঠিক জানি না, দায়ে না পড়লে জীবনে কোনদিন বাংলা বা হিন্দী ফিল্ম দেখিনি) এটা কোন্ হিন্দী ফিল্মের গান, চলন্ত ট্রেনের কামরায় উপরের বাঙ্কে নায়ক শুয়ে রয়েছে, আর নিচে বসে আত্মবিহ্বলা নায়িকা এই গানটি গাইছে। এই হচ্ছে এই গানের পটভূমি, কিন্তু পট ও ভূমি দুটোই ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি এই গান কলকাতার লক্ষকণ্ঠে ডানা বিস্তার করছে। বোধ হয় 'লারে লাপ্পা, লারে লাপ্পা, লারে লাপ্পা লা'-র পর কলকাতায় এই 'বুব্‌লা বু'-র একটা ফেজ্ আসছে, অন্তত উপসর্গ দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। কলকাতার চলতি গান বা পপুলার গানের ট্রেডিশন হচ্ছে এই। ক্যাপিটালিস্ট সমাজে যেমন 'বিজনেস সাইকেল' বলে একটা জিনিস আছে, কলকাতার সমাজেও (অভিজাত থেকে রাস্তার লুম্পেন পর্যন্ত) তেমনি 'মিউজিক সাইকেল' বলে একটা বস্তু আছে। সেই 'সাইকেলে'র ধারা যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন, ফিল্ম ও রেডিও থেকে (কিছু কিছু রেকর্ড থেকেও) গানগুলো প্রথম ঠিক্‌রে আসে সমাজের নিম্নতম স্তরের মুষ্টিমেয় লুম্পেন বা লুচ্চাদের কণ্ঠে এবং উচ্চতম স্তরের মুষ্টিমেয় অভিজাতদের কণ্ঠে। নিচের ফুটপাথে ও উপরতলার ড্রয়িংরুমে যুগপৎ গুন্‌গুনানি শুরু হয়। তারপর উপর ও নিচ দু-দিক থেকে নেমে-উঠে সেই গুন্‌গুনানির শব্দতরঙ্গ মধ্যবর্তী স্তরে একাকার হয়ে গিয়ে থৈ থৈ করতে থাকে। কলকাতার গানের মোটামুটি এই হল গতি-তরঙ্গ বা 'ডাইনামিক্স অফ মুভমেণ্ট'। একে কলকাতার 'মিউজিক কার্ভ'ও বলা যেতে পারে এবং গ্রাফ্ এঁকে গানের গতির ওঠা-নামাও বুঝিয়ে দেওয়া যায়। এখানে তা সম্ভব নয় বলেই দেওয়া হল না।

কলকাতা শহরের এই 'মিউজিক সাইক্লে' যে সব গানের ওঠা-নামা ও অনিবার্য অবলুপ্তি লক্ষ্য করেছি, তাদের সকলের কথা আজ মনে নেই, জান বাঁচানোর তাড়নায় অনেক গানের মূল, কথা ও সুর পর্যন্ত ভুলে গেছি। তবু যতগুলোর কথা মনে আছে, তাদের একটা তালিকা দিচ্ছি পরের পাতায়, বিশেষ করে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য যেগুলো। তালিকা ক্রনোলজিকাল নয়—

'কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজালে বনে'
'ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল—' (চণ্ডীদাস)
'শেফালী তোমার আঁচলখানি—'
'যদি গোকুলচন্দ্র·········সখি গো'
'দুঃখে যাদের জীবন গড়া······'
'কে নিবি ফুল, কে নিবি ফুল—'
'সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে—'
'নিশীথে যাইও ফুলবনে, রে ভোমরা—'
'বন কি চিড়িয়া বন মে বন্ বন্'
'আমি বন বুল্‌বুল্ গাহি গান, আমি রে'
'লারে লাপ্পা, লারে লাপ্পা, লারে লাপ্পা, লা'
'সিন্ সিনা সিন্ বুব্‌লা বু—' ইত্যাদি

এই গানগুলো সবই ফিল্ম, রেকর্ড ও রেডিওর যুগের গান। এক-একটি গানের ফেজ্ এসেছে এবং প্রত্যেক বোনাফাইড্ সঙ্গীতপ্রিয় লোকের প্রাণ অতিষ্ঠ করে দিয়ে অন্তর্ধান করেছে। 'কে বিদেশী মন উদাসী' ও 'শেফালী তোমার আঁচলখানি' আমলের কথা মনে পড়ে। কলকাতার সমস্ত বিড়ির দোকানে দেখেছি বিড়িওয়ালারা বিড়ি বাঁধার তালে তালে হেলেদুলে এই গান গাইছে। গানের সুর, ঝোঁক ও তাল মাত্রা সব যেন বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে সুরকার দিয়েছেন বলে মনে হয়, এমন কি কথাগুলো পর্যন্ত। তেমনি দেখেছি 'বন্ কি চিড়িয়া', আমি বন বুল্‌বুল্' ও 'লারে লাপ্পা, লারে লাপ্পার' যুগে। সেলুনে চুল কাটতে গেছি, ঘাড়টি নিচু করে চোখ বুজে বসে আছি, চুলের উপর কাঁচি চলছে। কাঁচি চলার একটা চমৎকার ছন্দ ও মিউজিক আছে, লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই। হঠাৎ কানের কাছে শুনেছি সেই কাঁচি চলার সুরে ও ছন্দে কাটারের কণ্ঠে 'বন কি চিড়িয়া' 'বন্ বুল্‌বুল্' ও 'লারে লাপ্পা'র গুনগুনানি। চমকে উঠলেও নড়াচড়ার উপায় নেই, নড়লেই হয়ত কানের ডগাটি কুচ করে কেটে যাবে। অতএব চোখ বুজে সেলুনে কাটারের কণ্ঠে 'লারে লাপ্পা লারে লাপ্পা' শুনতে হল। এলাম স্টেশনারী দোকানে সাবান তেল কিনতে

জিনিস প্যাক করতে করতে দোকানের সেল্‌সম্যানও সেই 'লারে লাপ্পা' 'লারে লাপ্পা' গাইছেন। যাই কোথা? বাজারে এলাম, সেখানেও আলুওয়ালা, পটলওয়ালা, শাকওয়ালী, মেছুনী সকলের কণ্ঠে সেই 'লারে লাপ্পা, লারে লাপ্পা' বা 'আমি বন বুল্‌বুল্‌'-এর গুনগুনানি। বাসে উঠে বসলাম, হঠাৎ পাশের সিট থেকে এক তরুণের কণ্ঠে 'লারে লাপ্পা' ধ্বনিত হয়ে উঠল এবং সামনের ডবল-সিটের এক তরুণী 'আমি বন্ কি চিড়িয়া' বলে গুঞ্জরিয়া উঠলেন। সন্ধ্যায় 'প্রাইভেট টিউশন্' করতে গেলাম, আমি একমনে 'সিভিক্সে'র লেক্‌চার দিচ্ছি, ছাত্রীও একমনে তন্ময় হয়ে 'লারে লাপ্পা, লারে লাপ্পা' করছে। বাড়ি ফিরে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম, ভাবলাম বাঁচা গেল এতক্ষণে। কিন্তু পাশের বাড়ির রেড়িওতে 'আধুনিক গান' চলছে। 'আধুনিক গান' ও 'টক' (বক্তৃতা)—এই দুয়ের আতঙ্কে আজ পর্যন্ত শহরে থেকেও রেডিও নিই নি, কিন্তু প্রতিবেশীর রেডিও থেকে নিষ্কৃতি কোথায়? মধ্যে মধ্যে বলতে ইচ্ছে হয়, 'ও লর্ড (প্রাইম মিনিস্টার) সেভ আস্ ফ্রম্ দিজ্ রেডিওজ'! কিন্তু শুনবে কে সে-কথা? সুতরাং আধুনিক গান পূর্ণোদ্যমে চলল। শুধু কি চলল, রেডিওর সামনে বসে একপাল ছোটবড় ছেলেমেয়ে তাই নকল করে গাইতে লাগল। আমার একে সম্প্রতি 'গমে'র গুঁতোয় পেটের অবস্থা ভাল নয়, তার ওপর গানের জ্বালায় প্রাণ যায় যায় আর কি! যাই হক—রেডিও থামল, কিন্তু গান? কিছুক্ষণ ধরে পাশের বাড়িতে আধুনিক গানের রিহার্সাল চলল, তারপর সকলে চুপ করল। কিন্তু আমার পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটি তখনও শয়নকক্ষে (বোধহয়) রেওয়াজ করছে—'আমি বন বুলবুল গাহি গান, আমি রে'। শুনতে পাচ্ছি তার পরিশ্রান্ত পিতা বেশ জোরে জোরেই তাকে বলছেন (বোধ হয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে): 'তুমি তো বন বুলবুল মা! কিন্তু আমি যে দশটা পাঁচটার আফিসের কেরানী, অনেক রাত হয়েছে, আমাকে একটু ঘুমুতে দাও মা, তুমিও ঘুমোও এখন—আবার কাল সকালে উঠে গেও'। 'মা' তার উত্তর দিল—'আর আধঘণ্টাটাক্ বাবা! কাল আমাদের কলেজে 'স্বাধীনতা দিবসে'র পতাকা তোলার সময় এই গানটা আমাকে গাইতে হবে কিনা,—তাই—ততক্ষণ তুমি শুয়ে একটু এ-পাশ ও-

পাশ করো না বাবা, একটু করো—!' বাবা হয়ত বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগলেন, কিন্তু আমার আর শেষ পর্যন্ত শোয়া হল না, কারণ স্বাধীনতা দিবসের পতাকা উত্তোলনে 'বন বুল্‌বুল্‌'—বাপ্‌! তড়াং করে লাফিয়ে উঠে মেঝেতে কয়েকটা ডন-বৈঠক দিয়ে শরীরটাকে একটু গরম করে নিলাম। সারারাত ঘুম হল না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কেবল গান শুনেছি। একদিন পরে খবরের কাগজে দেখলাম, কয়েক জায়গায় পতাকা তোলার সময় 'বন্‌ কি চিড়িয়া' ও 'লারে লাপ্পা' 'লারে লাপ্পা' গান গাওয়া হয়েছে। এটা কি হিন্দী রাষ্ট্রভাষা বলে হয়েছে না কি? তা তো হয়েছে, কিন্তু ষাঁড়ের মতন গানে 'তাড়া' করেছে. শুনেছেন কখনও? যদি না শুনে বা দেখে থাকেন, তাহ'লে আমার কথা এবং আমার মতন আরও অনেকের কথাটা একবার স্মরণ করুন। তাহ'লেই দেখবেন, কলকাতা শহরে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত, রাস্তাঘাটে-বাজারে-বাসে-ট্রামে-ট্রেনে, এমন কি শয়নঘরে পর্যন্ত ষাঁড়ের মতন গানে 'তাড়া' করে।

এ তো ফিল্ম, রেকর্ড ও রেডিওর যুগের কলকাতার গানের কথা। তার আগের যুগেও গান ছিল এবং গান গাইত কলকাতার লোক। তখন ছিল সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীদের গান এবং সে-গান ঠিক এই একই ধারায় সাইক্লিক গতিতে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠে মিলিয়ে যেত। তারও আগের যুগে ছিল যাত্রা, খেউড়, আখড়াই, তরজা ও কবি-গান এবং সেইসব গানও ঠিক একই রীতিতে 'পপুলার' হয়ে উঠতো কলকাতায়। সে প্রায় হুতোম প্যাঁচার আমলের কথা। তখন থেকেই কলকাতার তথা বাংলাদেশের গানের এই 'মিউজিক সাইকেলে'র সূত্রপাত হয়েছে। বাংলাদেশে গানের ধারা বা ট্রেডিশন এটা নয়। এটা বিকৃত ধারা এবং এই ধারাই সেই বাবু-কালচারের যুগ থেকে বেতার ও ফিল্ম কালচারের যুগ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলা চলে। গানের এই বিকৃত ধারাকেই লক্ষ্য করেই হুতোম তখন বলেছিলেনঃ 'হ্যাঁ! বাংলা দেশের সঙ্গীত শাস্ত্রের কি দুর্দশা! এই মনোহর ও লোকপ্রীতিকর সঙ্গীতবিদ্যা যেন এদেশকে পরিত্যাগ করে গিয়েছে।' সত্যিই আজ বেতারে ও ফিল্মে বাংলা গান শুনে মনে হয় না যে দেলবর খাঁ, শা-সাহেব, দক্ষিনীবাঈ, বড়মিঞা, নেক্কীবাঈ, বৃন্দাবন দাস,

তানসেন, গোপাল নায়ক, বৈজু বাওয়া, আমীর খস্‌রু হসসু খাঁ, ফিরোজ খাঁ, প্রমুখ গাইয়েরা এদেশে একদিন এসেছিলেন এবং তাঁদের কাছে চুঁচড়োর রামচন্দ্র শীল, বাবু রামকানাই মুখোপাধ্যায়, গঙ্গানারায়ণ চট্টো-পাধ্যায়, হাটখোলার রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, ভবানীপুরের ভোলানাথ চৌধুরী, শ্রীরামপুরের রামদাস গোস্বামী, বঁড়িশার চন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি গান শিক্ষা করেন। তার পরের যুগে রমাপতিবাবু, বিষ্ণুবাবু, নিধুবাবু এঁরা নানা দিকে গানের চর্চা করেন। বিখ্যাত সেতারিয়া আলি রেজা, হোসেন রেজা, গোলাম রেজা ও সা-ইমম বক্সের কাছে মাধবচন্দ্র ঘোষ, আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু), রাজনারায়ণ বসাক, সিঙুরের শ্রীনাথবাবু, শিবচন্দ্র পাল, নবীন গোস্বামী প্রভৃতি সেতার বাজনা শেখেন। লালা কেবল কিষণ, পীর বক্‌স ও গোলাম আব্বাসের কাছে শ্রীরাম চক্রবর্তী, কেশবচন্দ্র মিত্র, উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পঞ্চানন মিত্র মৃদঙ্গ বাজনা শেখেন। এ-সব শুনে অনেকে হয়ত বলবেন যে, তখন শহরের বড়মানুষের গানবাজনার শখ ছিল, তাই গানের চর্চাও হয়েছে। এখন সে যুগও নেই, গান বড়মানুষের শখের বস্তুও নেই। উত্তম কথা! গান বড়মানুষদের বিলাসিতার বস্তু হয়ে থাক, এ কেউই চায় না। কিন্তু কথা হচ্ছে, এটাই কি গানকে গণতন্ত্রীকরণের পদ্ধতি? উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত তো আজও কলকাতা শহরে বড়লোকের বিলাসিতার বস্তু হয়ে রয়েছে—৫০৲ টাকার কম তার টিকিট বিক্রি হয় না। আজকের দিনেও এই নির্লজ্জ সঙ্গীত-বিলাস কলকাতা শহরের অসংখ্য সঙ্গীতপ্রিয় সাধারণ লোককে মুখ বুজে সহ্য করতে দেখেছি। বাস্তবিকই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এই ধরনের উন্নাসিক অনুষ্ঠান আজকের দিনে কলকাতা শহরে হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে কলকাতার তথা বাংলার গানের বিকৃত রুচি ও ধারা বদলাতে গেলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আরও জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে-পথে না গিয়ে যদি সিনেমা ও রেডিও মারফত গানকে এই পদ্ধতিতে ডিমোক্রাটিক করা হয়, তাহলে কলকাতার লোককে ষাঁড়ের মতন গানেও তাড়া করতে বাধ্য। স্বাধীনতা দিবসে 'লারে লাপ্পা' গাওয়া গানের গণতন্ত্রীকরণ নয়। তা যদি হয় তাহলে গানের সেই গণতান্ত্রিক যুগ

হুতোমের আমলেও এসেছিল। হুতোমের আমলের 'গণতান্ত্রিক' গানের একটা নমুনা দিচ্ছি—পাঠকরা চেষ্টা করে দেখবেন কোন বিবাহবাসরে, সামাজিক অনুষ্ঠানে বা স্বাধীনতা দিবসে এ গান গাওয়া যায় কিনা—?

কোহি জাৎ কো না মানো বাবা,
না মানো দেবী দেবা।
এক্কি মন্‌সে, কালী মাইকো, পাঁওমে
করো সেবা
বাবা, পাঁওমো করো সেবা॥
আব্ কি নারী, পর কি নারী,
যেস্কি মেলে সঙ্গ।
নেহি ছোড় দেও, ক্যা খুসি হ্যয়,
যব দেও কি রঙ্গ।
বাবা, যব দেও কি রঙ্গ॥
এস্‌মে পাপ, ওস্‌মে পাপ,
এহো ধূর্ত কি বাৎ।
মরণসে যব মুক্ত হয় তব্
পাপ যাগা কোন সাৎ।
বাবা, পাপ যাগা কোন সাৎ॥
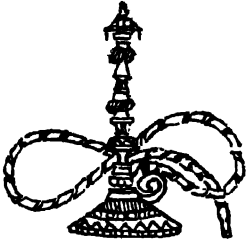
টিপু সুলতানের হুঁকো

'History is Bogus'

—Henry Ford

'ইতিহাস বুজরুকি'—বলেছেন শতকোটিপতি হেনরী ফোর্ড।

আমি যদি হেনরী ফোর্ড হতাম, তাহলে হয়ত এর চাইতেও জোরালো কিছু বলতাম। কিন্তু বুজরুকি হোক আর যাই হোক, ইতিহাস যে একটা মারাত্মক ব্যাধি তাতে কোন সন্দেহই নেই। বাতিক তো নিশ্চয়ই। টিপু সুলতানের হুঁকোর ব্যাপারেই সেটা বোঝা যায়। সম্প্রতি কলকাতা শহরে টিপু সুলতানের হুঁকো পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে মানে কলকাতায় হুঁকোটা এসে পৌঁছেচে। কলকাতার যাদুঘরে এখনও অবশ্য হুঁকোটা আসেনি, যিনি পেয়েছেন এখনও তাঁর হাতে-হাতেই ঘুরছে। তার সঙ্গে আমার গ্রহচক্রে দৈবাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল। দেখা হয়েছিল এক কোটিপতির বাড়িতে, এই শহরেই। কৌতূহল চাপতে না পেরে হুঁকোর মালিককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম : 'এই হুঁকোতে একবার অন্তত তামাক টেনেছেন নিশ্চয়ই—কি রকম মনে হল?' শুনে তিনি : 'আরে রাম, রাম, কি যে বোলেন বাবু!' বুঝলাম ব্যাপারটা। লোকটি মাড়োয়ারী, গোঁড়া হিন্দু, শুদ্ধাচারী। তামাকই খান না একে, তার উপর হুঁকোটা আবার হায়দার আলির পুত্র টিপু সুলতানের। হুঁকোটা যদি মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, কি সমুদ্রগুপ্ত, অন্তত গ্রীক মীনাণ্ডার, ইংরেজ ওয়ারেন হেস্টিংস বা লর্ড ক্লাইভের হত, তাহলেও না হয় গঙ্গাজলে ধুয়ে দেখা যেত, দু-একটা টান দিয়ে কেমন লাগে। কিন্তু টিপুর হুঁকো

নন্দন যে হাতে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এই তো যথেষ্ট,

টানা না-টানার কোন প্রশ্নই আসে না। আমার অবশ্য দুর্দমনীয় লোভ হচ্ছিল একটু টেনে দেখবার, কিন্তু অসহায় বলে লোভ সংবরণ করে হুঁকোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসে রইলাম। চেয়ে চেয়ে কত কি যে মনে হল তা সব বলা যায় না। মনে হল হায়দার আলি, টিপু সুলতানের কথা, হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিসের কথা, মহীশূরের কথা। ইঙ্গ-মহীশূর সম্পর্ক ও যুদ্ধবিগ্রহের সমস্ত ইতিহাসটা কারুকার্যখচিত সুলতানী হুঁকোর নলের উপর দিয়ে ঠিক যেন ডকুমেণ্টারী ফিল্মের মতন চোখের সামনে দিব্যি ভেসে উঠলো। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে চলে এলাম বটে, কিন্তু হুঁকোর কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। রাত্রে শুয়ে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে সেই হুঁকোয় বেশ আরামে তামাক খেলাম। পরদিন সকালে খবর পেলাম, হুঁকোটা পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে গেছে। যিনি কিনেছেন তিনি টিপু সুলতানের কোন বংশধর নন। তাঁর 'টাকা' আছে এবং 'কালচার' আছে, সুতরাং তাঁর 'কিউরিওসিটি' আছে, তাই এই 'সিটি'তে বসেও তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার 'কিউরিও' কেনেন, কলেক্টও করেন।

সেকেণ্ডহ্যাণ্ড শহরের কথা আগে শুনেছেন। এটা হল সেই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড শহরেরই রাজকীয় দিক—এই কিউরিও জগৎ। কলকাতা শহরে এই কিউরিও হান্টিং ও কলেক্‌শন সাধারণত বিত্তবানদের একটা বাতিক, বিশেষ করে বিত্ত ও কৃষ্টি দুই-ই যাঁদের আছে তাঁদের অর্থাৎ যাঁরা 'কৃষ্টি-বিত্তবান'। প্রাচীন ঐতিহাসিক জিনিসপত্তর, ব্যবহার্য জিনিস পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে আরম্ভ করে আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌টস, পট, ছবি পাথরের ও পোড়ামাটির মূর্তি পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি ব্যক্তিগতভাবে যে যত বেশি সংগ্রহ করতে পারবেন, শহরে তিনিই তত বড় কৃষ্টিবান ও রুচিবান লোক বলে পরিচিত হবেন। কলকাতা শহরে এই রকম জন-দশ-বারো মাত্র বিখ্যাত লোক আছেন, যাঁদের নিজেদের বাড়িতে রীতিমত একটা ছোটখাটো মিউজিয়ম আছে। সারাজীবন, এমন কি দু-একজন বংশানুক্রমে পর্যন্ত এইভাবে কলেক্ট করছেন। অগাধ টাকা ও অবসর আছে, সুতরাং এটা তাঁদের একটা মারাত্মক বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে। সকলেই যে উচ্চশিক্ষিত ও কৃষ্টিবান তা নন, ঐতিহাসিক জিনিস চিনবারও

ক্ষমতা সকলের নেই, তবে হয়ত কালচারের একটা পারিবারিক আভিজাত্য আছে, এই পর্যন্ত। সাধারণ পটুয়ার হাত-গড়া পোড়ামাটির খেল্না পুতুল একটু ভাঙাচোরা অবস্থায় দেখিয়ে এঁদের অনেকের কাছে মহেঞ্জদড়োতে খুঁড়ে পাওয়া পুতুল বলে বেশ ভাল দামে বিক্রি করা যায়। দু-একজন অবশ্য চেনেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা সারা দেশ ঘুরে ঘুরে অনেক ভাল ভাল দুষ্প্রাপ্য জিনিস সংগ্রহে করেন, কিউরিও-শপ্ অথবা ধাপ্পাবাজ কিউরিও-ডীলারদের খপ্পরে পড়েন না।

ঐতিহাসিক দুষ্প্রাপ্য জিনিস বা কিউরিও অনেক সময় হঠাৎ সাধারণ সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বাজারেও পাওয়া যায়। খ্যাতনামা কয়েকজন ঐতিহাসিক ও সংগ্রাহককে এইসব বাজারে মধ্যে মধ্যে ঘুরতে দেখেছি, তাঁরা জহুরী, জহর চেনেন, তেমন কিছু নজরে পড়লে কিনে নিয়ে যান। কলকাতার নিলেমঘরেও অনেক সময় বড় বড় লোকের দুষ্প্রাপ্য কলেকশন্ বিক্রি হয়ে যায়, ঠিক মতন খোঁজ রেখে কিনতে পারলে ভাল জিনিস কেনা যায় নিশ্চয়ই। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে কলকাতার কিউরিও ডীলাররা। পার্ক স্ট্রীট, লিণ্ডসে স্ট্রীট ও চৌরঙ্গী অঞ্চলে দেখবেন এঁরা কিউরিওর দোকান খুলে বসে আছেন এবং অধিকাংশই মাড়োয়ারী ও বিদেশী মুসলমান। কিছু চীনে জিনিসপত্র, কিছু প্লেট, ছবি, ফুলদানি, নটরাজ মূর্তি, ওয়ালপ্লেট ইত্যাদি সাজিয়ে এঁরা পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলের কালচার-স্নবদের মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকেন। এইসব কালচার-বুজরুকদের জন্যেই এই ডীলারদের ব্যবসা চলে। আধুনিক কায়দার ফ্ল্যাট ভাড়া করে যদি ড্রয়িংরুমে একটা নটরাজের মূর্তি না রাখা যায় এবং সেই মূর্তিটা যদি দ্রাবিড়দেশের মূর্তি না হয়, যদি একখানা তিব্বতী ব্যানার, নেপালী ব্রোঞ্জ মূর্তি, বুদ্ধ ও শিবমূর্তি এবং বিখ্যাত শিল্পীদের কোন পুরনো অরিজিন্যাল ছবি না রাখা যায়, তাহলে কালচারের ইজ্জৎ থাকে না।

কলকাতা শহরের কৃষ্টিবানদের মধ্যে বর্তমানে তিনরকমের কালচারের আধিপত্য দেখা যায়। প্রথম হল ঃ 'কিউরিও কালচার'—দ্বিতীয় 'ফোক্ কালচার' এবং তৃতীয় হল 'বিশ্বভারতী কালচার'। আরও একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এইসব কালচারের একটা লোকালাইজেশনের টেণ্ডেন্সী

দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ এক-একটি কালচার ক্রমে কলকাতা শহরে 'আঞ্চলিক কালচারে' পরিণত হচ্ছে। এটা সমাজবিজ্ঞানীদের একটা অনুসন্ধানের খোরাক। কেন হচ্ছে জগদীশ্বর জানেন, তবে কালচারগুলো যে নিশ্চিত 'জোনাল' হয়ে উঠছে তাতে কোন সন্দেহই নেই। যেমন, 'কিউরিও কালচার' সাধারণত পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলের অভিজাত বঙ্গদেশীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এরই একটা পুরনো শাখা আবার ঠনঠনে কালীবাড়ি থেকে বরানগর পর্যন্ত বিস্তৃত। 'ফোক্ কালচার' ও 'বিশ্বভারতী কালচার' দুটোই দক্ষিণ কলকাতায় সীমাবদ্ধ, তাও আবার ভবানীপুর বা কালীঘাটে নয় (কিছুটা এলগিন রোড ও ল্যান্সডাউন রোডে অবশ্য আছে), বালীগঞ্জ থেকে লেকের সীমানা পর্যন্ত, আবার টালীগঞ্জটুকু বাদ দিয়ে ওদিকে রিজেণ্ট পার্ক পর্যন্ত। এইসব কালচারের একটা বিশেষ ভাল দিক অবশ্যই আছে, এগুলোর বদহজমের ফলে যে কালচার-স্নবারি বা বুজরুকি দেখা দিয়েছে, তার কথা বলছি। 'ইতিহাস' বা 'আর্ট' সম্বন্ধে ই-ঈ জ্ঞান নেই, অথচ ঘরে অরিজিন্যাল ছবি অবনীন্দ্রনাথের, নটরাজ বা বুদ্ধমূর্তি আর চীনে ফুলদানি সাজিয়ে একটা হোমরা-চোমরা 'Culture-Uncle' বা 'Culture-Aunt' সাজবার চেষ্টা করা নির্জলা স্নবারি ছাড়া কিছুই নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জ্ঞান একেবারে টন্‌টনে, অথচ হাতের লেখাটি রবীন্দ্রনাথের মতন, চলায় ফেরায় 'হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে' ভঙ্গী, কথার মাত্রা 'গুরুদেব', সুরে ন্যাকা ন্যাকা মেয়েলি সুর এবং ঘরে পর্দা শ্রীনিকেতনের, ফুলদানি, ছাইদানি ইত্যাদি সব সেখানকার শিল্প-বিভাগের, আলমারীতে সাজানো রবীন্দ্র-রচনাবলী, ভক্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের। একেবারে চূড়ান্ত স্নবারি। এরই আর-এক সংস্করণ হলেন, 'ফোক্ কালচারের' স্নবরা। জীবনে ছবিতেও কখনও সাঁওতাল গারো ওঁরাও মুণ্ডা বা নাগাদের দেখেন নি, পটুয়া কারু-শিল্পীদের কথা শুনেছেন লোকমুখে, অথচ ফোক্ পেন্টিং, ফোক্ আর্টস ও ক্র্যাফ্‌টসের ভক্ত, ঘরেতে কোন বিখ্যাত পটুয়াশিল্প-প্রবর্তক শিল্পীর দু-একখানা ছবি ঝুলছে, মুখে 'ফোক্' সম্বন্ধে খৈ ফুটছে, কবিতায় খিস্তি করে আর দুর্বোধ্য ইমেজারী দিয়ে ফোক্ ও মাইথোলজির শ্রাদ্ধ করছেন, প্রোগ্রেসিভ্

সাহিত্য ও শিল্পসভায় 'ফোক্‌ কালচার' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন—এই যে একদল কালচার-স্নব বর্তমানে কলকাতা শহরের কালচারাল ফিল্ড হস্তীর মতন চষে বেড়াচ্ছেন, এঁরা হলেন এই তিন দলের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। অধিকাংশই ফোঁপ্‌রা ঢেঁকীর দল (হয়ত অধ্যাপকও হতে পারেন), নিজের দেশের মাটির ইতিহাস, মানুষের ইতিহাস, কিছুই জানেন না, জানার আগ্রহও নেই, মুখে বিদেশী মনীষীদের কতকগুলো বাছা বাছা বুলি আছে আর 'ফোক্‌-মন্ত্রে'র ফাঁকা আওয়াজ আছে। এঁরাই 'প্রগতি'র মূর্তিমান প্রতীক, ফোক্‌-কালচারের ধারক ও বাহক। একজন সাধারণ 'ফোক্‌' হিসেবে মনে হয়ঃ 'হে ভগবান! এ-দেশের হতভাগ্য বেচারী ফোক্‌দের এই ভাগ্যবান ফোক্‌-বিলাসীদের হাত থেকে রক্ষা করুন, এখনও বাঁচান।'

যাই হোক, 'কালচার' সম্পর্কে কোন কথা বলবার অধিকার আমার নেই, কারণ কালচারটা বর্তমানে বিভিন্ন ক্র্যাফ্‌ট-গিল্ডের সিক্রেট হয়ে দাঁড়িয়েছে—তবু অনেকটা হয়ত অনধিকার-চর্চা করে ফেললাম। টিপু সুলতানের হুঁকো প্রসঙ্গে এত কথা এইজন্যেই উঠলো যে, এইসব কালচার-বুজরুকরা কলকাতা শহরে গজ্‌-গজ্‌ করছেন বলেই কিউরিওর একটা প্রধানত জুয়োচুরি ব্যবসা কলকাতায় জাঁকিয়ে জমে উঠছে। অনেক খ্যাতনামা লোকও এই ব্যবসা করেন, শুধু মেড়ো বা পশ্চিমা মুসলমানরা নন। একজনকে জানি, তিনি ঘরেতে কয়েকজন আর্টিস্টকে দিয়ে বিখ্যাত শিল্পীদের দুষ্প্রাপ্য ছবি নকল করিয়ে বিক্রি করেন অরিজিন্যাল বলে এবং তাই করে লক্ষ টাকা করেছেন। আরও দু-চারজন ফোক্‌ আর্টস ও ক্র্যাফ্‌টস ইত্যাদির ব্যবসা করে পয়সাও করেছেন, কাল্‌চার্ডও হয়েছেন। আমাদের সেই জগদীশদা একবার কলকাতার পালদের তৈরী একটা পোড়ামাটির বুদ্ধমূর্তি একটু ভেঙেচুরে পুরনো করে, সারনাথে খুঁড়ে পাওয়া মূর্তি বলে একজনের কাছে তিনশ টাকায় বেচেছিলেন। এই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। যতদিন কালচার-স্নবরা থাকবেন ও গজিয়ে উঠবেন, ততদিন টিপু সুলতানের হুঁকো, সিরাজউদ্দৌলার লুঙ্গি, আকবরবাদ্‌শাহের আতরদানি, অশোক স্তূপের পাথুরে টুক্‌রো, ধর্মপালের বা লক্ষ্মণসেনের

যুগের টেরাকোটা সব নিয়মিত পাওয়া যাবে এবং অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের একই ছবি একশবার অরিজিন্যাল বলে বিক্রি হবে। তাই বলে কিউরিওর যে সত্যিকার ঐতিহাসিক আবেদন তা কোনদিনই নষ্ট হবে না, রুচিবান ও সংস্কৃতিবানরা তার প্রতি চিরকালই আকৃষ্ট হবেন। আর যতদিন আমাদের সমাজে কালচার-স্নবরা থাকবেন ততদিন টিপু সুলতানের হুঁকো থেকে শ্রীচৈতন্যের নামাবলী ও কালীঘাটের পট, সবই মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাবে এবং মাড়োয়ারী ডীলাররা তা বিক্রি করে বেশ দু-পয়সা করবেন।

দাঁতের মর্যাদা

মানুষ হয়ে মানুষের মর্যাদা না দিন, দেঁতো হয়ে অন্তত দাঁতের মর্যাদা দিতে শিখুন। কলকাতার লোকদের বিশেষ করে দাঁত সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হবার প্রয়োজন হয়েছে। কারণ যতবড় মর্যাদাবান লোকই হন না কেন, দাঁতের মর্যাদা দিতে তিনি জানেন না। অথচ দাঁতের বিরুদ্ধে একটা ভয়ানক চক্রান্ত চলেছে, দাঁতের উপর অন্সল্টও বেড়ে চলেছে দিন দিন। কেউ সেটা খেয়াল করেছেন কিনা জানি না, তবে রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে আমার সেটা মনে হয়েছে। শুনে বা পড়ে কেউ যেন দাঁত বার করে হাসবেন না, অথবা রেগে গিয়ে দাঁত কিড়্‌মিড়্‌ করবেন না। দাঁত সম্বন্ধে একটা ওয়ার্নিং দেবার প্রয়োজন হয়েছে, তাই এই নক্‌শার অবতারণা। দাঁত যাদের সবে গজিয়েছে তারা এখনও পড়তে শেখেনি হয়ত, দন্তবানরা তাদের পড়ে বুঝিয়ে দেবেন। দাঁত যাঁদের আছে, অর্থাৎ দেঁতো যাঁরা, তাঁরা মন দিয়ে পড়বেন। দাঁত যাঁদের নেই, চলতি ভাষায় ফোগ্‌লা,

অথবা যাঁরা বাঁধানো দাঁতে কাজ চালান, তাঁরা এই নক্‌শা পড়বেন না। গজদন্তাদি নিয়ে সংখ্যায় যাঁদের বত্রিশটার বেশি দাঁত আছে তাঁরা পড়তেও পারেন, না পড়তেও পারেন, কারণ সাম্প্রতিক দন্তচক্রান্তে যদি দু-একটা দাঁত তাঁদের খসেও যায় তাহলেও ক্ষতি নেই কিছু; দাঁত যাঁরা একটাও স্পেয়ার করতে পারেন না, দাঁতের ফাংশান্ বা চিবুনো কামড়ানো সম্বন্ধে যাঁদের এখনও যথেষ্ট লোভ আছে, তাঁদের একবার পড়লে হবে না, কয়েকবার পড়তে হবে। কলকাতার কয়েক হাজার ডেন্টিস্ট, চীনাপল্লী চিৎপুর থেকে সর্বত্র অলিগলিতে পর্যন্ত যাঁরা 'ডেন্টাল ক্লিনিক্' খুলে বসে আছেন, পথের লোকের দাঁতের দিকে চেয়ে যাঁরা দিন কাটিয়ে দেন, তাঁরা যেন ভুলেও এ লেখা পড়বেন না, কারণ এটা দন্তবিশারদ বা দাঁতের ডাক্তারদের জন্যে লেখা নয়, লেখক নিজেও তা নন। সাধারণের জন্যে এ লেখা এবং একজন বিশিষ্ট আনাড়ীর লেখা। তবে লেখার দরকার কি? দরকার আছে বৈ কি, কারণ দাঁত যখন আছে এবং যতদিন আছে ততদিন লেখার দরকার আছে, অধিকারও আছে। তাছাড়া শুধু নিজের দাঁতের মর্যাদা দিলেই হয় না, অন্যের দাঁতেরও মর্যাদা দিতে হয়। মনে করুন আপনার নিজের খুব সুন্দর ঝক্‌ঝকে দাঁত আছে, ঠিক টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের ছবির মতো। আপনি যত্রতত্র প্রাণ খুলে হাসতে পারেন, দাঁত বার করে হাসতে পারেন, এবং সে হাসি দেখে লোকে খুশিও হয়, হাসির জন্যে যারা হয় না তারা অন্তত দাঁত দেখেও হয়। কিন্তু যার আটগণ্ডার জায়গায় ন-গণ্ডা দাঁত আছে তার কি অবস্থা? একটা ছোট্ট গল্প বলি, সত্যিগল্প। গোবর্ধন খুব ভাল খেলোয়াড়। রোজ মাঠে খেলে, সকলে বাহবা দেয়। খেলতে খেলতে হঠাৎ একদিন গোবর্ধন দেখতে পেলে, মাঠের সামনের বাড়িতে একটি মেয়ে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তার খেলা দেখছে। রোজই ঐ মেয়েটি দাঁড়িয়ে দেখে; গোবর্ধনও দেখে আর ভাবে, অন্যমনস্ক হয়, খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড ফল্ করে, করবেই তো। সেণ্টার ফরোয়ার্ড থেকে গোবর্ধন ক্রমে ব্যাক্ খেলতে আরম্ভ করে, কারণ ব্যাকে দাঁড়িয়ে থাকা চলে, ছুটোছুটি করতে হয় না। গোবর্ধনের পোজিশন চেঞ্জ করার

রহস্যটা কেউ অবশ্য ধরতে পারলে না। ব্যাক্ থেকেও সে ঐ জানলার দিকে চেয়ে থাকে এবং বল্ যখন আসে তখন ঐ দিকে চেয়ে মারতে গিয়ে উল্টে পড়ে যায়, বল্ যায় পায়ের তলা বা উপর দিয়ে গলে। গোবর্ধনের এই ট্র্যাজিক পরিণতির রহস্য তবু কেউ জানতে পারে না, শুধু সেই জানে। একদিন গোবর্ধন মরিয়া হয়ে কলেজের পথে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করলে। নিরিবিলিতে এক পার্কের বেঞ্চিতে বসে আলাপ শুরু হল। মেয়েটি হাসছে, কথা বলছে, কিন্তু গোবর্ধন কথা দু-একটা বলে, একেবারে হাসে না, গম্ভীর। মেয়েটি হঠাৎ কি বেফাঁস বলাতে গোবর্ধন ফ্যাঁক্ করে হেসে ফেলে দিলে। বড় বড় ডবল দাঁতগুলো সব বেরিয়ে গেল। মেয়েটি চম্‌কে উঠল, মিনিট দুই পরে 'আচ্ছা আসি' বলে সেই যে গেল আর কোনদিন তার দেখা পাওয়া গেল না। দিন তিনেক পরে গোবর্ধন এক চিঠি পেল, মেয়েটি লিখেছে: 'আপনার যা দাঁত, বাব্বা! আমার পক্ষে স্ট্যাণ্ড করা পসিব্‌ল নয়, মাপ করবেন। ইতি।' গোবর্ধনের ভয়ানক দুঃখ হল—মনে মনে সে আওড়াতে লাগল: 'হোয়াট্ ইজ্‌ মাই ডিয়ার, টুথ অর লভ্‌, টুথ অর লভ্‌!' ধিক্কার এল জীবনে, একদিন সে জোর করে গজালের মতো সেই কাঁচা দাঁত উপ্‌ড়ে ফেললে। শেষে আর ব্লিডিং বন্ধ হয় না, সেপ্টিক হয়ে মুখ ফুলে ঢোল হয়ে গেল। গোবর্ধন দীর্ঘদিন হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরল। তারপর খেলাও ছেড়ে দিল এবং কোথায় যে চলে গেল কেউ খোঁজ পেল না। এই গোবর্ধনের ব্যাপার থেকে বোঝা যায়, দাঁতের একটা সোশ্যাল্ রোল আছে, এবং সেটা খুবই ভয়ানক। দাঁতের জন্যে প্রেমের ব্যাপারও হাসপাতাল পর্যন্ত গড়াতে পারে, একবার কল্পনা করুন ব্যাপারটা। দাঁতের জন্যে আপনার প্রেম, আপনার পদোন্নতি, পপুলারিটি সবই ব্যাহত হতে পারে। সুতরাং দাঁত বাঁচান, যদি বাঁচতে চান।

ঠিক এই কথাগুলোই ট্রেনের একজন ক্যানভাসার সেদিন মুখস্থ বলছিলেন। যে যারই ক্যানভাসার হোক না কেন, দাঁতের মাজনটা সকলেরই কমন্। 'এক পয়সায় পথের শান্তি দাদা' বলে হয়ত একজন ঢুকলেন, তারপর এক পয়সায় একটা করে মাদ্রাজ প্যারিস পিপারমেণ্ট

লজেন্স বেচে যাত্রীদের শান্তি দিয়ে যাবার সময় বললেন: 'ভাল দাঁতের মাজন আছে, মেডিকেটেড টুথ-পাউডার দাদা, যাঁর দরকার হয় বল্‌বেন।' স্পেশাল ক্যানভাসার যাঁরা তাঁরা এসেই কৃষ্ণের শতনামের মতো দাঁতের মাজনের শত উপকার গল্‌গল্‌ করে এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন, শেষে অন্যান্য হজমি বড়ি, ভাস্কর লবণ ইত্যাদি হেঁকে অন্য গাড়িতে চলে গেলেন। কেউ নাটকীয় ভঙ্গীতে ঢুকে বললেন, 'বাংলা দেশের জংলা গাছের ফল দাদা—ত্রিফলা, ত্রিফলার চাট্‌নি আছে।' বলেই: 'আর আছে দাঁতের মাজন, দন্তকুমুদিনী। বেশি কথা বলব না দাদা, কারণ মাজন বেচতে এসে অনেকেই অনেক কথা বলে। আমার মাজন পয়সা দিয়ে কিনে নিয়ে যান, পয়সা না থাকে এমনি নিয়ে যান, উপকার পেলে পরে পয়সা দেবেন। দুটো মাস মাজন ব্যবহার করুন, দাঁতের পুঁজ বেদনা, কনকনানি, দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। আমার কাছে আসবেন, কিছু মনে করবেন না, যে-কাউকে ডেকে গায়ের জোরে একটা ঘুষি মারতে বলবেন দাঁতে, তার হাতখানা দু-খানা হয়ে যাবে, দাঁত একটু নড়বেও না। মিথ্যে কথা হয় যদি আমার দাঁত খসিয়ে দেবেন। দরকার থাকলে বলবেন, এক প্যাকেট দু-আনা দু-প্যাকেট তিন আনা, তিন প্যাকেট চার আনা, দাদা!' ট্রেনের কথা থাক। বাস বা মানুষ যারই প্রতীক্ষায় হোক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন, হঠাৎ উস্কো-খুস্কো কাঁদ-কাঁদ মুখ করে একজন আপনার নাকের কাছে দুটো দাঁতের মাজনের প্যাকেট তুলে ধরে বলবেন: 'হেল্প মি স্যার! ছেলেপুলে নিয়ে আজ দু-দিন না খেয়ে আছি দাদা, দুটো প্যাকেট কিনুন, মাত্র এক আনা পয়সা!' আপনি গম্ভীর হয়ে যখন মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, তখন বিরক্ত হয়ে যাবার সময় সে বলে গেল: 'আপনি কি বাঙালী নন? বাঙালীর দুঃখ—।' আপনি আঃ বলে চলে গেলেন। আর একস্তরের ম্যাজিশিয়ান্‌ ক্যানভাসার আছে শহরে, সেও ঐ দাঁতের মাজনের। কলকাতার বড় বড় অভিজাত রাজপথের মোড়ে হঠাৎ তাদের রাজকীয় স্টাইলে ক্যানভাস করতে দেখতে পাবেন। ফুটপাথের উপর টেবল পাতা, তার উপর নানারকমের দাঁতের সেট, ওষুধপত্তরের শিশি, যন্ত্রপাতি সাজানো। পিছনে

সাদা চাদর ঝুলছে, পেট্রোমাক্স জ্বলছে, নিচে একটা কাপড়ের উপর কড়ির মতো দাঁত ছড়ানো। একটা হয়ত মড়ার খুলি দাঁতসুদ্ধ বসানো। ক্যানভাসার বাঙালী যুবক ঠিক ডেন্টাল কলেজের প্রফেসারের মতো চোস্ত ভাষায় দাঁত সম্বন্ধে লেকচার দিচ্ছেন। হাতে একটা স্টিক্ আর একসেট দাঁত। লেকচারের পর এক্সপেরিমেণ্ট। চারিদিকে লোকের ভীড়। ভীড়ের ভেতর থেকে খুঁজে একটা ছোট ছেলেকে ডেকে নিয়ে এসে মধ্যে বসানো হল, আর একজন বৃদ্ধ দাঁত নড়ছে বলে তুলতে এল। দু-জনকেই যে আনা চারেক করে পয়সা দিয়ে আগে থেকে বুঝিয়ে ডেকে আনা হয়েছে, সেটা কেউ বুঝল না, কারণ লেক্চারের গুঁতোয় সকলেই তখন প্রায় হিপ্‌নোটাইজ্‌ড। ছোট ছেলেটিকে মাজন দিয়ে একবার দাঁত মাজতে বলা হল, তারপর কাচের গুঁড়ো তার মুখের ভেতর দিয়ে চিবুতে বলা হল, মাজনের এমন গুণ যে রক্ত পড়ল না, অথচ কাচ গুঁড়িয়ে গেল। বৃদ্ধের মুখে একটা রুমাল চাপা দিয়ে দাঁত তুলে ফেলা হল, রক্ত পড়তে লাগল, কিন্তু মাজন দিয়ে একবার মুখ ধুতেই রক্তপড়া বন্ধ হয়ে গেল। সবটাই ম্যাজিক। ভদ্রলোক মাজন বেচতে আসেননি বললেন, শুধু প্রচার করতে এসেছেন। সমস্ত দোকানেই তাঁর মাজন পাওয়া যায়। যে কেউ কিনতে পারেন। তবে তাঁর কাছ থেকে যদি কেউ একান্তই কিনতে চান, তিনি দু-প্যাকেটের বেশি একজনকে দিতে পারবেন না এবং এক টাকার প্যাকেট তাঁরা কমিশন বাদ দিয়ে বারো আনায় পাবেন। বেশ কয়েকটা প্যাকেট চট্‌পট্ বিক্রি হয়ে গেল। আশ্চর্য! একে দাঁতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ছাড়া কি বলবেন? কলকাতার সর্বত্র এই চক্রান্ত দেখতে পাচ্ছি। কলকাতার দশটা ছোট দোকানে খোঁজ করলে তিরিশ রকমের দাঁতের মাজন দেখা যাবে, তাছাড়া ম্যাজিশিয়ান ক্যানভাসাররা তো আছেই।

তাই বলছি, দাঁত সম্বন্ধে খুব সাবধান। এই চক্রান্ত থেকে দাঁত বাঁচানো সত্যিই দায়! অথচ দাঁত না বাঁচালে উপায় নেই। দাঁতের জন্যে স্বাস্থ্য নয় শুধু আপনার সমস্ত জীবনটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গোবর্ধনের কাহিনীটা মনে করুন। নিজে বাঁচুন না বাঁচুন, দাঁতগুলো বাঁচান। হয়ত

বলবেন, নিজে না বাঁচলে দাঁত বাঁচিয়ে কি হবে? মনে রাখবেন, জীবজগতের লক্ষ লক্ষ বছরের ইতিহাস বিজ্ঞানীরা প্রধানত দাঁত দেখেই লিখেছেন। দাঁত দেখেই হাজার হাজার বছর আগেকার প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বয়স ঠিক করেছেন বিজ্ঞানীরা। তার কারণ দেহের আর সব অংশই মৃত্যুর পরে ধ্বংস হয়ে যায়, দাঁত অক্ষয় অমর, মাটির তলায় বা পাহাড়ের মধ্যে দাঁত চিরকাল থাকে। দাঁত হল কঙ্কালবিদ্‌দের কাছে লক্ষ লক্ষ বছরের জৈবিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস পাঠোদ্ধার করার বর্ণমালা। সুতরাং দাঁত বাঁচান, নিজে না বাঁচুন ক্ষতি নেই। শুধু প্রেম বা পপুলারিটির জন্যে নয়, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীদের জন্যেও আমাদের দাঁত বাঁচানো দরকার। সব সময় রাস্তাঘাটে দাঁত বার করে থাকবেন না, কথায় কথায় দাঁত খিঁচোবেন না বা দাঁত কিড়্‌মিড়্‌ করবেন না, যা তা মাজন দিয়ে ভুলেও দাঁত মাজবেন না (আমি ক্যানভাসার নই, আমার কোন মাজন নেই), লোভ সামলাতে না পেরে কৃন্তক বা ছেদক দন্ত দিয়ে প্রাণপণে কিছু কামড়াবেন না, চিবুবেন না, দাঁত বেশি গজিয়ে বেরিয়ে থাকলেও পরোয়া করবেন না, দাঁত উঁচিয়ে চলবেন, প্রেম ব্যর্থ হয়ে গেলেও কাঁচা দাঁত উপ্‌ড়ে ফেলবেন না। তাহলেই দেখবেন আপনার দাঁত দীর্ঘজীবী হবে।
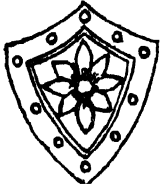
খেলার ভক্ত

ভক্ত আপনারা অনেক দেখেছেন, ভগবানও দেখেছেন অনেক, কিন্তু ভক্ত ও ভগবানের এমন অদ্ভুত ক্যামারাদেরি নিশ্চয়ই কোথাও দেখেননি, ইতিহাসেও শোনেননি। অমুক 'বালা,' অমুক 'কুমারে'র ভক্ত চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে অনেক দেখেছেন, রঙ্গমঞ্চে চৌধুরী-ভাদুড়ীদেরও ভক্ত আছে অনেক। পর্দায় বা মঞ্চে তাঁদের আবির্ভাব হলে বড় জোর ভক্তদের হুইস্‌ল দিয়ে এই সব অভিনয় রাজ্যের ভগবানদের অভিনন্দন জানাতে শুনেছেন। কিন্তু খেলার ভক্ত সত্যনারাণদা এবং নানা রকমের খেলোয়াড়দের মধ্যে যে সম্পর্ক তা নিশ্চয়ই কোথাও দেখেননি। মাঠের মধ্যে ভগবানের দেখা পেলে ভক্তকে ভল্ট্ ও সমরসল্ট্ খেয়ে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন পোল্ জাম্পারের মতো ছাতিতে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠে অভিনন্দন জানাতে দেখেছেন কোন দিন? যদি দেখতে চান তাহলে কলকাতা শহরের খেলার মাঠে যান, ফুটবল-হকি-ক্রিকেট যে কোন খেলার মাঠে। খেলা ও খেলোয়াড়ের ভক্ত আমাদের সর্বজনপ্রিয়

হাজার লোকেরই ভিড় হোক্ না কেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্যে'র মতন সত্যনারাণদা আপনার দৃষ্টিপথে নিশ্চয়ই ভেসে উঠবেন, একবার নয়, একশ বার এবং একদিকে সত্যদা, ও আর-একদিকে খেলোয়াড়সহ হাজার হাজার দর্শকদের মধ্যে আপনার মনে হবে 'খেলা দেখা' মানেই হল তাঁকে দেখা, অর্থাৎ সত্যনারাণদাকে দেখা। কলকাতা শহরে লক্ষ লক্ষ লোক খেলা দেখেছে, আজও দেখছে, ভবিষ্যতেও দেখবে, কিন্তু সত্যদার জুড়ি ছিল না কোনদিন, আজও নেই, আগামীকালে তো থাকবেই না। সত্যনারাণদা নিজে অদ্বিতীয়, অতুলনীয়, অনন্যসাধারণ এবং সত্যনারাণদার

'খেলা দেখা' অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব, ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক। একটা কথাও যে এর মধ্যে আমার অতিরঞ্জিত নয় তা যে-কোন অভিজ্ঞ দর্শকই বুঝতে পারবেন। খেলার ইতিহাসে ভারতবর্ষে তো নিশ্চয়ই, আমার মনে হয় সারা পৃথিবীতে এই সত্যনারাণদা এক যুগান্তর সৃষ্টি করেছেন এবং সেটা খেলা দেখিয়ে নয়, খেলা দেখে। ফুটবল-হকি-ক্রিকেট খেলায় হাত পায়ের বিচিত্র কলাকৌশলে অপূর্ব খেলা দেখিয়ে আজ পর্যন্ত অনেক খেলোয়াড় প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। খেলার ইতিহাসে সগৌরবে এক একটা অধ্যায় জুড়ে আছেন তাঁরা। তার মধ্যে কোন নতুনত্ব বিশেষত্ব কিছুই নেই। খেলা দেখিয়ে, অর্থাৎ চল্‌তি ভাষায় 'খেল্ দেখিয়ে' কৃতিত্ব অর্জন করা নতুন ব্যাপার নয়। খেলার উৎপত্তিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেকেই তা করেছেন। কিন্তু কেবল 'খেলা দেখে' তার চেয়েও বেশি খ্যাতি অর্জন করা নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক ব্যাপার। খেলার ইতিহাসে খেলোয়াড়রা খেলা দেখিয়ে বাহবা পেয়েছেন, পুরস্কার পেয়েছেন, মেডেল পেয়েছেন, এই আমরা এতদিন শুনে এসেছি, কিন্তু শুধু 'খেলা দেখা'র জন্যে মেডেল পুরস্কার পেয়েছেন, এমন ঘটনা খেলার ইতিহাসে কোনদিন ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। আমি কেন, আপনারা হয়ত অনেকেই তা জানেন না। যদি না জানেন তাহলে জেনে রাখুন, খেলার ইতিহাসে খেলা দেখিয়ে অনেকে পুরস্কার পেয়েছেন, পুরস্কার দিয়েছেন দর্শকরা, কিন্তু 'খেলা দেখে' আজ পর্যন্ত একজন মাত্র পুরস্কার পেয়েছেন এবং পুরস্কার দিয়েছেন বিখ্যাত খেলোয়াড়রা খুশি হয়ে। তিনি আমাদের সত্যনারাণদা। যে সময় সত্যনারাণদাকে মেডেল দেওয়া হয়, সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না, তা না হলে প্রস্তাব করতাম মেডেলের উপর এই দুটি লাইন খোদাই করে দিতে—

'প্লেয়ার্স মে কাম্ অ্যাণ্ড প্লেয়ার্স মে গো,
বাট্ সত্যনারাণদা গোজ্ অন্ ফর এভার।'

বাস্তবিকই সত্যনারাণদা হলেন খেলার মূর্তিমান প্রতীক। যদিও দেখতে তিনি বেশ লম্বা-চওড়া গোলগাল, তাহ'লেও তাঁকে খেলার অদৃশ্য স্পিরিট বা আত্মা বলা যায়। আত্মা হিসেবে নিশ্চয়ই তিনি অবিনশ্বর।

বুলবুলির লড়াই দেখা আর ঘুড়ি ওড়ান এক সময় কলকাতা শহরের ভদ্রলোকদের একটা মহা আনন্দের বিষয় ছিল। এক-একটা জায়গায় লোহার জাল দিয়ে ঘিরে বহু বুলবুলি পাখি রাখা হত এবং মধ্যে মধ্যে তাদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে কৌতুক দেখা হত। সেই কৌতুক দেখবার জন্যে শহরের লোক হুমড়ি খেয়ে ভেঙে পড়ত। ঘুড়ি ওড়ানোও একটা দর্শনীয় বস্তু ছিল। ঢাউস ঘুড়ি, মানুষ ঘুড়ি ইত্যাদি, ঘুড়ির প্রকার ও প্রণালী ছিল বহু রকমের। শহরের ভদ্রলোকরা দিনদুপুরে গড়ের মাঠে গিয়ে আকাশে ঘুড়ির খেলা দেখতেন। বুলবুলি পাখির লড়াই সাধারণত শীতকালের দিকেই হত এবং শহরের বিত্তবান সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকরাও অনেকে বুলবুলি পুষতেন, লড়াইয়ের প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। একবার আশুতোষ দেবের বাড়িতে এই রকম বুলবুলির লড়াইয়ের আয়োজন করা হয়েছিল মহাসমারোহে। আশুবাবুর বিপক্ষ দল ছিল হরনাথ মল্লিকের একদল বুলবুলি পাখি। বুলবুলির লড়াই দেখার জন্যে শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, দর্শকদেরও ভিড় হয়েছিল খুব। বুলবুলিদের উভয় পক্ষের ট্রেনাররা প্রথমে এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন, খেলার মাঠে আজকাল যেমন ক্যাপ্‌টেনরা করেন তেমনি। তারপর হুইস্‌ল দেওয়া মাত্রই লড়াই শুরু হল, দুই দলের বুলবুলির মধ্যে। মল্লিকবাবুর বুলবুলিরা প্রথম দিকে খুব কায়দা কসরৎ দেখাল, দর্শকরা ট্রেনারকে খুব বাহবা দিতে লাগলেন। কিন্তু প্রায় দুই ঘণ্টা ঘোরতর লড়াইয়ের পর মল্লিকদের বুলবুলিরা ঝিমিয়ে পড়ল, আশুতোষ দেব ওরফে বিখ্যাত 'ছাতুবাবু'র বুলবুলিরা জয়ী হল। ম্যাচ্ বা কন্টেস্টের পর খেলার মাঠে আজকাল যেমন লাটবাহাদুর বা অন্য কোন স্বনামধন্য ব্যক্তি পুরস্কার বিতরণ করেন, তেমনি ঐ বুলবুলির লড়াই শেষ হবার পর বিচারক মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় পুরস্কার বিতরণ করলেন। ছাতুবাবুর বুলবুলিদের কীর্তিকথা শহরময় লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রিকেটের টেস্ট খেলার খবর যেমন এখনকার খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়, তেমনি বুলবুলির লড়াইয়ের খবরও তখনকার কাগজে ছাপা হত। তবে প্রহরে প্রহরে স্পেশাল বুলেটিন বেরুত কিনা জানি না। লড়াইয়ের ক্ষেত্র থেকে

কোন্‌পক্ষের বুলবুলিরা কখন কিভাবে কসরৎ দেখাচ্ছে তা ব্রডকাস্ট করে জানাবারও তখন উপায় ছিল না। তবে ছাতুবাবুর বিখ্যাত বৈঠকখানা থেকে নিশ্চয়ই কেউ চোঙ্‌ ফুঁকে বাইরের অপেক্ষমান জনতাকে বুলবুলি-দের খবর বলত বলে মনে হয়।

এখন সেই বুলবুলের লড়াই দেখার যুগ কেটে গেছে, কারণ লড়াবার জন্যে শখ করে বুল্‌বুল্‌ পুষে রাখার মতো কলকাতা শহরের সেই সেকেলে তুল্‌তুলে আবহাওয়া আর নেই। আজ ক্রিকেট-হকি-ফুটবল-টেনিসের লড়াইয়ের যুগ এসেছে। সেকালের মতন এখন আর পাখিরা খেলা করে না বা লড়াই করে না। একালে মানুষেই খেলা করে। বুলবুলদের দল হিসেবে তখন নাম হত এবং সবচেয়ে বেশি নাম হত যিনি পুষতেন আর যিনি ট্রেনিং দিতেন তাঁর। এক একটা বুল্‌বুলের একটা করে স্বতন্ত্র নাম ছিল কিনা এবং লড়াইয়ের কৌশলের জন্যে কোন একটি বুল্‌বুলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ত কিনা, জানা যায় না। কোন একটি বুল্‌বুলের পক্ষে রণাঙ্গনে কৃতিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য দেখাবার সুযোগ ছিল কিনা, যাঁরা লড়াই দেখেছেন তাঁরাই বলতে পারেন, আমরা জানিনে। পশুদের মধ্যে আজকাল দেখা যায়, ঘোড়ারা এদিক দিয়ে খুব ভাগ্যবান। ঘোড়দৌড় খেলায় ঘোড়াদের নিজেদের সুখ্যাতি হয়, ঘোড়ার ট্রেনারদেরও সুনাম হয় এবং ঘোড়া যাঁরা পোষেন তাঁরাও নামজাদা হন। বুল্‌বুল্‌দের বোধ হয় সেরকম সৌভাগ্য হয়নি। তবে আজকাল মানুষের খেলায় দল হিসেবে নাম হয়, খেলোয়াড় হিসেবে ব্যক্তিরও নাম হয় এবং ট্রেনার ও ক্যাপটেন্‌দেরও নাম হয়। যুগ হিসেবে আজ খেলা বদলেছে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে খেলোয়াড়ের কৃতিত্বের সুযোগই আজ বেশি। সবই বদলেছে, কিন্তু দর্শকরা যে খুব বেশি বদলেছেন তা মনে হয় না। সেই সেকালে বুল্‌বুলির লড়াই ও ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে যাঁরা কলকাতার নানাস্থানে, গড়ের মাঠে ভিড় করতেন, মানুষে মানুষে লড়াই অর্থাৎ কোস্তাকুস্তী দেখতে যাঁরা নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেতেন, তাঁদেরই বংশধর আমরা আজ খেলার মাঠে ফুটবল-হকি-ক্রিকেট-টেনিস খেলা দেখি। কিন্তু তবু বলব এবং হলপ্‌ করে বলব, সেই বুল্‌বুলির লড়াই ও কোস্তাকুস্তীর যুগ থেকে আজকের এই ক্রিকেট-হকির যুগ পর্যন্ত

আমাদের সত্যনারাণদার মতো একটি দর্শকও জন্মায়নি। অবতার যাঁরা তাঁরা হয়ত যুগে যুগে আবির্ভূত হন, কিন্তু সত্যনারাণদারা বোধ হয় একবারই আসেন। সত্যনারাণদা যেন নিজেই একটা যুগের প্রতিনিধি।

সুপুরুষ সজ্জন লোক সত্যনারাণদা ব্যবসায়ী হলেও ব্যবসা তাঁর কাছে খেলার চেয়ে বড়ো নয়। সদালাপে ও সম্ভাষণে এত মধুর যে চেষ্টা করেও তাঁকে রাগানো যায় না। খেলার মাঠে কোন বিখ্যাত খেলোয়াড় নামলে হয়ত সব সময় আপনারা টের পাবেন না, কিন্তু মাঠের যেখানেই থাকুন, সত্যনারাণদা এলে বুঝতে পারবেন তিনি এসেছেন এবং তাঁকে চিনতেও দেরী হবে না। সুদীর্ঘ চেহারা, হাতে ছাতি, কোমরে চাদর জড়ানো— সত্যনারাণদা মাঠে ঢোকামাত্রই দর্শকরা সানন্দে সরবে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। গ্যালারীতে নয়, মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসে তিনি খেলা দেখেন। এই বয়সে নিজের প্রিয় খেলোয়াড়কে দেখলে ভল্ট ও ডিগবাজী খেতে তাঁর একটুও কষ্ট হয় না, এবং খেলা দেখে দেখে তিনি তার নাড়ীটি পর্যন্ত এমন-ভাবে জেনেছেন যে, খেলার ভবিষ্যদ্বাণী তিনি অকাট্যভাবে করতে পারেন। কে কখন নক্‌ট আউট হবে, বাউণ্ডারী মার মারবে, সব তাঁর আগে থেকেই জানা। এ হেন সত্যনারাণদাকে যে খেলোয়াড়রা নিজেরাই মুগ্ধ হয়ে স্পোর্টিং স্পিরিটের জন্যে পদক-পুরস্কার দেবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? বিদেশী খেলোয়াড়রাও একথা সানন্দে স্বীকার করে গেছেন যে, পৃথিবীর অনেক জায়গায় তাঁরা ঘুরেছেন, অনেক রকমের দর্শক দেখেছেন, কিন্তু সত্যনারণদার মতো দর্শক কখনও দেখেননি। তাঁদের মতে সত্যনারাণদা খেলার আত্মাস্বরূপ।

সত্যনারাণদা একজন নিরীহ ভদ্রলোক। বাঙালীরা শুধু 'খেলা দেখাতে' নয়, 'খেলা দেখতেও' জানে। সত্যনারাণদা তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় হিসেবে চিরজীবী হয়ে থাকবেন খেলার ইতিহাসে। খেলা যাঁরা দেখেন তাঁদের আদর্শ যেমন, খেলা যাঁরা দেখান তাঁদেরও মডেল তেমনি সত্যনারাণদা। সত্যনারায়ণদা দীর্ঘজীবী হোন কামনা করি, কিন্তু লক্ষ লক্ষ খেলার মাঠের দর্শকদের মধ্যে, খেলার ভক্তদের মধ্যে, ভবিষ্যতে তাঁকে রিপ্লেস করবে কে জানিনে।

মাতালের যুক্তি

গত ত্রিশ বছর ধরে মদ্যপানে অভ্যস্ত এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক কিছুদিন আগে আমাকে বলেছিলেন : 'লেখেন তো অনেক কিছু সম্বন্ধে—একবার মদ্যপান সম্বন্ধে লিখতে পারেন? মদ খাওয়া সম্বন্ধে লোকের এত কুসংস্কার কেন? মদ্যপান কি সত্যিই অন্যায়?' মদ্যপান ন্যায় কি অন্যায় জানি নে, মদ্যপানের পক্ষে বা বিপক্ষে ওকালতি করার অধিকারও আমার নেই। আমার মতে, মদ যাঁরা খান তাঁরাও মানুষ, এবং যাঁরা খান না তাঁরাও মানুষ, উভয় দলকেই আমি শ্রদ্ধা করি। তবে মাতলামি বরদাস্ত করতে আমি কেন, কেউই রাজী নন। যত পুষ্টিকর খাদ্যই হোক না কেন, এমন কি অমৃত পর্যন্ত, অপরিমিত খেলে অনিষ্ট হয়। সুতরাং মদও অপরিমিত পান করলে ক্ষতি হয়। পরিমিত পান উচিত কি অনুচিত, আমার বিচার্য নয়। আমি শুধু এখানে মদ্যপানের ইতিহাস বলছি শুনুন।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে মানুষ মদ্যপান করে আসছে। যে কোন দেশের আদিবাসীদের মধ্যে গেলে যে কেউ বুঝতে পারবেন। যব, গম বা ধান থেকে মদ চোলাই করার কৌশল পৃথিবীর প্রত্যেক আদিম জাতি জানে, এবং গাছের রস থেকে সুরা তৈরীর পদ্ধতিও তাদের অজানা নয়। আমাদের দেশের সাঁওতাল হো মুণ্ডা ওরাঁও শবর জুয়াং প্রভৃতি আদিবাসীদের মধ্যে মহুয়া, হাড়িয়া, তাড়ি ইত্যাদি অত্যন্ত প্রচলিত। স্কচ্ হুইস্কি তারা না খেতে পেলেও, মদ তারা খায় এবং কাজে-কর্মে-উৎসবে-পার্বণে মদ না হলে তাদের চলে না। সুতরাং মদ খাওয়া আমাদের দেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই চলে আসছে। মহেঞ্জদড়ো-হড়প্পার যুগেও চালু ছিল। তারপর বৈদিক যুগের কথা যদি বলেন তাহলে বলতে হয় যে, ঋগ্বেদের অধিকাংশ ঋকের মধ্যে সোমরস পানের কথা

আছে, স্বয়ং ইন্দ্র পর্যন্ত সোমরস পেলে সবচেয়ে বেশি খুশি হন। সোমরস বস্তুটি কি? হয়ত তাড়ি নয়, কিন্তু ঐ জাতীয় কোন পানীয় তো নিশ্চয়ই। এইবার রামায়ণ মহাভারতের যুগে মদ্যপান কতটা চলত দেখা যাক।

প্রথমে রামায়ণের কথা বলি। ভরত যখন সসৈন্যে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন, তখন আশ্রমবাসী ঋষি কি দিয়ে তাঁদের অতিথিসেবা করেছিলেন জানেন? আশ্রমে অতিথিদের সেবা করবার জন্যে প্রচুর মদ্য ও মাংসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এতো গেল অযোধ্যাকাণ্ডে ভরদ্বাজের আতিথ্যের কথা। সুন্দরকাণ্ডে বানরসেনার মধুপান এর চেয়েও ভয়ঙ্কর। মহেন্দ্র পর্বত থেকে নেমে মহাবীর হনুমানকে সঙ্গে নিয়ে বানররা কিষ্কিন্ধ্যা অভিমুখে যাত্রা করল। ক্রমে তারা নন্দনকাননতুল্য রমণীয় মধুবন নামক কাননে উপস্থিত হল। বানররা অঙ্গদের কাছে মধুপানের অনুমতি চাইল। জাম্বুবান ও হনুমানের অনুমতি নিয়ে অঙ্গদ মধুপানের আদেশ দিলেন। বানররা মধুপানে উন্মত্ত হয়ে—

মহীতলাৎ কেচিদুদীর্ণবেগা
মহাদ্রুমাগ্রাণ্যভি সংপতন্তি।
গায়ন্তমন্যঃ প্রহসন্নুপৈতি
রুদন্তমন্যঃ প্ররুদন্নুপৈতি॥

—কেউ মহাবেগে ভূতল থেকে লম্ফ দিয়ে উঁচু গাছের মগডালে উঠল, কেউ গান করছে দেখে অন্য কেউ হাসতে হাসতে তার কাছে গেল, একজন কাঁদছে দেখে আর একজন কাঁদতে কাঁদতে তার কাছে হাজির হল। মধুবনে এই যে ব্যাপারটা ঘটল, এটা আজকালকার কোন নিম্নস্তরের বার-রেস্টুরেন্টেও ঘটে না এবং মধুবনের এই মধু যে 'হনি' নয় তা যে কোন হাবাগোবাও বুঝতে পারেন। বেশ বোঝা যায়, মধুবন হল তালবন এবং মধু হল তাড়ি। উন্মত্ত হয়ে পরস্পরকে প্রহার করা এবং বনরক্ষক দধিমুখ শান্ত করতে এলে তাকে নখ, দাঁত, হাত পা দিয়ে হাঁচড়ে, কামড়ে দেওয়া, একমাত্র তাড়ি খেলেই সম্ভব হতে পারে। সুতরাং রামায়ণের যুগে তাড়ি ও নানারকমের দেশি চোলাই মদের প্রচলন যে লোকসমাজে যথেষ্ট ছিল তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

মহাভারতের মধ্যে মদ্যপানের বড় বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। অভিমন্যুর বিবাহবাসরে প্রচুর মদ্যের আয়োজন ছিল। আচার্য শুক্র মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন। বলরামের মদ্যপানের কথা তো অনেক জায়গাতেই বলা হয়েছে। উদ্যোগপর্বে একটি দৃশ্যে কৃষ্ণ ও অর্জুন দুজনকেই মাতাল অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে দূতরূপে পাঠালে সঞ্জয়ের প্রতি উভয়ের কথাবার্তা থেকে বেশ বুঝতে পারা যায়, উভয়েই যেন প্রচুর মদ্যপান করেছেন। দ্রোণপর্বে দেখতে পাই, একদিন যুদ্ধযাত্রাকালে ভীমসেন কৈরাতক মধু পান করলেন এবং দ্বিগুণ বলে বলীয়ান হয়ে যাত্রা করলেন। যুদ্ধযাত্রাকালে মদ্যপান করা অনেকেরই অভ্যাস ছিল। কেউ কেউ শখ করেও মদ্যপান করতেন। কামুক কীচক একদিন দ্রৌপদীকে বলছেন: 'এস, আমার সঙ্গে মধুকপুষ্পজ মদিরা পান কর!' যদুবংশে মদ্যপান খুব বেশি মাত্রায় চলত এবং অত্যধিক মদ্যপানই যদুবংশের ধ্বংসের কারণ। বড় বড় ব্যাপারে প্রচুর মদ্যের আয়োজন করা হত। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে খাদ্য ও পানীয়ের তালিকাতে মাংস ও মদ্যেরই প্রাচুর্য দেখা যায়। অভিজাত ঘরের কুলবধূরাও রীতিমত মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিলেন। কৃষ্ণ ও অর্জুন জলকেলির উদ্দেশ্যে যমুনায় যাত্রা করেছেন, তাঁদের সঙ্গে দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রমুখ কুলবধূরাও আছেন। কেউ আনন্দে নৃত্য করছেন, কেউ হাসছেন, কেউ বা উৎকৃষ্ট আসব পান করে মত্ত হয়েছেন। মৎস্যরাজের মহিষী সুদেষ্ণা পিপাসা দূর করার জন্য মদ্যপান করতেন, কতকটা ইয়োরোপীয় মহিলার বিয়ার পানের মতো। অভিমন্যুর শবদেহ আলিঙ্গন করে উত্তরাকে বসে থাকতে দেখে গান্ধারী দুঃখ করে বলছেন: 'মাধ্বীকের মত্ততায় মূর্ছিত হয়েও যে উত্তরা স্বামীকে আলিঙ্গন করতে লজ্জিত হত, আজ সেই উত্তরা সকলের সামনে পতির অঙ্গ পরিমার্জন করছে।' এই বিলাপোক্তি থেকেই বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়, ধনীদের অন্তঃপুরেও বেশ রীতিমত মদ্যপান চলত।

সুতরাং মদ্যপানের মধ্যে আধুনিকতার কোন চিহ্ন নেই। মদ্যপান রীতমত প্রাচীন ব্যাপার এবং প্রাচীন ভারতের সর্বত্র মদ্যপানের ছড়াছড়ি

ঢলাঢলি। ভরদ্বাজ মুনি যেভাবে মদ মাংস দিয়ে ভরতসেনাদের অতিথিসেবা করেছিলেন, তা আজকালকার টি পার্টি, গার্ডেন পার্টিতেও কেউ করে না। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞে যে মদ্য-মাংসের আয়োজন দেখা যায় তা আজকালকার লাটসাহেবদের ভোজ-সভাতেও দেখা যায় না। মহাভারতের যুগে ধনীদের অন্তঃপুরে পর্যন্ত যখন রীতিমত মদ চলত, তখন আজকালকার কোন অভিজাতের গৃহে যদি আধুনিকা মহিলারা শেরী ব্রাণ্ডি দিয়ে অতিথিসেবা করেন এবং নিজেরাও পান করেন, তাহলে অবাক হবার কিছু আছে কি ? মৎস্যরাজমহিষী যখন পিপাসা পেলেই মদ খেতেন, তখন এযুগের কোন মিসেস্ বনার্জি বা মিস্ বোস যদি জলের বদলে বিয়ার খেতে ভালবাসেন তাহলে তার নতুনত্ব কোথায় ?

অনেকের ধারণা আছে, ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা মদ খেতে শিখেছি। এটা মারাত্মক ভুল ধারণা। কেউ যদি বলেন, ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা কাপড় পরতে শিখেছি তাহলে যেমন ভুল বলা হয়, মদ খেতে শিখেছি বললেও তেমনি হাস্যকর ভুল বলা হয়। ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা বিলেতী কাপড় পরতে শিখেছি, বিলেতী মদ খেতে শিখেছি, এই পর্যন্ত। বরং ইতিহাসের দিক থেকে বলা যায়, ইংরেজরাই আমাদের কাছ থেকে মদ খাওয়া শিখেছে। পৃথিবীতে যব গম ও ধানের প্রাচুর্য যেখানে, সেখানেই মদ চোলাই প্রথম শুরু হয়েছে। শর্করা থেকে যদিও অ্যালকহল তৈরি করা যায় তাহলেও স্টার্চকে শর্করায় পরিণত করা শক্ত নয় এবং গম ও ধানের মধ্যে প্রচুর স্টার্চ আছে। সুতরাং মদ চোলাই এসিয়াতেই শুরু হয়েছে আগে, ভারতবর্ষে তো নিশ্চয়ই। ইংরেজরা আসার পর আমরা আধুনিক পদ্ধতিতে চোলাই করা বিলিতি মদ খেতে আরম্ভ করেছি এবং বহুকাল ধরে সমাজের উচ্চস্তরে ও নিম্নস্তরের মধ্যে যে মদ্যপান এদেশে প্রচলিত ছিল, সমাজের নতুন শিক্ষিত মধ্যবর্তীস্তরের মধ্যে সেটা ইংরেজ আমলেই চালু হল। অর্থাৎ ইংরেজরা নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের বিলিতি মদ খেতে শেখালেন। সস্তায় বিলিতি মদ যথেষ্ট কিনতে পাওয়া যায়, তাছাড়া নতুন খেতে শিখলে খেতে ইচ্ছেও করে বেশি। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে

মদ খাওয়ার একটা হুজুগ এল এবং মদ খাওয়াটাই যেন আধুনিক সভ্যতার একটা মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াল।

মদ্যপান বিষয়ে রামমোহন রায়ের শিষ্য ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে মতভেদ ছিল। রামমোহন রায়ের শিষ্যরা পরিমিত মদ্যপানের পক্ষে ছিলেন, হিন্দু কলেজের ছাত্ররা তা ছিলেন না। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখছেন : 'তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। আমাদিগের বাসা তখন পটলডাঙ্গায় ছিল। আমি পাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, প্রসন্নকুমার সেন ও নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কলেজের গোলদীঘিতে মদ খাইতাম, এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি শিককাবাবের দোকান ছিল, তথা হইতে গোলদীঘির রেল টপ্‌কাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়া আমরা আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক কার্য মনে করিতাম।' এই কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কলকাতা শহরে মদ্যপান ও মাতলামি অতিমাত্রায় বেড়ে যায়। হুতোমের নক্‌শার মধ্যে তার চমৎকার সব চিত্র পাওয়া যায়। এক জায়গায় হুতোম বলছেন : 'শহরের ইতর মাতালের ঘরে ধরে রাখবার লোক নাই বলেই আমরা নর্দমায়, রাস্তায়, খানায়, গারদে ও মদের দোকানে মাতলামি কত্তে দেখতে পাই। শহরে বড়মানুষ মাতালও কম নাই, সুদ্ধ ঘরে ধরে রাখবার লোক আছে বলেই তাঁরা বেরিয়ে এমন মাতলামি কত্তে পান না। এঁদের মধ্যে অনেকে এমন মাতলামি করে থাকেন যে অন্তরীক্ষ থেকে দেখলে পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে যায় ও বাঙ্গালী বড়মানুষদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হয়।'

ঘৃণা আজও যে হয় না তা নয়, তবে মাতালের ইতরবিশেষ নেই এবং মদ্যপান যাই হোক, মাতলামি নিশ্চয় ঘৃণার যোগ্য। হুতোমের আমল থেকে কালপেঁচার কাল পর্যন্ত মদ্যপান ও মাতলামি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তখন যেটা অত্যুৎসাহীর ফ্যাশান ছিল, এখন সেটা নিরুৎসাহীর ও

হতোত্তমের 'নেসেসিটি' হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইটাই ভয়ের কারণ। হুতোমের আমলে মদ খেয়ে লোকে পাখি হয়ে উড়তে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মরত, বাবার প্রতিষ্ঠিত পুকুরে ডুব দিয়ে আর উঠত না। এখন কালপেঁচার কালে মদ খেয়ে লোকে ইচ্ছে করে ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে, এবং কর্পোরেশনের লেকে ডুবে গিয়ে মরে ভেসে ওঠে। দুই কালের মধ্যে তফাত অনেক। আত্মহত্যা, আত্মবিস্মৃতি বা পরিপার্শ্ব-বিস্মৃতির উপকরণ যদি মদ হয় তাহলেই ভয়ের কারণ, তা না হলে রামমোহনের শিষ্যদের মতো পরিমিত পান এমন কি আর অন্যায়? তাছাড়া মদ খাওয়াটা মোটেই ভারতীয় ঐতিহ্যবিরোধী নয় এবং একেবারেই আধুনিক বা ইয়োরোপীয় নয়। মদ খেয়ে মাতলামি করাটা একশবার অন্যায় এবং বেঁচে থাকার জন্যে যা খাওয়া একান্ত প্রয়োজন তা না খেয়ে মদ খাওয়া আরও বেশি অন্যায়।
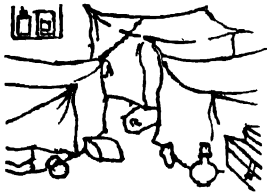
৩০ স্কয়ার ফুট লাইফ

গড়ে পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা আমরা, অথচ আমাদের এত মূল্যবান লাইফ্‌টা তিরিশ স্কয়ার ফুট হল কি করে, সত্যিই ভাববার বিষয়। স্কয়ার ফুট বলতে 'এরিয়া' বোঝায়, সুতরাং আমাদের লাইফের এরিয়া ক্রমে তিরিশ স্কয়ার ফুটের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আসছে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের কথা বলছি। কলকাতা শহরটা এমনিতে অবশ্য অনেক বড়, তার চেয়ে

বড় বাংলাদেশ, আরও বড় ভারতবর্ষ, এসিয়া এবং সবার চেয়ে বড় হল কমলালেবুর মতন পৃথিবীটা, কিন্তু তাতে কাচকলার মতন মানুষের আসে যায় কি? বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ, এসিয়া বা গ্লোবের এরিয়ার কথা আপাতত বাদ দেওয়াই ভাল। সামান্য যে কলকাতা শহরে আপনারা থাকেন তার এরিয়া চৌত্রিশ স্কয়ার মাইল, কিন্তু তাহলেও আপনাদের ব্যক্তিগত জীবনের এরিয়া তিরিশ স্কয়ার ফুটের সিকি ইঞ্চিরও বেশি নয়, বরং ঠিক করে মাপলে হয়ত কিছু কমতে পারে। কলকাতার অধিকাংশ লোক 'শূন্যে' থাকে বলে বিশ তিরিশ লক্ষ লোক শহরে বাস করতে পারে। অর্থাৎ কলকাতার 'ফার্স্ট' থেকে 'টপ' ফ্লোর পর্যন্ত যারা থাকে তারা শূন্যে ঝুলছে বলা যায়, কিন্তু মনে করুন, সকলে যদি আপার ফ্লোর-গুলি ছেড়ে একবার গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে আসে, তাহলে কি হয়? প্রত্যেক লোকের গড় দৈহিক এরিয়া (পুরুষ, স্ত্রী, শিশু মিলিয়ে) যদি বিশ স্কয়ার ফুট হয় (পাঁচ ফুট লম্বায়, আর দুই হাত সমেত চার ফুট আড়ে), তাহলে চৌত্রিশ স্কয়ার মাইল কলকাতায় বিশ লক্ষ লোকের কি অবস্থা হয় একটু ম্যাথামেটিকালি ভাববার চেষ্টা করুন। সামান্য এরিথমেটিকের জ্ঞান থাকলেই এটা ভাবা যায়, কিন্তু শুধু এরিথমেটিক নয়, এর মধ্যে একটু জিওমেট্রি বা জ্যামিতির ব্যাপার আছে। বিশ লক্ষ লোক যদি সোজা হয়ে কলকাতায় দাঁড়ায় বা চলাফেরা করে, তাহলে গ্রাউণ্ডের উপর তাদের দৈর্ঘটা নিছক 'পার্পেণ্ডিকুলার' হয়ে যায়, গ্রাউণ্ড-এরিয়া বা 'টু ডাইমেন্‌সানাল' জ্যামিতির মধ্যে সেটা গণ্য হয় না। সমস্যাটা 'থ্রি-ডাইমেন্‌সানাল' জ্যামিতি বা লেংথ, ব্রেড্‌থ ও ডেপ্‌থের দিক থেকে ভাবতে হয়। কিন্তু সে কথা আপাতত বাদ দিয়ে বলা যায় যে, 'ফ্ল্যাট্' জ্যামিতির দিক থেকেও ব্যাপারটা অন্যরকম রূপ নিতে পারে। যদি লোকগুলো না দাঁড়িয়ে থেকে মাথায় হাত দিয়ে উবু হয়ে বসে পড়ে বা একেবারে মাটিতে থেবড়ে বসে, তাহলেই সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যায়। আর যদি শুয়ে পড়ে তাহলে তো কথাই নেই। তার মধ্যে আবার চিত হয়ে, কাত হয়ে, উপুড় হয়ে, হাত-পা ছড়িয়ে ইত্যাদি নানা রকমের শোওয়া আছে। এক-এক ধরনের শোয়ার সাইজ্ ও এরিয়া এক-এক রকমের,

কিছুতেই চৌত্রিশ স্কয়ার মাইল কলকাতায় বিশ তিরিশ লক্ষ লোকের জায়গা হয় না। সুতরাং কলকাতার 'ফ্ল্যাট' ও 'ফ্লোর' লাইফ্ যদি না থাকত, তাহলে হয়ত তিনভাগের দু-ভাগ লোককে 'পাম্প আউট' করে দিতে হত বাইরে। তার বদলে অধিকাংশ লোককে শূন্যে তুলে দিয়ে কোনরকমে সমস্যাটার সমাধান করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও কলকাতার সাধারণ লোকের লাইফের এরিয়া তিরিশ স্কয়ার ফুটের বেশি কোনমতেই বলা যায় না। তাও আবার বাইরে নয়, নিজের ঘরে। বাইরে বাসেট্রামে গড়ে তিন স্কয়ার ফুট, আফিসের চেয়ারে ওই তিন চার স্কয়ার ফুট, শুধু বাড়িতে শয়নে পদ্মলাভের পর বেশি হলে তিরিশ স্কয়ার ফুট—এর বেশি শহরের সাধারণ মানুষের জীবনের এরিয়া নয়, অন্তত 'আজব শহর কলকেতা'য় তো নয়ই। ১৮৩৭ সালে একবার কলকাতার পুলিস-সুপার বাড়ির সংখ্যা হিসেব করেছিলেন ঃ

পাকাবাড়ি	ঃ ১৪,৬২৩
খোলার ঘর	ঃ ২০,৩০৪
খড়ের ঘর	ঃ ৩০,৫৬৭

অর্থাৎ প্রায় একশ বছর আগে কলকাতায় খড়ের ঘর ছিল সবচেয়ে বেশি, খোলার ঘর তার চেয়ে কিছু কম, পাকাবাড়ি সবচেয়ে কম। লোক ছিল তখন দু-লক্ষ উনত্রিশ হাজারের মতন। এখনকার কলকাতার চেহারা একেবারে বদলে গেছে ও যাচ্ছে। কলকাতার লোক বাড়ছে যত, তত বাড়ির উপরের তলা বাড়ছে, কারণ গ্রাউণ্ডে জায়গা নেই। মানুষ ক্রমেই উপরে উঠছে এবং শূন্যে ঝুলছে, মাটিতে পা নেই। সম্প্রতি দেখবেন, কলকাতার বাড়ির উপরের দিকে 'তলা' উঠছে ভাড়াটেদের জন্যে। এমন কি, টপ্ ফ্লোরের চিলে-কোঠায় বা ঠাকুর ঘরে অথবা ছাদের উপর দরমা টিন, এক-ইঁটের দেয়াল ও টালি দিয়ে ঘর বানিয়ে ভাড়াটে বসানো হচ্ছে। নিচের রাস্তা থেকে জানা যায় না এইভাবে কতলোক দোতলা, তেতলা, চারতলা, পাঁচতলা বাড়ির ছাদের ওপর ছোট্ট টালির ঘরে বাস করে। বোধহয় কর্পোরেশনের কর্তারাও জানেন না। কলকাতার সমস্ত বাড়ির টপ্ ফ্লোর ও ছাদ ইন্‌স্পেক্‌শন করলে

(এরোপ্লেনে করে করাই ভাল) জানা যায়, কত লোক একেবারে শূন্যে ঝুলছে। এইভাবে শূন্যে যারা বাস করছে তারা প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে, বৃষ্টিতে ধসে যাচ্ছে, তবু বাস করতেই হবে, সুতরাং করতে হচ্ছে। তাদের জীবনের এরিয়া নিচের বস্তিবাসীদের মতন আরও কম, পনের স্কয়ার ফুটের বেশি নয়। কিন্তু সে লাইফের কথা থাক্, মোটামুটি সাধারণ লোকের ত্রিশ স্কয়ার ফুট লাইফের কথা বলি।

ত্রিশ স্কয়ার ফুট হিসেবটা আমার কাল্পনিক মনগড়া হিসেব নয়। সম্প্রতি গভর্নমেণ্ট কেন্দ্রীয় মধ্যবিত্ত সরকারী কর্মচারী, কর্মচারীদের 'ফ্যামিলি বাজেটে'র যে তদন্ত করেছেন তার রিপোর্ট থেকে এই হিসেব কষে বার করা হয়েছে। ভাড়াটে বাড়ির মধ্যবিত্ত কর্মচারীরা মাসিক আয় অনুযায়ী কতটা জায়গার মধ্যে (ফ্লোর স্পেস) বাস করেন তার হিসেব তাঁরা যা দিয়েছেন তা হল এই :

১০০৲ টাকার নিচে :	৪৯	স্কয়ার	ফুট
১০০৲—১৫০৲ টাকা :	৪৩	”	”
১৫০৲—২০০৲ টাকা	৪৮	”	”
২০০৲—২৫০৲ টাকা	৫৫	”	”
২৫০৲—৩০০৲ টাকা	৫০	”	”
৩০০৲—টাকার উপর :	৬৯	”	”

এই হিসেব থেকে বলা যায় যে, ১০০৲—৩০০৲ টাকা আয়ের সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রত্যেক লোক গড়ে ৪৫ স্কয়ার ফুট ফ্লোর-স্পেসের মধ্যে বাস করেন। কিন্তু এর মধ্যে ফ্লোরে যে ট্রাঙ্ক বাক্স প্যাঁটরা খাট আলমারী প্রভৃতি আরও অন্যান্য জায়গা জুড়ে থাকে তার হিসেবটা করা হয়নি। তার জন্যে পনেরো স্কয়ার ফুট গড়ে বাদ দিয়ে আমি প্রত্যেক লোকের ফ্লোর-স্পেস ত্রিশ স্কয়ার ফুট হিসেব করেছি। বোধহয় খুব অন্যায় করিনি। কিন্তু সরকারী সংখ্যাবিদ্‌দের 'এরিথমেটিক মীনে'র চালাকি বাদ দিয়ে হিসেব করলে লাইফের এরিয়া আরও অনেক কম হয়। সাধারণত এক কামরা বা দু-কামরা ঘরে ভদ্রলোকরা বাস করেন এবং স্ত্রী-পুরুষ, বড়-ছোট মিলিয়ে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রায়

সাতজন লোক থাকে, কলকাতায় (সরকারী হিসেব অনুযায়ী)। কলকাতার ঘরের এরিয়া সাধারণতঃ ১০০ থেকে ১২০ স্কয়ার ফুট—প্রত্যেক লোকের শুয়ে থাকাকালীন দৈহিক এরিয়া অন্তত পঁচিশ স্কয়ার ফুট, তাও 'নট নড়চড়ন টকাস্ সইয়ে'র মতন শুধু চিত হয়ে থাকলে। শুধু 'চিত' হয়ে শোয়া আর 'চিৎপটাং' হয়ে শোয়ার মধ্যে এরিয়ার অনেক তফাত হয়ে যায়। অপারেশনের টেব্‌লে যেভাবে চিত হয়ে শুতে হয়, সেই ভাবে ঘরে শুলে পঁচিশ স্কয়ার ফুটের মতন জায়গা লাগে, আর চিতপটাং হয়ে বা হাত-পা আল্‌গা করে ছড়িয়ে চিত হয়ে শুলে প্রায় পঞ্চাশ স্কয়ার ফুট জায়গা লাগে। শুধু চিত হয়ে অপারেশন পেশেণ্টের মতন শুলেও যাঁরা এক কামরা ঘরে থাকেন, তাঁদের ছ-সাতজন লোকের শোয়ার স্থান হয় না, ছু-কামরা ঘর হলেও সাতজন লোক প্রত্যেক গড়ে চৌত্রিশ স্কয়ার ফুট আন্দাজ জায়গা পান, অর্থাৎ চিত হতে পারেন, কাতও হতে পারেন, তবে পুরো চিতপটাং হতে পারেন না। এইবার ত্রিশ স্কয়ার ফুট লাইফের আসল অবস্থা ভাবুন।

মধ্যবয়স্কা স্বামী-স্ত্রী, কুমারী মেয়ে, কুমার কিশোর-পুত্র, শিশু-সন্তান, বিধবা পিসি মাসি বা জ্যাঠাইমা নিয়ে যদি পরিবারের গড়ন হয়, তাহলে এক কামরা ঘরে কিভাবে শোয়া যায়? মোটামুটি আমি যা দেখেছি স্বচক্ষে তা হল এই ঃ কোলের শিশু থেকে সাত আট বছরের ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা মশারির মধ্যে স্বামী-স্ত্রী, দ্বিতীয় মশারির মধ্যে কুমারী কন্যাকে 'সেগ্রিগেট' করা হয়েছে, পিসিমা আলমারীর মাথায় দেয়ালের দিকে মুখ করে কাত হয়ে শুয়ে আছেন, ছুটো চেয়ার আর একটা টুল জোড়া দিয়ে কুমার পুত্র চিৎ হয়ে আছে। কারও নড়াচড়ার উপায় নেই, শুধু চিৎ হয়ে ক্লোরোফর্ম-করা রুগীর মতন 'অজ্ঞান' হয়ে বা ঘুমিয়ে থাকে। কিন্তু ঘুমের ঝোঁক যেহেতু চিতপটাং-এর দিকে, সুতরাং ঘুম গভীর হলে বাপ-মা-মেয়ে-ছেলে সকলের ঠ্যাঙে ক্রশ-কনেকশন্ হয়ে যায়, বোনের ঠোক্করে ভাইয়ের চেয়ার সরে গিয়ে ঝুলে পড়ে, পিসিমা পাশ ফিরলেই একেবারে আলমারীর মাথা থেকে সকলের ঘাড়ে সবকিছু ছিঁড়ে পড়ে এবং 'আ-মরণ' বলে 'কেষ্ট' নাম জপ করতে করতে গিয়ে আবার উঠে

শুয়ে থাকেন। এরই মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন, আলাপ-আলোচনা চলে, শিশুদের কৌতূহলী মন জেগে থাকে, অনাস্বাদিত জীবনের কল্পনায় কুমারী কন্যার দেহ মনপ্রাণ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে, কিশোর পুত্রের মন কল্পনার ঘোড়সওয়ার হয়ে জীবনের রঙীন কুয়াশাচ্ছন্ন পথে দুরন্তবেগে ছোটে। পারিবারিক ল্যাবোরেটরীতে জীবনের এই প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক পরিণতি কি এবং কোথায়? আপনারাই যেভাবে খুশি কল্পনা করুন, কারণ জীবনের দৈহিক এরিয়াটা যদিও এইভাবে ত্রিশ স্কয়ার ফুটের মধ্যে বাঁধা, তাহলেও মনটার তো কোন বাঁধা এরিয়া নেই, কোন বাঁধন বা বাধাও মানতে চায় না মন। তবু চিৎ হয়েই শুই, আর কাৎ হয়েই শুই, দাঁড়িয়েই চলি আর বসেই থাকি—এই ত্রিশ স্কয়ার ফুট এরিয়ার মধ্যেই আমাদের 'ফ্ল্যাট লাইফ্' কেটে যায়। এই আমাদের কলকাতার জীবন, আমাদের পরিবার ওরফে পাগলা-গারদ।

মুদ্রাদোষ হইতে সাবধান

হাত নেই, পা নেই, নাক নেই, চোখ নেই, কান নেই, এমন কি মাথা নেই পর্যন্ত, এরকম মানুষও বেশ দেখা যায়; কিন্তু কোন 'মুদ্রাদোষ' নেই, এ রকম মানুষ দেখা যায় না। মানুষ হলেই তার মুদ্রাদোষ থাকবেই। কলকাতার মতন বড় শহরে যেখানে, লোকসমাগম সবচেয়ে বেশি, সেখানে মুদ্রাদোষের যে ভ্যারাইটি দেখা যায়, এমনটি আর অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। স্ট্যাটিস্টিসিয়ানরা ভাল করে অনুসন্ধান করলে নানারকমের মুদ্রাদোষের একটা শ্রেণীবদ্ধ 'টেব্‌ল' তৈরি করতে পারেন এবং তার

'ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন'ও স্টাডি করতে পারেন। এখানে আমার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়, কারণ আমি সংখ্যাবিজ্ঞানী নই, এরকম কোন অনুসন্ধানের কাজ বোধহয় আজ পর্যন্ত কোন সমাজবিজ্ঞানী বা মনোবিজ্ঞানী করেন নি। তবু মনে হয় যে, 'মনোবিজ্ঞানে'র সঙ্গে মুদ্রাদোষের একটা নিকট-সম্পর্ক আছে এবং 'মুদ্রাদোষ' মোটামুটিভাবে 'নিউরসিসে'র মধ্যে গণ্য। যতদূর লক্ষ্য করেছি তাতে মনে হয়েছে 'মুদ্রাদোষ' তিন শ্রেণীর আছে—(১) আঙ্গিক, (২) বাচনিক ও (৩) কাল্পনিক। হাত নাড়া, পা নাড়া, মাথা নাড়া, মুখভঙ্গী করা ইত্যাদিকে 'আঙ্গিক' মুদ্রাদোষ বলা যেতে পারে। 'বাচনিক' মুদ্রাদোষ সাধারণত কথার মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ, কথা বলতে বলতে যেসব কথা ঝড়ের মুখে আবর্জনার মতন আসে, কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সব চেয়ে ভয়াবহ হল 'কাল্পনিক' মুদ্রাদোষ। কোন একটা 'কল্পনা' বা 'আকাঙ্ক্ষা' (সাধারণত অবদমিত ও অপূর্ণ) সব সময় মনের মধ্যে পাক খেতে থাকে এবং সুযোগ পেলেই দৈনন্দিন জীবনের আলাপ আলোচনায় আত্মপ্রকাশ করে। যিনি প্রকাশ করেন তাঁর তো কোন চেতনাই থাকে না, এমন কি যাঁদের সামনে প্রকাশ করেন তাঁদেরও চৈতন্য প্রায় লোপ পাবার উপক্রম হয়। এই তিন শ্রেণীর মুদ্রাদোষ, কলকাতা শহরের নানাধরনের লোকের মধ্যে যা নজরে পড়েছে, তাই এখানে উল্লেখ করব। উল্লেখ এই জন্যেই করা প্রয়োজন যে মধ্যে মধ্যে মুদ্রাদুষ্ট মানুষ পকেটমারের চাইতেও বিপজ্জনক হয়ে ওঠেন, কিন্তু যেহেতু সকলেরই কিছু কিছু মুদ্রাদোষ আছে সেইজন্যেই কেউ কাউকে সাবধানও করতে পারেন না। সুতরাং মুদ্রাদোষ থেকে প্রত্যেকেরই নিজেদের সাবধান হওয়া উচিত। 'পকেটমার' 'কে' বা 'কোথায়' আছে যেমন কেউ জানে না, কিন্তু ট্রেনে বাসে সর্বত্রই লেখা থাকে যে 'পকেটমার কাছেই আছে, সাবধান!' ঠিক তেমনই 'মুদ্রাদোষ' কার আছে বা কার নেই কেউ জানে না, অতএব প্রত্যেকেরই ও-সম্বন্ধে সাবধান হওয়া কর্তব্য।

যাঁরা বসে বসে দোলেন, হাঁটু নাচান, পা নাচান, হাত নাড়েন এবং

নানারকমের খিকট মুখভঙ্গিমা করেন কথা বলার সময়, তাঁরা সাধারণত নিরীহ টাইপের, তাঁদের দেখে খুব বেশি ভয় পাবার কারণ নেই। তাঁদের কাছাকাছি বসে স্বচ্ছন্দে আলাপ-আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এঁদের মধ্যে একটু উপরের স্তরের যাঁরা তাঁদের মধ্যে একটা দৈহিক আক্রমণের ঝোঁক আছে দেখা যায়। কথা বলতে বলতে খুব জোরে জোরে হাত-পা ছোড়া, টেবিলে ঘুষি মারা, টেবিল চাপড়ানো, এসব উপসর্গ নির্ভরযোগ্য নয়। অর্থাৎ যাঁদের এসব উপসর্গ আছে তাঁদের ধারেকাছে, অন্তত গজ দুইয়ের মধ্যে থাকা উচিত নয়, আর সব সময় এঁদের বাঁদিকে থাকাই নিরাপদ (বামপন্থীদের ছাড়া)। এঁদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের যাঁরা সত্যি সত্যি একেবারে সোজা অফেনসিভ্ নিয়ে বসেন। আড্ডায় আলোচনায় দু-একজনকে দেখেছি, খুব বেশি ফুর্তি হলে বা কোন হাসির মজার কথা হলে, হাসতে হাসতে পাশের লোককে সাপটে জড়িয়ে ধরতে এবং উত্তেজনার মাত্রা বাড়লে সোজা কিল ঘুষি মেরে তা প্রকাশ করতে। আঙ্গিক মুদ্রাদোষের এইটাই বোধহয় চরম স্তর। এই ধরনের লোক কেমন করে যে দাম্পত্য জীবন যাপন করেন ভগবান জানেন, তবে এঁদের অবস্থা দেখে মনে হয় যে 'ব্যাচিলার' থাকাই এঁদের কর্তব্য, কারণ স্বামীর যত আনন্দই হোক, কোন স্ত্রীই প্রচণ্ড কিল চড় ঘুষিতে তা উপভোগ করতে রাজী নয়।

'বাচনিক' মুদ্রাদোষের অসংখ্য ভ্যারাইটি আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে কমন্ হচ্ছে 'মানে' ও 'বুঝেছেন'। 'মানে' ও 'বুঝেছেন' মাত্রার তোড়ে আপনি ভেসে যাবেন এবং শেষ পর্যন্ত যে বক্তা কি বলতে চান তার 'মানে' কিছুই বুঝতে পারবেন না। 'মানে সমস্ত জিনিসটা যদি ভেবে দেখা যায় মানে, তাহলেই দেখবেন মানে গলদ কোথায় মানে?' অথবা এই 'মানের'ই আর এক সংস্করণ: 'এই যে লোকগুলো বুঝেছেন, এরা যাকে বলে বুঝেছেন একেবারে যে যার স্বার্থ নিয়ে বুঝেছেন কিনা—' ইত্যাদি। এর পরে বুঝতে পারা সত্যিই মুশকিল। এই 'বুঝেছেন'-এরই অনেক ভ্যারাইটি আছে, যেমন 'বুঝেছেন,' 'বুঝতে পেরেছেন,' 'বুঝেছেন কিনা' থেকে ক্রমে সংক্ষিপ্ত আকারে 'বোয়েন' 'বাঁ, বাঁ' পর্যন্ত। 'বুঝেছেন'

অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে যখন 'বাঁ, বাঁ' হয়, তখন তার উপরে জোর পড়ে খুব বেশি, হেঁচকির মতন। যেমন—'যদি মানে আপনারা আসেন বাঁ, তাহলে বাঁ, মানে ওটা আমি দু-এক মাসের মধ্যেই তৈরি করে দেব বাঁ, ওর জন্যে কোন অসুবিধা হবে না বাঁ—'। একে 'বাঁ,' তার উপর 'মানে' একসঙ্গে দুই মুদ্রার সংযোগ, সবার উপরে বাঁ মুদ্রাটি 'বুঝেছেন' কথার সংক্ষিপ্ত রূপ হবার জন্যে তার ওপর এ্যাকসেণ্ট খুব বেশি। এই ধরনের লোকের সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে হলে অসম্ভব ধৈর্যের দরকার। একজনের দেখেছি 'কথা হচ্ছে'। কিছু বলতে হলেই তিনি আরম্ভ করবেন ঃ 'কথা হচ্ছে কি জানেন ? যত দিন যাচ্ছে, ততই কথা হচ্ছে, ততই মানুষের কথা হচ্ছে, কংগ্রেসের ওপর, সেই আগেকার বিশ্বাস, কথা হচ্ছে আর থাকছে না। তার কারণ কথা হচ্ছে—'। একটু অসাধারণ হলেও আর একটি বাচনিক মুদ্রাদোষ শুনেছি—'যদি বলি কেন'। যেমন ঃ 'ব্যাপারটা কি জান, এদের যতই বল, এরা কিছুতেই শুনবে না। যদি বল কেন, এদের স্বভাবই হল তাই। যদি বল কেন, এরা চিরকাল ঐ করে এসেছে। যদি বল কেন—'। এ ছাড়া কথায় কথায় অকথ্য কথা বলা, যেমন 'ব্যাটাচ্ছেলে সোয়াইন্ ইডিয়ট ইত্যাদি' এ তো অনেকেরই মুদ্রাদোষ আছে। সবচেয়ে বিচিত্র একটি মুদ্রাদোষ বাঙালী ভদ্রলোকদের মধ্যেই বিশেষভাবে দেখা যায়, সেটা হল বাংলা কথাকে ইংরেজীতে অনুবাদ করার মুদ্রাদোষ। 'আমার বাবা, মানে আমার ফাদার, বুঝতে পেরেছেন'—এটা একেবারে ত্র্যহস্পর্শযোগ বলা চলে। অর্থাৎ 'মানে', 'বুঝতে পেরেছেন' এবং বাংলার 'ইংরেজী অনুবাদ' তিন মুদ্রার যোগাযোগ। এঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ করা সত্যিই বিরক্তিকর। যেমন মনে করুন একজন বলছেন ঃ 'আমি মানে এক সময় খুব পড়াশুনা করতাম, আই ওয়াজ এ ভোরেশাস্ রিডার, বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু পরে দেখলাম ও সব একেবারে বাজে মানে এ্যাবসলিউটলি মিনিংলেস, বুঝতে পেরেছেন'—ইত্যাদি। সাধারণত বাঙালী শিক্ষিত ভদ্রলোকদের এই হল কথাবার্তার ধরন বা প্যাটার্ন। এই মারাত্মক মুদ্রাদোষ থেকে আমি খুব কম ভদ্রলোককেই মুক্ত দেখেছি। এ সম্বন্ধে সত্যিই আমাদের সাবধান হওয়া

উচিত। 'বাবা' মানে 'ফাদার,' অথবা 'বাজে মানে 'মিনিংলেস' একথা আলাপের সময় না বলাই ভাল নয় কি ?

'কাল্পনিক' মুদ্রাদোষ সবচেয়ে মারাত্মক, কারণ সেটা প্রায় মনোবিকারের স্তরে পড়ে। সাধারণ লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিদের মধ্যে এই মুদ্রাদোষ খুব বেশি দেখা যায়। কথাবার্তার সময় প্রত্যেকে নিজেদের প্রতিভা প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং নিজে যে কি কি ভয়ানক ব্যাপার করেছেন, তার একটা অযাচিত বিরক্তিকর ফিরিস্তি দিতে বসেন। এটা তাঁদের শেষ পর্যন্ত একটা মুদ্রাদোষেই পরিণত হয়ে যায়, এবং কি বলছেন, কোথায় বলছেন, কেন বলছেন, বলার দরকার কি, সে সম্বন্ধে কোন চেতনাই আর থাকে না। এঁদের মধ্যেই এক টাইপের লোক আছেন, যাঁদের ধারণা তাঁরা 'এক বিরাট পিতার পুত্র' অথবা 'সর্বগুণসমন্বিতা স্ত্রীর স্বামী'। কেউ শুনতে না চাইলেও এরা যে-কোন কথা উপলক্ষ করে বলবেন: 'আমাদের ফাদারও বুঝেছেন, অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন, খুব সাহসী ছিলেন, কোন অন্যায় কোনদিন টলারেট করেন নি—' ইত্যাদি। বলবার উদ্দেশ্য হল এই যে তিনি নিজে যে 'গ্রেট' সেটা অনেকটা যে 'হেরিডিটারী' তাই প্রমাণ করা। অর্থাৎ 'গ্রেটনেসটা' তাঁর ব্যক্তিগত গুণ নয় শুধু, বংশগত গুণ। তেমনি অনেককে বলতে শুনেছি: 'আমার ওয়াইফ্ গ্র্যাজুয়েট বুঝেছেন, কিন্তু সব কাজ নিজে হাতে করে, রান্নাবান্না সেলাই পর্যন্ত।' হঠাৎ কোথাও কিছু নেই: 'আমার ওয়াইফের হাতের লেখা একেবারে ছাপার মতন বুঝেছেন, দেখলে অবাক হয়ে যাবেন।' হোটেলে বসে একসঙ্গে মাংস খাচ্ছেন, হঠাৎ: 'আমার ওয়াইফ্ বুঝেছেন এত চমৎকার মাংস রাঁধে, খেলে আর ভুলবেন না।' একটা কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন, হঠাৎ: 'আমার ওয়াইফ্ অদ্ভুত রিসাইট করে বুঝেছেন, অনেক মেডেল পেয়েছে—' ইত্যাদি। এসব কথা বলার যে কি দরকার, তা বুঝি না। আপনার 'বাবা মানে ফাদার,' অথবা 'স্ত্রী মানে ওয়াইফ্' যে রকমই হন না কেন, তাতে অন্যের কি আসে যায়, কেউ তা জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব নয় জানবেন। অতএব 'ওয়াইফ্' ও 'ফাদারের মুদ্রাদোষ ছাড়ুন।

বৌবাজার বিলোকনে বিক্ষেপ

ঝুলন্ত কাটা-পাঁঠার সামনে যদি উপচে-পড়া আবর্জনা ডাস্টবিনের চারিদিকে স্তূপাকার হয়ে থাকে—তার পাশ দিয়ে যদি ফুলের দোকানে গোলাপ আর রজনীগন্ধা দেখা যায়—তার ভিতর দিকে দূর থেকে সোনার গহনাগুলো জুয়েলারের দোকানে যদি ঝিক্‌মিক্ করে ওঠে—এবং সকলের উপর দিয়ে যদি ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি মাথা ও মুখের চারিদিকে ভন্‌ভন্ করে, তাহলে পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমার মধ্যে কেবল একটিমাত্র স্থানের কথাই মনে হয়, যে স্থানটির নাম হল কলকাতা শহরের 'বৌবাজার'।

বৈঠকখানা-শিয়ালদহ থেকে ভিখিরিদের অনর্গল নোংরা স্রোত বইতে থাকে বৌবাজারের দু-পাশের ফুটপাতের উপর দিয়ে। পাইকারী বাজারের পচা কুমড়ো আর গলা তরকারির উপর পা ফেলতে ফেলতে শিউরে উঠতে হয়, এবং ভিখিরিদের আধমরা দেহে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে পাগুলো আবার সটান হয়ে চলতে থাকে। কাঠের পা নয়, দু-পেয়ে মানুষের পা। বহু-বাজারের বহু লোকের মধ্যে হঠাৎ কোন সময় দু-একটি চারপেয়ে ষাঁড় দেখা যায়, ধর্মের কি অধর্মের ষাঁড় জানি না। তবে মনে হয় এদেরই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে 'brahmanic bull' বলা হত, এবং সেকালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজরা এদেশের নিরীহ অস্থিচর্মসার মানুষদের যতই অবজ্ঞা করুন না কেন, এই ষণ্ডদের ফোঁস্-ফোঁসানি দেখে রীতিমত ভীত হতেন। বোধ হয় এই ষণ্ডদেরই শৌর্যবীর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা 'জন বুল' পরিচয়ে গৌরব বোধ করতেন।

যাই হোক, বহুবাজারের বহু লোকের প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে এরকম ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী-টাইপ ষাঁড়ের হঠাৎ-প্রবেশের ফলে ভয়ানক চাঞ্চল্যের

সৃষ্টি হয়, যেমন হয় ফুটপাতের ফিরিওয়ালাদের উপর পুলিসের হঠাৎ-হাম্‌লায়। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে তখন হয়তো মাংসওয়ালার দোকানে কাটা-পাঁঠার কল্‌জের তলায় আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এরকম অনেকবার হয়েছে এবং এর মধ্যে এমন একটা মাদকতা আছে যার জন্য শ্যামবাজার শোভাবাজার রাধাবাজার রাজাবাজার মেছোবাজার প্রভৃতি কলকাতার সমস্ত বাজারকে ভোলা যায়, কিন্তু বৌবাজারকে ভোলা যায় না। একদা যখন বৌবাজারে থাকতাম তখন এই কথাটা প্রায় মনে হত। কেন মনে হত বলতে পারি না। হয়ত মনটা কোনদিনই সাধারণ লোকের মতন হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল ছিল না তাই। যতই যাই হোক বৌবাজারের একটা রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক স্মৃতি আছে এবং সেই সব স্মৃতির টুকরো আজও তার অসংখ্য অলিগলির পথের ধুলোয় মিলেমিশে বেঁচে আছে। আরও একটা কথা হচ্ছে কি, ইতিহাসের অন্ধকার করিডোর দিয়ে আপন মনে নির্জনে হেঁটে চলতে আমার খুব ভাল লাগে। কতদিন চাঁপাতলা লেন, বাই-লেন, চুনাপাড়া থেকে লালবাজারে টিরেটাবাজার ও চীনেপাড়ার গলিতে-গলিতে সকাল-সন্ধ্যায় ঘুরে বেড়িয়েছি তার ঠিক নেই। তবু বৌবাজারের রোমাঞ্চ ও রহস্য আজও মনে হয় অন্তহীন।

মনে হয় বৌবাজার শুধু ১+১=২-এর মত বৌ+বাজার অথবা বহু+বাজার নয়, তার উপরেও plus কিছু একটা। সেই অতিরিক্ত পদার্থটুকু এমন কিছু যা চোখে দেখা যায় না, হাতে ছোঁয়া যায় না, নাকে শোঁকা যায় না, কানে শোনা যায় না, কেবল মনে মনে অনুভব করতে হয়। জোড়াসাঁকোর বিশ্বকবির হাজারভাগের একভাগ ক্ষমতা থাকলে আমি হয়ত লিখতাম—

হায় বৌবাজার!
তুমি কি শুধু বৌবাজার, কর্পোরেশনের রাস্তা!
আলু কপি পেঁয়াজে ভর্তি,
ঐ যে সব বড় বড় বস্তা
ত্রিচক্র টেম্পোতে করে আছে ভীড়
তুমি কি তাদের মত সত্য নও!

হায় বৌবাজার, তুমি কি শুধু বৌবাজার,
কর্পোরেশনের ক্ষতবিক্ষত রাস্তা !
এই ডাস্টবিন,
মরা কুকুর, মরা বেড়াল আর পচা আবর্জনা,
দুর্গন্ধ দিকে দিকে ধায়
বসন্তের মিলন-উষায়—
এই ড্রেন, এও সত্য হায়।
এরা আছে, তাই এরা সত্য ও সাকার
তুমি কিম্ভূত-কিমাকার বৌবাজার
তুমি শুধু বৌবাজার।

শোনা যায়, এই বৌবাজারের কোন এক ছাতিমতলায়, শিয়ালদহের দিকে, কলকাতার 'প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক সাহেব দ্বিপ্রহরে টহল দিতে দিতে বিশ্রাম নিয়েছিলেন এবং স্থানীয় গ্রাম্যলোকদের কাছ থেকে হুঁকো-কলকে চেয়ে নিয়ে তামাক খেয়েছিলেন। সূতানুটি ডাইরিতে একথা কোথাও লেখা নেই, কিন্তু লোকমুখে কথাটা চলে এসেছে। বৌবাজারের এই রাস্তা দিয়েই শোনা যায় নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাবাহিনী কাস্টমস হাউসের কাছে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজদের পুরাতন দুর্গ আক্রমণ করেছিল। এই বৌবাজারেই লালবাজারের কাছে ছিল হেস্টিংসের আমলের কলকাতা শহরের বিখ্যাত সব ট্যাভার্ন। সবচেয়ে বিখ্যাত 'হারমনিক ট্যাভার্ন'। সেখানে তদানীন্তন কলকাতার ইংরেজ ভি-আই-পি-দের নিয়মিত সমাবেশ হত। নাচগান, জুয়াখেলা, মদ্যপান সারারাত ধরে চলত। সিরিয়াস বিষয় নিয়ে বৈঠক ও সলাপরামর্শ করার জায়গাও ছিল এই ট্যাভার্ন। এছাড়া হারমনিকে নৃত্যবিদরা নৃত্য শিক্ষা দিতেন। জনৈক ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের এই বিজ্ঞাপনটি (১৭৯৫) থেকে হারমনিকে নৃত্য শিক্ষার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় :

'Mr. Macdonald presents his respects to the ladies and gentlemen amateurs of dancing, and informs them that he will instruct any lady' or

gentleman, who are in the habit of dancing, in the fashionable Scotch step, and its application to country dancing, for sicca rupees 100.

'Besides the fashionable step, the athletic and agile may be taught a variety of Scotch steps, equally elegant, but more difficult in the execution, for an additional charge.'

তখনকার একটি সিক্কা-টাকার দাম ছিল এখনকার একশোটি কাগজের টাকার সমান। প্রায় হাজার দশেক টাকা দক্ষিণা দিয়ে স্কচ নৃত্যের তাল ও পদক্ষেপ শিক্ষা করা সহজ ব্যাপার নয়। বোঝা যায় যাঁরা শিখতেন তাঁরা ইংরেজ মহলেও অসাধারণ 'লেডি' ও 'জেণ্টলম্যান' ছিলেন। কিন্তু ফ্যাশানেবল স্কচ পদতালের সঙ্গে দেশীয় নৃত্যের ('country dancing') ককটেল কি করে ম্যাকডোনাল্ড সাহেবরা করতেন, তা সত্যিই ভাবা যায় না। বৌবাজার-লালবাজারের গুণে সবই সম্ভব হত কোম্পানির আমলে আর জনসনের ট্যাভার্ন-কফিহাউসের কালে।

এখন আর বৌবাজার-লালবাজারে হারমনিকের যুগ নেই, এখন পার্ক স্ট্রীটের ব্লু-ফক্সের যুগ। Scotch whisky আছে, Scotch steps নেই, এবং ট্যাভার্নে জনসন-বসওয়েলিয়ান পরিবেশে স্কচের সঙ্গে কান্ট্রি ড্যান্সিং-এর পাঞ্চিংও নেই। ফক্স ট্রট আছে, টুইস্ট আছে, হুলা-হুলা আছে। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই বৌবাজারে বাইজীর ঘুঙুরের শব্দ শুনেছি, হঠাৎ ঝাপ্‌টা হাওয়ায় উড়ে-আসা পুরনো স্মৃতির গন্ধের মতো। ছানাপটির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দোতলার ঘরে, নিচে ফুটপাতে আমেরিকান আর নিগ্রো সৈন্যদের ভিড়। পাশের হাড়কাঠা গলি থেকে তখন ঘন ঘন হাড়ে হাড়ে ডুগডুগি বাজানোর শব্দ প্রায় শোনা যেত, প্রাণস্পন্দিত মাংসপিণ্ডের মহোৎসব তখন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হত বৌবাজারে। মনে আছে, আজও মনে আছে। কারণ ভোলা যায় না।

বোধ হয় বৌবাজারের যে ভাড়াটে বাড়িতে প্রথম সংস্কৃত কলেজ

স্থাপিত হয়েছিল (১৮২৪ সালে), সেই বাড়িতেই বাইজীদের নাচতে দেখেছিলাম, আর বিদেশী সৈন্যদের হুজ্জত-হুল্লা শুনেছিলাম।

বৌবাজারে চাঁপাতলার যে বাড়িটাতে শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁর মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ থাকতেন, প্রথম যে-বাড়ি থেকে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনায় প্রকাশিত হয়, সেই বাড়ির গলিটাতে প্রবেশ করার সময় মনে হয় যেন আপাতাল-বিস্তৃত সুড়ঙ্গে প্রবেশ করছি।

হারমনিক ট্যাভার্ন আজ নেই। কিন্তু তার রোমাঞ্চকর স্মৃতির টুকরো লালবাজার-বৌবাজারের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। একদিন মনে আছে লালবাজার অঞ্চলে আপন মনে ঘুরছি। উড়ন্ত বলাকার ডানার মতন মনটা বেশ হালকা ছিল, এবং ট্যাভার্নের একটা আমেজ এসেছিল মেজাজে। টিরেটাবাজারে চীনে টাউনের অলিগলির ভিতর দিয়ে অন্ধকারে ফুরফুরে মন নিয়ে হাঁটছি, এমন সময় একটি গলির মুখে কয়েকটি বঙ্গীয় রঙ্গচিঙ্গার শিস-সহযোগে তু ছত্র গানের সুর কানে ভেসে এল। নিধুবাবুর টপ্পার চালে গাইছে ঃ

(প্রথম) ওরে আমার কালো ভ্রমর,
মধু লুটবি যদি আয়।
(দ্বিতীয়) আমি থাকতে চাকের মধু
পাঁচ ভ্রমরে খায়॥
(সকলে) হায় রে হায়!
মধু লুটবি যদি আয়!

যাত্রার দলের ছোকরা-সখীদের মত ভঙ্গি করে গাইছে আর জিবে শব্দ করে তাল দিচ্ছে। উল্টোদিকের গলি থেকে তাদের লক্ষ্য করে কয়েকটি নপুংসক কদর্য অঙ্গভঙ্গি করছে! চীনে যাচ্ছে, কালোয়ার যাচ্ছে, মিঞা যাচ্ছে, কাবুলি যাচ্ছে, উড়িয়া যাচ্ছে, বিহারী যাচ্ছে। সরু নালা দিয়ে ড্রেনের স্রোত বইছে। জীবন যৌবন ধন মান অপমান সব ভেসে যাচ্ছে। মরা পাখি ঝুলছে দোকানে। তার পিছনে কনফুসিয়াসের ছবি। চীনে ড্রেগন। নির্লোম মঙ্গোলীয়ান মুখের পাশে শ্মশ্রুভরা সেমিটিক মুখ।

তার মধ্যে গানের ছত্রটা কানে ভেসে আসছে 'চাকের মধু পাঁচ ভ্রমরে খায়'। নপুংসকরা মুখখিস্তি করছে। এর মধ্যে নিজের মুখটা আয়নায় দেখতে পাচ্ছি, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। অস্ট্রালয়েডের মুখ, অর্থাৎ নিষাদকুলোদ্ভব। শুধু আকৃতি নয়, প্রকৃতিও নিষাদতুল্য। বেশ ভাল লাগে আমার বৌবাজারের এই লালবাজার, আর আগেকার সেই কসাইতলা। মহানগরের জনারণ্যে নিজস্ব সত্তাটি যখন তালকানা হয়ে পথ হারিয়ে ফেলে, তখন তাকে আবার খুঁজে পাই এই বৌবাজারের অলিগলিতে, চাঁপাতলায়, পঞ্চাননতলায়, টেরেটিবাজারে, চীনে-টাউনে। চৌরঙ্গি-পার্কস্ট্রীটের কৃত্রিম জনস্রোতে নিজেকে হারিয়ে ফেলি।

থ্যাঙ্ক ইউ

অগ্রজ হুতোম যখন 'হুতোম প্যাঁচার নকৃশা' লিখেছিলেন তখন বাঙালী সমাজের চেহারাটা ছিল অন্যরকম, বিশেষ করে কলকাতা শহরে। কালপেঁচার আমলে কলকাতার সমাজের চেহারার আকাশপাতাল পরিবর্তন হয়ে গেছে। বীরকৃষ্ণ দাঁ, পদ্মলোচনবাবু, ছুঁচো শীল বা প্যাঁচা মল্লিকরা আজও অবশ্য শহুরে সমাজে যথেষ্ট আছেন, মধ্যে মধ্যে তাঁদের কথা তাই আমাকেও লিখতে হয়েছে। কিন্তু হুতোমের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সমাজের বিকৃতিগুলির উপর তীব্র বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করা। আমার লক্ষ্য তা নয়। কেবল বিদ্রূপ করবার জন্যেই আমি বিদ্রূপ করিনি, অথবা

বিশুদ্ধ 'হিউমার' করার জন্যেও হাসাইনি। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে যেসব অসঙ্গতি, বৈচিত্র্য ও অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে, সেগুলি প্রকাশ করেই আমি দায়মুক্ত হইনি। যাঁরা ভাল করে নক্‌শাগুলি পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, বিদ্রূপ বা হাস্যরসের পিছনে প্রত্যেক মানুষের জীবনে যে করুণ ট্র্যাজিডি বা কমেডি আছে, তার দিকেই আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেছি। তাতেও যদি কারও গা বাঁচানো না সম্ভব হয়ে থাকে এবং কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁকে বার্নাড শ'য়ের ভাষায় বলব যে হিউমারিস্ট বা স্যাটায়ারিস্টের কাজ অনেকটা ডেন্টিস্টের মতন। খারাপ দাঁত তুলে দেওয়াই যেমন ডেন্টিস্টের কাজ, তা না হলে অনেক কঠিন ব্যাধির সূত্রপাত হতে পারে, ঠিক তেমনি স্যাটায়ারিস্টের সবচেয়ে বড় কাজ হল, মানুষের সমাজের খারাপ দাঁতগুলো তুলে দেওয়া। তাতে হয়ত একটু যন্ত্রণা হতে পারে, কিন্তু তবু তা তোলাই দরকার। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র যখন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন তার গৌরচন্দ্রিকায় হুতোম লেখেন যে, তাঁর নকশা পড়ে 'অনেকে শুধরেচেন, সমাজের উন্নতি হয়েচে ও প্রকাশ্য বেলেল্লাগিরি বদমাইশি ও বজ্জাতির অনেক লাঘব হয়েছে।' 'কালপেঁচার নক্‌শা' পড়ে সেরকম কিছু সুফল ফলবে কিনা সন্দেহ আছে, তবু হয়ত ফলতে পারে মনে করে লিখেছি—

'থ্যাঙ্ক ইউ'

হাঁচি

নাসিকার দুটি লোমাকীর্ণ ছিদ্রপথ-প্রান্তের ঝিল্লীকেন্দ্রে যে-কোন বহিরাঙ্কুশের ঈষৎ স্পর্শে যে ঝনন-রণন ঝঙ্কার ওঠে, তারই মৃদু বৈদ্যুতিক শিহরণ সমস্ত স্নায়ুতে সঞ্চারিত হয় এবং সেই পুঞ্জীভূত শিহরণের কম্পমান বেগ যখন নাসারন্ধ্রের গভীরতম কেন্দ্রস্থল থেকে চৈতালী ঘূর্ণীর মতন পাক খেতে খেতে সজোরে আত্মপ্রকাশ করে, তখন আমরা 'ঝ্যিঃ' করে যে ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি করি তারই বাংলা নাম 'হাঁচি'। কিন্তু শিহরণ মাত্রেই যে 'জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংস করি চতুর্দিকে বাহিরায় ফল'—সেইভাবে আত্মপ্রকাশ করবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অনেক সময় শিহরণের ঘূর্ণায়মান বেগ নাসারন্ধ্রের মধ্যপথেই নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন আমরা মুখব্যাদান করে চক্ষু বুজে কোনরকমে নিজেদের দৈহিক ইকুইলিব্রিয়াম রক্ষা করি। এটা কতকটা 'মার্জিন্যাল ইকুইলিব্রিয়ামে'র অবস্থা বলা চলে। সামান্য একটু শ্লিপ করলেই 'ঝ্যিঃ' করে দুর্ধর্ষ বেগে 'হাঁচি' আত্ম-প্রকাশ করবে এবং তখন তার 'সহজ প্রবল' রূপ দেখে করজোড়ে আপনিও বলতে বাধ্য হবেন—

হে হাঁচি!

সনাতন নাসারন্ধ্র দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া অপূর্ব আকারে

সজোরে সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ প্রণমি তোমারে।

জীবনে কোনদিন হাসেননি এমন লোক দু-চারজন হয়ত খুঁজলেও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু লাইফে হাঁচেননি কখনও এমন লোক দুনিয়াতে দুর্লভ। সুতরাং পাঠকরা ভাবতে পারেন যে হাঁচির মতন এমন একটা সাধারণ বস্তুর ডেফিনিশন দিয়ে এই গৌরচন্দ্রিকা করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। একসময় আমারও 'হাঁচি' সম্বন্ধে তাই ধারণা ছিল এবং সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে ছেলেবেলায় খুব প্রাণখুলে হেঁচেছি। কিন্তু তাতে

যে কি মারাত্মক ক্ষতি করেছি তখন বুঝিনি, এখন বুঝি। জীবনে প্রথম যেদিন 'হাঁচি' সম্বন্ধে সচেতন হলাম, সেদিনের কথা আজও আমার মনে আছে। বাড়িতে ঠাকুমা-পিসিমারা তীর্থযাত্রা করবেন। বাইরে গাড়ি প্রস্তুত, দরজায় পোঁটলা-পুঁটলি রেডি। জপমালা হাতে দু-জনে দাঁড়িয়ে আছেন, সকলে বিদায়-প্রণাম সেরে নিচ্ছে। আমারও ডাক পড়ল। কিন্তু কাছে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ নাকের মধ্যে এমনভাবে সুড়সুড় করে উঠলো যে 'ঝ্যিঃ' শব্দে প্রচণ্ড জোরে একটা 'হাঁচি' বেরিয়ে পড়ল। তারপর হাঁচবি তো হাঁচ ক্রমান্বয়ে প্রায় সাতটা হাঁচির পর দৈহিক ভারসাম্য ফিরে পেলাম। আমার ভারসাম্য ফিরে এল বটে, ওদিকে কিন্তু সমস্ত ভারসাম্য টলমল করে উঠলো। সকলে এমনভাবে আমাকে ঘিরে 'এই রে, এই এই' করে উঠলো যে আমি হকচকিয়ে গেলাম। কে একজন বললেঃ 'একটু পরে হাঁচতে পারলে না, হতভাগা!' ছয় বছর বয়সের সেই নার্ভাস শক আজও আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। গাড়ি ফিরে গেল, তীর্থযাত্রা সেদিন আর হল না। কিন্তু হাঁচির রহস্য সেদিন আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি। কিশোর বয়সে আমার একটি দুষ্টবুদ্ধি সঙ্গীকে দেখেছি, পাড়ার এক নিরীহ ভদ্রলোককে হাঁচির চোটে প্রাণ ওষ্ঠাগত করতে। ভদ্রলোক যখন আপিসে বেরুতেন, বন্ধুটি তখন রাস্তার ধারে বাড়ির দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে নাকে খড়্কে দিয়ে হাঁচত। ভদ্রলোক বিড়্বিড়্ করতে করতে ঘরে ফিরে যেতেন, আবার বেরুতেন, কিন্তু আবার হাঁচি পড়ত। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে, অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতে দিতে তিনি ডবলপথ ঘুরে আপিস যাত্রা করতেন। এই সময় থেকে 'হাঁচি' সম্বন্ধে আমার ছেলেমানুষি ধারণা বদলাতে আরম্ভ করল। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে পর্যন্ত যে এই সামান্য 'হাঁচি'র একটা অসামান্য ভূমিকা আছে, একথা আমার কিশোর-মনে প্রথম উঁকি দিয়ে গেল। শপথ করলাম, খেয়ে-পরে যদি বাঁচি, তাহলে হাঁচির এই দুর্ভেদ্য রহস্যজাল ভবিষ্যতে একদিন আমি ভেদ করবই করব।

বিজ্ঞানের আলোকরশ্মি আজ নাসারন্ধ্রের ঝিল্লীকেন্দ্র পর্যন্ত প্রবেশ করেছে, দেখেছি 'হাঁচি'র উৎস কোথায়! 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' নয়,

হাঁচির উৎস সন্ধানে যাত্রা করে আজ বুঝেছি 'হাঁচা' ও 'বিষম লাগা' এক নয়। একই মোড়ের মাথায় দুই গলি—শ্বাসনালী ও গ্রাসনালী। খাওয়ার সময় শ্বাসনালীর 'রোড ক্লোজ্‌ড' থাকে। হঠাৎ যদি কোন খাদ্যকণা অসাবধানে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে তাহলে তৎক্ষণাৎ 'হু কাম্‌স দেয়ার' বলে বেয়নেটের খোঁচা মেরে তাকে বাইরে ঠেলে দেওয়ার জন্যে সজোরে যে কাসি ওঠে, তাকেই 'বিষমলাগা' বলে। অবশ্য বিষম যদি ভীষণভাবে লাগে তাহলে খাদ্যকণা সোজা ঠ্যালার চোটে নাসারন্ধ্র দিয়ে বেরিয়েও আসতে পারে, অথবা নাসাপথের লোমারণ্যে যদি আটকে যায় তাহলে শিহরণ সঞ্চারিত হয় এবং ঝন্ ঝন্-ঝন্‌ৎকার শব্দে একটার পর একটা 'হাঁচি' হয়ে দৈহিক ইকুইলিব্রিয়াম ফিরে আসে। এইভাবে 'বিষম-লাগা' থেকেও 'হাঁচি'র উৎপত্তি হয়, কিন্তু এটা হল সেকেণ্ডারী সোর্স, প্রাইমারী উৎসকেন্দ্রের কথা প্রারম্ভেই বলেছি। মোটামুটি 'হাঁচি' সম্বন্ধে গবেষণা করে এই তথ্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে।

তথ্য যাই উদ্‌ঘাটিত হোক, সেটা এমন কিছু জটিল নয়। খাদ্যকণার পথ-ভুলে গ্রাসগলি থেকে শ্বাসগলির মধ্যে ঢুকে পড়ার জন্যে বিষম লাগে, কিন্তু এত সহজেই বিষম লাগা বা হাঁচি ব্যাখ্যা করা যায় কি? বিষম লাগা যে কি ভীষণ ব্যাপার তা লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই। বেকায়দায় লাগলে প্রাণ নিয়েও টানাটানি হতে পারে। তাছাড়া বিষম লাগে যখন তখন শুভাকাঙ্ক্ষীদের 'জীবন, জীবন!' ও 'ষাট্! ষাট্!' বলতে শুনেছেন নিশ্চয়ই। দূরে কোন প্রিয় বন্ধু-বান্ধবী আত্মীয়-স্বজন কেউ ঘন ঘন আপনার নাম করছে, তাই খাদ্যকণা পথ-ভুলে শ্বাসনালীতে ঢুকে পড়েছে এবং বিষমও লাগছে। খুব বেশি মাত্রায় নাম করলে প্রচণ্ড জোরে বিষম লাগতে পারে এবং আপনার চক্ষু ব্রহ্মতালুতে উঠে যেতে পারে। সুতরাং কোন প্রিয়জনেরই উচিত নয়, যতই মনোবেদনা হোক, দুবেলা খাবার সময় অন্তত অন্য কোন প্রিয়জনের নাম করা। এটা একটা সাধারণ 'কোড অফ কন্‌ডাক্ট', সকলের মানা উচিত। নাম-করা আর বিষম লাগার সঙ্গে কার্যকারণ সম্বন্ধ কি আছে জানি নে, তবে নিজের ক্ষেত্রে তিন তিনবার টেস্ট করে দেখেছি, একটা কিছু যেন সম্পর্ক, যত সূক্ষ্মই হোক,

আছে। যেদিন বিষম লেগেছে সেইদিন বা তার পরে খোঁজ করে দেখেছি, ঠিক সেই সময় কোন প্রিয় বন্ধু আমার নাম করেছে, অথবা কোন রেস্টুরেন্টে বসে পরিচিতরা আমার লেখা নিয়ে তুমুল তর্ক করেছে। ঠিক তেমনি যেদিন জিব কামড়েছি, সেদিন খোঁজ করে দেখেছি, হয় কোন পাওনাদার আমার নাম করে গাল দিয়েছে, অথবা নিন্দুকেরা নিন্দা করেছে। অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অবশ্য কোন ফল পাইনি। ভালবাসি এরকম অনেকের নাম খাবার সময় করে দেখেছি তাদের বিষমও লাগেনি, হাঁচিও হয়নি, দিব্যি আরামে খেয়ে উঠেছে। শত্রুদের এমনভাবে গাল দিয়েছি যে, তাদের জিব কামড়ে রক্তারক্তি করে ফেলবার কথা, কিন্তু দিব্যি চেটেমুছে তারা খেয়ে উঠে গেছে, দাঁতের ছোঁয়া পর্যন্ত জিবে লাগেনি। ভগবান জানেন, কেন এমন হল, নিজের বেলায় ফলে গেল অন্যের বেলায় ফলল না। তবে কিছুটা যখন ফলেছে, তখন বিষম লাগার গুরুত্ব অস্বীকার করি কি করে ? নামের সঙ্গে নামের ক্রস্-কনেকশনের ফলেও বিষম লাগতে পারে, যেমন টেলিফোনের ক্রস্-কনেকশনের ফলে অন্যের কথা আপনি শুনতে পারেন। অর্থাৎ আপনার নাম আরও অনেকের নাম হতে পারে এবং যে-কেউ সেই নাম করলে আপনার বিষমও লাগতে পারে, জিবও কাটা যেতে পারে। তবে বিষম-বিশারদের কাছ থেকে শুনেছি যে ক্রস্-কনেকশনের ফলে নাকি সে-রকম ভয়াবহ রিয়াকশন্ হয় না। ভয়ের কারণ নাকি তখনই, যখন নাম করার সঙ্গে সঙ্গে কেউ মুখটা পর্যন্ত মনে করে। 'ফেটাল অ্যাকসিডেন্ট' তখনই হয়।

হাঁচি-প্রসঙ্গে বিষমের অবতারণার কারণ হল, অনেক সময় বিষমের সঙ্গে হাঁচি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে, কোন্‌টা থেকে কোন্‌টার উৎপত্তি ঠিক বলা যায় না। মুখে গ্রাস তোলা মাত্রই যদি হাঁচি পায়, হাঁচি কণ্ট্রোল না করতে পেরে বাইচান্স যদি কেউ হেঁচে ফেলেন, তাহলে খাদ্য-কণা ছিটকে গলবিল দিয়ে সোজা শ্বাসনালীতে ঢুকে পড়তে পারে এবং সেখান থেকে প্রচণ্ড ঠ্যালা খেয়ে উল্টোপথে এসে নাসারন্ধ্রের লোমারণ্যে আঁটকে গিয়ে, হাঁচির পর হাঁচি সৃষ্টি করে একটা বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

সুতরাং বিষম ও হাঁচি অনেকটা হরিহরাত্মা বললেও ভুল হয় না। তবে সামাজিক শক্তি হিসেবে বিষমের চাইতে হাঁচি যে হাজার-গুণ বেশি প্রচণ্ড তাতে কোন সন্দেহ নেই। একবার বিষম লাগলে আপনি সামলে নিলেই ব্যাপারটা চুকে যায়, কিন্তু একবার হেঁচে ফেললে আপনি সামলে নিলেও অন্যেরা ভয়ঙ্করভাবে বেসামাল হয়ে যেতে পারে। আমাদের ব্যক্তি-জীবনে ও জাতীয়-জীবনে 'হাঁচি' একটা অদৃশ্য বৈদ্যুতিক শক্তির মহাকেন্দ্র। কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রান্তরে 'হাঁচি' শক্তি জেনারেট করে, এক থেকে বহুর মধ্যে গোপনে সঞ্চারিত হয়ে যায়। আমাদের সমাজে হাসির মূল্য না থাকলেও হাঁচির মূল্য খুব বেশি।

কবে কোন্ প্রস্তরযুগে, কি ব্রোঞ্জযুগে, কি লৌহযুগে, কে কবে প্রথম হেঁচেছিল কে জানে? অগস্ত্য মুনি পহেলা তারিখে যখন যাত্রা করেন তখন নিশ্চয়ই হেঁচেছিল কেউ, যার জন্যে তিনি আর ফিরে আসেননি। অথবা তারও আগে হয়ত কোন আদিম শিকারীর দলের নেতা যাত্রাকালে হেঁচেছিল এবং সেই শিকারিরা আর শিকার থেকে ফিরে আসেনি। তারপর থেকে যুগে যুগে 'পদে পদে হাঁচির ডোরে' আমরা বাঁধা, হাঁচির শৃঙ্খল থেকে আজও আমরা মুক্ত হইনি। চলার পথে হাঁচির হোঁচট খেতে খেতেই আমাদের জীবনটা জখম ও খতম হয়ে গেল।

হাঁচি যখন আজও আমাদের জীবনের পরিচালক, তখন হাঁচিকে উপেক্ষা করে লাভ নেই। কে হাঁচি মানেন, কে মানেন না, তা নিয়েও তর্ক করা বৃথা। সুতরাং হাঁচি মানুন আর নাই মানুন, সব সময় যেখানে-সেখানে হাঁচবেন না। হাঁচি সম্বন্ধে সচেতন হবেন। আপনার কাছে যা শুধু 'হাঁচি', অন্যের কাছে তা 'বাঁচি কি না-বাঁচি'র প্রশ্ন। বাসে-ট্রামে হয়ত হাঁচলেন, আর আপনার অলক্ষ্যে কোন যাত্রী হয়ত পরের স্ট্যাণ্ডে নেমে ঘরে ফিরে গেলেন মনঃক্ষুন্ন হয়ে। তাতে আপনার ভাল হবে কি? কারও বাড়িতে গিয়ে হাঁচলেন এবং হয়ত সে-বাড়ির কোন শুভযাত্রার তোড়জোড় সব ভেস্তে দিলেন। সুতরাং হাঁচি পেলেই হাঁচা উচিত নয়। হাঁচি কণ্ট্রোল করতে শিখুন। নাসারন্ধ্রের ঝিল্লীকেন্দ্রে যখনই ঝঙ্কারের রেশ অনুভব করবেন তখনই নাকের ব্রিজের দুপাশে ঘন ঘন দুই আঙুল

দিয়ে টোকা দেবেন, ডগা দুটো টিপবেন আর ছাড়বেন, তাহলেই দেখবেন শিহরণের ঘূর্ণায়মান বেগ নিস্তেজ হয়ে গেছে এবং সামান্য একটু মুখ-ব্যাদান করে নাক ফুলিয়ে আপনি অন্তত 'মার্জিনাল ইকুইলিব্রিয়ামে'র স্তরে পৌঁছেচেন। এই মার্জিনাল অবস্থাতেও সবদিক রক্ষা করা হবে, তা-না হলেই নিশ্চিত বিপর্যয় ঘটবে। আর একটা কথা। দু-বেলা খাবার সময়, সকাল নটা থেকে বেলা বারোটা, আর রাত আটটা থেকে এগারোটা, প্রিয়জনের নাম করবেন না। মোটামুটি এইটুকু আত্মসংযম-নীতি সকলে পালন করলে ঘরে ঘরে বিষম লাগাটা অনেক কমে যাবে এবং পরোক্ষভাবে বিষম-কার্ম-হাঁচিও। তাতে ব্যক্তিগতভাবে আপনিও উপকৃত হবেন, সমষ্টিগতভাবে সমাজেরও কল্যাণ হবে।

আমাদের সমাজের অসংখ্য অলিগলিতে, প্রশস্ত রাজপথে পর্যন্ত জীবনের ট্রাফিক রেগুলেট করবার জন্যে যে রুলটি বড় বড় হরফে লিখে লট্‌কানো রয়েছে, সে হল ঐ হাঁচির রুল। পথ চলতে হাঁচবেন না, চলা বন্ধ হয়ে যাবে, লাল আলো জ্বলে উঠবে জীবনের পথের সামনে। হাঁচবেন না, অ্যাকসিডেন্ট হবে। কবে কোন নিয়ালডার্থাল মানুষ হেঁচে ফেলেছিল এবং তার পরেই তার সঙ্গীদের বিপদ ঘটেছিল, আজও মানুষ তা ভুলে যায়নি। রকেটে চড়বার সময় আজও সেকথা তার মনে পড়ে। মানবমনের অদৃশ্যলোকে অস্ত্রোপচার করেও আজও সে ঐ সামান্য হাঁচির এই কালোত্তীর্ণ অফুরন্ত শক্তির উৎস কোথায় খুঁজে পায় না।

হাসি

Laughter is essentially democratic ; humour is the most democratic of human ways of life.
—*Karl Capek.*

গোপাল ভাঁড়ের জীবনচরিত কেউ লেখেননি, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-কাহিনী দু-একজন লিখেছেন। তা না লিখলেও বেশ বোঝা যায় যে, গোপাল কোন রাজবংশের ছেলে নন, জমিদারপুত্রও নন। সাধারণ গরীব বাঙালী ঘরের ছেলে গোপাল, ভাঁড়ের কাজ করত মহারাজের কাছে জীবিকার জন্যে। অফুরন্ত হাসির খোরাক যুগিয়ে যাওয়া ছিল গোপালের কাজ। গোপাল আজ তাই তার আসল পদবী হারিয়ে হয়েছে শুধু গোপাল ভাঁড়। তবু কে না জানে যে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বেঁচে আছেন প্রাচীন ইতিহাসের উইপোকায়-কাটা পৃষ্ঠার মধ্যে, আর গোপাল বেঁচে আছে প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে ঘরে, বাঙালীর জীবনে। আর কিছু না হোক, গোপাল অন্তত এইকথা প্রমাণ করে গেছে যে, হাসির মৃত্যু নেই, যে হাসতে জানে ও হাসাতে পারে সেও অমর হয়ে থাকে সাধারণ মানুষের কাছে। হাসতে সকলে পারে না এবং যারা নিজেরা হাসতে পারে না, তারা অন্যকেও কখন হাসাতে পারে না। ইতিহাসে রাজা-মহারাজারা যত না-হেসেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি হেসেছে সাধারণ প্রজারা। সাধারণ দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের দুঃখ দূর করবার জন্যে যাঁরা গোমড়ামুখ করে রাজনৈতিক সংগ্রাম করছেন এবং হাসতে ও হাসাতে ভুলে গেছেন, তাঁরা এই কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখবেন।

হাসি সম্বন্ধে কিন্তু বাজারে যেটা চলতি ধারণা সেটা ঠিক এর বিপরীত। অনেকের ধারণা এ-সংসারে একমাত্র তারাই হাসতে পারে, জীবনটা যাদের মাখনের মতন মসৃণ, প্লাওফোম ম্যাট্রেসের মতন নরম তুলতুলে। অর্থাৎ যারা খুব আরামে ও আলস্যবিলাসে জীবন কাটায়,

হাসির ক্ষমতা একমাত্র তাদেরই আছে, আর কারও নেই। হাসি সম্বন্ধে এধারণা ভুল, মারাত্মক ভুল। মানুষের সমাজে চিরকাল দেখা গেছে রাজাবাদশাহরা মোসাহেব ও বয়স্য পুষেছেন শুধু একটু হাসবার জন্যে। তাঁদের নিজেদের যদি হাসার ও হাসাবার ক্ষমতা থাকত তাহলে জীবনে তাঁরা বয়স্য পোষার প্রয়োজন বোধ করতেন না। মন্ত্রী বা সেনাপতিদের দিয়ে নিশ্চয় সে-কাজ চলত না। সুতরাং রাজদরবারে সবার আগে প্রয়োজন হত বয়স্যদের এবং বয়স্যরা সকলেই সাধারণ স্তরের লোক। হাসতে পারা তখন একটা কোয়ালিফিকেশন বলে গণ্য হত এবং তার জন্যে ধনীরা গরীবদের চাকরি দিতেন। আজকালকার ইকনমিক্সের ও কমার্সের এম-এ-দের চাইতে সেকালের হাস্যরসিকরা চাকরির বাজারে অনেক বেশি কোয়ালিফায়েড বলে গণ্য হতেন। একালে হাসির মূল্য মানুষের সমাজে অনেক কমে গেছে বলে মনে হয়। তাই দু-চারজন যাঁরা সত্যি নিজেরা হাসতে ও হাসাতে পারেন, তাঁরা প্রায়ই দেখা যায় বেকার হয়ে কলার ভেলার মতন ভেসে বেড়াচ্ছেন এবং সমাজের চোখে তাঁরা খুব শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিও নন। এটা আমাদের সামাজিক জীবনের একটা ট্রাজিডি। তার কারণ, হাসি সাধারণ মানুষের জীবনের অমূল্য সম্পদ এবং সম্ভ্রান্ত উচ্চসমাজের বিলাসিতার উপকরণ। হাসির উৎস নিম্নতম সমাজের আন্‌কোরা মানুষের অন্তরের মণিকোঠায়, ধনীদের বাগান-বাড়িতে, দরবারে বা ড্রয়িংরুমে নয়।

সমাজের স্তরে স্তরে, জীবনের পদে পদে, একথার অসংখ্য প্রমাণ প্রতিদিন পাওয়া যায়। চলার পথে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যাদের মুখে সর্বক্ষণ হাসি দেখা যায়, তারা কেউ অসাধারণ উচ্চস্তরের লোক নয়। তারা অত্যন্ত সাধারণ লোক, একেবারে মাটির মানুষ। অথচ যুগে যুগে অধিকাংশ সাহিত্যিক তাদের কি মিথ্যা ও কদর্য ছবিই না এঁকেছেন! গরীব সাধারণ মানুষের হাসবার অধিকার নেই, তারা হাসতে জানে না, একথাই যেন দরিদ্রদরদী সাহিত্যিকরা বলতে চান—বিশেষ করে এযুগের একশ্রেণীর বস্তুবাদী সাহিত্যিকদের এইটাই যেন মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। গরীবের মুখে হাসি ফুটবে, একথা কবিরা কল্পনা করতে পারেন না।

তাই সাধারণ গরীব মানুষের ছবি যা সাহিত্যে আঁকা হয় তা অত্যন্ত ভয়াবহ ও বীভৎস, পড়তে পড়তে দম বন্ধ হয়ে আসে, মনে হয় এমন একজাতের মানুষের কাহিনী পড়ছি যারা কখন হাসে না, কেবল কাঁদে, মুখ অন্ধকার করে বসে থাকে এবং সব সময় প্রতিহিংসার তাড়নায় দাঁত কিড়মিড় করে। সাধারণ গরীব মানুষ সম্বন্ধে সাহিত্যিক ও কবিরা যত মিথ্যা কথা বলেছেন, এত মিথ্যা বোধ হয় অন্য কেউ বলেনি। তার কারণ যাঁরা সাহিত্যচর্চা করেন তাঁরা দূরে থেকে কল্পনায় এদের জীবন দেখেছেন, তাই তাঁদের গরীবের সাহিত্য অনেকটাই কাল্পনিক ও রোমান্টিক হয়েছে, বাস্তব সাহিত্য হয়নি। হাজার দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ থাকলেও, মালিকদের চেয়ে মজুরদের জীবন যে অনেক বেশি হাসি-ঠাট্টা-রসিকতায় ভরা, একথা কজন শিল্পী জানেন? মালিকদের জীবনে দুশ্চিন্তার মেঘ যত ঘন ঘন জমে, মজুরদের জীবনে তা জমতে পারে না, হাসির আলোকে বারংবার তা ঝলমল্ করে ওঠে। মর্গান, হেনরী ফোর্ড, টাটা, বিড়লা জীবনে যতটা না-হেসেছেন ও হাসাতে পেরেছেন, তার চেয়ে লক্ষগুণ বেশি হেসেছে তাঁদের কারখানার মজুররা। পৃথিবীর সমস্ত কোটিপতিদের সারাজীবনের হাসির পরিমাণ, মজুরদের জীবনের একঘণ্টার হাসির সমান। মাঠে মাঠে, ক্ষেতেখামারে চাষীরা প্রতিদিন যা হাসে, জমিদাররা সারাজীবন চেষ্টা করেও এবং বয়স্য রেখেও তা হাসতে পারেন না। স্ল্যাঙ্ বা অসাধু ভাষার মতন হাসিও জনসাধারণের অন্তরের ভাষা, তাই হাসি চিরকালই এত জীবন্ত, এত গতিশীল। হাসি তাই মৃত্যুহীন।

কথাটা যে কত বড় সত্য তা আরও তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায়। বাড়িতে দেখবেন বাড়ির কর্তা যিনি তিনি যা না-হাসেন, তার চেয়ে অনেক বেশি হাসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। কর্তার যেন বাড়ির মধ্যে হাসাই বারণ, হাসলেই যেন তাঁর কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হয় এবং তাঁর উপস্থিতিতে হাসি তাই বন্ধ হয়ে যায় বাড়ির মধ্যে। ঘরের বাইরেও ঠিক এই ব্যাপার দেখা যায়। আপিসের বড়বাবুরা অল্প হাসেন, তাঁর চেয়ে বড় যাঁরা অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাডিশনাল ও ডেপুটি, তাঁরা আরও অল্প হাসেন এবং যাঁরা সবচেয়ে বড় বা চীফ, তাঁরা একেবারেই হাসেন না। না-হাসাটাই

যেন তাঁদের 'চীফ' হবার অন্যতম গুণ। অর্থাৎ হাসির গ্রেড অনুযায়ী পদমর্যাদার গ্রেড। সাধারণ কেরানীদের যত অভাব অভিযোগই থাকুক না কেন, তবু তাঁদের মধ্যে দেখা যায় রসিক লোকের অভাব নেই, এবং চলতে-ফিরতে, কথা বলতে তাঁরা প্রাণখুলে হাসতে ও হাসাতে পারেন। কিন্তু ডিপার্টমেন্টের হেড যাঁরা, তাঁরা মধ্যে মধ্যে হয়ত একটু হাঃ হাঃ করে হাসেন, ডেপুটিরা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কালেভদ্রে মুচকি হাসেন, এবং চীফ যদি বছরে একবার 'স্মাইল' করেন তাহলেই আপিসের মধ্যে সোরগোল পড়ে যায়। এছাড়া লক্ষ্য করে দেখবেন (কলকাতা শহরে দেখার সুযোগ যথেষ্ট পাবেন) বাড়িওয়ালারা নতুন বাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে যা না-হাসতে পারেন, তার চেয়ে অনেক বেশি হাসে মিস্ত্রীরা কয়েকহাজার ফুট উপরে বাঁশের ভারার উপর বসে, বাড়ির ইট গাঁথতে গাঁথতে। আবার মিস্ত্রীরা যত সহজে স্বাভাবিকভাবে হাসতে পারে, মন্ত্রীদের শুড়শুড়ি দিলেও তা পারেন না। দু-জন ড্রাইভারের যদি রাস্তায় দেখা হয় তাহলে তাদের কথাবার্তায় যত সহজে হাসি উপ্‌চে পড়বে, দু-জন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরের দেখা হলে তা কখনই পড়বে না, তাঁরা মুচ্‌কি হেসে চলে যাবেন। হাসির এই হল ঐতিহাসিক নিয়ম। ডাকপিওনদের যেমন ভাবে হাসতে দেখবেন, পোস্টমাস্টার-জেনারেলকে কখনই সেরকম হাসতে দেখবেন না। স্কুলের ছাত্ররা যেমন প্রাণ খুলে হাসতে পারে, মাস্টার মশায়রা তা পারেন না। আবার স্কুলের শিক্ষকরা যেটুকু বা হাসেন, কলেজের অধ্যাপকরা তার চেয়ে অল্প হাসেন, স্কলাররা প্রায় হাসেনই না, আর শিক্ষামন্ত্রীর কাছে হাসিটা অবশ্যই ট্যাবু। ধরুন, অর্থসচিবের কথা। পার্লামেন্টে যখন তিনি সেলট্যাক্স বা বিক্রয়কর বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর মুখে হাসি বেরোয় না, এবং এমনিতেও তিনি জীবনে হাসবার মতন ফুরসত খুব কমই পান। কিন্তু বিক্রয়কর যাঁরা দেন তাঁরা সাধারণ লোক, কর দিতে তাঁদের যথেষ্ট কষ্ট হয়, তবু কেনাবেচার সময় তাঁরাই হাসাহাসি ঠাট্টাতামাশা করেন। রেলমন্ত্রী যখন থার্ডক্লাস যাত্রীদের ভাড়া বাড়াবার কথা বলেন, তখন মুখটা এমন গম্ভীর করে বলেন যে, হাসি তাঁর ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারে না। কিন্তু না-খেয়েও যাঁরা বেশি

ভাড়া দেন, থার্ডক্লাসের যাত্রী যাঁরা, ভাড়ার জন্মে তাঁদের হাসিতে ভাটা পড়ে না এবং চলন্ত ট্রেনের থার্ডক্লাস কামরা থেকেই জীবন্ত মানুষের হাসির শব্দ সবচেয়ে বেশি ধ্বনিত হয়ে ওঠে। এমন কি রেলমন্ত্রী যদি স্পেশাল সেলুন বা ফার্স্টক্লাসে বসে সেই থার্ডক্লাসের হাসি শোনেন, তাহলে তিনি চমকে উঠবেন, মুখে তাঁর হাসি ফুটে উঠবে না।

এরই নাম হাসি, যার অন্য নাম প্রাণ। সমাজের নিম্নতম স্তর থেকে যদি উচ্চতম স্তরের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে দেখা যায় যে ক্রমেই হাসির ধ্বনি-প্রতিধ্বনি কমে আসছে। ধাপে ধাপে যত ঐশ্বর্য ও সম্ভ্রমের উপরের স্তরে ওঠা যায়, ততই দেখা যায় হাসিখুশি মুখ ক্রমেই গম্ভীর হয়ে উঠেছে। উচ্চতম স্তরে দেখা যায়, হাসি পাথরের মতন জমাট বেঁধে নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।

ধনদৌলত ও সামাজিক সম্ভ্রম হাসির উৎস নয়। হাসির উৎস সহজ স্বচ্ছ সূর্যালোকের মতন ঝক্‌ঝকে জীবন। পৃথিবীর নাট্যকাররা, সেক্সপীয়র পর্যন্ত, যেসব হাস্যরসিকের চরিত্র এঁকেছেন, তাঁরা কেউই সমাজের উপরতলার সম্ভ্রান্ত লোক নন। বিশ্বসাহিত্যে কেন চিরদিন গরীব, নিঃস্ব, সাধারণ লোকরাই ক্লাউনের অভিনয় করেছে, সেকথা কেউ ভেবে দেখেছেন কি ? তার কারণ হাসিটা সাধারণ মানুষের জীবনের সম্পদ, বড়লোকের সাময়িক বিলাসিতার উপকরণ। গরীবের দুঃখ-বেদনা যদি ঠাট্টা-তামাশা, রঙ্গরসিকতা, ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিচিত্র হাসির আলোকস্পর্শে হাল্‌কা না হত, তাহলে তো তারা বাঁচতেই পারত না। তারা যদি না-হাসত, তাহলে পৃথিবীর বুক থেকে অনেক আগেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। মানুষের ইতিহাসে চিরদিন :তাই সমাজের নিচের তলা থেকে হাসির একটা হাঃ হাঃ শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মতন। জীবনের উদ্দাম স্রোত হল সেই হাসি। উপরের স্তরে জীবনের স্রোতের মুখে যত কৃত্রিমতার বাঁধ জমে, হাসির উদ্বেল উচ্ছ্বাস তত কমে আসে, এবং হাসি ক্রমে স্থির হয়ে জমাট বেঁধে যায়।

কেমন আছেন ?

পৃথিবীটা গোল হয়েই যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। গোল না হয়ে যদি ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ হত তাহলে সমান্তরাল বা কোণাকুণি পথ ধরে চলতে পারত মানুষ এবং বিনা প্রয়োজনে একজনের সঙ্গে অন্যজনের মুখোমুখি দেখাও হত না। কিন্তু গোলাকার পৃথিবীতে বন্দী মানুষের এইভাবে দেখা হওয়া ছাড়া গতি নেই। এমনই এক খাঁচায় আবদ্ধ আমরা যে রাম প্রাণপণে শ্যামকে এড়িয়ে চলতে চাইলেও, চলতে চলতে এই পৃথিবীর ব্যাসপৃষ্ঠের যে কোন বিন্দুর উপর হঠাৎ দু-জনের মুখোমুখি চোখাচোখি, নাকানাকি বা ধাক্কাধাক্কি হবেই হবে এবং হওয়া মাত্রই শুনতে হবে 'কেমন আছেন?' ছেদক-কৃন্তক-পেষক-বিকশিত সহাস্য প্রশ্ন—'কেমন আছেন' ?

জীবনের প্রতিদিন যদি গড়ে একশবার এই প্রশ্নের জবাব দিতে হয় কেমন আছেন? তাহলে মধ্যে মধ্যে কার না বলতে ইচ্ছে করে, যথেষ্ট সভ্য শিষ্ট ও সহিষ্ণু হয়েও যে, 'আমি যেমনই থাকি না কেন, তাতে আপনার কি? আপনার কি তার জন্যে ঘুম হচ্ছে না?' দেখুন না, দিন নেই রাত নেই, স্থান নেই অস্থান নেই, সময় নেই অসময় নেই, দেখা হলেই 'কেমন আছেন?' ঐখানে যদি শেষ হত তাহলে তো বাঁচা যেত। চলার পথে একটা নিতান্ত চল্‌তি প্রশ্ন হিসেবে জিজ্ঞাসা করা এবং কোন উত্তরের প্রত্যাশা না করে ঠিক যান্ত্রিক অটোমোবিলের মতন গড্ডলিকা-প্রবাহে গড়িয়ে চলে যাওয়া, তবু হয়ত কোনরকমে বরদাস্ত করা যায়। চলতে চলতে বাঁদিকে ঘাড় বেঁকিয়ে আমি জিগ্যেস করলাম—'ভাল?' আপনিও একবার ডানদিকে ঘাড় বেঁকিয়ে, অথবা ঈষৎ মুচকি হেসে, চলার ভেলসিটি একটুও না কমিয়ে চলে গেলেন। আমার সঙ্গে আপনার সামাজিক সম্পর্কটা ও রীতিনীতিটা কতকটা যান্ত্রিক ট্রাফিক রেগুলেশনের

মতন, অর্থাৎ চলার পথে যে যার বাঁয়ে চললেই হল, নেহাৎ দুর্ভাগ্যক্রমে সভ্য মানুষ বলে ঐ যে 'কেমন আছেন' 'ভাল?' ইত্যাদি বলার যে বাধ্যবাধকতাটুকু তা এমন কিছু নয়, সামান্য একটু হর্ন বাজানোর মতন বাক্‌যন্ত্রটা বাজানো। এই পর্যন্ত কোনরকমে মানিয়ে নেওয়া যায় এবং খুব দুরন্ত হতে পারলে কোন কথা বলবারও দরকার করে না। সামান্য একটু ঘাড় বেঁকাবেঁকি করে যে যার চলে গেলেই হল। চলার পথে শুধু ট্রাফিকের প্রাথমিক 'keep to the left' নীতি মেনে চললে, মুখোমুখির বা ধাক্কাধাক্কির সম্ভাবনা থাকে না, কেবল চোখাচোখি হতে পারে মাত্র।

কিন্তু যদি কেউ হঠাৎ ব্রেক করে দাঁড়িয়ে যায় এবং সাধারণ ট্রাফিক রুল ভায়োলেট্ করে বাঁদিক থেকে তির্যকভঙ্গিতে ডানদিকে এসে সোজা জিজ্ঞাসা করে: 'এই যে, কেমন আছেন? ভাল? সব খবর ভাল? বাড়ির খবর? স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে দেখছি—হে-হে, অসুখ বিসুখ করেছিল নাকি? হে-হে! তারপর কি করছেন আজকাল। হে-হে, আছেন কোথায়?' একটা নয়, দুটো নয়, প্রশ্নের প্রবাহ নয় জোয়ার, জোয়ার নয় মহাতুফান উঠলো। আপনি নাকানি-চোবানি খেয়ে হাঁপাতে লাগলেন। 'কেমন আছেন' এবং তার রকমফেরে যখন কুলোয় না, তখন 'কি করছেন' শুরু হয়। খেয়েদেয়ে যাঁদের কাজ থাকে তাঁদের এসব লৌকিকতার বালাই নেই। খেয়েদেয়ে যাঁরা নিয়মিত ঘুমোন তাঁদের তো প্রশ্ন করবার মতন অবস্থাই হয় না। তবে কারা এই প্রশ্ন করেন? খেয়েদেয়ে যাঁদের যথেষ্ট অকাজ থাকে তাঁরা এবং যাঁরা সাধারণত আপনার সম্বন্ধে বিশেষভাবে উদাসীন ও নির্বিকার।

যদি বলেন উদাসীনের এতো আগ্রহ আসে কোথা থেকে, তাহলে আমি বলব 'Aye, there's the rub!' দেখবেন যাদের আপনি এড়িয়ে চলতে চান, যাদের দেখলে ডাইরেক্ট কারেণ্টের শক্ খেয়ে ছিট্‌কে পড়বার মতন অবস্থা হয়, তারাই ঠিক ঘুরেফিরে হিপোর মতন ভুস্ করে যখন-তখন, যেখানে-সেখানে আপনার চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং একটার পর একটা প্রশ্নবাণে আপনাকে জর্জরিত করে তোলে। তাই বলছিলাম, পৃথিবীটা গোল হবার ফলে আমরা একটা প্রাচীরঘেরা জেলখানায় যেন

বন্দী হয়ে গেছি। কি অপরাধে এইভাবে আমাদের জেলখানায় বন্দী করা হল তা স্বয়ং ভগবানই জানেন। পৃথিবীটা একটা দিগন্তবিস্তৃত সীমাহীন রেখাঘেরা 'রেক্‌ট্যাঙ্গেল' হলে কি এমন ক্ষতি হত? কত স্বাধীনভাবে আমরা চলতে পারতাম এবং প্যারালাল লাইনে চলতে পারলে ঐসব 'কেমন আছেন'-দের সঙ্গে কস্মিনকালেও দেখা হত না। কিন্তু বৃত্তাকারে চলা আমাদের ত্বরদৃষ্টের লিখন। সুতরাং যতু আর মধুর সঙ্গে কেমিক্যাল বিস্ফোরকের সম্পর্ক থাকলেও, দেখা তাদের সঙ্গে হবেই এবং হলেই সেই 'কেমন আছেন? ভাল?'

মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হলেই যে মনুষ্যসুলভ প্রতিক্রিয়া হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এটা অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন। এমন অনেক লোক আছেন যাঁদের দেখলে শুধু পিত্ত নয়, প্যাংক্রীজ পর্যন্ত চেড়ে উঠতে চায়। আবার অনেকে আছেন যাঁরা ম্যাগনেটের মতন আকর্ষণ করেন। আমার মনে হয়, মাধ্যাকর্ষণের মতন একটা লোকাকর্ষণ শক্তি আছে, কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা সেটা নিয়ে বিশেষ কোন গবেষণা করেননি। কেন একজন লোক কাছে টানে এবং অন্য একজন দূরে ঠেলে ফেলে দেয়, কেউ বলতে পারেন কি? এমন যথেষ্ট ভাল নিরীহ বেচারী লোক আছে যাদের দেখলে আর দ্বিতীয়বার দেখতে ইচ্ছে করে না। আবার এমন অনেক কড়াপ্রকৃতির পাথুরে লোক আছেন যাঁরা কেবলই কাছে টানেন, যেন তাঁদের চরিত্রটা পাহাড়ের চূড়ার মতন। যত কাছে যাওয়া যায়, তত মনে হয় দূরে, এবং যত দূরে মনে হয়, তত ইচ্ছে হয় কাছে যেতে। সবটাকে হয়ত ধোঁয়াটে কথায় 'ব্যক্তিত্ব' বলা যায় এবং সত্যিই এই ব্যক্তিত্ব যে কি তা ভাষায় ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। সে যাই হোক, যা বলছিলাম। দেখলেই পিত্ত চড়ে যায়, যকৃৎ কেঁপে ওঠে, যাবতীয় ইন্টেস্টাইনাল বিক্রিয়া শুরু হয়, এমন লোকই আপনার কুশলপ্রার্থী বেশি। সত্যিই যাঁরা আপনার কুশল কামনা করেন, তাঁরা আপনার কুশলাকুশলের সমস্ত খোঁজ রাখেন, দেখা হলে কেমন আছেন বলবার দরকার হয় না তাঁদের। যাঁরা সে খোঁজ রাখেন না, রাখবার ইচ্ছাও নেই, স্বার্থও নেই, অথচ আপনার সম্বন্ধে একটা অস্বাভাবিক

অসুস্থ কৌতূহল আছে শুধু, তাঁরাই দেখা হলে 'কেমন আছেন', 'কি করছেন' ইত্যাদি প্রশ্ন এমন নাছোড়বান্দার মতন জিজ্ঞাসা করেন যে আশপাশের লোক মনে করে যেন তাঁর মতন আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী এ-সংসারে আর কেউ নেই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? তা কখনও নয়। তবে কি?

তবে কেন এমন হয়? আপনি জানেন এবং খুব ভালভাবেই হাড়ে-হাড়ে জানেন যে—

যদিও এ জগতের কল্‌জেটা জ্বল্‌ছে
মিথ্যে মিষ্টি কথা সবাই তো বল্‌ছে,

কিন্তু তাও আপনি এই শ্রেণীর হিতাকাঙ্ক্ষীদের সবসময় সর্বত্র সহ্য করতে পারেন না। মনে করুন, লোকের ভিড়ের মধ্যে বাসে ট্রামে, অথবা কোন লোকসভায় এই জাতের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী সবেমাত্র কেমন আছেনের পালা শেষ করে, কি করছেন শুধাতে শুরু করেছেন। আপনি হয়ত একজন শিল্পী বা লেখক। কি উত্তর দেবেন তাহলে এবং উৎকর্ণ লোকের মধ্যে? কিন্তু তবু হিতাকাঙ্ক্ষীর প্রশ্ন চলল: 'ছবিটবি আঁকা অভ্যাস ছিল আপনার, আঁকছেন তো, না ছেড়ে দিয়েছেন'? অথবা লেখাটেখা চলছে তো, কোথায় লিখছেন কি লিখছেন আজকাল? কল্পনা করুন একবার প্রশ্নের ঠ্যালাটা কি? অন্যান্য সকলে প্রশ্ন শুনে আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে, যেন আপনি একটি চিড়িয়াখানার জন্তু। আপনার তখন কি মনে হবে? চুপ করে আছেন, তবু রেহাই নেই। মনে হবে না কি যে সটান উঠে দাঁড়িয়ে, হিতাকাঙ্ক্ষীর দুই গণ্ডদেশে সজোরে দুটো কষিয়ে দিয়ে বলতে: 'আমি যা-ই করি না কেন, তাতে আপনার কি? কিন্তু সভ্যসমাজে তা করবার উপায় নেই, বিশেষ করে নিজেকেও যদি সভ্য বলে পরিচয় দিতে হয়। সুতরাং এই গোলাকার পৃথিবীতে 'কেমন আছেন' 'কি করছেন' থেকে সারাজীবনেও কারও মুক্তি নেই। এক রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা দিয়ে যান, দেখবেন হঠাৎ পাশের কোন গলির মোড় থেকে সেই 'কেমন আছেন ভাল?' এক পাড়া ছেড়ে অন্য পাড়ায় যান, দেখবেন হঠাৎ কোন বাজারের ভিতর থেকে সেই লোকটি উঁকি

মেরে জিজ্ঞাসা করছে—'কি করছেন?' শহর ছেড়ে গ্রামে যান, হঠাৎ কোন হাটের পথের বটগাছের আড়াল থেকে শুনতে পাবেন, 'এই যে এখানে? কেমন আছেন?' সংসার ছেড়ে অরণ্যে যান তবুও রেহাই নেই—হঠাৎ হয়ত গভীর অরণ্যের ভিতর থেকে শুনতে পাবেনঃ 'কেমন আছেন স্যার'? এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখবেন, একটি গাছের মগ্‌ডালে বসে আছে ঠিক সেই লোকটি যাকে আপনি এড়িয়ে চলতে চান।

তাই বলছিলাম, এই গোলাকার পৃথিবীতে যখন বৃত্তাকারে ব্যাসরেখার উপর দিয়ে চলতেই হবে, সমান্তরাল পথে চলবার কোন উপায় নেই, তখন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবেই। কিন্তু যদি হয় তাহলে সভ্য মানুষের কতকগুলি মৌলিক অধিকার মেনে চলবেন। যেমন—

(ক) 'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করে কারও ব্যক্তিগত শান্তিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না। কে কেমন আছে না-আছে তা জানবার আপনার কোন প্রয়োজন নেই এবং বাস্তবিক আপনি তা জানতেও চান না। তবু কেন জিজ্ঞাসা করেন 'কেমন আছেন?'

(খ) কাউকে কখনও ভুলেও জিজ্ঞাসা করবেন না 'কি করছেন?' ওটা সভ্যতা বা ভদ্রতা কোনটাই নয়। কে কি করছে না-করছে সে সম্বন্ধে আপনার জানবার যদি আগ্রহ থাকে, তাহলে কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন। দোহাই আপনার, যত্রতত্র 'কি করছেন' জিজ্ঞাসা করে কাউকে বিব্রত করবেন না।

(গ) জীবনের পথে চলবার সময় 'Keep to the left' নীতি মেনে মুখবুজে চলবেন।

হে শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আমার! আপনাকে আমি জানি। সেই আদিপ্রস্তর যুগ থেকে এই অ্যাটমিক যুগ পর্যন্ত আপনাকে দেখে আসছি, আপনার কোন পরিবর্তন হয়নি। বাইরের চেহারাটা দৈহিক মেহনত করতে করতে একটু বদলেছে, কিন্তু ভিতরের চেহারা আপনার একটুও বদলায়নি। আপনি নিজের ছাড়া অন্য কারও শুভকামনা করেন না, যেটুকু করেন তাও নিজের স্বার্থে। কে কি করছে না-করছে, বা কেমন আছে না-আছে, তা জানবার কোন বাসনা আপনার নেই। তবু সভ্যতার

যন্ত্রে তৈরি হয়েছেন আপনি, তাই আপনার মুখে যন্ত্রমানবের মতন সেই একই বুলি অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে—কেমন আছেন ? কি করছেন ?

যদি
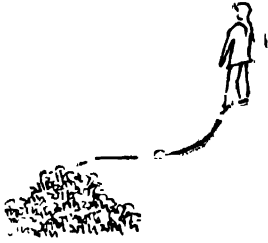
বাংলাভাষায় এমন একটি 'শব্দ' আছে যাকে সাহিত্যিকরা উপেক্ষা করেন, ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা অবহেলা করেন, অথচ যার আকর্ষণশক্তি দুর্বার, মাধুর্য অনির্বচনীয় এবং বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনার কোন আদিঅন্ত নেই। বাংলাভাষার মহারণ্যে মাত্র দুই অক্ষরের সেই শব্দটি ঠিক নিরাভরণ বনদুহিতার মতন। কোন ঝঙ্কার নেই তার, কোন রূপলাবণ্য নেই। আলঙ্কারিকের দৃষ্টিতে কোন অলঙ্কারের চিহ্ন তার গঠন-বিন্যাসের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও। তবু তারই জন্যে সাহিত্য সচল রয়েছে এবং জীবন দুর্বিষহ বোঝার ভারে আজও অচল হয়নি। কাব্যের উপেক্ষিতা সেই বাংলা শব্দটি হল, আমাদের বহু পুরাতন নগণ্য 'যদি'।

আমরা কোনদিন ভেবে দেখিনি, আমাদের অলঙ্কারবহুল জীবনে এই নিরলঙ্কার নির্বিকার 'যদি' কি প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। 'চলন্তিকা' অভিধানে 'যদি' সম্বন্ধে রাজশেখর বসু লিখেছেন : 'অবধারণে বা বিকল্পে if (যদি বৃষ্টি হয় তবে ঠাণ্ডা পড়বে, যদি আসতে তো ভালই হত)। সংশয়ে বা আশঙ্কায়, lest (যদি রাত হয় তাই লণ্ঠন এনেছি,

ভয় হয় যদি সে রাগ করে)। সংশয়াধিক্যে (যদি মরি তাতে ক্ষতি কি) ইত্যাদি।' এই হল 'যদি'র আভিধানিক অর্থ। অবধারণে বা বিকল্পে ইংরেজি 'ইফে'র মতন, সংশয়ের বা আশঙ্কায় ইংরেজি 'লেস্টে'র মতন, অথবা সংশয়াধিক্যে, ইংরেজী 'ইভ্‌ন ইফ্‌'-এর মতন, আমাদের বাংলাভাষার 'যদি'। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, আভিধানিক অর্থের এই নির্দিষ্ট সীমানা ছাড়িয়ে বাংলার 'যদি' তার গভীর দ্যোতনার ইন্দ্রজাল মানসিক ভাবানুভাবের নিঃসীম দিগন্তরেখা পর্যন্ত বিস্তার করে রয়েছে। ইংরেজির 'ইফ্‌' আছে, 'ইভ্‌ন-ইফ্‌' আছে, 'থ্যো' আছে, 'অল্‌থ্যো' আছে, কিন্তু বাংলায় আছে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর, আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, হিমাদ্রির মতন অচল অটল অদ্বিতীয় 'যদি'। আমাদের জীবনের একমাত্র পাটাতন যদি, যেমন ওদের 'ইফ্‌'। সারাজীবনের সমস্ত সঞ্চিত পাথেয় থেকে যে-কোন সময় একটি একটি করে সবগুলি 'যদি' একবার যদি খসিয়ে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে বিয়োগফল যা পড়ে রইল সেটা শুধু একটা শূন্য খোলস্‌ মাত্র, একটা স্কেলিটন বা কঙ্কাল, রক্তমাংস রূপলাবণ্য কিছুই তার নেই। তার কারণ জীবনের রক্তমাংস, জীবনের রঙবেরঙের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য, জীবনের মনোহর লাবণ্য, সবই ঐ 'যদি'। জীবন যাদের বিশাল হাজারদুয়ারী রাজপ্রাসাদের মতন জমকালো, তাদেরও সেই হাজার স্তম্ভের প্রতিটি স্তম্ভ ঐ 'যদি'। জীবন যাদের পর্ণকুটিরের মতন জীর্ণ, তাদেরও প্রত্যেকটি ঘুণধরা খুঁটি ঐ 'যদি'। তা না হলে আপনিও মানুষ আমিও মানুষ, এরা ওরা সকলেই তো মানুষ, তবু কেন এক নবকৃষ্ণ শোভাবাজারের মহারাজা হলেন এবং আর-এক হরেকৃষ্ণ দেনার দায়ে তার শুধু দুই বিঘে জমি বেচে দিয়ে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেল। একজনের জীবনে স্বপ্নলোক থেকে 'যদি' নেমে এল মাটির পৃথিবীতে, আর একজনের জীবনে 'যদি' চিরদিন স্বপ্নাকাশে তারার মতন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে রইল।

মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান কেবল 'যদি'র ব্যবধান, জীবনের সঙ্গে জীবনের দূরত্ব কেবল ঐ 'যদি'র দূরত্ব। জীবনের কোন এক সময়ে আপনার নিজের পায়ে-হাঁটা পথের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যদি স্থিরদৃষ্টিতে 'অনেক দূর

পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া কোন জীবনের ছায়ামুর্তির দিকে চেয়ে থাকেন, তাহলে দেখবেন যে গভীর অন্তঃস্থল থেকে একটি চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল এবং পিছনে-পড়ে থাকা আপনি ও এগিয়ে-যাওয়া সে এই দুই জীবনের মধ্যে যে পথের দূরত্ব, তার মধ্যে অসংখ্য মাইলপোস্ট দৃষ্টিপথে ভেসে উঠলো। প্রত্যেক পোস্টের পাথুরে গায়ে বড় বড় হরফে খোদাই করা 'যদি'। এই যদি-ই আপনার দীর্ঘনিঃশ্বাসের উৎস এবং জীবনধারণের একমাত্র জীবিকা। যে এগিয়ে যাচ্ছে সে কেবল চলার আনন্দে মশগুল হয়ে চলছে না, ঐ 'যদি'র টানে চলছে, 'যদি' আরও একটু চলা যায়, 'যদি' আরও কয়েকটা পর্বতচূড়া পার হওয়া যায়, 'যদি' জীবনের নন্দাগিরি, ধবলগিরি অতিক্রম করে এভারেস্ট পর্যন্ত পৌঁছানো যায়, 'যদি' তার পরেও কোন তুষার-শৃঙ্গ থাকে! জীবনের আঁকাবাঁকা পথ দিগন্তবিস্তৃত, সেই পথের বাঁকে বাঁকে 'যদি'র মাইলপোস্ট। আপনার চলার ইতিবৃত্ত কয়েকটা 'যদি' পার হওয়ার করুণ বা রোমাঞ্চকর কাহিনী। আপনার ব্যর্থতার ইতিহাস হল, সামনে অসংখ্য দূরতিক্রম্য 'যদি'র মর্মান্তিক ইতিহাস এবং আপনার সার্থকতার ইতিহাস কেবল কতকগুলি অতিক্রান্ত 'যদি'র রোমাঞ্চকর ইতিহাস। এ ছাড়া আর কিছুই নয়।

জীবনে যে ব্যর্থ হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, দেখবেন যখন জীবন-কাহিনী সে বলা শুরু করবে তখন অনর্গল ধারায় মুখ থেকে উৎসারিত হবে 'যদি, যদি, যদি'! প্রত্যেক 'যদি'র পর এক একটা দীর্ঘশ্বাসের ছেদচিহ্ন, একটা সকরুণ ভাব, একটা গ্লানিবোধ, একটা প্রতিহিংসার লেলিহান অগ্নিশিখা। যদি ওটা পেতাম তাহলে এই করতাম, এই হত। যদি পারতাম যদি ঘটত, যদি ঐ ভুলটা না করতাম, যদি একবার মুঠোয় পেতাম, তাহলে তাহলে—বলে বক্তা উত্তেজিত হয়ে উঠবেন। যদির কাহিনী শুনতে শুনতে আপনি অবসন্ন হয়ে পড়বেন। যত মহাজন যত 'আত্মজীবনী' লিখেছেন আজ পর্যন্ত তার সবটাই প্রায় যদি। জীবনে যার প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছে, প্রতিহিংসার আগুনে সে নিয়ত জ্বলছে আর ভাবছে 'যদি একবার পাই—'। প্রেমিক যে সে ভাবছে 'যদি সে আসে—'। শিশুর স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা তাজ্জব দুনিয়ায় যদি ছাড়া আর কিছু

নেই। যদি সে ছাড়া পায় তাহলে গাছে ওঠে, পাহাড় ডিঙোয়, নদী পার হয়। যদি তার ছোট্ট খেল্না-এরোপ্লেনটা উড়তে পারত তাহলে তাতে চড়ে সমস্ত আকাশটা সে একবার বোঁ করে ঘুরে আসত, দেখে আসত মেঘগুলোকে। যদি মা না মানা করত, তাহলে ঠিকই সে কাগজের নৌকায় চড়ে ভেসে পড়ত নদীর বুকে, কত দূর দেশে বিদেশে চলে যেত। শৈশব থেকে কিশোর জীবনের যদি আরও একটু পাল্লার মধ্যে এল। যদি 'উকিল' হই তবে রাসবিহারী ঘোষ হব, যদি ডাক্তার হই তাহলে গরীব-দুঃখীদের বিনাপয়সায় চিকিৎসা করব, যদি পড়াশুনা করতে পারি তাহলে বিদ্যাসাগর হব, যদি ব্যবসা করি তবে বিড়লার চেয়েও বড়ো হব, যদি শ্যামাকান্তের মতন বীর হতে পারি তাহলে বাঘের গলায় বগ্‌লস্‌ দিয়ে শিকল বেঁধে কুকুরের মতন টেনে নিয়ে বেড়াব, আর দেশের সমস্ত বন্দিনী, অভাগিনী, কুমারী কন্যাদের দস্যুদের কবল থেকে ছিনিয়ে আনব। অর্থাৎ যদি একবার কিছু একটা হই, তাহলে দেখে নেব, দেখিয়ে দেব কি করতে পারি, যা কেউ করেনি কখনও, ইতিহাসে যে কাহিনী লেখাজোখা নেই। এই হল কৈশোরের যদি। এ যদি এমনই জীবন্ত যে যদি একবার কিশোর রাজপুত্র তার ওবাড়ির বা ওপাড়ার কিশোরী রাজকন্যাকে পায়, তাহলে তার হাত ধরে সে এই কমলালেবুর মতন পৃথিবীটাকে স্বচ্ছন্দে জয় করে তার মাথার উপর বিজয়দর্পে দাঁড়িয়ে বিষাণ বাজিয়ে ঘোষণা করতে পারে যে সে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। দিল্লী থেকে মক্কা, মক্কা থেকে কাম্‌চাট্‌কা, টাঙ্গানিকা থেকে সাইবেরিয়া সে এক-এক লাফে চলে যেতে পারে, গিয়ে সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারে সেখানে, ঠিক এস্কিমোদের মতন, নিগ্রোদের মতন, বেদুঈনদের মতন, অবশ্য যদি সে তাকে পায়, যদি তাকে তেমনি করে পাওয়া যায়, যদি তাকে ঐ রুদ্ধ ঘরের জানলার গরাদ ভেঙে একবার ছিনিয়ে আনা যায়, যদি—যদি—। এই হল দুরন্ত কৈশোরের দুর্ধর্ষ যদি। শৈশবের যদি রূপকথার পক্ষীরাজ ঘোড়া, কৈশোরের যদি দুর্বারগতি গ্যালপিং ঘোড়া। শৈশবের যদি কাগজের নৌকা, কৈশোরের যদি হাজারদাঁড়ি ময়ূরপঙ্খী নাও। যৌবনের যদি উত্তাল তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে ভাসমান স্টীমলাইণ্ড জাহাজের মতন, দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে, দেশ

থেকে দেশান্তরে তার বিরামহীন যাত্রা। অনুসন্ধানী মন চির-অতৃপ্ত, 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।' তাই যদির টানে কেবল খোঁজা আর চলা, যদি পাই যদি সার্থক হই, যদি জয়ী হই যদি—যদি—। প্রৌঢ়ত্বের বালুচরে যৌবনের তরঙ্গায়িত জাহাজটা হঠাৎ যখন ধাক্কা লেগে আটকে যায়, তখন বিস্তীর্ণ বালুচরের দিকে চেয়ে চেয়ে হিসেবী মনটা সজাগ হয়ে ওঠে, চোখের সামনে অস্তগামী সূর্যের আলোয় জীবনের বালুস্তূপে ঝিক্‌মিক্‌ করে ওঠে অসংখ্য ফেলে-আসা পাশ-কাটানো যদি। মনে হয় হায়, হায়! যদি ওটা না করতাম, যদি আর একটু হুঁশিয়ার হতাম, একটু বুদ্ধিমান অথবা যদি অতটা লোভ, অতটা বাড়াবাড়ি না করতাম,· যদি—যদি—। বালুতটের অস্বস্তি ও হা-হুতাশের মধ্যে বার্ধক্যের সন্ধ্যা নামে, জীবনের সূর্য যায় অস্তাচলে। শেষ দিনের শেষ মুহূর্তটিতে অসংখ্য যদি এসে ভিড় করে ক্ষীয়মান দৃষ্টিপথে, আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব সকলে যখন চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ায় তখন মনে হয় যেন প্রত্যেকে এক একটি মূর্তিমান যদি। বৃদ্ধা মা'র দিকে চেয়ে মনে হয়, জীবনে তাঁর প্রতি কত অন্যায়, কত অবিচার করেছি, ক্ষমা চাওয়া হয়নি—অমনি কোথা থেকে যদি উদ্বেল হয়ে ওঠে। মনে হয় যদি একবার প্রাণ খুলে ক্ষমা চাইতে পারতাম, যদি মা বলে ডাকতে পারতাম, কিন্তু সে সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, ডাকবার শক্তি নেই, তাই 'যদি যদি' করে নিব-নিব চোখে জল জমে শুধু। স্ত্রী-পুত্র, স্বজন-বন্ধুদের দিকে চেয়েও ঐ কথা মনে হয়, কেবলই মনে হয় যদি একবার সকলকে আমার মনের আসল কথাটা বলতে পারতাম তাহলে কত ভুলের বোঝা হাল্‌কা হয়ে যেত। কিন্তু সে সময় নেই। কেবল যদি, আর অন্ধকার। অন্ধকার গাঢ়তর হয়, বৃহত্তর হতে হতে মাথার উপরে সিলিং স্পর্শ করে—যদি আর একটা দিন, মাত্র একদিন, যদি—যদি—।

জীবনের 'দি এণ্ড' বা 'ঐ শেষ'। হাজার হাজার অসংখ্য যদির ভগ্নস্তূপ এই জীবন। কিন্তু ঐখানেই শেষ নয়। যার শেষ হয়ে গেল সে তো জানল না যে যারা বেঁচে রইল তাদেরও জীবন কতদিন কতবার ঐ যদি জর্জরিত করবে। তারা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ঐ যদি তাদের

হন্ট্ করবে। যে চলে গেল তার কথা ভেবে মনে হবে, মধ্যে মধ্যে ভীষণভাবে মনে হবে—যদি তাকে পেতাম,যদি একদিনের জন্যেও পেতাম, যদি একবারটি জীবন্ত পেতাম তাকে—যদি—তাহলে—। চলার পথে জীবনের বাঁকে বাঁকে মাইলপোস্ট যেমন যদি, জীবনের এপার থেকে ওপারের সেতুও তেমনি যদি। যদি-শূন্য জীবন মানেই মৃত্যু আর যদি-দীপ্ত জীবন মানেই এগিয়ে চলা।

যদি অমর অক্ষয় অনন্ত। আমি ভাবছি যদি আরও ভাল করে লিখতে পারতাম, তাহলে এই যদি নিয়ে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ লিখতাম। যদি কোনদিন লিখতে পারি নিশ্চয় লিখব। যদি আপনারা বেঁচে থাকেন তো অবশ্যই পড়বেন।

ঘড়ি

সরল পাটীগণিতের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ যদি আপনার জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, তাহলে ফলাফল দাঁড়ায় কি ? যতই ভাগ্যগণনা করান বা ভিটামিন খান, কোনরকমে টেনেহেঁচড়ে ষাটটা বছর যদি বাঁচেন, তাহলে জানবেন খুব বাঁচা বেঁচে গেলেন এবং সেটা আপনার বংশানুক্রমিক সুক্রিয়ার সুফল ছাড়া কিছু নয়। ষাট হলেই নাকি কাঁধে ওঠার সময় হল। তাই যদি হয় তাহলে একবার অঙ্ক কষে দেখলে, জীবনটার চেহারা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় কি ? জীবনটা উর্বশী-মেনকার মতন নিখুঁত সুন্দর নয় যেমন, তেমনি হিড়িম্বা-সুর্পনখার মতন ভয়াবহ কুৎসিতও নয়। মোটামুটি শ্যামবর্ণ সুশ্রী মেয়ের মতন জীবন।

ষাট বছর মানে প্রায় ১৮৯ কোটি সেকেণ্ড। এই সরল পাটিগণিতের হিসেবটুকু মনে রাখলে জীবনের দার্শনিক তত্ত্ব বুঝতে কোন দুর্বোধ্য শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজন হবে না। শুধু এই ১৮৯ কোটি সেকেণ্ডের কথা মনে রেখে যদি কিছুক্ষণ কোন ঘড়ির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন এবং কান পেতে নিবিষ্টচিত্তে তার টিক্‌টিকিনি শোনেন, তাহলে বুদ্ধ-শঙ্কর-কণাদ-কপিল সকলের সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বকথা একমুহূর্তে জলের মতন প্রাঞ্জল হয়ে উঠবে। ঘড়ির চেয়ে বড়ো দার্শনিক আজ পর্যন্ত কেউ জন্মায়নি। ঘড়ির প্রত্যেকটি টিক্ মানে আপনার ঐ ১৮৯ কোটি সেকেণ্ড পুঁজি থেকে একটি সেকেণ্ডের ক্ষয় এবং এই ক্ষয় অবিরাম চলছে। প্রত্যেক দিনে প্রায় ৮৬ হাজার সেকেণ্ড আপনার মজুত তহবিল থেকে খরচ হয়ে যাচ্ছে। গচ্ছিত মূলধনের যদি সুদে বা আসলে কোন বৃদ্ধির সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে আপনি ১৮৯ কোটির মালিক হলেও দৈনিক ৮৬ হাজার করে ক্ষয় সহজ কথা নয়। সমস্ত পুঁজি ফুঁকে দিতে কতদিনই বা সময় লাগবে? ঐ ষাট বছর। কাঠুরের কাঠ কাটার মতন ঘড়ি প্রতি সেকেণ্ডে আমাদের জীবনকাণ্ড কেটে চলেছে। একমনে যদি একবার ঘড়ির টিক্‌টিকিনি শোনেন তাহলে কেবল এই বিরামহীন কাটার শব্দ শুনতে পাবেন।

ঘড়ি আপনার জীবনটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলছে এবং যখন কাটার পালা শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন আপনি ১৮৯ কোটি টুক্‌রোতে পরিণত হচ্ছেন। সেই স্তূপাকার সেকেণ্ডের টুকরো সময়ের মহাসমুদ্রে মিশে যাচ্ছে। তারপরই 'দি এণ্ড' বা 'ঐ শেষ'।

কিন্তু জীবনের হিসেবটা এখানেই শেষ হচ্ছে না। জীবনে যাঁরা কাজ করতে চান, যে-কোন কাজ, তাঁদের সেই কর্মজীবনের মেয়াদ কতটুকু? কোনদিন কেউ ভেবে দেখেছেন কি? অর্থাৎ ১৮৯ কোটি সেকেণ্ড পুঁজির মধ্যে কতটা আপনি ঠিক মতন ব্যয় করবার সুযোগ পান এবং কতটা অপব্যয় করতেই হয়, তার হিসেব কেউ রাখেন না। আপনার বাঁচার জন্যে দৈনিক অন্তত ছ-ঘণ্টা ঘুমুনো দরকার, এবং তার মানে ঘুমিয়ে জীবনের চারভাগের একভাগ কেটে যায়। সাধারণত তার অনেক বেশি যায়, তিনভাগের একভাগ তো নিশ্চয়ই। তবু সবচেয়ে কম সময়টুকু

আমি হিসেবে ধরছি। ১৮৯ কোটি সেকেণ্ডের মধ্যে প্রায় ৪৭ কোটি সেকেণ্ড ঘুমের খাতে ব্যয় হয়। খুব স্বাস্থ্যবান হলেও অন্তত বছরে তিনটে দিন আপনার শরীরটা ম্যাজ্ম্যাজ করে, মাথাটা ঝিমঝিম করে, অর্থাৎ ৬০ বছরে ৬ মাস। তাহলে সামান্য অসুস্থতার জন্যেও প্রায় ১ কোটি ৫৭ লক্ষ সেকেণ্ড খরচ হয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়া স্নান ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক কাজের জন্যে খুব তৎপর যিনি, তাঁরও দৈনিক তিনঘণ্টা সময় লাগে, অর্থাৎ জীবনের আটভাগের একভাগ সময়। তাহলে প্রাত্যহিক কাজ বাবদ প্রায় ২৪ কোটি সেকেণ্ড খরচ হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় খরচ হল, জীবনের প্রথম কুড়িটা বছর, সাবালক বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে যে সময়টুকু লাগে অর্থাৎ একেবারে জীবনের তিনভাগের একভাগ সময় বরবাদ। সুতরাং শুধু সাবালক মানুষ হতেই প্রায় ৬৩ কোটি সেকেণ্ড ব্যয় হয়। এছাড়া শেষের পাঁচটা বছর অন্তত বাত ব্লাডপ্রেসার ও ডায়েবিটিসের ফলে আপনার কর্মক্ষমতা থাকবে না, এটা ধরে নিতেই হবে। তার জন্যে আরও প্রায় ১৫ কোটি সেকেণ্ড বাদ যাবে। এইবার যদি জীবনের জমাখরচ হিসেব করেন, তাহলে আপনার কর্মজীবনের মেয়াদ দাঁড়ায় এই ঃ

জমা	খরচ
১৮৯ কোটি সেকেণ্ড	নিদ্রা বাবদ : ৪৭ কোটি সেকেণ্ড
	অসুস্থতা বাবদ : ১ কোটি ৫৭ লক্ষ
	নিত্যনৈমিত্তিক : ২৪ কোটি
	সাবালকত্ব বাবদ : ৬৩ কোটি
	বার্ধক্য বাবদ : ১৫ কোটি
বাকি : ৩৮ কোটি ৪৩ লক্ষ	মোট খরচ : ১৫০ কোটি ৫৭ লক্ষ সেকেণ্ড

মোট জীবনের পুঁজি ১৮৯ কোটি সেকেণ্ড থেকে প্রায় ১৫১ কোটি সেকেণ্ড খেতে ঘুমুতে, সাবালক হতে বেমালুম বাদ চলে যায়। বাকি যা থাকে সেইটাই আপনার কর্মজীবন, মাত্র ৩৮ কোটি সেকেণ্ড।

এইবার আর একবার ঘড়ির টিক্‌টিকিনি কান পেতে শুনুন, দেখবেন

কত দ্রুত এই কর্মজীবনের অবসান হয়ে যাচ্ছে। মনে থাকে যেন, জীবনের যত কিছু লম্ফঝম্প সব এই ১২ বছর বা ৩৮ কোটি সেকেণ্ডের মধ্যে শেষ করতে হবে। দিল্লী চলা, মক্কা চলা, গৌরীশৃঙ্গে ওঠা, যেখানে চলাই আপনার জীবনের চরম লক্ষ্য হোক না কেন, এই ১২ বছর মাত্র পৌঁছবার সময়। জীবনের অভিযান এর মধ্যেই শেষ করতে হবে। জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-কামনা, জল্পনা-কল্পনা, সব এই বারো বছরের চেষ্টায় সার্থক করে তুলতে হবে। জীবনে যুদ্ধজয়ের যতরকম পরিকল্পনাই করুন না কেন, সবই দ্বাদশ বার্ষিক। অর্থাৎ মোটামুটি দুটো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় পাওয়া যায় জীবনে।

এই হল ঘড়ির বাণী, এযুগেব সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক। গণৎকার বা ভবিষ্যদ্বক্তার প্রতিপত্তি মধ্যযুগে ছিল, যখন অনেক দার্শনিক জীবনের গভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবার জন্যে অজস্র আবোল-তাবোল কথা বলে গেছেন। তখনও ঘড়ির জন্ম হয়নি। তখন সূর্য চন্দ্রের গতি দেখে আমরা দিনরাত্রির হিসেব করতাম, পাখির ডাকে ভোর হত, শেয়ালের ডাকে প্রহর গুণতাম। মিনিট সেকেণ্ড তো দূরের কথা, ঘণ্টার জ্ঞানও তখন ছিল না আমাদের। তাই হাই তুলতে আর আড়ামোড়া দিতে স্বচ্ছন্দে একঘণ্টা সময় আমাদের কেটে যেত, তৈলমর্দন করতে একঘণ্টা এবং কাষ্ঠাসনে উপবেশন করে ভোজন করতে যে দু-ঘণ্টা সময় কাটত তা গায়ে লাগত না। সময়টা তখন ছিল মহাসমুদ্রের মতন এবং সেই মহাসমুদ্রের গর্ভ থেকেই মধ্যযুগের 'মহাকাল' ও 'সনাতন-বাদে'র জন্ম। সময়ের এই মহাসামুদ্রিক পটভূমিতে মানুষের জীবনটাকে সত্যিই একটা বুদবুদের মতন মনে হত এবং দেখা যেত হুঁকোয় কল্‌কে সাজিয়ে তামাক খেতে খেতেই জীবনটা কোথা দিয়ে হুস্ করে কেটে গেল। জীবনটাকে হুঁকোর ধোঁয়ার মতন মিথ্যা মনে হত, মনে হত সব ফক্কা।

মধ্যযুগের এই মহাকালবাদ, সনাতনবাদ ও ফক্কাবাদের ভিত্ পর্যন্ত ভেঙে দিয়ে আধুনিক যুগে ঘড়ির আবির্ভাব হল। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে সময়কে ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ডে পর্যন্ত ভাগ করে ফেলা হল। আধুনিক যন্ত্রযুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ঘড়ি সদম্ভে ঘোষণা করল: 'মহাকাল,

সনাতন সময়, এসব মিথ্যা। সময়টা নির্দিষ্ট ও পরিমিত, তাকে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে ফেলা যায়। আমি অবিরাম টিক্ টিক্ করে সনাতন সময়কে খণ্ডিত করব। জেনে রেখো, প্রত্যেকটা টিকের মূল্য আছে।' নতুন যুগের আদর্শ হল তাই 'টাইম্ ইজ্ মনি'—এই হলো আধুনিক যুগের জীবন-দর্শন। এই বিরাট যন্ত্রসভ্যতার নিখুঁত মডেল হল ঘড়ি। বিরাট কারখানার যান্ত্রিক উৎপাদনের যে আবর্তন-ছন্দ ও গতি, তার সঙ্গে ঘড়ির আবর্তনের বিচিত্র সাদৃশ্য আছে। ঘড়িই যেন আধুনিক উৎপাদন-যন্ত্রের প্রতিচ্ছবি। শুধু তাই নয়, প্রতি ঘণ্টায় প্রতি মিনিটে, প্রতি সেকেণ্ডে উৎপাদনের কাজ চলছে কারখানায়, একটা সেকেণ্ডের গরমিলে সমস্ত যন্ত্র হয়ত বিকল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং ঘড়ির টিক্‌টিক্ শুধু টিক্‌টিকিনি নয়, সমস্ত যন্ত্র-সভ্যতার গতির ছন্দ,প্রত্যেক আধুনিক মানুষের জীবনের ধিক্‌ধিক্ ধুক্‌ধুক্ হৃদ্‌স্পন্দন।

ঘড়ির বাণী তাই দ্বাদশ বর্ষের বাণী নয়। ঘড়ি বলেছে: 'মাত্র ৩৮ কোটি সেকেণ্ড আমি স্পেয়ার করতে পারি, জীবনে যা কিছু করবার এর মধ্যেই করতে হবে।' প্রত্যেক সেকেণ্ডে ঘড়ি সকলকে সাবধান করে দিচ্ছে, সব সময় টিক্ টিক্ করছে সকলের কানের কাছে এবং জানিয়ে দিচ্ছে যে, ৩৮ কোটি পুঁজি থেকে শত শত, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ সেকেণ্ড দ্রুত খরচ হয়ে যাচ্ছে। প্রতি সেকেণ্ডে ঘড়ি সকলকে বলছে, হিসেব রাখুন, হিসেবী হোন। টাকার হিসেব নয়, সময়ের হিসেব। কবি শিল্পী দার্শনিক বিজ্ঞানী যেই হোন না কেন আপনি, হিসেবী আপনাকে হতেই হবে, ঘড়ির টিক্‌টিকিনিতে কর্ণপাত করতেই হবে। তা যদি না করেন, তাহলেও ঘড়ি তার কর্তব্য করে যাবে। প্রত্যেক সেকেণ্ডে ঘড়ি জানিয়ে যাবে যে এক সেকেণ্ড কমে গেল, প্রত্যেক মিনিটে ৬০ সেকেণ্ড, প্রত্যেক ঘণ্টায় ৩৬০০ সেকেণ্ড, প্রত্যেক দিনে ৮৬,৪০০ সেকেণ্ড, প্রত্যেক বছরে ৩,১৫,৩৬০০০ সেকেণ্ড। আপনার কাছে পঞ্চাশ থেকে একান্ন, একান্ন থেকে বাহান্ন সাল কিছুই নয়, কিন্তু প্রত্যেক সালে ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ৩৬ হাজার সেকেণ্ড খরচ হয়ে যাচ্ছে, এবং মোট কর্মজীবনের পুঁজি ৩৮ কোটি থেকে সেটা বাদ পড়ছে। ঘড়ি এ হিসেব রাখছে আপনার জন্যে

ঘড়ি আপনার জীবনের অ্যাকাউন্টান্ট। আপনি যদি হিসেব না রাখেন তাহলে হঠাৎ একদিন ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখবেন—ঘড়ি টিক্‌টিক্ করছে, আর ৮৬,৪০০ সেকেণ্ড বাকি অর্থাৎ একদিন—টিক্‌টিক্ টিক্‌টিক্ আর ৩৬০০ সেকেণ্ড বাকি অর্থাৎ একঘণ্টা—টিক্‌টিক্ টিক্‌টিক্, আর ৬০ সেকেণ্ড বাকি অর্থাৎ এক মিনিট—তারপর।

টিক্‌টিক্ ধুক্ ধুক্
টিক্‌টিক্ ধুক্ ধুক্
টিক্‌টিক্ ধুক্ ধুক্—

এইভাবে ৫৯ বার ঘড়ি ও আপনার বুক টিক্‌টিক্-ধুক্‌ধুক্ করছে—আর এক সেকেণ্ড বাকি—ঘড়িও টিক্ করল, আপনারও পূর্ণচ্ছেদ পড়ল।

আপনি থেমে গেলেন, ঘড়ি থামল না। ধুক্‌ধুকানি শেষ হল, টিক্‌টিকিনি চলল—কারণ আপনার পরেও অন্য জীবনের ধারা আছে—তারও হিসেব রাখতে হবে। সুতরাং বেলা ৮টা ১৩ মিনিট ১৫ সেকেণ্ড গতে আপনি হয়ত গত হলেন, কিন্তু জীবনের ধারা চলল, তাই ঘড়িও চলল—টিক্ টিক্ টিক্ টিক্—টিক্ টিক্—

দাড়ি

The regard of the beaad as an asset or an obstacle to male handsomeness and the change of beard fashions through the ages belong to the most fascinating chapter of cultural history. —Julius E. Lips.

এবারে এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যা কিউরিওর মতন কেবল সকলের কৌতূহল মিটিয়েই ক্ষান্ত হবে না। বিষয়টি হল

পুরুষের দাড়ি। প্রথমেই মহিলারা হয়ত বলবেন যে দাড়ির মাহাত্ম্য-কীর্তন শোনার কোন আগ্রহ নেই তাঁদের। কিন্তু দাড়ির ইতিহাস অতটা সহজ বা সরল নয় এবং দাড়ির সঙ্গে কেবল যে পুরুষেরই সম্পর্ক আছে এমন কথা ভাববার কোন কারণ নেই। ইতিহাসে দেখা যায়, দাড়ির সঙ্গে খোঁপার সম্পর্ক 'ক্রস-কাজিনে'র সম্পর্কের মতন। উপমাটা উপেক্ষণীয় নয়। কেন নয়, একটু ধৈর্য ধরে পড়লেই বুঝতে পারবেন। পুরুষরা আজকাল প্রতিদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে, গালে হাত বুলোতে বুলোতে যেভাবে হন্তদন্ত হয়ে ক্ষৌরকর্ম সমাধা করেন, তাতে মনে হয় দাড়িটা একটা অনাবশ্যক আবর্জনা বিশেষ। সত্যিই তাই। শুধু আবর্জনা নয়, দাড়ি আজ অসভ্যতার প্রতীক। জীবনের কোন ক্ষেত্রে আজ যদি আপনি একগাল দাড়ি নিয়ে নিজের দু-পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন, পারবেন না দাঁড়াতে। চাকরির জন্য ইণ্টারভিউ দিতে গেলে সর্বাগ্রে দাড়ির ক্ষীণতম চিহ্ন পর্যন্ত মুখমণ্ডল থেকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। শৌখিন কোন সমাবেশে বা আসরে যদি দাড়িসহ আপনি উপস্থিত হন তাহলে সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি আপনার উপর নিবদ্ধ হবে। আপনার একান্ত প্রিয়জন যে সেও আপনার দাড়িপ্রীতি ক্ষমা করবে না। পরিবারের আত্মীয় স্বজন মনে করবে, দাড়িটা আপনার বৈরাগ্যপ্রবণতার লক্ষণ, অতএব সাংসারিক জীব হিসেবে আপনি অপদার্থ। দাড়ির সামাজিক মূল্য আজ যে সব দিক থেকেই কমে গেছে, তা জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই উপলব্ধি করা যায়। দাড়ি নিয়ে একপাও চলা যায় না। দাড়ি আজ অপদার্থতার প্রতীক হয়ে উঠেছে বললেও ভুল হয় না। অথচ এমন একসময় ছিল যখন পদার্থতা ও অপদার্থতার সীমানায় ছিল গালভরা চাপদাড়ি। অপদার্থতার গণ্ডি অতিক্রম করে পদার্থতার গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করতে হলে তখন দাড়ির পাসপোর্ট প্রয়োজন হত। মানুষের যা কিছু পদার্থতা সব তখন দাড়ির ভিতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ করত। যত বড় উদ্ধত মাথাই হোক না কেন, রাজা-উজীরের মাথা থেকে গ্রাম্য বালখিল্যের মাথা পর্যন্ত, সকলের মাথা তখন দাড়ির সামনে সসম্ভ্রমে হেঁট হয়ে আসত। কালের যাত্রায় দাড়ির এহেন মহিমা আজ ম্লান হয়ে গেছে।

মানুষের মতন মানুষের মুখের দাড়িরও একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত দাড়ির সেই ইতিহাস যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি বৈচিত্র্যময়। তা নিয়ে স্বচ্ছন্দে একটি পুরাণ রচনা করা যায় এবং তার নাম দেওয়া যায় 'শ্মশ্রু-পুরাণ' বা ঐ জাতীয় কিছু। সভ্যতার প্রথম যুগে আদিম মানুষের দাড়ি সম্বন্ধে বিশেষ কোন চেতনা ছিল বলে মনে হয় না। মাথার কেশের মতন দাড়িও স্বাভাবিকভাবে গজিয়ে উঠত এবং বয়সকালে পেকে গিয়ে ধীরে ধীরে ঝরে পড়ে যেত। অবশ্য মাথার কেশের মতন মুখের দাড়ি স্বভাবতঃই ঝরে পড়ে না বলেই মনে হয়। মাথার গভীর ঘনকেশ শীতের জীর্ণপত্রের মতন ঝরে পড়ে গেছে এবং সেখানে নদীবুকের বালুচরের মতন চক্‌চকে টাক গজিয়ে উঠেছে, এরকম হামেশাই দেখা যায়। এমন কি ভরা যৌবনেও এরকম আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কোন উপায়েই মাথার কেশের এই অবশ্যম্ভাবী পতন প্রতিরোধ করা যায় না। বিশাল রোমান-সাম্রাজ্যের পতনের মতন কেশাকীর্ণ মাথার যখন পতন ঘটে, তখন টাকের দিকে চেয়ে মনে হয় যেন তৃণহীন পরিত্যক্ত কোন বাস্তুভিটায় ঘুঘু চরছে। দাড়ির তা হয় না। ঘনকালো চাপদাড়ি ক্রমে সাদাকালো রং ধরে একেবারে ধব্‌ধবে সাদা হয়ে যায়, কিন্তু তবু তার আকস্মিক পতন হয় না কোনদিন। এটা নিশ্চয় সকলেই লক্ষ্য করেছেন। মাথার মতন মুখে কখন টাক পড়ে না। স্বহস্তে নির্মূল না করলে দাড়ির মূলোৎপাটন করার ক্ষমতা স্বয়ং প্রকৃতিরও নেই। দাড়ির এই বিস্ময়কর দৃঢ়তার জন্যই বোধ হয় মানুষ এককালে দাড়িকে চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রতীক বলে মনে করত এবং সম্মানও করত তাকে। সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, সৌন্দর্যের সঙ্গে মাথার কেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও, সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক কোনকালে ছিল না। দাড়ির ছিল, সৌন্দর্য ও মর্যাদা—দুয়েরই সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। বিশ্ববিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্ ক্রোবার (Kroeber) বলেছেন: দাড়ির সঙ্গে টাকের একটা আশ্চর্য যোগাযোগ আছে দেখা যায়। দাড়ি যাদের থাকে, তাদেরই টাক পড়ে মাথায়। পুরুষের মাথায় তাই টাক পড়ে বেশি এবং মেয়েদের মাথায় পড়ে না।

এটা বিজ্ঞানের কথা। কথাটা হল, মাথা ও মুখের উর্বরাশক্তি সমান নয়। পুরুষদের মুখের ফলন ও ধারণশক্তি খুব বেশি, দৃঢ়মূল দাড়ি তার প্রমাণ। মাথার ফলনশক্তি থাকলেও ধারণশক্তি নেই—ছিন্নমূল টাক তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মেয়েদের মসৃণ মুখের জন্য মাথার ফলন ও ধারণ-শক্তি দুই প্রবল। দীর্ঘায়ু কেশ ও কবরী তার সাক্ষী। মাথার ধারণ-শক্তির এই আধিক্যের জন্যই বোধ হয় মেয়েদের ধৈর্য ও স্মৃতিশক্তি পুরুষের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। দাড়ির সঙ্গে খোঁপার সম্পর্ক কেন 'ক্রসকাজিনে'র সম্পর্ক বলেছিলাম, এতক্ষণে নিশ্চয় তা বুঝতে পেরেছেন।

দাড়ি সম্বন্ধে প্রথমে যাঁর কথা ইংরেজীতে উদ্ধৃত করেছি তাঁর নিজের দাড়ি না থাকলেও, তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত জার্মান নৃবিজ্ঞানী, হেঁজিপেঁজি লোক নন। জুলিয়াস লিপ্‌সের মতে দাড়ি নাকি মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটা অত্যন্ত রোমাঞ্চকর অধ্যায় জুড়ে রয়েছে। থাকাই স্বাভাবিক, কারণ মানুষ দাড়ি মুখে নিয়ে না-জন্মালেও, মানুষের সভ্যতা দাড়ি নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছে। 'সেভ্‌ন ও ক্লক্' বা 'গিলেট', কোন ব্লেড বা ক্ষুরই তখন ছিল না। হাজার হাজার বছর পর্যন্ত মানুষ তো কোন ধাতুরই খোঁজ পায়নি। যখন পেল তখন প্রথমে তামা, তারপর তামার সঙ্গে রাং মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করেই অনেককাল কাটল। তামার বা ব্রোঞ্জের ব্লেড বা ক্ষুর দিয়ে নিশ্চয়ই দাড়ি কামানো যায় না, বিশেষ করে সেকালের দাড়ি। সেকালের দাড়ি এইজন্য বলছি যে, মানুষের চেহারা তখন এ-যুগের নাড়ুগোপালের মতন গোলগাল ছিল না, যেমন চোয়াড়ে চেহারা ছিল, তেমনি দাড়িও ছিল ঘন কণ্টকারণ্যের মতন। তামা বা ব্রোঞ্জের কর্ম নয় সেই দাড়ি কেটে সাফ করা। অবশ্য নিগ্রো ও মোঙ্গলদের দাড়ি এমনিতেই খুব অল্প, ইচ্ছা করলে একটা-দুটো করে উপড়ে ফেলতেও পারা যায়। কিন্তু ফেলবার প্রয়োজন কি? দাড়ি কামিয়ে ফেলবার কোন প্রয়োজনই মানুষ তখন অনুভব করত না, অবশ্য কামাবার যন্ত্রপাতি বা উপায়ও ছিল না। লোহা আবিষ্কৃত হবার পরেও মানুষ প্রথম দাড়ি কামাবার ক্ষুর তৈরি করেনি, লাঙলের ফলা ও কাস্তে

তৈরি করেছিল। দাড়ি কামাবার ক্ষুর আগে, না কাস্তে আগে, তা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু কোন লাভ নেই তাতে। কারণ দাড়ি কামানো মুলতুবী রাখা যায়, কিন্তু ক্ষুন্নিবৃত্তি মুলতুবী রাখা যায় না। আজকাল হয়ত আমরা কারও সঙ্গে দেখা করবার আগে কিছু না খেয়েও চার আনা দিয়ে 'শেভ' করি, কিন্তু তখন সে প্রয়োজন মানুষের ছিল না। পুরুষের সৌন্দর্য তখন শ্মশ্রু-সমন্বিত ছিল, শ্মশ্রুবর্জিত ছিল না। প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ দাড়ির প্রতি সকলেরই তখন গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

অনেকে শুনলে হয়ত অবাক হবেন, কিন্তু তাহলেও দাড়ির একটা সুদীর্ঘ নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস আছে এবং থাকা আদৌ বিচিত্র নয়। মানুষ যখন থেকে এই পৃথিবীতে এসেছে তখন থেকেই তার দাড়ি গজিয়েছে, সুতরাং মানুষের মতন দাড়ির ইতিহাসেরও একটা ধারাবাহিকতা থাকা আশ্চর্য নয়। বর্তমানে নাকি পৃথিবীর সমস্ত দেড়োদের মধ্যে জাপানের আদিবাসী আইনু ও অস্ট্রেলিয়ার অসভ্যরা সর্বপ্রধান। এরকম দাড়ি নাকি পৃথিবীর আর কোন জাতের মানুষের মুখে আজকাল আর গজাতে দেখা যায় না। তারপরেই মধ্য ইউরোপের আলপাইন ও আর্মেনয়েড জাতের দাড়ি উল্লেখযোগ্য। শোনা যায়, আইনু ও আদিম অস্ট্রেলিয়ানরা নাকি এদেরই প্রাচীন পূর্বপুরুষ, অনেক যুগ আগেই দ্বীপান্তরিত। নিগ্রো ও মোঙ্গলদের দাড়ির স্বল্পতার কথা আগে বলেছি এবং অন্যান্য যাদের সঙ্গে এদের রক্তের মিশ্রণ হয়েছে তাদেরই দাড়ির ভাগ একটু কম। অবশ্য যাঁরা তূবরক (মাকুন্দ) বা যাঁদের গোঁফদাড়ি অল্প, তাঁরা নৃবিজ্ঞানীদের এই কথা শুনে বিচলিত হবেন না। কারণ অনেক সময় থাইরয়েড গ্রন্থির স্বাভাবিক ক্ষরণাভাবের জন্যেও কেশাল্পতা ঘটে এবং দাড়ি ভালরকম না-গজাতেও পারে। সুতরাং দাড়ি থাক আর না থাক, don't mind, go ahead!

দাড়ি নিয়ে যাঁরা রীতিমত ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করেছেন তাঁরা বলেন যে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে আজ পর্যন্ত যত রকমের দাড়ি দেখা গেছে সেগুলি মোটামুটিভাবে 'পনেরটি স্ট্যাণ্ডার্ড টাইপে' ভাগ করা যায়। সভ্যযুগেই যদি এই অবস্থা হয় দাড়ির, তাহলে অসভ্য যুগে যখন

অনেক সময় দাড়ি রাখা ছাড়া মানুষের উপায় ছিল না, তখন যে দাড়ির কি অপূর্ব বৈচিত্র্য ও শৈল্পিক বিলাসিতা ছিল তা কল্পনাই করা যায় না। পুরুষরা হয়ত তখন দাড়ির বিনুনি করত, ছোট ছোট বিনুনি টেনে চওড়া করে বুনত, তারই ফাঁকে ফাঁকে হয়ত লাল নীল ফুল গুঁজে দিত। নৃত্যোৎসবেরসময় একদিকে পুরুষদের বিনুনি-করা ফুল-গোঁজা দোদুল্যমান দাড়ি, অন্যদিকে মেয়েদের পুষ্পশোভিত দীর্ঘ বিনুনির দোলন—সৌন্দর্যের এক অনুপম প্রতিযোগিতা, শুধু নৃত্যের নয়, দাড়ি বনাম খোঁপা-বিনুনির। কারও দাড়ি গালভরা, কারও দাড়ি কর্কস্ক্রুর মতন পাকানো, কারও বিনুনি করে ঝুলানো, কারও বা গালের উপর দিয়ে কান পর্যন্ত টানা, কারও তরঙ্গায়িত, কারও ঋজু মসৃণ চক্‌চকে, কারও বা রেশমী সুতোর মতন ফিনফিনে, হাওয়ায় ঊর্ধ্বমুখী, কারও খোঁচা-খোঁচা ফণিমনসার কাঁটার মতন আক্রমণোদ্যত।

জনৈক শ্মশ্রুবিশারদের মতে ঐতিহাসিক যুগের প্রাচীনতম দাড়ির নিদর্শন নাকি ক্রীটিয়ান-মিসেনীয়ান যুগের শেষদিকে পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ দাড়ির যা বর্ণনা পাওয়া যায় তা এই রকম ঃ ক্ষুরিত (কামানো) মুখমণ্ডলের চারিদিকে অর্ধবৃত্তাকার শ্মশ্রুর একটি কৃশরেখা, ঠিক দ্বিতীয়ার চাঁদের মতন। মুখমণ্ডলের প্রান্ত বেষ্টন করে শীর্ণরেখার মতন বিরাজমান, দেখলে মনে হয় যেন—'আভাতি বেলা লবণাম্বু-রাশের্ধারানিবর্ধেব কলঙ্করেখা।' একেই ঐতিহাসিকরা 'ক্লাসিকাল দাড়ি' বলেন। ইংলণ্ডের রাজা এডগার দশম শতাব্দীতেও এই দাড়িতে হাত বুলোতেন দেখা যায়। সোমালি উপকূলের আরবদের মধ্যে, আমাদের সিংহলীদের মধ্যে এবং ওসানিয়া দ্বীপপুঞ্জের প্রায় একাদশ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এই দ্বিতীয়ার চাঁদের মতন ক্লাসিকাল দাড়ির আজও চলন আছে। প্রায় ৫০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি নাকি ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে এই ক্লাসিকাল দাড়ির পরিবর্তে গালভরা দাড়ির প্রচলন হয়। একশ বছরের মধ্যে পূর্ণিমার চাঁদের মতন দাড়ি 'ফ্যাশান' হয়ে ওঠে।

আমাদের ভারতবর্ষের দাড়ির ইতিহাস একটু জটিল, তবু যেটুকু জট তার ছাড়ানো গেছে সেইটুকুই বলছি। হড়প্পা-মহেঞ্জদড়োয় যেসব

পোড়ামাটির পুরুষ-মূর্তি পাওয়া গেছে তার মধ্যে অনেকের মুখেই দাড়ির চিহ্ন দেখা যায়! গোঁফ কামানো অথচ ছোট্ট দাড়ি আছে, শক্ত ঊর্ধ্বমুখী দাড়ি, পাকানো দাড়ি—এসব মূর্তি সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গেছে, এমন কি, এমন মূর্তিও পাওয়া গেছে যার সমস্ত মুখটাই মনে হয় কামানো কিন্তু চিবুকে একগুচ্ছ দাড়ি। সুতরাং 'নুর' বা চিবুকদাড়ি মুসলমানদের আমদানি নয় যে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। মার্শাল ও ম্যাকে সাহেব বলেন যে সুমেরুবাসীদের মতন সুদীর্ঘ দাড়ি না থাকলেও, তখনকার কালে ভারতীয়দের নাতিদীর্ঘ দাড়ি ছিল। কারণ তাঁদের মতে—'Full beards were not desirable in the more humid climate of India'—ভারতের স্যাঁতসেঁতে আর্দ্র আবহাওয়ায় তৃণগুল্মের মতন দাড়ি বেশি গজালেও, দাড়ি রাখাটা হয়ত ঠিক নয়। যাই হোক, ভারতবর্ষে দেড়োদের বেশ কয়েকবার অভিযান হয়েছে তাতে কোন ভুল নেই। আগেই বলেছি শ্বেতজাতীয়দের মধ্যে দাড়ি খুব বেশি, তার মধ্যে আলপাইন আর্মেনয়েড মেডিটারেনিয়ান—এদের দাড়ি আরও বেশি। সিন্ধু সভ্যতার কাল থেকে আর্যযুগ পর্যন্ত এদের অনেকবার অভিযান হয়েছে এবং এই অভিযানগুলোকে আমরা সংক্ষেপে দাড়ির বিচিত্র অভিযান বলতে পারি। আর্যযুগ থেকে তাই দাড়ি হু-হু করে গজিয়ে উঠেছে দেখা যায় এবং আমাদের কালচারের সঙ্গে দাড়িও জড়িয়ে পাকিয়ে গেছে। আজও যে আমাদের দেশে বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্যের প্রতীক দাড়ি তা বোধ হয় ঐ আর্য কালচারেরই ঐতিহ্য। ঐতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষে দাড়ির অভিযান হল ইসলামের অভিযান, কিন্তু ইসলামিক দাড়ি হয় 'দ্বিতীয়ার চাঁদ', না হয় চিবুকগুচ্ছ। আলপাইন-আর্মেনয়েড-নর্ডিক-মিশ্রিত আর্যদের বা হিন্দুদের গালভরা ঘন আলুলায়িত দাড়ি এবং ইসলামের অর্ধবৃত্তাকার বা চিবুকদাড়ি, এই দুইয়ে মিলে কোন 'কালচারাল সিনথেসিস' হয়েছিল কি-না জানি না, তবে হিন্দু বৈষ্ণব ও মুসলমান পীরফকিরদের মধ্যে অনেকের ঘন চাপদাড়ি দেখে মনে হয়, কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছিল। সর্বশেষ অভিযান ডাচ, পর্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজদের এবং এরা সকলেই শ্বেত-জাতীয় দেড়োদেরই বংশধর,

সুতরাং দাড়ির মহাসমুদ্রে আবার আমরা মিলিত হলাম। তার প্রমাণ মনে-প্রাণে, শিক্ষা-দীক্ষায় ইংরেজ হয়েও বাঙালী মধুসূদনের দাড়ি, জাতীয়তাবাদের দীক্ষাগুরু রাজনারায়ণ বসু ও সুরেন বাঁড়ুজ্জের দাড়ি এবং এই নবযুগের কালচারের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথের দাড়ি। ইংরেজদের মধ্যে তার সর্বশেষ মূর্তিমান প্রতীক ছিলেন জর্জ বার্নার্ড শ।

দাড়ির যুগ আজ নিশ্চিত অস্তাচলে। আধুনিক মানুষের দাড়ির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল দাড়ি কদর্য কুৎসিত, দাড়ি অসভ্যতার নিদর্শন। জানি না, কোনদিন কোন নারী পুরুষের দাড়ি সম্বন্ধে এমন উক্তি করেছেন কিনা। তবে পুরুষের দাড়ি যে কোনকালেই নারীর প্রেমের অন্তরায় ছিল না, ইতিহাসই তার সাক্ষী। এখনও যেসব জাতের দাড়ি আছে তাদের মধ্যে পুরুষ-নারীর প্রেমে ভাঁটা পড়েনি। পুরুষের উদ্দাম কেশের দিকে চেয়ে যে-নারী স্বপ্নে বিভোর হতে পারে, সে-নারী স্বচ্ছন্দে দাড়ির দিকে চেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হতে পারে। বড় বড় প্রতিভাবান ও মনীষী পুরুষদের অনেকেরই দাড়ি ছিল, কিন্তু তাঁদের কোন প্রেমিকা ছিল না এমন কথা শোনা যায়নি। সুতরাং পুরুষের দাড়ি নারীর কাছে কুদর্শন এ-অভিযোগ যুক্তিহীন। তবু আমরা যেন অনেকটা অকারণেই একটা শ্মশ্রুগুম্ফহীন সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এবং তাতে যে আমাদের ব্যক্তিগত প্রৈমিক বা সামাজিক জীবন উন্নত হচ্ছে তারও কোন প্রমাণ নেই। সভ্যতার প্রথম যুগে পুরুষেরও নারীর মতন দীর্ঘ কেশ ছিল, তখন নারী-পুরুষের মর্যাদাও সমান ছিল প্রায়! দ্বিতীয় যুগে পুরুষেরা কেশ সঙ্কুচিত করল, দাড়ি রইল, কিন্তু কেশ-কর্তন করে পুরুষের আধিপত্য বাড়ল। তৃতীয় যুগে নারীরা যখন পুরুষের উপর আধিপত্য দাবি করল তখন তারাও পুরুষের মতন কেশ সঙ্কুচিত করল। চতুর্থ বা বর্তমান যুগে পুরুষরা নারীর সমকক্ষ হতে চাইছে বলে কি গোঁফ-দাড়ি একেবারে চেঁছে কামিয়ে ফেলা হয়েছে? ইতিহাসের গতি কতকটা এই নির্দেশই দিচ্ছে না কি? অবশ্য মধ্যে মধ্যে বাইরের সামাজিক কারণেও গোঁফদাড়ি লোপ পেয়ে যায়। মুসলমান আমলে বনেদি হিন্দুদের দাড়ি রাখাটাই হয়ত আভিজাত্য ছিল। আবার হালের পার্টিশানের আমলে

ভারতবর্ষে দাড়ি রাখাটাই (শিখরা ছাড়া) যেন অনেকটা বিপজ্জনক হয়েছে। কলকাতার ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আমি অন্ততঃ প্রায় শ পাঁচেক শ্রদ্ধেয় হিন্দুকে দাড়ি কামিয়ে ফেলতে দেখেছি (যাঁরা বরাবর দাড়ি রাখতেন)। তিতুমীরের বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর, তার দলের লোকরা (মুসলমান) বৃটিশের অত্যাচারের ভয়ে এমনভাবে দাড়ি কামাতে আরম্ভ করেছিল যে হিন্দুনাপিতরা তখন দাড়ি কামানোর রেট্ প্রায় আজকালকার ফার্স্টক্লাস সেলুনের মতন করেছিলেন। এগুলো হল নিছক ঐতিহাসিক অ্যাকসিডেন্ট। এইসব আকস্মিক দুর্ঘটনা বাদ দিলেও দেখা যায় যে, বর্তমানে গোঁফদাড়ির অবশ্যম্ভাবী গতি বিলুপ্তির দিকে। কিন্তু Why ?

খোঁপা

পুরুষের দাড়ির চেয়ে মেয়েদের খোঁপার ইতিহাস আরও অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। বৈচিত্র্য ও বাহারের দিক থেকে দাড়ি যুগে যুগে খোঁপার কাছে হার মেনেছে এবং দাড়ি-বনাম-খোঁপার প্রতিযোগিতায় মেয়েরাই জয়ী হয়েছে বেশি। দাড়ির বিরুদ্ধে মেয়েরা কোনদিন প্রকাশ্য বিদ্রোহ করেছে কিনা জানা যায় না, তবে নানারকমের উদ্ভট ও অদ্ভুত খোঁপার বিরুদ্ধে পুরুষদের বিদ্রোহের কথা ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়।

দাড়ি-বনাম-খোঁপার প্রতিযোগিতার কথায় কেউ যেন মনে করবেন না যে, আমি পুরুষ-বনাম-নারীর প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলছি। অবশ্য আধুনিক সভ্য সমাজে যদি তার আভাস মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে অসভ্য মানব-সমাজে নিশ্চয়ই তার অস্তিত্বের কথা কল্পনা করা

যেতে পারে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে আধুনিক শ্মশ্রুগুম্ফহীন পুরুষের যে সুবিধা আছে, প্রাচীনকালের দেড়োদের তা ছিল না। কিন্তু সে যাই হোক, দাড়ি-বনাম-খোঁপার প্রতিযোগিতা বলতে আমি আধুনিক অর্থে বিউটি প্রতিযোগিতার কথা বলছি। দাড়ির এরকম কোন প্রতি-যোগিতা প্রাচীনকালে কখনও হয়েছে কিনা ঐতিহাসিকরা আজও জানেন না, তবে না-হওয়া আশ্চর্য নয়। অহম্‌সর্বস্ব পুরুষরা নিজেদের দাড়ির স্বকীয়তায় ও স্বাতন্ত্র্যে বিভোর হয়ে নির্জনে উদাসীন মনে বসে বসে তাতে হাত বুলিয়েছে। কিন্তু অরিজিনালিটি যাচাই করবার জন্যে তাকে সাধারণের প্রদর্শনীতে উপস্থিত করবার কোন পরিকল্পনাই তারা করেনি। মেয়েরা যেদিন থেকে পুরুষদের অধীন হয়েছে, সেদিন থেকে খোঁপার উপর তাদের কর্তৃত্বও খর্ব হয়েছে। মেয়েদের অসাধারণ উদ্ভাবনীশক্তির জন্যেই যুগে যুগে খোঁপার বৈচিত্র্য বেড়েছে, কিন্তু তা বাড়লেও যখনই যে-ধরনের খোঁপা পুরুষের চোখে বিসদৃশ ও উদ্ভট মনে হয়েছে, তখনই তার বিরুদ্ধে পুরুষরা দলবদ্ধ আন্দোলন করে তাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। খোঁপার ইতিহাসের এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখা দরকার। দাড়ির কাছে খোঁপা বহু যুগ ধরে পরাধীন, এইটাই খোঁপার জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক ট্র্যাজিডি।

খোঁপা সম্বন্ধে আরও একটা কথা জানা দরকার। আমরা জানি খোঁপার মালিক মেয়েরাই, পুরুষরা নয়। কিন্তু পুরষরাও অনেককাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ আলুলায়িত কেশের মালিক ছিল এবং সে-কেশ যে বেশ সযত্নে পরিপাটি করে তারা নানা ছাঁদে বাঁধত, তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। একটা আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে আমাদের দেশে মহেঞ্জদড়োতে যে সব ছোট ছোট পুরুষ ও নারীর মূর্তি পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, পুরুষদের কেশবিন্যাসের বৈচিত্র্য মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি। দেবীদের চেয়ে দেবতাদের চুলের বাহার ও বিন্যাস এত বিচিত্র যে, মনে হয় যেন এক-কালে কবরী-কালচার পুরুষরাও পূর্ণোদ্যমে মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে করেছে। তারপর যখন যুদ্ধবিগ্রহের দায়িত্ব বেড়েছে এবং নিজেদের প্রাধান্যের কথা খুব বেশি করে মনে হয়েছে, তখন পুরুষরা কেশকর্তন করে

দাড়ির দিকে মনোযোগ দিয়েছে এবং মেয়েরা হয়েছে খোঁপার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাজ্ঞী। ঠিক কতকাল আগে, কোন্ যুগসন্ধিক্ষণে এই কবরী-কালচার ও শ্মশ্রুকালচার স্ত্রী-পুরুষ ভেদে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে তা অবশ্য বলা যায় না, তবে যাযাবর যুগে কখনই নয়, স্থায়ী স্থিতিশীল যুগে হয়েছে নিশ্চয়।

খোঁপার সঙ্গে ভৌগোলিক পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার একটা সম্পর্ক আছে যা উপেক্ষা করা যায় না। মানুষ যখন শিকারীর যাযাবর জীবন যাপন করত, মেয়েরা যখন বনেজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ফলমূল সংগ্রহ করত, তখন নিশ্চয়ই এত নির্লিপ্ত অবসর তাদের ছিল না যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে কেশবিন্যাস করা চলে। সেইজন্য যাযাবর অসভ্য অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে কেশবিন্যাসের বৈচিত্র্য আদৌ দেখা যায় না। আমাদের দেশেও এই স্তরের আদিম জাতির মেয়েদের (বিড়হোড়, ভেদ্দ, চেঞ্চু ইত্যাদি) মধ্যে খোঁপার বাহার উল্লেখযোগ্য নয়। পরিপাটি করে খোঁপা বাঁধবার অফুরন্ত সময় কোথায় অরণ্যচারী যাযাবরদের ? কিন্তু পশ্চিম-আফ্রিকার কৃষিজীবীদের মধ্যে খোঁপার এমন অসাধারণ বৈচিত্র্য ও বিলাসিতা দেখা যায় যা বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও সচরাচর দেখা যায় না। একজন বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী আফ্রিকার মেয়েদের এই খোঁপার বাহার সম্বন্ধে বলেছেন ঃ 'Compared with their coiffures, the hair fashions at the court of Marie Antoinette can be called drab and unimaginative'— এদের কেশবৈচিত্র্যের কাছে মেরী অ্যাণ্টইনেটের কোর্টের কেশবিলাসিতা ম্লান হয়ে যায়। আমাদের দেশের সাঁওতাল ওরাঁও মুণ্ডা হো মেয়েদের কেশের পরিপাটি দেখলে মনে হয় যে অনেক রাজাবাদ্শাহের অন্তঃপুরের অসূর্যম্পশ্যাদের কেশবিন্যাস তার কাছে হার মেনে যায়।

কৃষিযুগে যখন অবসর পাওয়া গেল এবং মেয়েরাও অনেকটা ঘরে বন্দী হল, তখন থেকে অপূর্ব আলস্য-বিলাসে বিচিত্র কেশবিন্যাসের সূচনা হল বলা চলে। তখন থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত খোঁপার যে ধারাবাহিক ইতিহাস তা একদিক থেকে যেমন রোমাণ্টিক, অন্যদিক থেকে তেমনি মর্মান্তিক। নানা ছাঁদের ও ছন্দের খোঁপার অতুল্য কলাবৈচিত্র্যের ইতিহাস বাস্তবিকই

রোমান্টিক, কিন্তু খোঁপার এই বৈচিত্র্যবৃদ্ধিই মেয়েদের পরাধীনতা-বৃদ্ধির পরিচায়ক বলেই এ-ইতিহাস আবার ট্র্যাজিক। প্রথমে কৃষিযুগের খোঁপার অফুরন্ত বিন্যাসবৈচিত্র্যের একটা স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হয়েছিল, কতকটা প্রাকৃতিক ফুলফোটার মতন। কিন্তু পরবর্তীকালে মেয়েদের পরাধীনতার শৃঙ্খল যতই কঠোর হল, পুরুষের ভোগবিলাসের সামগ্রীতে পরিণত হয়ে মেয়েরা যখন ঘরে বন্দী হল কয়েদীর মতন, তখন মধ্যযুগের অন্তঃপুরে মেয়েরা যা জীবনভোর চর্চা করল তা হল কেশচর্চা। কবরী-কালচারের স্বর্ণযুগ তাই মেয়েদের জীবনে ঘোর অমানিশার যুগ। তাই এ যুগের মেয়েদের ময়ূরপুচ্ছ ছাঁদের খোঁপা নেই বলে আর যিনিই দুঃখ করুন আমার কোন খেদ নেই, কারণ এ যুগের মেয়েদের মুক্তকেশ তাদের মুক্তজীবনেরই প্রতীক।

তবে মধ্যে মধ্যে মনে হয় যে, যদি শিল্পকলার নমুনা হিসেবেও কিছু 'খোঁপা' মিউজিয়মে রাখা হত! সেইসব বিচিত্র খোঁপা, অনন্ত অবসরের মধ্যে বিনিয়ে বিনিয়ে সযত্নে রচনা করা, রঙবেরঙের ফুল, লতাপাতা, কড়ি, কাচ ও মণিমুক্তাখচিত ময়ূর ও পারাবতপুচ্ছের মতন বিস্ফারিত, পর্বত-চূড়া ও মন্দিরের শিখরের মতন স্তরবিন্যস্ত, মেঘের মতন স্তবকে স্তবকে সাজানো, আঙুরের মতন গুচ্ছে গুচ্ছে দোলানো, কদলীগুচ্ছের মতন ঝোলানো, বা ঈষৎ হেলানো। কোথায় আজ সেই সব খোঁপা, কবিরা যার বর্ণনা করছেন—

> ধনী, কানড়া ছাঁদে বাঁধে কবরী,
> বন মালতী মালা তাহার উপরি।
> দলিতাঞ্জন গুঞ্জ কলা কবরী,
> ক্ষণ উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী—

কেউ বলেছেন—

> বিবিধ কুসুমের বাঁধিল কবরী
> শিথিল না ভেল ডোরী,
> কস্তুরী চন্দন, অঙ্গের ভূষণ
> দেখিতে অধিক জোরি।

সেই সব খোঁপা! তার কত না ছাঁদ, কত না ছন্দ! কত না বিন্যাস পরিপাটি, কত না বন্ধন-বৈচিত্র্য! লোটন ছাঁদ, কানড়ি-ছাঁদ, তবল্লকী-ছাঁদ, কত না তার নামের বাহার! রাগরাগিণী ও মৃদঙ্গের বোলের মতন ছন্দোবন্ধ মিষ্টি নাম সব ছাঁদের। শুধু আমাদের দেশের মেয়েদের খোঁপা নয়, অন্য দেশেরও। মেমসাহেবদের খোঁপার কথা ইংরেজ কবি ড্রাইডেনের মুখে শুনুন—

With curls on curls they build
her head before,
And mount it with a formidable
tow'r ;
A giantess she seems ; but look
behind
And then she dwindles to the
pigmy kind.

কতকটা আমাদের সেকালের পিসিমাদের মাথার উপর কুণ্ডলী পাকানো ঝুঁটির মতন কেশবিন্যাসের কথা কবি ড্রাইডেন বলেছেন। মাথার উপর যেন ছোট-খাটো মিশরীয় পিরামিড বসানো, অথবা বর্মী প্যাগোডা, দেখলে মনে হয় মেয়েরা সব পুরুষদের চেয়ে অনেক লম্বা—'a giantess she seems'—এবং ভয় হবারও কথা। ইংরেজ মেয়েদের এই কেশবিন্যাসের কথা মনে করেই স্বনামধন্য অ্যাডিসন বলেছেন ঃ

'The women were of such an enormous stature that we appeared as grasshoppers before them. At present the whole sex is in a manner dwarfed, and shrunk into a race of beauties that seems almost another species.'

অ্যাডিসন লিখেছেন যে সাত ফুট লম্বা এই মেয়েদের দেখলে তাঁর রীতিমত ভয় করত এবং পুরুষ হিসেবে তাদের সামনে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতে অপমানিত বোধ করতেন। এই পিরামিড-খোঁপা বর্জন করে মেয়েরা যে তাদের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যে খুশি হয়েছে, তাতে তিনি

নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এর জন্যে তিনি জনৈক পাদ্রীসাহেবের কাছে ঋণী, কারণ ইউরোপে নাকি এই পাদ্রীর আন্দোলন ও আবেদন-নিবেদনের ফলেই মেয়েরা ঐ শ্রেণীর চূড়াকার খোঁপা বর্জন করে। অ্যাডিসন সাহেব মাথার ও কেশের স্বাভাবিক সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষপাতী, তার উপর কোন কৃত্রিম কেশচূড়া গঠনের তিনি বিরুদ্ধে—'I am not for adding to the beautiful edifices of nature, nor for raising any whimsical superstructure upon her plans.' আমি অবশ্য এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করি না, স্বাভাবিক সৌন্দর্য বজায় রেখে কিছুটা কেশবিন্যাস ও কারিগরির প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। তবে মাথার বেণী যদি পায়ের শৃঙ্খল হয়, তাহলে ঘরে বসে বসে পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্যে সে খোঁপা কোন ছাঁদে বাঁধারই দরকার নেই মেয়েদের। কিন্তু স্বাধীন কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে যদি একেবারে বৈরাগীর মতন আলুথালু অগোছালো কেশ একটু বিন্যস্ত করা যায়, নিছক কলাচর্চা হিসেবেও, তাতে কোন ক্ষতি আছে কি ?

তবে সেই সব লোটন-খোঁপা, কানড়ি-খোঁপা, তবল্লকী-খোঁপা, পারাবত-ময়ূরপুচ্ছ-খোঁপা, শিখর-খোঁপা, চূড়াকার-খোঁপা—আর মেয়েদের মাথায় দেখা যাবে না কোনদিন। যে সব প্রতিভাবান মেয়েরা সেগুলি আবিষ্কার করেছিল তাদেরও নাম আর জানা যাবে না। অ্যাডিসন তাই খোঁপাবিরোধী হয়েও দুঃখ করে বলেছেন ঃ

'Those female architects, who raise such wonderful structures out of ribands, lace and wire, have not been recorded for their respective inventions.'

সত্যিই যারা ফিতে কাঁটা লতাপাতা ফুল কড়ি কাচ মণিমুক্ত দিয়ে এমন সব বিচিত্র কবরী রচনা করতে পারত, স্থপতি ও ভাস্করদের তুলনায় তাদের শিল্পদক্ষতা কম কিসে ? প্রত্নবিজ্ঞানীরা মাটি খুঁড়ে হয়ত মেয়েদের কিছু মাথা পেতে পারেন, এমনকি মধ্যযুগেরও, কিন্তু মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও সেইসব খোঁপা আর পাওয়া যাবে না। যদি কিছু ভাল ভাল খোঁপা মধ্যযুগের রাজাবাদ্‌শারা কেটেকুটে সযত্নে ঘর সাজাবার

জন্মে তুলে রাখতেন, অন্যান্য ঢাল-তলোয়ার-পোশাক-পরিচ্ছদের মতন, তাহলে আজ আমরা মিউজিয়মে তার প্রত্যক্ষ নমুনা দেখতে পেতাম, এবং মেয়েরা তাই দেখে সেরকম খোঁপা বাঁধবার চেষ্টা না করলেও, অনেক কিছু রচনা করতে পারতেন। মাটির হাঁড়িকুঁড়ি পাত্রের মতন খোঁপাও ইতিহাসে মেয়েদের সৃজনী প্রতিভার একটা অপূর্ব কীর্তি। মাটির পাত্রের টুক্‌রো অনেক খুঁড়ে পাওয়া গেছে, কিন্তু খোঁপার কীর্তিচিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত।

নাক

নাক ওঠে নাক ওঠে—ধানের শিষ
নাক ওঠে নাক ওঠে—প্রদীপের শিষ,
নাক ওঠে নাক ওঠে—পানের বোঁট,
যাদুর নাকটা শীগ্‌গির ওঠ!

আমাদের দেশের মায়েদের মুখে মুখে রচিত খুকুমণির ছড়াতে 'নাকে'র এই উল্লেখটুকুর তাৎপর্য অনেকেই ভেবে দেখেননি। মায়েরা জানেন তাঁদের সন্তানদের নাকের মূল্য কতখানি, তাই শিশুদের নাকের ডগায় হাত বুলোতে বুলোতে তাঁরা কামনা করেন, ধানের শিষের মতন, প্রদীপের শিষের মতন, পানের বোঁটার মতন নাকটিও উন্নত হয়ে উঠুক। একমাত্র মায়েদেরই দেখেছি শিশুদের গায়ের রং অথবা নাকের গড়নের কথা উল্লেখ করে আদর করতে। 'খেঁদা নাক কই', 'থ্যাব্‌ড়া নাকী কই', 'বোঁচা নাক কই', 'কালো মানিক কই', 'সোনা মাণিক কই'—এইসব হল মেয়েদের

আদরের সম্বোধন। সুতরাং মনে হয়, নাকের মূল্য মেয়েরাই বোঝেন, বিশেষ করে মায়েরা। পুরুষরা নাক সম্বন্ধে সাধারণত উদাসীন, যদিও 'উন্নাসিকে'র অভাব নেই পুরুষদের মধ্যে। কতটা নির্মমভাবে উদাসীন সেটা শুধু 'বক্সার'দের কথা একবার চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়। সুস্থ নাকটাকে অকারণে ঘুসি খাইয়ে খাইয়ে বিকৃত করে ফেলা, আর যাই হোক সুস্থ মনের লক্ষণ নয়। নাকটা অহেতুক বিসর্জন দিয়ে, সার্থকতা কি ওরকম খ্যাতনামা বক্সার হবার বুঝিনে। বক্সিং না জানলেও আমরা যে অন্য কেউ ঘুসি মারলে পিছিয়ে আসি তা তো নয়! কেউ ঘুসি মারলে আমরাও ঘুসি মেরে থাকি। তবে সব সময় নিজের নাকটা বাঁচিয়ে। আমার মনে হয়, সকলেরই এই নিয়ম পালন করা উচিত। অন্তত ব্যক্তিগতভাবে আমি সব সময় তাই করে থাকি, যদিও আমার নাকটা তেমন মূল্যবান নয়, একটু থ্যাবড়া গোছের, প্রোটোঅস্ট্রালয়েডদের মতন, অথবা ঝোলের বড়ির মতনও বলতে পারেন। আধুনিক যুগে মারামারির টেণ্ডেন্সি হচ্ছে বক্সিং-এর দিকে, লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই। একটা কিছু ঘটলেই 'কাম্ অন' বলে ঘুসি পাকিয়ে বুনো শুয়োরের মতন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করাটাই হল লড়িয়েদের স্বভাব। সুতরাং ঘুসোঘুসিই যখন মারামারির মডার্ন টেকনিক, তখন যখনই হোক মারামারির সম্ভাবনা দেখলেই প্রত্যেকের আগে নাক বাঁচানোর চেষ্টা করা উচিত, বিশেষ করে উন্নত দীর্ঘ নর্ডিক নাকওয়ালা যাঁরা তাঁদের তো অবশ্যই করা উচিত। যাই হোক, এটা আলোচ্য নয়, যা বলছিলাম।

পুরুষরা যে 'নাক' সম্বন্ধে বাস্তবিকই ক্যালাস্ তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কাব্যে বা সাহিত্যে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যেরকম বর্ণনা পাওয়া যায়, নাকের সেরকম পাওয়া যায় না। কবিরা ও সাহিত্যিকরা যে নাকের উপর রীতিমত বীতশ্রদ্ধ তা বেশ বোঝা যায়। রূপলাবণ্য বর্ণনায় কালিদাসের সমকক্ষ আর কেউ আছেন কিনা জানি না, কিন্তু সেই কালিদাসও নাককে অবহেলা করে গেছেন। কালিদাস আড়চোখে দুগ্ধদোহনরতা গয়লানীর 'সমুদ্বহাৎচারু নিতম্ব রম্যম্, আমন্দ্রমন্থ ধ্বনিদত্ততালম্' পর্যন্ত লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু নাকটির কথা কিছুই বল্লেননি।

পরবর্তীকালের বৈষ্ণব কবিরাও 'পীন পয়োধর' নিয়ে অত্যন্ত মাতামাতি করেছেন, কিন্তু নাক সম্বন্ধে একেবারে নীরব। এমনকি রসিক ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী' ও 'নায়িকাপ্রকরণ' পর্যন্ত তন্নতন্ন করে হাঁতড়েও নাকের চিহ্ন কোথাও পেলাম না। রবীন্দ্রনাথের মতন তীক্ষ্ণদৃষ্টি মহাকবির কাব্যেও নাক চিরদিন উপেক্ষিত রয়ে গেছে। আধুনিক কাব্য তো একেবারে নাকচোখহীন, কেবল মস্তিষ্ক ও যৌনগ্রন্থিপ্রধান, সুতরাং তার কথা বাদ দেওয়াই ভাল। আধুনিক শিল্পীরাও অ্যাবস্ট্রাকশনের পক্ষপাতী, সুতরাং মানুষের মুখে যে নাকচোখ থাকবেই তা তাঁরা স্বীকার করেন না। কারও 'মুখ' দেখে শিল্পীর যদি হঠাৎ 'কুমড়ো'র কথা মনে হয়, তাহলে তিনি শুধু একটি কুমড়ো এঁকে তার তলায় হয়ত 'প্রদীপকুমার দত্ত' লিখে রাখতে পারেন। ইমপ্রেশানিজম ও কিউবিজমের যুগে নাক তো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেই, চোখমুখেরও বিশেষ কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং নাকের প্রতি সুবিচার আশা করা, আধুনিক যুগের কবি ও শিল্পীদের কাছ থেকে, দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নয়।

একালের শিল্পীরা নাকদ্রোহী হলেও সেকালের শিল্পাচার্যরা অন্তত কিছুটা নাককে স্বীকার করেছেন দেখা যায়। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ডৌল বর্ণনাপ্রসঙ্গে তাঁরা নাককে একেবারে অবহেলা করেননি। মুখের কথা তাঁরা বলেছেন, 'মুখম্ বর্তুলাকারম্ কুক্কুটাণ্ডাকৃতি'—মুখের আকার কুক্কুটডিম্বের মতন গোল—'ললাটম ধনুষাকারম্', ললাট ঈষদাকৃষ্ট ধনুকের মতন অর্ধচন্দ্রাকার—'নিম্বপত্রাকৃতিঃ ধনুষাকৃতির্বা', ভ্রূ নিম্বপত্রের মতন, অথবা ধনুকের মতন—নয়ন মৎস্যাকৃতি—আঙুল 'শিম্বীফলম্' বা শিম্ ও মটরসুঁটির মতন—উরু 'কদলীকাণ্ডম্' বা কলাগাছের মতন—বাহু 'করি-করাকৃতিঃ' বা হাতীর শুঁড়ের মতন, ইত্যাদি। 'নাক' সম্বন্ধে শিল্পাচার্যরা বলেছেন ঃ 'তিলপুষ্পাকৃতির্ণাসাপুটম্ নিষ্পাববীজবৎ', অর্থাৎ নাসিকা তিল-পুষ্পের মতন এবং নাসাপুট দু'টি নিষ্পাববীজ বা বরবটির বীজের মতন হওয়া উচিত। অবশ্য একথা আমি স্বীকার করি না যে তিলফুলের মতন নাক এবং বরবটির বীজের মতন নাসাপুট হলেই সবচেয়ে সুন্দর নাক হবে। দেহের সৌন্দর্য, এমনকি প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য পর্যন্ত

কেবল নিখুঁত অ্যানাটমি নয়, অ্যানাটমি প্লাস অতিরিক্ত কিছু এবং এই অতিরিক্ত কিছুটাই সবচেয়ে মূল্যবান ও অনির্বচনীয়। যেমন, থ্যাবড়া নাক অনেকেই দেখেছি পছন্দ করেন না, কিন্তু কারও কারও আবার ঐ থ্যাবড়া নাকটার জন্যেই সেই লোকের প্রতি একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে। ঠিক তেমনি, চোখা নাক ও অজন্তার মুখের চেয়ে থ্যাবড়া নাক ও গোল-গাল মুখের প্রতি অনেকের আকর্ষণ বেশি। তিব্বতী ও চীনা মেয়েদের অনেকের চোখে বেশ সুন্দর দেখায়, অস্ট্রালয়েডীয় চেহারার বাঙালী মেয়েদেরও। আবার কেউ কেউ হয়ত নিটোল ডিমের মতন মুখ, বাঁশির মতন বা তিলফুলের মতন নাক দেখলে উন্মাদ হয়ে যান। সুতরাং নাকের সৌন্দর্য থ্যাবড়া বোঁচা বা চোখা-চোখার উপর নির্ভর করে বলে মনে হয় না। মঙ্গোলিয়ান-নিগ্রয়েড-মেডিটারেনিয়ান-ককেসিয়ান বা অস্ট্রালয়েড, যে-কোন রকমের নাকের উপরে ইচ্ছা করলে কবিতা লেখা যায়। আসল কথা হচ্ছে, কবিদের ও শিল্পীদের নাকের দিকে নজর ফেরানো উচিত। নাক শুধু নৃতত্ত্ববিদদের কাছে মূল্যবান হবে কেন? বিজ্ঞানীদের কাছে বিভিন্ন জাতি-নির্ণয়ের ও জাতির সংমিশ্রণ মাপবার সবচেয়ে মূল্যবান মাপকাঠি হল নাক অথচ শিল্পী-কবিরা চিরকাল সেই নাককে অবজ্ঞা করে এসেছেন। পীন পয়োধর, সফরী বা হরিণের মতন চোখ, দিগন্ত-রেখার মতন ভ্রূ, এসব তো অনেক হয়েছে। এইবার নাকের দিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, তাতে মানুষের মঙ্গল হবে। কারণ প্রধানত এই নাক আর রঙের পার্থক্যের জন্যেই পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরোধ ও মনোমালিন্য। রঙের কথাটা অনেকেই বুঝেছেন, কিন্তু নাকের গুরুত্বও বোঝা দরকার। আমরা যদি আমাদের 'নেজাল প্রেজুডিস' জয় করতে পারি তাহলে হয়ত মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির সম্পর্ক আবার ফিরিয়ে আনতে পারি।

নাক সম্বন্ধে অনেক সিরিয়াস কথা বলা হল, কেউ যেন হাল্‌কাভাবে উপেক্ষা করবেন না। এইবার নাক সম্বন্ধে বাকি দু-চারটে সাধারণ কথা বলে শেষ করি। বুক আর চোখের দিকে কবিদের টান খুব বেশি, কিন্তু কেন? দৃষ্টিশক্তি বড়ো, না ঘ্রাণশক্তি বড়ো, তা নিয়ে তর্কের শেষ হবে না

কোনদিন। চক্ষুহীন অন্ধ যথেষ্ট সুন্দর হতে পারে, কিন্তু নাকশূন্য মুখ ভাবাই যায় না। মঙ্গোলীয় মুখে নাকের ঐ যে সামান্য একটু আভাস, একটু ব্যঞ্জনা বা হাতছানি, ঐটুকুই সাংঘাতিক, মনে হয় দিগন্তবিস্তৃত সাহারার বুকে মরূদ্যানের একটু রেখা। তাছাড়া ফুলের রঙটা, না গন্ধটা, কোন্‌টা সুন্দর? কোন্‌টার বদলে কোনটা ত্যাগ করতে আপনি রাজী আছেন, ভেবে দেখবেন, তাহলেই নাকের গুরুত্ব বুঝবেন। যে খাদ্য খেয়ে আপনি বেঁচে আছেন তার ঘ্রাণের মূল্য কতখানি জানেন কি? যাকে ভালবাসেন তাকে শুধু দূর থেকে চোখের দেখাই দেখতে চান, না তার নিবিড় অন্তরঙ্গতার ঘ্রাণও উপভোগ করতে চান? কোন প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারা যায় না। সুতরাং বুক আর চোখের প্রতি যতই কবির দুর্বলতা থাক, নাককে ভুলেও উপেক্ষা করা যায় না। আদরণীয়কে, ভালবাসার পাত্রপাত্রীকে মধ্যে মধ্যে নাকের ডগা ধরেও আদর করতে কার না ইচ্ছা করে? আর যদি কারও প্রতি বিরক্ত হয়ে তাকে হয়রাণ করবার ইচ্ছা হয়, তাহলেও তার নাকে ছাড়া আর অন্য কোন অঙ্গে দড়ি দিয়ে ঘুরুতে ইচ্ছা হয় না। বিচ্ছেদ-বেদনায় শুধু যে দুই চোখ দিয়েই আমাদের জল ঝরে পড়ে, অথবা তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতন বুকটাই কেবল ওঠানামা করে, তা নয়। নাকের ডগা কাঁপে, নাসাপুট দুটো রক্তিম হয়ে ওঠে, হাপরের মতন ফুলতে থাকে ঘন ঘন, চোখের জল শুধু গালের উপর নয়, নাকের উপর গড়িয়ে এসেও শিশির বিন্দুর মতন টলটল করে। নাকের স্বর্গীয় সৌন্দর্য তখন মুখসমুদ্র থেকে উর্বশীর মতন আত্মপ্রকাশ করে। চরম নাকবিদ্বেষী যিনি, তাঁরও ইচ্ছা হয়, নাক ধরে একটু আদর করতে, তুলতুলে ফোলা-ফোলা নাকের ডগাটা আল্‌তোভাবে একটু নেড়ে দিতে। নাকের উপর একটি সনেট লেখার প্রেরণাও তখন পাওয়া যায়, এমনকি থ্যাবড়া নাকের উপরেও।

চিঠি

কোথায় গেল সেই সব চিঠি যা পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে সমাধিস্থ হত না, সারাজীবন ধরে উপভোগ করবার জন্যে পারিবারিক কাস্কেটে সযত্নে রক্ষা করা হত ?

—ভার্জিনিয়া উল্ফ

সে যুগও নেই, সেইসব চিঠিও নেই। আর অফুরন্ত অবসরের মধ্যে অক্লান্তভাবে সেই চিঠি যাঁরা লিখতেন এবং যাঁরা পড়তেন তাঁরা কেউ নেই আজ। আমাদের যুগ হল তড়িঘড়ির যুগ, কেবল ঘড়ির যুগ নয়, অর্থাৎ তড়িৎগতিতে আমরা কাজ করি এবং ঘড়ির কাঁটা দেখে চলি। এর মধ্যে বসে বসে রসিয়ে বা বিনিয়ে-বিনিয়ে চিঠি লেখবার অবসর কোথায় আমাদের এবং কখনসখন লিখলেও তা পড়বারই বা সময় কোথায় পাঠক-পাঠিকার। সকালের ডাক যখন আসে তখন আর চিঠির চেহারার দিকে চেয়ে তা খুলে পড়তে ইচ্ছা করে না। চিঠির উপর ঠিকানা লেখা থেকে শুরু করে, ভিতরের সম্ভাষণ ও বাচনভঙ্গি সর্বত্রই একটা অত্যন্ত অযত্ন-অবহেলা ও শশব্যস্ততার সুস্পষ্ট ছাপ। দেখলেই মনে হয়, এইসব শীর্ণ-দেহ কাগজের টুকরোগুলোর মধ্যে কোন গরজ বা অনুরোধের ঠ্যালা, কোন জরুরী কথার শর্টহ্যাণ্ড সিম্বল, কোন ব্যবসা বা দেনাপাওনার হিসেব, নিছক সামাজিক সৌজন্য ও লৌকিকতার খাতিরে কোন কুশলপ্রশ্ন, অথবা স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অযাচিত কিঞ্চিৎ প্রশস্তি ও গুণগান ছাড়া আর কিছুই নেই। শত শত, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আজকালকার চিঠিও যেমন কয়েকঘণ্টার মধ্যে আসে, তেমনি কয়েকমিনিটের মধ্যে সেই চিঠি ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে চলে যায়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নেই, মনের সঙ্গে মনের লেনদেন নেই, অন্তরের সঙ্গে অন্তরের যোগাযোগ নেই, একটা ত্রস্ত সচকিত ব্যতিব্যস্ত ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর যেন চিঠির আগাগোড়া উজ্জ্বল হয়ে ফুটে থাকে। সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা ভার্জিনিয়া উল্ফ এইজন্যই বলেছেন যে, একটা হন্তদন্ত অস্থির ব্যক্তিত্বের ছাপ আধুনিক চিঠিলেখার

মধ্যে অত্যন্ত পরিস্ফুট—'This haphazard harum-scarum individuality is reflected in the style.'

তাই সেকালের জন্যে যদি আর কোন কারণে আমাদের দুঃখ নাও হয়, তাহলেও সেকালের চিঠির জন্যে দুঃখ না-করে যেন উপায় থাকে না। সেকালের চিঠি কত খানাডোবা ডিঙিয়ে, কত সুদীর্ঘ পথপ্রান্তরের উপর দিয়ে, কত রজ্জু ও বাঁশের সাঁকোয় নদনদী পার হয়ে আমিরি চালে, অপূর্ব আলস্যবিলাসে কয়েক সপ্তাহ ও মাসের পর এসে কাছে পৌঁছত। যাঁরা চিঠি লিখতেন তাঁরাও সেই রোমান্স মনে মনে উপলব্ধি করতেন। কত কষ্ট করে নিজের কথা অন্যকে জানাতে হত চিঠিতে! তাই চিঠির মধ্যে আন্তরিকতার নিবিড় স্পর্শ থাকত, মনের কথা কল্পনার রঙ চড়িয়ে সুন্দর মধুর ভাষায় প্রকাশ করতেন পত্রলেখকরা। সেকালের পত্রলেখকরাও সেই কারণে সাহিত্যিক বলে গণ্য হতেন এবং পত্রসাহিত্য সবদেশের সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। কেবল পত্রলেখক হিসেবে সাহিত্যিকেরা মর্যাদা পেয়েছেন, এ রকম দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল, কিন্তু ওদেশের কথা মনে হলে ওয়ালপোল, ডরোথি ওসবর্ণ, কুপার এবং আরও অনেকের কথা বিশেষভাবে মনে হয়। বোধ হয় এঁদের কথাই মনে করে কোন বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক বলেছেন: 'Great letter-writers were suppressed novelists, frustrated essayists born before their time.' বাস্তবিকই তাই, ওয়ালপোলের চিঠি পড়লে মনে হয়, তিনি আমাদের যুগে জন্মালে বিখ্যাত সাংবাদিক হতে পারতেন, ডরোথির চিঠি পড়লে মনে হয় শক্তিশালী জীবনচরিতকার হবার সমস্ত গুণই তাঁর ছিল। সমালোচকরা যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট সাহিত্যিক শিল্পী হন, তাহলে পত্রলেখকরা নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী ঔপন্যাসিক ও নিবন্ধকার। নিছক চিঠিপত্র যে সাহিত্য হিসেবে কতখানি উচ্চস্তরে উঠতে পারে, আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ একালেও তা প্রমাণ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের আগে বঙ্কিমচন্দ্রও উৎকৃষ্ট পত্র লিখেছেন, মধুসূদন-বিদ্যাসাগরের পত্রবিনিময় বেশির ভাগ বিদেশী ভাষায় হলেও মর্মস্পর্শী, শরৎচন্দ্রের অনেক পত্র তাঁর সাহিত্যের মতন রসোত্তীর্ণ ও উপভোগ্য। কিন্তু

এখনকার সাধারণের কথা ছেড়ে দিলাম, মনে হয় সাহিত্যিকরাও পত্র লিখতে ভুলে গেছেন এবং লেখার কোন প্রেরণাই পান না। 'হসন্তের পত্র' বিশুদ্ধ সমালোচনা, স্বতঃস্ফূর্ত চিঠিতে সাহিত্য-সৃষ্টি নয়। বরং একালের প্রেমেন্দ্র মিত্রের কয়েকখানি পত্র যা অচিন্ত্যকুমারের 'কল্লোল যুগে' পাওয়া যায়, সাহিত্য হিসেবে তা অনুপম ও অতুল্য! চিঠি লেখাও যে একটা আর্ট, একথা তিনি উপলব্ধি করেন, যদিও আমরা অনেকেই আজ তা ভুলে গেছি।

শুধু চিঠি লেখা নয়, চিঠি পড়তেও যেন আমরা ভুলে গেছি। কবিতা লেখা এবং কবিতা পড়া, দুটোই যেমন আর্ট হিসেবে গণ্য, চিঠি লেখা এবং চিঠি পড়াও ঠিক তাই। চিঠি লেখার যদি অবনতি হয়ে থাকে, চিঠি পড়ারও কোন উন্নতি হয়নি। কোন ভাল চঠি উপভোগ করতে হলে তা ভাল করে পড়া চাই এবং ভাল করে পড়তে হলে প্রয়োজনীয় অবসর, সুন্দর পরিপার্শ্ব এবং মানসিক পরিবেশ চাই। ব্যস্তবাগীশ জনকোলাহল থেকে দূরে কোন নিরিবিলি স্থানে বা বিদেশে হাওয়া-বদলের মুক্ত পরিবেশে উন্মুখ মন নিয়ে কোন বন্ধুর বা প্রিয়জনের লেখা চিঠি যেমন নিবিড়ভাবে উপভোগ করা যায়, দৈনন্দিন জীবনে বিবিধ তুচ্ছতার ভীড়ের মধ্যে কর্মস্থলে তেমন করে সে চিঠি উপভোগ করতে পারা যায় না। তাই ক্রমেই যত মনের হাওয়াবদলের ফুরসৎ কমে যাচ্ছে, ঘড়ির কাঁটার মতন কর্মক্লান্ত জীবনের অহর্নিশ টিক্-টিকিনিটাই সার হচ্ছে, ততই চিঠি পড়বার মতন পারিপার্শ্বিক ও মানসিক অবস্থা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। দু-চারখানা ভাল চিঠি, অনেকবার পড়বার মতন চিঠি, কেউ যে এখনও কালেভদ্রে লেখেন না তা নয়, কিন্তু লিখলেও তা নিরিবিলিতে পড়বার মতন সময় নেই আমাদের। আমরা এমনই একটা যুগে বাস করছি যে মানুষ সবচেয়ে বেশি চিঠি যাঁদের লেখেন, ঠিক তাঁরাই আবার সবচেয়ে কম পড়েন চিঠি। বিখ্যাত ফিল্ম অভিনেতা-অভিনেত্রী, কবি সাহিত্যিক শিল্পী সাংবাদিক, অথবা দেশবরেণ্য রাজনীতিক, যাঁদের কাছে আমরা খুব বেশি চিঠি লিখি এবং অনেক সময় হয়ত মনের কথা, ইচ্ছাআকাঙ্ক্ষা সবই প্রাণ খুলে প্রকাশ করি, আমরা জানি না যে আমাদের অধিকাংশ চিঠিই তাঁরা পড়েন

না, পড়বার মতন অবসরও নেই তাঁদের। সেক্রেটারীরা সেই সব চিঠি পড়েন এবং তার মধ্যে যেটুকু ভাবানুভাবে রঞ্জিত ও অতিরিক্ত ঠিক সেইটুকু বাদ দিয়ে দরকারী দু-চারটে কথায় লালপেন্সিলের দাগ দেন, তারপর তা কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ছেঁড়াকাগজের টুকরিতে চলে যায়।

তাই মনে হয়, চিঠির সর্বাঙ্গীণ অবনতি হয়েছে, লেখার ও পড়ার দুয়েরই। 'টাইমস্' পত্রিকা তাই একদা দুঃখ করে লিখেছিলেন চিঠি-পড়া সম্বন্ধে : 'There is no time to read it as it should be read. A hurried eye sweeps carelessly down the first page; impatient fingers rustle on to the second. The spell is broken and the charm fled. The pleasingest letter, like good wine taken at a gulp, has been made a sacrifice to haste.'

উত্তম সুরা একনিশ্বাসে গলাধঃকরণ করলে যেমন তার আসল আস্বাদই পাওয়া যায় না, তেমনি ভাল চিঠি তাড়াহুড়ো করে পড়ে ফেললেও তার মাধুর্য উপভোগ করা যায় না। সাহিত্য বা শিল্প স্রষ্টার সঙ্গে সমাজের সকল মানুষের মনের যোগাযোগ স্থাপন করে, চিঠি তা করে না। চিঠি হল একান্ত ব্যক্তিগত সাহিত্য, পৃথিবীর দুটি মাত্র প্রাণীর মধ্যে তার লেনদেন ও ভাব-বিনিময় সীমাবদ্ধ। তাই লেখক ও পাঠক উভয়েরই দায়িত্ব ও কর্তব্য সেখানে অনেক বেশি। পত্রলেখকের প্রগাঢ় অনুভূতি পাঠকের সামান্য অবহেলা, উদাসীনতা ও ব্যস্ততার ছোঁয়াচ লাগলেই বিবর্ণ পাণ্ডুর হয়ে যায়। সাহিত্য তা হয় না, কারণ কোন একজন মাত্র ব্যক্তির ভাবানুভাবের গণ্ডির মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়।

শুধু চিঠিলেখা নয়, চিঠি পড়ার দিকেও আমাদের তাই মন দেওয়া উচিত।

'প্রণাম শতকোটি
ঠাকুর! যে খোকাটি
পাঠিয়ে দেছ তুমি মাকে,

সকলি ভাল তার ;—
কেবল—কাঁদে, আর
দাঁত তো দাও নাই তাকে !
পারে না খেতে তাই,
আমার ছোট ভাই ;
পাঠিয়ে দিও দাঁত, বাপু।
জানাতে এ কথাটি
লিখতে হ'ল চিঠি।
ইতি। শ্রীবড়খোকাবাবু।'

সত্যেন্দ্রনাথ অনূদিত কবি রেক্সফোর্ডের চিঠি, অপূর্ব উপভোগ্য নয় কি ? বড়খোকাবাবু লিখছে (কাকে লিখছে তা তো বুঝতেই পারা যায়, স্বয়ং স্রষ্টাকে) নবজাত ছোট ভাইয়ের দাঁত পাঠিয়ে দিতে, কারণ সে ভাল করে খেতে পারছে না এবং সেজন্য কেবল কাঁদছে। কল্পনার সওয়ার হয়ে বড়খোকা এখানে অনেকদূর দৌড়েছে অবশ্য, কিন্তু চিঠির এই হল প্রাণ, যে চিঠি ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে পাঁচমিনিটে সমাধিস্থ হয় না, পারিবারিক কাস্কেটে পঞ্চাশ বছর তোলা থাকে।

লক্ষ লক্ষ মানুষ, জীবনে যাদের আর কোন সাহিত্য পড়বার সুযোগ হয় না, চিঠিই তাদের একমাত্র সাহিত্য। যখন চিঠি লেখার চলন ছিল না, লিখলেও পেঁৗছে দেবার উপায় ছিল না, অতি প্রাচীনকালের কথা— তখন মনের কত কথাই না মনের মধ্যে গুমরে গুমরে মরে যেত। লঙ্কা থেকে সীতাদেবী যদি একখানা চিঠি রামকে লিখতে পারতেন তাহলে কত দুঃখই না তিনি তার মধ্যে প্রকাশ করতেন এবং রামও কত নিশ্চিন্তই না হতেন! শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ি থেকে একখানা চিঠিও যদি পিতৃতুল্য মহর্ষি কণ্বকে লিখতেন তাহলে কত কথাই না আমরা জানতে পারতাম! 'সুন্দরী, যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করবেন তখন তোমার পিতার সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে যেও, আমার বিরহে দুঃখ করো না'—এইকথা চিত্রাঙ্গদাকে বলে অর্জুন যখন মণিপুর থেকে চলে গেলেন, তারপর কি একদিনের জন্যও চিত্রাঙ্গদার ইচ্ছা হয়নি মনের কথা তাঁকে জানাতে ? এখন মণিপুর

থেকে দিল্লী (ইন্দ্রপ্রস্থ) উড়োজাহাজে চিঠি চলে যায় কয়েক ঘণ্টায়, কিন্তু তখন যাবার কোন উপায়ই ছিল না। এখন আকাশপথে চিঠি উড়ে যাচ্ছে, কিন্তু চিঠির মধ্যে মনের কল্পনাকাশে বিচরণের কোন উপায় নেই। রূঢ় বাস্তবতার সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক চিহ্নসম্বলিত চিঠির আর আকাশে ওড়ার কোন রোমান্স নেই, কয়েক ঘণ্টায় চিঠি পাওয়ারও কোন সার্থকতা নেই। চিঠি ও চিঠিপত্রের চমৎকার সাহিত্য বোধ হয় তড়িঘড়ির যুগে একেবারে শেষ হয়ে গেল।

খবরের কাগজ

With every morning edition of the papers the world is born anew into a wilderness where innumerable surprises, dangers and epic events are lurking about.

Karel Capek.

সকালে উঠে চা-টোস্টের সঙ্গে খবরের কাগজ না পেলে আমাদের চলে না। আমরা শহুরে মানুষ, খাবারের ক্ষিদের চেয়ে খবরের ক্ষিদে অনেক বেশি। খাবার ফেলে আমরা খবর গিল্‌বার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি। বর্তমানের প্রতি আগ্রহের উগ্রতাই হল জীবনের একটা বড়ো লক্ষণ। খবরের কাগজের মূলধন হল মানুষের এই আগ্রহ। সাহিত্যের মূলধন হল, যা চিরন্তন সত্য তাকে নতুন ভঙ্গিতে, নতুন ভাষায় বলা। খবরের কাগজ ও সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য হল নতুন নতুন পরিবর্তনশীল সত্যকে একই ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রকাশ করা। তাই সাহিত্য চিরদিনের, আর খবরের কাগজ প্রতিদিনের। খবরের কাগজ নিত্যনতুন, সাহিত্য

চিরনতুন। নিত্যনতুনের প্রতি মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। যত দিন যায়, তত আগামী দিনের প্রতি আগ্রহ মানুষের বাড়তে থাকে এবং সেই আগ্রহ মেটায় খবরের কাগজ। তাই সকালে উঠে চা-খাবারের সঙ্গে আমরা খবরও খাই সাগ্রহে। কিন্তু তবু ফরাসী কবি বোদলেয়ার বলেছেন—

'It is with this loathsome appetizer that civilized man daily washes down his morning repast.'

আরও অনেকে, যাঁদের খবরের কাগজ না হলে চলে না, তাঁরাও বোদলেয়ারের মতন বলেছেন যে, খবরের কাগজ সভ্য মানুষের ভোরের খাদ্য হলেও, সুখাদ্য নয়। তাঁদের মতে, সুস্থ মানুষ, স্বাভাবিক মানুষ, খবরের কাগজ পড়লে নাকি নিউরটিক হয়ে যায়।

এই সব খবরের কাগজবিদ্বেষীর কথা গ্রহণযোগ্য, এমন কথা আমি বলতে পারি না। তবে তাঁদের কথা প্রণিধানযোগ্য যে নিশ্চয়ই তাতে কোন সন্দেহ নেই। খবরের কাগজের খবরই হল আসল এবং প্রতিদিন নতুন নতুন খবর পরিবেশন করাই হল খবরের কাগজের কাজ। ভোরের খবরের কাগজ তাই প্রত্যেক মানুষের কাছে একটা নতুন বিচিত্র দুনিয়া, তাজ্জব ও ভয়াবহ ঘটনায় ভরা এক আজব দুনিয়া। বিশ্ববিখ্যাত চেক্ সাহিত্যিক ক্যারেল ক্যাপেক এই কথাই খবরের কাগজ সম্বন্ধে বলেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল, খবরের কাগজের 'খবর' জিনিসটা কি? আধুনিক সভ্যজগতে 'খবর' কাকে বলে? অর্থাৎ 'খবর' কাকে বলে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে খবরের কাগজের মহিমা বোঝা মুশ্‌কিল।

বাইরের জগতে প্রতিদিন অনেক ঘটনাই ঘটছে এবং তার মধ্যে সুস্থ ও স্বাভাবিক ঘটনাই বেশি, কিন্তু তার কোনটাই খবর নয়, সুতরাং খবরের কাগজে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়। ঘটনা মাত্রই খবর নয়। ঘটনার মধ্যে যা অস্বাভাবিক ঘটনা, যা আশাতীত ও কল্পনাতীত, একমাত্র তাই হল খবর এবং এই ধরনের নিত্যনতুন খবরের দৈনন্দিন সঙ্কলন হল খবরের কাগজ। কথাটা খুব সহজ কথা হলেও খবরের এই সংজ্ঞা ঠিকমতো

উপলব্ধি করা সত্যিই কঠিন। প্রকৃতির বুকে চিরকাল কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ফলেছে, আম গাছে আম, আমড়া গাছে আমড়া এবং কুমড়ো গাছে কুমড়ো। যতদিন এইভাবে ফল ফলতে থাকে, ততদিন সেটা খবর নয়। কিন্তু হঠাৎ যদি প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালে কোন এক গণ্ডগ্রামে আমড়া গাছে আম হয় এবং কুমড়ো গাছে জাম, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেটা একটা বিরাট খবর বলে গণ্য হয় এবং খবরের কাগজে বক্স করে বোল্ড-টাইপে ছাপা হয়। ছাগলের পেটে যদি ছাগল হয় এবং মানুষের পেটে মানুষ তাহলে ছাগল বা মানুষ কারও সেটা খবর হিসেবে জানবার দরকার হয় না। কিন্তু কোন আধিভৌতিক ও জৈবিক কারণের সংমিশ্রণে যদি মানুষের পেটে ছাগল বা ছাগলের পেটে মানুষ হয়, তাহলে খবর হিসেবে সেটা সকলের জানা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ে। একজন জননীর একটি বা দুটি যমজ সন্তান হওয়া স্বাভাবিক এবং এরকম লক্ষ লক্ষ জননীর কয়েক লক্ষ সন্তান প্রতিদিন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করছে। খবরের কাগজে তা কোনদিন খবর হিসেবে ছাপা হয় না। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত দ্বীপে যদি কোন অখ্যাত জননীর গর্ভ থেকে হঠাৎ ছয়টি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে হামাগুড়ি দিতে থাকে, তাহলে সেই অজ্ঞাতদ্বীপের অখ্যাত জননী সকলের কাছে খ্যাতনামা হয়ে যান খবরের কাগজের মাধ্যমে। অথবা কোন মহারাণীর গর্ভে কোন রাজপুত্র বা রাজকন্যা জন্মালে সেটা খবর হয়, সাধারণ মায়ের গর্ভে মানবশিশু জন্মালে হয় না। আমার আপনার বিয়ের খবর দু-চারজন উড়ে রাঁধুনি বামুন জানতে পারে, আর জানতে পারে আমন্ত্রণপত্র মারফত কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন। সমাজের হবুগবুদের বিয়ে অবশ্য খবর হিসেবে খবরের কাগজ মারফত সকলের কাছে পৌঁছয়। কিন্তু আমার-আপনার বিয়েতে যদি অঘটন বা অস্বাভাবিক কিছু ঘটে, যেমন বর বা কনে যদি পিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে উঠে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করে, তাহলে আমন্ত্রিতরা ছাড়াও পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে খবরটা পৌঁছয়, এবং অস্বাভাবিকতা যদি আরও চরমে ওঠে, অর্থাৎ বিবাহবাসরে বরপক্ষে ও কন্যাপক্ষে যদি হাতাহাতি মারামারি ও খুনোখুনি হয়ে যায়, তাহলে আমার-আপনার মতন রামশ্যামের বিয়েটাও খবর

হিসেবে খবরের কাগজে ছাপা হয়। অনেকে আছেন যাঁরা খবরের কাগজে নিজেদের কোন খবর ছাপবার জন্যে পাগল হয়ে যান, বিয়ের খবর ছাপা হলে তো মহাখুশি। এমনিতে তাঁদের বিয়ের কথা খবর হিসেবে ছেপে বেরুবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু বিবাহের দিন যদি তাঁরা অস্বাভাবিক কোন ঘটনার সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে সহজেই তাঁদের বিয়েটা খবর হিসেবে কাগজে বেরুতে পারে। এটাকে অবশ্য ইঙ্গিত হিসেবে গ্রহণ না করাই উচিত। খবরের কাগজে নাম বা খবর ছাপার মোহ ত্যাগ করাই ভাল। তা যদি না করা যায়, তাহলে যে কোন কুকাণ্ড করবার সম্ভাবনা সব সময় থাকে। সৎ ও সাধু উপায়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা অর্জন করাটা খবর নয়, কিন্তু যদি চুরি-ডাকাতি করা যায়, এমনকি পকেটও কাটা যায়, তাহলেই সেটা খবর হয়ে যায় এবং কাগজেও ছাপা হয়। সারাজীবন আপনার হাড়ভাঙা খাটুনির অর্থ যদি বেশির ভাগই আপনি নীরবে দান করে যান দুঃখীদের, তাহলে তা কোনদিনই খবর বলে গণ্য হবে না এবং খবরের কাগজেও ছাপা হবে না। কিন্তু সারাজীবন ব্যভিচার বিলাসিতার পর যদি শেষ জীবনে কোন হবুচন্দ্র জাঁকজমক করে কিছু দান করেন, তাহলেই সেটা বিরাট খবর হয়ে যায় এবং খবরের কাগজ তাঁকে দানবীর আখ্যা দেয়। সমাজে সত্যিই যাঁরা ভাল কাজ করেন তাঁরা যখন ভাল কথা বলেন, তখন তা খবর হিসেবে কোনকালেই ছাপা হয় না! কিন্তু যাঁরা কখনই কোন ভাল কাজ করেন না বা করতে চান না, তাঁরা যখন কোন ভাল কথা শুধু বলার জন্যে বলেন, তখন সেটা বিবৃতি ও খবর হিসেবে ছাপা হয়। এই হল খবর, এই নিয়ে খবরের কাগজ, যা না হলে একদিনও আমাদের চলে না এবং কবি বোদলেয়ার যাকে 'লোদসাম অ্যাপেটাইজার' বলেছেন।

অদ্ভুত আজগুবি ও অস্বাভাবিক কাহিনী জানবার জন্যে মানুষের একটা শিশু-সুলভ কৌতূহল আছে বলেই বোধ হয় আধুনিক সভ্য মানুষের খবরের কাগজ পড়বার আগ্রহ এত বেশি। বাস্তবিকই খবরের কাগজের খবর পড়ে মনে হয় যে, মানুষ যদি শান্তিতে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে থাকে তাহলে খবরের কাগজ হয়ত শেষ পর্যন্ত

উঠেই যাবে, কারণ খবরের এই আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন ঘটনাই তখন খবর বলে স্বীকৃত হবে না এবং খবরের কাগজ ছাপারও দরকার করবে না। মনে করুন, ভবিষ্যতে এমন একদিন যদি আসে যখন মানুষ সুখে-শান্তিতে প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করবে, মানুষে মানুষে হানাহানি, হিংসাবিদ্বেষ, যুদ্ধবিগ্রহ থাকবে না এবং প্রত্যেক মানুষ ঘরে বসে রেডিওতে দেশের ও দশের খবর পাবে, তখন কি জন্যে তাহলে খবরের কাগজ ছাপা হবে? আমার মনে হয়, তখন খবরের কাগজ ছাপার দরকার হবে না, সাংবাদিকরা তখন অন্য কাজ করবেন। তাই মনে হয়, যে-খবরের কাগজ আমরা পড়ি, সেই খবরের কাগজ ও খবরের কোন ভবিষ্যৎ নেই। যে সমাজে অদ্ভুত ও আজগুবি ঘটনা বেশি ঘটে, একমাত্র সেই সমাজেই খবরের কাগজের প্রয়োজন।

আশা করি, 'খবর' জিনিসটা কি এবং 'খবরের কাগজ' কি বস্তু পাঠকরা বুঝেছেন। রোজই সকলে খবরের কাগজ পড়েন, কিন্তু তার বিশেষত্ব কি তা বোধ হয় কেউ ভেবে দেখেননি। এখন অন্তত জেনে রাখুন, যতদিন সোজা হয়ে দু-পায়ে ভর দিয়ে হেঁটে চলবেন, ততদিন সেটা খবর নয়। কিন্তু যদি দু-হাতে ভর দিয়ে পাদুটো উপরে তুলে পিকক্ হয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুয়ের উপর দিয়ে চলতে থাকেন, তাহলে কাগজের ফটোগ্রাফাররা ভিড় করে আপনার ছবি তুলে নেবেন এবং কাগজে সেটা খবর হিসেবে ছেপে বেরুবে। চলতে চলতে যদি ক্লান্ত হয়ে পড়েন সেটা খবর নয়, কিন্তু চলতে চলতে যদি পা পিছলে পড়ে যান এবং পড়ে তৎক্ষণাৎ মরে যান, তাহলেই সেটা খবর। এমনিতে যদি আমরা মরে হেজে ভূত হয়ে যাই, তাহলে সেটা খবর হয় না, কিন্তু যদি মোটর চাপা পড়ে মরি তাহলে নামটা অন্তত বর্জাইস অক্ষরেও কাগজে খবর হিসেবে ছাপা হয়। এই হল খবর ও খবরের কাগজ।

তাহলে খবরের কাগজের খবর ও সাহিত্যের মধ্যে তফাৎ কি? আমরা শুনে এসেছি এতদিন যে 'সাংবাদিকতা' আর যাই হোক 'সাহিত্য' নয়। কিন্তু কেন নয়? একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। প্রেমের কথাই ধরুন না কেন। প্রেম সনাতন সত্য এবং এই প্রেম নিয়ে যুগে যুগে কত কবি কত কাব্য

ও সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কবির কাছে প্রেমের মূল্য যাই থাকুক না কেন, খবরের কাগজের সাংবাদিকের কাছে তার কোন মূল্য নেই। একমাত্র কোন রাজপুত্র যদি প্রেমের জন্যে রাজসিংহাসন ছেড়ে চলে যান, যেমন অষ্টম এডওয়ার্ড গিয়েছিলেন, তাহলেই সেটা খবরের কাগজের উল্লেখযোগ্য প্রেম হয়। এছাড়া অন্য কোন প্রেমেরই কোন 'নিউজ ভ্যালু' নেই। আমার আপনার প্রেম, তা যতই গভীর ও চণ্ডীদাসতুল্য হোক না কেন, সাংবাদিকের কাছে তা চিরাচরিত, সুতরাং নিউজ হিসেবে বোগাস্। যে-কোন প্রেমের সাহিত্যিক মূল্য আছে, কিন্তু সাংবাদিক মূল্য নেই। প্রেমটা যতক্ষণ না কোন আজগুবি ঘটনায় পরিণত হয়, ততক্ষণ তার কোন সাংবাদিক মূল্য থাকে না। প্রেম করে আত্মহত্যা করলেও আজকাল সেটা খবর হয় না। কিন্তু প্রেম করে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যদি অক্টারলোনী মনুমেণ্টের মাথায় উঠে, প্রেম সম্বন্ধে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করে কেউ সোজা ডাইভ করে ময়দানে পড়ে আত্মহত্যা করেন, তাহলে নিশ্চয়ই প্রেমের 'নিউজ ভ্যালু' হয় এবং খবরের কাগজে তা ফলাও করে ছাপাও হয়। অবশ্য, খবরের কাগজে প্রেমিক হিসেবে প্রখ্যাতনামা হবার জন্যে একাজ কোন সুস্থ ব্যক্তি কেউ যেন না করেন কোনদিন।

এই হল খবর ও খবরের কাগজ এবং সাহিত্য ও সাংবাদিকতার মধ্যে পার্থক্যও এইখানে। এই কারণেই বোধ হয় বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে থাকেন যে, খবরের কাগজ সাহিত্য নয় এবং সাংবাদিকরা সাহিত্যিক নন। এইজন্যেই মনে হয়, যাঁরা সাংবাদিক তাঁদের ভবিষ্যৎ নেই, সাহিত্যিকদের আছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ থাকুক আর নাই থাকুক, বর্তমান আছে। যতদিন সমাজে ও মানুষের জীবনে অদ্ভুত, অপ্রত্যাশিত ও আজগুবি ঘটনা ঘটবে, ততদিন সাংবাদিকও বেঁচে থাকবেন, খবরের কাগজও বাঁচবে। তারপর, আজ থেকে শতবর্ষ পরে, লোকে চণ্ডীদাসের কবিতা পড়বে, না খবরের কাগজের খবর পড়বে, তা নিয়ে জল্পনা করবার প্রয়োজন নেই এখন।

ছাতি

সেদিন বন্ধু, সজলমেঘৈর্মেত্বরাম্বরতলে
ভাড়া-নৌকায় হারান্থু ছাতাটি ভাত্বরে গাঙের জলে।
ছত্রিবিহীন ভাঙা সে তরণী, উপরে ও নীচে জল,
ছত্র-মাথায় এক কোণ ঘেঁসে বসে আছি নিশ্চল ;
অঝোরে ঝরিছে বাদলের ধারা, ঘনায়ে আসিছে রাতি,
আচম্‌কা এক দম্‌কা হাওয়ায়, উড়াইয়া নিল ছাতি।
মাথা ছেড়ে ছাতা উড়িয়া পড়িল ভাত্বরে গাঙের টানে,
ত্ব-বার নড়িয়া অসহায় বাঁট তলাইল কোন্‌খানে!

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

বাঙালী কবি এখানে ছাতাডুবির ট্র্যাজিডি বর্ণনা করেছেন। স্ত্রী নয়, পুত্র নয়, বন্ধু নয়, স্বজন নয়, নায়িকা নয়, প্রেমিকাও নয়—সামান্য একটি ছাতার বিরহে কাব্যরচনা করা নেহাত বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় না কি? কিন্তু 'ত্ব-বার নড়িয়া অসহায় বাঁট্ তলাইল কোন্‌খানে'—এর মধ্যে যে গভীর 'পেথস্' আত্মগোপন করে আছে তার তুলনা হয় না। ছাতির প্রতি বা 'ছাতার কথার' কবির প্রতি কোন 'বায়াস্' থেকে একথা বলছি না, আন্তরিক উপলব্ধি থেকে বলছি। এ 'দেবতার গ্রাস' নয়, কালবৈশাখী ও বর্ষার গ্রাস। ত্বয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর।

'—মুহূর্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গ-মাঝে মেলি আর্ত চোখ
'মাসি' বলি ফুকারিয়া মিলাল বালক
অনন্ততিমিরতলে। শুধু ক্ষীণ মুঠি
বারেক ব্যাকুল বলে ঊর্ধ্ব-পানে উঠি
আকাশে আশ্রয় খুঁজি ডুবিল হতাশে।

'ফিরায়ে আনিব তোরে'—কহি ঊর্ধ্বশ্বাসে
ব্রাহ্মণ মুহূর্তমাঝে ঝাঁপ দিল জলে—'

এই হল রবীন্দ্রনাথের রাখালডুবির ট্র্যাজিডি। এর সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের ছাতাডুবির পার্থক্য কোথায়? ক্ষীণ মুঠি নয়—'দু-বার নড়িয়া অসহায় বাঁট তলাইল কোন্‌খানে।' তারপর কি?

'ধর ধর ধর মাঝি!'
দুকূল-হানা সে গাঙে ঝাঁপ দিতে
আঁধারে কে হবে রাজি?
ভাবি নিজ বেয়াকুবি—
নিরুপায় হয়ে বসিয়া বসিয়া দেখিলাম
ছাতাডুবি!

এর পর কবি দুঃখ করে বলছেন—

শুধু মনে পড়ে বাদলের ঝড়ে অকূলে সে
উড়ে পড়া,
অতলের টানে প্রাণপণে তার আকাশ
আঁকড়ি' ধরা।

প্রাণপণে আকাশ আঁকড়ে ধরতে দু-জনেই চেয়েছিল, রাখালের 'ক্ষীণ মুঠি' এবং ছাতার 'অসহায় বাঁট' দুই-ই। তফাৎ হচ্ছে এই যে, রাখালের জন্যে ব্রাহ্মণ শেষ পর্যন্ত ঝাঁপ দিয়েছিলেন জলে, অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ প্রথমে গর্জে উঠে মোক্ষদাকে তিরস্কার করেছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ পরে 'রাখ্, রাখ্, রাখ্' বলে চীৎকার করে এবং 'ফিরায়ে আনিব তোরে' বলে জলে ঝাঁপ দিয়ে তাঁর ব্রাহ্মণত্ব ও মনুষ্যত্ব দুই-ই বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু ছাতার জন্যে ছাতার মালিক শুধু 'ধর ধর ধর' বলে একবার চেঁচিয়ে উঠলেন এবং ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল কেউ তাঁকে 'ফিরায়ে আনিব তোরে' বলে জলে ঝাঁপ দিল না। রাখালের সঙ্গে ছাতির যে পার্থক্য, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথেরও সেই পার্থক্য। একজন অ্যাবস্ট্রাক্ট আদর্শ মানুষের কবি, আর একজন কংক্রীট ছাতির কবি। একজন হিউম্যানিস্ট, আর একজন স্যাটায়ারিস্ট, সাইক্লিস্ট ও আমব্রেয়ালিস্ট। পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরে

বা কোন সভা-সমিতিতে ভুলেও যেন কেউ একথা লিখবেন না বা বলবেন না, কারণ এটা ছাত্রদের পরীক্ষার জন্যে লেখা কাব্যসমালোচনা নয়, নিছক ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথা।

আপাতত ছাতির কথাই বলা যাক। কে কবে ও কোন্‌খানে ছাতি আবিষ্কার করেছিল জানি না, ছাতির উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছিল তাও কোন ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাইনি। মনে হয়, অন্যান্য অনেক জিনিসের মতন ছাতির আইডিয়াটাও মানুষের মনে এসেছিল প্রকৃতির গাছ-পালা থেকে, আজও তাই ঝড়েবাদলে অসহায় অবস্থায় অনেক গাছপালার তলায় আমরা আশ্রয় নিই, আজও পাতাভরা ঝাঁকড়া গাছ ছাতির কাজ করে। তাই থেকে হয়ত মাঠের চাষীরা প্রথমে লতাপাতা দিয়ে মাথার ছাতা তৈরি করে, তারপর কাপড়ের ছাতা হয়। রোদে-জলে দেহ জর্জর, তবু মুখে কথা নেই, এই হল ছাতির চিরন্তন চরিত্র। মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মাথাটিকে চিরকাল ছাতি মুখ বুজে প্রটেক্ট করে এসেছে, কোন অভিযোগ নেই, কোন দাবি নেই, অথবা আমাদের অবহেলার জন্যে কোন অভিমানও নেই তার। ছাতি তাই শুধু চিরসেবাতুর নয়, 'প্রটেক্‌শন' ও 'পীসের' প্রতিমূর্তি। ছাতি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-প্রতীক বলে আমরা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় ঘরবাড়িও যথেষ্ট ছাতির মতন করে তৈরি করেছি, আজও করি। ঠিক ছাতির মতন দেখতে একরকমের ঘর সাঁওতালরা একসময় তৈরি করত, তার নাম 'ছাতম ওড়ক (ঘর)'। গোলাকার ঘরবাড়ি তৈরি করবার প্রেরণাও, অনেকে বলেন যে, ছাতি থেকে এসেছে। আমাদের মন্দিরের যে বৃত্তাকার ও চূড়াকার শিখর, তাও নাকি ছাতির মডেলে তৈরি। দেবতা আমাদের আশ্রয় দেন, তাই দেবতার মন্দিরের উপর ছাতি আশ্রয়ের প্রতীকরূপে বিরাজমান। রাজা প্রজাদের আশ্রয় দেন বলে রাজাদের যুগে রাজসিংহাসনের উপর রাজছত্র দেখা যেত। সত্যিকার আশ্রয়দাতা কেউ সংসার থেকে বিদায় নিলে আজও আমরা বলি—'মাথার উপর থেকে ছাতি সরে গেল।' মানুষের জীবনে ও ইতিহাসে এই হল ছাতির ভূমিকা। তাই রাখালডুবির চেয়ে ছাতাডুবি অনেক বেশি গভীরতর ট্র্যাজিডি হতে পারে জীবনে এবং তা

নিয়ে কাব্যরচনাও করা চলতে পারে। তাই বলছি, ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগের দিনে হারানো ছাতির বিরহে কাউকে মূহ্যমান দেখলে, আপনি প্লাস্টিকের ওয়াটারপ্রুফ গায়ে দিয়ে তার দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসবেন না। মনে রাখবেন, রবার ও প্লাস্টিক আবিষ্কৃত হবার অনেক আগে ছাতির আবিষ্কার হয়েছিল এবং সেই ছাতি মাথায় দিয়েই আমাদের পূর্বপুরুষরা তাঁদের মস্তকরক্ষা ও বংশরক্ষা করেছেন। তাঁরা মাথা বাঁচাতে না পারলে আজ আমরাও বাঁচতে পারতাম না। সুতরাং ছাতি দেখে রাস্তাঘাটে বাসে-ট্রামে হাসবেন না, কারণ মনে রাখবেন—

হোক শততালি, তবু সে মাথালি
মাথার দুখের দুখী—

এবং হারিয়ে-যাওয়া ছাতি—

নানান দুঃখের তালি দেওয়া সেই
হারানো সুখের স্মৃতি।

আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অ্যান্টি-ছাতি বা ছাতিবিরোধী হয়েও একথা বলছি। ছাতি হারানোর জন্যেই আমি অ্যান্টি-ছাতি হয়েছি, ছাতির জন্যে নয়। অন্তত এক ডজন ছাতি হারিয়ে বুঝেছি যে আমার সিংহরাশিতে ছাতি সইবে না, তাই অনেক দুঃখে ছাতি ছেড়েছি। কিন্তু তাহলেও ছাতির প্রতি আমার একটা গভীর দরদ আছে, বিশেষ করে তালি-দেওয়া ছাতির প্রতি।

পোশাক দেখলে মানুষ চেনা যায়, সেক্সপীয়র বলেছেন। কিন্তু আমি বলছি, ছাতি দেখলে তার চেয়ে অনেক ভাল করে মানুষকে জানা যায়। যে ছাতির রোদে ঝল্‌সে রঙ উঠে গেছে, বাঁশের বাঁটটি পেকে মোলায়েম হয়ে গেছে, সে-ছাতির মালিকও খুব পাকা লোক, জীবনের ঝড়বৃষ্টি রোদে ঝল্‌সে পুড়ে ভিজে গেলেও তিনি সংসারী মানুষ হিসেবে ওয়েদারপ্রুফ। যাঁর ছাতিতে যত বেশি তালি দেখবেন, জানবেন জীবনে তত বেশি হোঁচট ও ঠোক্কর-খাওয়া লোক তিনি এবং দুনিয়াকে থোড়াই কেয়ার করেন। নতুন ছাতি যাঁর তিনি ছাতিনবীশ, জানবেন তিনি ছাতি হারাতে ওস্তাদ এবং অত্যন্ত ভাবপ্রবণ উদাসীন কবিপ্রকৃতির লোক। আর ছাতি যাঁদের

নেই তাঁদের কোন চরিত্রই নেই, অর্থাৎ তাঁরা অত্যন্ত আরামপ্রিয় ও সুবিধাবাদী, দরকার মতন এর-ওর ছাতির তলায় 'কতদূর যাবেন দাদা' বলে কাজ চালিয়ে নেন এবং নিজে কিছু বহন না করে অন্যের স্কন্ধে চাপাতে চান। সরু ও লিকলিকে লোকের মতন এই ছাতিহীন ব্যক্তিরাও অত্যন্ত ডেন্‌জারাস এবং এই ধরনের লোকের সঙ্গে খুব বেশি সাতে-পাঁতে থাকবেন না। কারও সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার আগে দেখে নেবেন বা জেনে নেবেন যে, তিনি নিয়মিত ছাতি ব্যবহার করেন, না অন্যের ছাতি বা বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে কাজ চালিয়ে নেন।

ছাতির সঙ্গে মনুষ্যচরিত্রের যে কি গভীর সম্পর্ক তা এর থেকেই বোঝা যায়। এ ছাড়া ছাতির সঙ্গে মাথার সম্পর্ক তো আছেই—কারণ

পেটের উপর বুকের বসতি, বুকের উপর মাথা,
তাহারও উপর সুখের বসতি, মাথার উপর ছাতা।

সমাজে মাথার মূল্য যাঁদের যত বেশি তাঁরাই তত বেশি ছাতি ব্যবহার করেন। সমাজের তলার দিকে চাষীমজুররা বেশি ছাতি ব্যবহার করে না, কারণ তারা নিজেরাই ছাতি হয়ে গেছে, 'রোদে জলে দেহ জর্জর ; তবু কথাটি নেই মুখে।' মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাদের সবটাই ছাতি, তাই মাথার উপরে তাদের ছাতির দরকার হয় না। তা ছাড়া মাথাটা থাকল কি গেল, তাতে তাদের কিছু যায় আসে না, কারণ তারা জানে যে, জীবনে তাদের মাথার প্রয়োজন নেই, মাথা ঘামিয়ে বা খাটিয়ে তাদের খেতে হবে না, খেতে হবে গতর খাটিয়ে। তাই তাদের মাথা চিরকাল রোদে জলে খোলা থেকে ওয়াটারপ্রুফ, শক্‌প্রুফ অ্যান্টি-ম্যাগনেটিক হয়ে যায়। কিন্তু তার উপরের স্তরে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বেলায় তা হয় না, কারণ সমাজে এই মধ্যবিত্তের মাথার মূল্যই সব চেয়ে বেশি, মাথা খাটিয়ে ও মাথা বেচেই তাঁরা খান, তাই তাঁদের মাথা বাঁচানোর জন্যে উপরে ছাতির দরকার হয় বেশি। এইজন্য দেখা যায়, সমাজে ভদ্রলোক ও মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোকই বেশি ছাতি ব্যবহার করেন, অথবা টুপি। ছাতি দেখে মানুষ চেনার মতন, মাথাও চেনা যায়। যাঁর যত মূল্যবান ছাতা, তাঁর তত মূল্যবান মাথা। সাধারণ কাপড়ের বাঁশের বাঁটের ছাতির তলায় যে

মাথাটি দেখা যায়, সেটি নিঃসন্দেহে কেরানী বা স্কুলমাস্টারের মাথা। বেতের বাঁট, সিল্কের কাপড়ের ছাতি দেখলে বোঝা যায়, কোন ডেপুটি, অ্যাসিস্ট্যান্ট, হেড ক্লার্ক বা অধ্যাপক চলেছেন। দামী প্ল্যাস্টিক বা কাঠের কাজ-করা বাঁটওয়ালা ছাতি দেখলে ভাবা যেতে পারে, কোন অফিসারের মাথা তার তলায় রয়েছে। মাথার গ্রেড অনুযায়ী ছাতির গ্রেড।

ছাতি দেখে মাথা ও মানুষ চেনার সুবর্ণসুযোগ হয় বর্ষাকালে, যখন ঘরের ছাতি সব বাইরে বেরিয়ে পড়ে, সে সময় মাথা ও মানুষ দুইই চিনে নেওয়া যায়
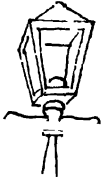
গ্যাসল্যাম্প

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন সেকালের কলকাতায়। তখন না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটরগাড়ি। তখন কাজকর্মেরও এত বেশি হাঁস-ফাঁসানি ছিল না, জিরিয়ে-থিতিয়ে দিন চলত, বাবুরা আপিসে যেতেন বাসে ঝুলতে ঝুলতে নয়, কষে তামাক টেনে নিয়ে, পান চিবোতে চিবোতে, কেউ পাল্‌কি চড়ে, কেউ বা ভাগের গাড়িতে। তা ছাড়া তখন শহরে যে শুধু মানুষ থাকত তা নয়, ভূতপ্রেতও ছিল যথেষ্ট। কারণ শহরে তখন আলো ছিল না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ 'তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি। কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ

দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই-সলতের একটা সেজ। মাস্টারমশায় মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট বুক। প্রথমে উঠত হাই, তারপর আসত ঘুম, তার পর চলত চোখরগড়ানি।' রেড়ির তেলের মিটমিটে আলোয় ঘুম তো আসতই, চলতে ফিরতে ভূতের ভয়ও করত। 'বাহির মহল থেকে বাড়ির ভিতরে যাবার সরু পথ ছিল খড়খড়ির আব্রু দেওয়া, উপর থেকে ঝুলত মিটমিটে আলোর লণ্ঠন। চলতুম আর মন বলত, কি জানি কিসে বুঝি পিছু ধরেছে। পিঠ উঠত শিউরে।'

মিটমিটে লণ্ঠনের আলোয় বা দুই সলতের সেজের আলোয় পিঠটা শিউরে ওঠারই কথা। পিঠের কোন দোষ নেই। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের পিঠ, শিউরে তো উঠবেই। ডাকসাইটে ডাকাতদের কড়া-পড়া পিঠ পর্যন্ত অন্ধকারে শিউরে ওঠে। বাড়ির মধ্যেই যদি ভূতে হাত বুলোচ্ছে মনে করে পিঠটা শিউরে ওঠে, তাহলে বাড়ির বাইরে কলকাতার রাস্তাঘাটে যে কি হত ভাবা যায় না। লোকজন বড় একটা কেউ চলাফেরা করত না সন্ধ্যার পর, চলতে হলে মশাল জ্বালিয়ে চলতে হত, আর মনে হত পিছন থেকে শিরদাঁড়ার উপর কে যেন অনবরত কিলোচ্ছে। অবশ্য লটারি-কমিটির পয়সায় কলকাতার রাস্তাঘাটও তখন তৈরি হচ্ছে, নর্দমা বসছে, জলের কলও বসছে। এমন সময় কেরোসিনের আলোও জ্বালিয়ে দেওয়া হল রাস্তায়। এই কেরোসিনের আলোর তেজ দেখেই অনেকে অবাক হয়ে গেলেন, কিন্তু ভূত পালাল না। ভ্রাম্যমান হাতলণ্ঠন ও মশালের পরে কেরোসিনের আলো যখন জ্বলে উঠলো কলকাতার রাস্তায়, তখন মানুষের চেয়ে বরং ভূতেরই সুবিধা হল বেশি। কলকাতার মতন সব শহরেই অবশ্য তাই হয়েছিল। যেমন লণ্ডন শহরের কথা মনে করে স্টিভেনসন সাহেব লিখেছেন:

'Closely following on this epoch of migratory lantharns in a world of extinction, came the era of oil-

lights, hard to kindle, easy to extinguish, pale and wivering in the hour of their endurance.'

ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগের সময় যখন সবচেয়ে স্টেডি হয়ে থাকা রাস্তার আলোর কর্তব্য, তখন কেরোসিন-ল্যাম্প ভয়ে থর্-থর্ করে কাঁপতে থাকে এবং আসন্ন অন্ধকারের বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত পথযাত্রী যখন সামান্য একটু আলোর আভাসের জন্যে আকুল হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই হয়ত অবিশ্বাসী কেরোসিন ল্যাম্প একবারটি শুধু দপ করে জ্বলে উঠে, খপ করে নিবে যায়। কলকাতার পথে রাতের নিঃসঙ্গ যাত্রীর সামনে দূর থেকে এইভাবে কেরোসিন বাতি কতদিন দপ করে জ্বলে উঠে যে নিবে গেছে তার ঠিকানা নেই। তখন চারিদিক থেকে ভূতপ্রেত শাকচুন্নীরা জড়ো হয়েছে সেখানে, পথিকের পিঠ শুধু নয়, হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত শিউরে উঠেছে। সুতরাং রাস্তার কেরোসিনের অনিশ্চিত, অবিশ্বাসী আলোয় ভূতের দৌরাত্ম্য আরও বেড়েছে ছাড়া কমেনি। তার ফলে যে কত ক্ষতি হয়েছে তার হিসেব নেই। যেমন, রামমোহন রায়ের সামাজিক আন্দোলনটাই কেরোসিনের আলো প্রায় পঙ্গু করে দিয়েছে বললে ভুল হয় না। কেরোসিনের আলোয় যুক্তিবাদ ও মানবধর্ম প্রচার করলে তা সম্পূর্ণ সার্থক হয় না। প্রেতবাদ ও পরলোকবাদ কেরোসিন ল্যাম্পের ঐতিহাসিক সৃষ্টি। রামমোহন রায় তাই 'আত্মীয় সভা' গড়ে এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেও দেশের লোকের মনের আনাচ-কানাচ থেকে ভূত তাড়াতে পারেননি। কেরোসিনের আলোয় ব্রাহ্মদের দীক্ষা হয়েছিল বলেই শেষ পর্যন্ত ভূত তাঁদের স্কন্ধ থেকেও নামল না। যুক্তিবাদের যুক্তি তেমন জমল না, দলে দলে লোকে ব্রাহ্মধর্মও গ্রহণ করল না। তার বদলে কেরোসিনের টিমটিমে আলোয় যা জমে, তাই ক্রমে জমে উঠলো শহরে। অর্থাৎ কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় গাঁজার দল, গুখুরির দল, পক্ষীর দল, ঝকমারির দল, সব গজিয়ে উঠলো। রামমোহন রায় প্রায় হতাশ হয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে মারা গেলেন। অবশ্য রামমোহনের জীবদ্দশাতেই কলকাতা শহরে গ্যাসের আলো নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। ১৮২২ সালের ৩০ মার্চ তারিখে, আজ থেকে ঠিক ১৪৪ বছর আগে, তখনকার এক সংবাদপত্রে খবর বেরোয়ঃ

'ইংলণ্ড দেশে নল দ্বারা এক কল সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয়। সংপ্রতি শুনা গেল যে, মোকাম কলিকাতার ধর্মতলাতে শ্রীযুক্ত ডাক্তার টৌল্মিন সাহেব আপন দোকানে ঐ কল সৃষ্টি করিয়াছেন, অনুমান হয় লটারির অধ্যক্ষরাও লটারির উপস্বত্ব হইতে কলিকাতার রাস্তাতে ঐরূপ আলো করিবেন।'

অনুমান হলেও লটারির অধ্যক্ষরা অনেককাল পর্যন্ত তা করেননি, দু-চারজন সাহেব হয়ত তাঁদের বাড়িতে বা দোকানে গ্যাস বসিয়েছিলেন। কলকাতার রাস্তাতে কেরোসিনের বাতি জ্বলত। বিদ্যাসাগর যখন জন্মান, তখন গ্যাসের আলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তিনি যখন বিধবা পুনর্বিবাহের আন্দোলন করেন, তখন কলকাতার রাস্তায় দু-চারটে গ্যাসল্যাম্প জ্বলে উঠেছে, কারণ হুতোমের নক্‌শার মধ্যে দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যার সময় কলকাতার 'গ্যাসের আলো জ্বালা মুটেরা মই কাঁধে করে দৌড়ুচ্চে।' সুতরাং কলকাতার ধর্মতলা চৌরঙ্গী অঞ্চলে দু-চারটে গ্যাসল্যাম্প যে তখন সন্ধ্যার সময় জ্বলত তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেইজন্য রামমোহনের চেয়ে বিদ্যাসাগরের আন্দোলন অনেক বেশি জোরালো হয়েছিল গ্যাসের আলোয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেরোসিনের আলোর টানে তাও তেমন সার্থক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তবু দেখা যায়, কলকাতা শহরে গ্যাসল্যাম্প জ্বলবার পর থেকে বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গতিশীলতা ক্রমে বাড়তে থাকে এবং একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন থেকে দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ইতিহাস হল কলকাতা শহরের রাস্তায় কেরোসিনের আলো থেকে গ্যাসল্যাম্প প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। ঘরে অবশ্য তখনও রেড়ির তেল ও কেরোসিনের আলো টিম টিম করে জ্বলছে এবং বাইরেতেও তার প্রতিপত্তি কমেনি। আমাদের মনের আনাচে-কানাচে তখনও তাই ভূতের আনাগোনা ছিল। রামমোহন তো পারেনই নি—বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথও সমস্ত ভূত আমাদের মন থেকে তাড়াতে পারেননি। তবু গ্যাসের আলোকস্পর্শে তাঁদের প্রতিভার বিকাশ হয়েছিল বলেই আমাদের মন ও জীবনকে তাঁরা পথ দেখিয়ে অনেক দূর

এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কেরোসিনের আলোর চেয়ে গ্যাসের আলোয় অনেক দূরপথের আভাস পাওয়া যায়। সে আভাস কেরোসিনের কালে যাঁরা জন্মেছিলেন তাঁরা দেবেন কোথা থেকে? রামমোহনের কালে গ্যাসের আলো দু-চারজন সাহেব-বাড়িতে তো নিশ্চয় জ্বলেছিল, রাস্তাতেও যে দু-একটা জ্বলেনি, তা বলা যায় না। কলকাতায় প্রথম গ্যাসল্যাম্পের আলো রামমোহনই জ্বলতে দেখেছিলেন, তাই আমাদের সমাজ-জীবনের অন্ধকার পথ তাঁর চোখের সামনে অনেক দূর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠেছিল। আমরা যদি ততদূর পর্যন্ত না-এগুতে পেরে থাকি তাহলে সেটা তাঁর দোষ বা তাঁর উত্তরসাধকদের দোষ নয়, আমাদের ঘরোয়া জীবনের কেরোসিন লণ্ঠনের ও প্রদীপের আলোর দোষ। বিজলি-বাতির প্রখর আলোয় আজও তাই সেই লণ্ঠন ও প্রদীপের ভূত আমাদের ঘাড় থেকে নামেনি।

রামমোহন যেদিন প্রথম গ্যাসল্যাম্প জ্বলতে দেখেছিলেন রাস্তায় বা কোন সাহেববাড়িতে, সেদিন তাঁর কি মনে হয়েছিল তা তিনি প্রকাশ করে যাননি। তবু রবার্ট লুই স্টিভেনসন বলেছেন:

'When gas first spread along a city, a new age had begun for sociality and corporate pleasure-seeking. The work of Prometheus had advanced by another stride.'

রামমোহনেরও নিশ্চয়ই তাই মনে হয়েছিল। কলকাতার প্রথম গ্যাসল্যাম্পকে নিশ্চয়ই তিনি সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং মনে মনে কামনা করেছিলেন, সারা কলকাতা শহর, সারা বাংলাদেশ তথা সারা ভারতের বাইরের মাঠঘাট পথ গ্যাসের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠুক—সেই আলোয় অন্ধকার ঘুচে যাক, দেশের ঘাড় থেকে সমস্ত ভূত নেমে যাক। শুধু বাইরে নয়, ঘরে ঘরে যেন রেড়ির তেল ও কোরোসিনের আলো নিবে যায়, ঘরের ও মনের অন্ধকার যেন কেটে যায় মানুষের, ভূত যায় পালিয়ে।

শহরের চেয়ে শহরের আলোই যুগান্তর এনেছে মানুষের জীবনে। যতদিন শহর অন্ধকার ছিল, কেরোসিনের আলো টিম্‌টিম্ করে জ্বলত,

ততদিন গ্রামের মতন শহরও ছিল ঘুমিয়ে। অন্ধকারের তন্দ্রাচ্ছন্ন জড়তা ভেঙে, শহর ও শহরের মানুষের ঘুম ভাঙাল গ্যাসল্যাম্প। তাই কলকাতার সমাজে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কেরোসিন ও রেড়ির তেলের আলোয় আমরা কেবল হাই তুলেছি, ঘুমে আমাদের চোখ ঢুলে এসেছে, আর চোখ রগড়েছি। দ্বিতীয়ার্ধে যখন ধীরে ধীরে গ্যাসের আলো জ্বলতে থাকল রাস্তায়, তখন থেকে আমাদেরও প্রকৃত ঘুমভাঙার পালা শুরু হল। পথ দেখে আমরা ক্রমে চলতে শিখলাম, বহুকালের প্রাচীন ভূত ও ব্রহ্মদৈত্যরা এক-এক করে ঘাড় ছেড়ে চলে যেতে লাগলো। অবশ্য, যাবার আগে জানিয়েও গেল যে যাচ্ছে।

অন্ধকারে ও কেরোসিনের আলোয় সকলকেই মনে হত ছায়ামূর্তি। মানুষকে মনে হত ভূত, বন্ধুকে মনে হত ব্রহ্মদৈত্য, সুন্দরী নারীকে মনে হত পেত্নী বা শাকচুন্নী। প্রত্যেকে তাই প্রত্যেককে সন্দেহ করে, ভয় করে পথ চলত। কেউ কারও মুখের দিকে তাকাত না, চেনা পরিচয় করবার প্রয়োজন হত না, কথাবার্তা, অভিনন্দন বা সামাজিকতা কোন কিছুরই বালাই ছিল না। কেরোসিনের আলোয় যেসব 'মিস ক্যালকাটা' জন্মেছিলেন, তাঁদের সমস্ত ছলাকলা রূপের সৌরভ কেরোসিনের তীব্র গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে এবং অন্ধকারে তাঁদের ডাইনী বুড়ী বলে মনে হয়েছে। চৌরঙ্গীর স্নিগ্ধ গ্যাসের আলোর চন্দ্রাতপতলে আজ আর তা মনে হয় না। আজ মানুষকে মনে হয় মানুষ এবং গভীর রাতে চৌরঙ্গীর বুকে মানুষের পায়ের শব্দ, গ্যাসের আলোর নিবিড় স্নিগ্ধতায় মনে হয় যেন স্বর্গলোকের দেবতার পদধ্বনি। মনে হয় না ভূত, শিরদাঁড়াও শিউরে ওঠে না। চৌরঙ্গীতে আজ 'মিস্ ক্যালকাটা'দের মনে হয় যেন আলোর স্বপ্নরাজ্যের মেনকা সব। তাই হাজার হাজার লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে গ্যাসের আলোয় মিস্ ক্যালকাটা-দের একবার দেখবার জন্যে, আগেকার কালে যেমন ভূত দেখবার জন্যে ভিড় করত সকলে। মিস্টার-মিসেস্-মিস্-শ্রী-শ্রীমতী—সকলেই গ্যাসের আলোয় মনে হয় স্বপ্নাচ্ছন্ন অথচ সত্য। পার্ক স্ট্রীট আর চৌরঙ্গীর মোড়টায় ঠিক রাত দশটার সময় দাঁড়িয়ে কার না মনে হয়—

Coming figures, and far-off hum
of the street,
A dream, the gliding hurry
the endless lights,
Houses and sky, a dream, a dream !

টলটলায়মান মাতাল হল্-অ্যাণ্ডার্সনের দেয়ালে হেলান দিয়ে গ্যাস-ল্যাম্পের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে কি ভাবছে, কে জানে ? গাড়ি, ঘোড়া, মানুষ, কুকুর—স্বপ্ন, স্বপ্ন ! চৌরঙ্গীর গ্যাসল্যাম্প জাতুকর যেন। হাজার হাজার জাতুকর—মন্ত্র পড়ে যা করতে পারেনি, চৌরঙ্গীর জাতুকর গ্যাস-ল্যাম্প তাই করেছে। মানুষকে এক অন্ধকার ভৌতিক রাজ্য থেকে মুক্ত করে আলোর মানবিক স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে এসেছে। মানুষ আজ তাই শুধু অমৃতের পুত্র নয়, আলোকের পুত্র। আলোর স্বপ্ন মিথ্যা হয় না কখনও।

আধলা

সেদিন এক শূন্যবক্ষ পয়সার দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ হারিয়ে-যাওয়া আধ্লার কথা মনে পড়ল। আগে কোনদিন মনে পড়েনি। কাগজের নোট ও ব্যাঙ্কচেকের ঘূর্ণাবর্তে আনি, তু-আনি, সিকি, আধুলিরই যখন প্রায় ডুবুডুবু অবস্থা, তখন আধলার স্মৃতিচিহ্ন মন থেকে মুছে যাওয়া স্বাভাবিক। আজ আমরা আধলার কথা একেবারে ভুলে গেছি, অথচ

আমাদের অতীত জীবনে আধলার যে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল তা যেন ভুলেও ভোলা যায় না। জীবনের চলার পথে তাই পদে পদে মনে হয় আধলার অকালমৃত্যুর কথা—বলতে ইচ্ছা হয়,

'O Weep for আধলা, he is dead !'
'till the Future dares
forget the Past, his fate and
fame shall be
An echo and a light unto
eternity.'

আধলার অকালমৃত্যু ঘটেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রজ্বলিত লোভাগ্নির মধ্যে আমাদের দেশে 'সততার' মতন 'আধলা'ও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যুগে যুগে অনেক মুদ্রার জন্ম হয়েছে এবং মৃত্যুও হয়েছে স্বাভাবিকভাবে। আঞ্চলিক মুদ্রা হয়েছে প্রাদেশিক মুদ্রা, প্রাদেশিক মুদ্রা হয়েছে রাজমুদ্রা, রাজমুদ্রা হয়েছে সর্বদেশীয় মুদ্রা। নানা ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্যে, যুগ থেকে যুগান্তরে যাত্রার পথে আমাদের সমাজ মুদ্রা থেকে মুদ্রান্তরে যাত্রা করেছে। মুদ্রার যে নিজস্ব কোন মূল্যই নেই, কেবল পণ্য বিনিময়ের ক্ষমতার জন্যে, অর্থাৎ মধ্যবর্তী দালালির জন্যেই যে তার মূল্য, একথা অর্থতত্ত্ব না-জেনেও সকলেই জানেন। সুতরাং দেশে যখন পণ্যের উৎপাদন বাড়ে, লোকসংখ্যা বাড়ে, অর্থাৎ জাতীয় সম্পদ বাড়ে, তখন চল্‌তি মুদ্রার পরিমাণও বাড়তে থাকে এবং তার সঙ্গে বিনিময়ের হার বা মূল্যবৃদ্ধিও হতে থাকে। তার ফলে মুদ্রাসমাজের মধ্যে একেবারে প্রোলেটারিয়েট শ্রেণীর যারা, যেমন কড়ি পাই বা আমাদের আধলা, তারা ধীরে ধীরে অন্তর্ধান করে যায়, কারণ বিনিময়ের নতুন ইকুইলিব্রিয়ামে তাদের আর বিশেষ কোন মূল্য থাকে না। এইভাবেই বড় বড় দেশে বিভিন্ন যুগের প্রোলেটারিয়েট মুদ্রাদের বিলুপ্তি ঘটেছে, কেনাবেচার সমাজে বিনিময়যুদ্ধে যারা 'যোগ্যতম' তাদেরই উদ্বর্তন হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য দেশে যা হয়েছে, আমাদের দেশেও কি ঠিক তাই হয়েছে? আমাদের দেশের কড়ি, পাই ও আধলা কি ঠিক সেই

কারণেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? অনেকটা সেই কারণে বটে কিন্তু সম্পূর্ণ তার জন্যে নয়। আধলা তো নয়ই, এমনকি কড়িও নয়। জাতীয় সম্পদের (যাকে আমরা "ন্যাশনাল ডিভিডেণ্ড বা ইন্‌কাম" বলি) প্রাচুর্যের জন্যে বিনিময়ের তরঙ্গ-বিক্ষোভে আমাদের দেশের কড়ি পাই আধলারা যে মুদ্রার মহাসমুদ্রে বুদ্‌বুদের মতন বিলীন হয়ে গেছে, তা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। সম্পদ বেড়েছে ঠিকই, চল্‌তি মুদ্রার পরিমাণও অনেক বেড়েছে, মুদ্রাপণ্য বিনিময়ের স্তরও অনেক উন্নীত হয়েছে। কিন্তু যতটা সম্পদবৃদ্ধির ফলে মুদ্রাজগতের নিম্নতম স্তরের খুচরোদের ও রেজকীদের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটা উচিত ছিল, ততটা সম্পদ বাড়েনি। কথাটা অর্থনীতির গভীর তত্ত্বকথা, অতএব বেশিদূর অগ্রসর হয়ে কাজ নেই। আমার ধারণা আমাদের 'আধলা'র অকালমৃত্যু ঘটেছে, সত্যি-কথা বলতে গেলে দেশের মুদ্রানায়করা আধলাকে হত্যা করেছেন। শুধু আধলা নয়, পয়সা (ফুটোই হোক আর সলিডই হোক), ও দু-পয়সা পর্যন্ত আজ 'ফেটালি উণ্ডেড' হয়ে মৃত্যুশয্যায় দিন গুণছে। পাথরের নুড়ির মতন আজ আমরা পয়সা, দু-পয়সার ভার অনুভব করি পকেটে, বেশিক্ষণ বহন করতে হলে অস্বস্তি বোধ করি, ঝেড়ে ফেলতে পারলে যেন মুক্ত হই। কিন্তু কিছুদিন আগেও এই পয়সার যে কি প্রচণ্ড শক্তি ছিল, কি বিচিত্র জগৎ সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল, ভাবলে আজ অবাক হতে হয়। বাস্তব জগতে পয়সা, আধলা, পাইয়ের কোন মূল্য নেই বলে ভাবা যায় না যে এই পয়সাসর্বস্ব দুনিয়ায় তাদের মূল্য সত্যিই নেই। কাগজেকলমে আজও তাদের অনেক মূল্য আছে। সামান্য পাইয়ের কথা বলি। বিরাট একটি ব্যাঙ্কে সেদিন একান্নটাকা, সাত আনা, এক পাইয়ের একটি চেক্ ভাঙাতে গিয়েছিলাম। এক পাইয়ের জন্যে কেশিয়ার আমাকে আধঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রেখে দিলেন, পাইয়ের মায়া কাটিয়ে আমি আসতে চাইলেও, তিনি হিসেবের নির্ভুলতার জন্যে কিছুতেই আমাকে ছাড়েননি, বলেছেন: 'স্ট্রং রুম থেকে পাই আনতে দিয়েছি, এলে নিয়ে যাবেন।' বুঝুন অবস্থাটা! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও পাই নেই, কিন্তু বড় বড় ব্যাঙ্কের স্ট্রং রুমে আজও তারা আছে, কারণ আমাদের এই

জমাখরচের সভ্যসমাজে মৃত পাইয়ের প্রেতাত্মার কবল থেকে আমাদের মুক্তি কোথায়? তাই ভাবছিলাম, পাই আধলার মৃত্যু নেই। বাইরের বাজারে তাদের অকালমৃত্যু হলেও, ব্যাঙ্কের স্ট্রং রুমে তারা ভূত হয়ে রয়েছে। তবু তাদের 'রেসারেকশনে'র জন্যে কাউকে কোনদিন আবেদন করতে শুনিনি আজ পর্যন্ত।

কড়ির কথা বলি। কড়ির আজ কাণাকড়িও মূল্য নেই, কিন্তু এককালে যে ছিল তার প্রমাণ শুভঙ্করী এবং ধারাপাতের 'কড়াকিয়া'। কড়ি নিয়ে আমরা বাজারে কেনাবেচা করতাম, যেমন পনের গণ্ডার তরকারি, ষোল কড়ার শাক, দেড়বুড়ীর মোচা-থোড়, দশকড়ার রম্ভা, একপণের মাছ ইত্যাদি। মাত্র একশ বছর আগেও কড়ি চলত আমাদের বাজারে। তারপর সেকালের কড়ি ঠিক একালের পাই আধলার মতন উঠে যায়। তাতে লোকের কতটা অসুবিধা হয় তা সমসাময়িক একটি বিবরণ থেকে (১৮৩০ সালের) বুঝতে পারা যায়ঃ

'এইক্ষণে পয়সার বাহুল্যেতে কড়ি একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে, যদ্যপিও বণিকেরা কিঞ্চিৎ কড়ি রাখিয়া থাকে তাহা প্রায় দেওয়া নেওয়া হয় না, বাজারে দ্রব্যের মূল্য এক পয়সা আধপয়সার ন্যূন কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না যদি আট কড়া দশ কড়ার কোন দ্রব্য লইতে হয় তথাপি একটা পয়সা তজ্জন্য বাজারে প্রেরণ করিতে হয়, 'এককড়ার ভিখারীরা একপয়সা চাহে সুতরাং কড়ি না থাকিলে পয়সা দিতে হয় অথবা তাহাকে রিক্ত হস্তে বিদায় করিতে হয়...' ইত্যাদি।

কড়ির জন্যে এই যে গভীর বেদনাবোধ এটা শুধু সংস্কার বা অভ্যাস নয়। দেশের সম্পদের যদি আনুপাতিক বৃদ্ধি হত এবং লোকের গড়পড়তা আয় বাড়ত, তাহলে কড়ির জন্যে সেকালের লোক এইভাবে আক্ষেপ করত না এবং টাকশালের সাহেবদের কাছে প্রার্থনা জানাত না এই মর্মেঃ 'টাক্সালের বিবেচক সাহেবরা এমত কোন ধাতু, দস্তা বা সীসা ইত্যাদির আধ পাই সিকি পাই প্রস্তুত করিয়া চলন করেন তাহা হইলে লোকের মহোপকার হইবেক—এ বিষয় শুনিতে অতি সামান্য বটে কিন্তু দুঃখি-লোকের পক্ষে সামান্য নহে—'। এই

আবেদনের আলোকে আজও একবার আধলার কথা চিন্তা করা দরকার নয় কি ?

আধলার কথা এযুগের শিশুরা জানে না, তারা কখনও আধলা চোখেও দেখেনি। জীবনে কোনদিন আধলার জন্যে আক্ষেপ করবার কোন কারণ ঘটবে না তাদের। কিন্তু আমরা এবং আমাদের জেনারেশন যারা আধলা স্বচক্ষে দেখেছি, আধলার ঝংকার শুনেছি, আধলার 'পার্চেজিং পাওয়ার' বা ক্রয়শক্তি জীবনের প্রতিদিন মর্মে মর্মে অনুভব করেছি এবং আজও অনেক অসংলগ্ন মুহূর্তে পকেটে হাত দিয়ে একটা ফুটো পয়সার বদলে একটা সলিড আধলার জন্যে মধ্যে মধ্যে আফসোস করি, তারা আধলার কথা ভুলবে কি করে ? চেষ্টা করলেও আমরা আধলার কথা ভুলতে পারব না কোনদিন। আমাদের জীবনের কত রোমান্স, কত দুঃসাহসিক অভিযানের স্মৃতি এই আধলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। চার বন্ধু মিলে ঢাকুরিয়ায় সারাদিন বসে লেকে মাটি কাটা দেখেছি, চারজনের সম্বল চারটি আধলা শুধু এবং তাতেই মনের কি জোর ! সন্ধ্যার সময় চার আধলায় চারজন পেটভরে জলপান করে ঘরে ফিরেছি। এখন সেই ঢাকুরিয়া লেকে চারবন্ধু চার টাকায় কেবল ঢোক্ গেলা ছাড়া আর কিছুই গেলা যায় না। আমাদের উত্তমমধ্যম প্রহার করে আমাদের বাবারা একটি আধলা দিয়ে যেমনভাবে আমাদের খুশি করতে পেরেছেন, আজকালকার ছেলেমেয়েদের সামান্য কানমলার জন্যে টাকা দিয়েও তা করা যায় না। এই আধলার জোরে জীবনে আমরা কত বন্ধুত্ব, কত ভালবাসা, কত রোমান্স করেছি তার হিসেব নেই। আধপয়সার মাছ-লজেন্স, ফুলুরি বা কাঠিবরফ কিনে দিয়ে সেকালের ষষ্ঠবর্ষীয়া লক্ষ্মী ও পাঁচিদের বেশ সহজেই বশ করে ফেলা যেত, কিন্তু একালে ষষ্ঠবর্ষীয়া ডলিরুবিদের চার টাকার 'আইসক্রীম ও চকোলেট' কিনে দিয়েও মন পাওয়া যায় না। বাজারে তখন আধলার একটা রীতিমত মর্যাদা ছিল, শাক লঙ্কা লেবু মশলা সব আধলার বিনিময়েই যা পাওয়া যেত তাতেই চলে যেত, এখন একআনা একভাগা শাকের চারভাগের একভাগ একপয়সায় চাইলেও পাওয়া যায় না, কারণ আধলা

কেন, পয়সারও কোন মর্যাদা নেই। তখন ভিখিরীদের একটা আধলা দিলে আধঘণ্টা ধরে তারা আশীর্বাদ করত, এখন একটা পয়সা দিলে একঘণ্টা ধরে অভিসম্পাত দেয়। তার কারণ তখন আধলা ছিল সলিড, এখন পয়সারও মাঝখান ফাঁকা। মনে হয় যেন একটা সলিড বনিয়াদের উপর আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, হোক না তা আধলার বনিয়াদ—কিন্তু এখন যার উপর দাঁড়িয়ে আছি তার মাঝখানটাই শূন্য। বর্তমান যুগ ও জীবনের প্রতীকচিহ্ন এই কেন্দ্রশূন্য পয়সা।

জীবন ও যুগের ধর্মই এই। যুগ বদলায়, জীবনও বদলায়। পরিবর্তনের স্রোতে কড়ি, আধলা, পাই সব ভেসে যায়, পয়সাও ফুটো হয়ে যায়। কিন্তু তবু আধলার স্মৃতিবিজড়িত সেই হারানো দিনগুলোর কথা চিন্তা করলে মনে হয়—

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না
সেই যে আমার আধপয়সার দিনগুলি—

আয়না

If the outer world was changed by glass, the inner world was likewise modified. Glass had a profound effect upon the development of the personality : indeed, it helped to alter the very concept of self.

—Lewis Mumford.

দিনের মধ্যে অন্ততঃ দশবার আয়নায় মুখ না দেখলে মনটা খুশি হয় না, নিজেদের মুখ সম্বন্ধে এমনই আমরা আজকাল সচেতন। মুখটা পাঁচের মতন, কি পেঁচার মতন, সেটা বড়ো কথা নয়, তার চেয়ে অনেক বড়ো কথা হল, মুখটা আমার নিজের মুখ। আয়নায় নিজের মুখ নিজে

দেখা যায়। দেখতে দেখতে এযুগের অতিকুৎসিত রমণীমোহনেরও মনে হয়, তাইতো! গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ আমার চেয়ে এমন কি আর বেশি সুন্দর! ভীষণদর্শনা শকুন্তলা দেবীরও মনে হয়, লিপস্টিক ও ভ্রূপেন্সিল ঘষতে ঘষতে যে অপ্সরী মেনকাও রূপলাবণ্যে তাঁর কাছে হার মেনে যায়। সবই হয় আয়নার মহিমায়। আয়নার গুণে বোঁচা হয় কৃষ্ণ, বুঁচি হয় কৃষ্ণা। আয়না না থাকলে নিজের গোপন সৌন্দর্য মানুষ আবিষ্কার করতে পারত না। নিজের সৌন্দর্যবোধই হল ব্যক্তিত্ববোধ এবং আয়নাই সেই ব্যক্তিত্ববোধের জন্মদাতা। আয়নাপূর্ব যুগের বৈশিষ্ট্য হল সমগ্রতাবোধ, আয়নাযুগের বৈশিষ্ট্য স্বাতন্ত্র্যবোধ।

যেকোন শিশুকে যত সুন্দরই বলা যাক না কেন, সে কিছুতেই খুশি হবে না, কারণ সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোন চেতনাই তখনও তার হয়নি। কিন্তু পাঁচ বছরের সেই শিশুকে একবার যদি একটি আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে অবাক হয়ে সে তার প্রতিফলিত চেহারার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকবে। কতরকমের অঙ্গভঙ্গি, মুখভঙ্গি করবে আয়নার দিকে চেয়ে চেয়ে। বাইরের জগতের শিশু সেই আয়নার শিশুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে কত কি মনের কথা বলবার চেষ্টা করবে তার ঠিক নেই। পৃথিবীর শিশুর সঙ্গে যখন থেকে এইভাবে আয়নার শিশুর প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়, তখন থেকেই শিশুর মধ্যে আমিত্ববোধ জাগে। তাই ঘুরে ফিরে, মনের মতন খেল্না ছেড়েও, বারবার সে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। মা পিসিমা দিদিমারা তার নাক-মুখ-ঠোঁট নেড়ে যত আদরই করুন, যত বিনিয়ে বিনিয়ে রূপের ব্যাখ্যাই করুন, মন তার কিছুতেই খুশিতে ভরে ওঠে না যেন। সে ঐ আয়নার সামনে এসে দাঁড়াতে চায়। ঠিক স্পষ্ট কিছু বোঝে না, তবু একমাত্র ঐ আয়নার সামনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার আব্‌ছা আব্‌ছা মনে হয় যে সে একটা স্বতন্ত্র সত্তা। বয়স যত বাড়তে থাকে তত এই সত্তাটাও ফাঁপতে থাকে। অর্থাৎ বাইরের শিশুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আয়নার শিশুও বাড়তে থাকে, কৈশোরের চাঞ্চল্যের সঙ্গে সত্তারও চাঞ্চল্য জাগে। বাইরের শিশু কিশোর হয়, আয়নার শিশুরও কৈশোর আসে। তাই আয়নার সামনে শিশুর চেয়ে

কিশোর-কিশোরীদের আনাগোনা অনেক বেড়ে যায়। সৌন্দর্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধ তার অনেক তীব্রতর হয়। কৈশোরের নতুন সৌন্দর্য আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনুভব করতে অনেক বেশি সময় লাগে। তারপর বাইরের শিশুর মতন আয়নার শিশুরও ভরা যৌবন আসে। সৌন্দর্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধ কানায় কানায় ভরপুর হয়ে টলমল করে, সমস্ত আয়নাটা জুড়ে যেন তার প্রতিফলন হয়। বাইরের জগৎটাকেও তখন মনে হয় যেন একটা বিরাট আয়না, তখন জীবনের প্রত্যেক পদে পদে নিজের মুখ, নিজের রূপ, নিজের সত্তা ছাড়া আর কিছুই আমরা দেখতে পাই না। সারা যৌবনটা যেন আমাদের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কেটে যায়। এই যে আয়নাময় জীবন, এই হল যৌবন। তারপর যৌবনের প্রান্তসীমা থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত ইতিহাস হল আয়নার সঙ্গে আমাদের জীবনের বিচ্ছেদ ও ব্যবধানের ইতিহাস। অস্তগামী জীবনের ছায়াটাই তখন শুধু আয়নায় প্রতিফলিত হয়। স্বাতন্ত্র্যবোধ, আমিত্ব ও অহমিকা সবই তখন ঐ ছায়ার মতন অস্পষ্ট ও ঝাপসা হয়ে আসে। জীবনে আয়নার মূল্য যায় কমে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কৈশোর ও যৌবনকালে তৃপ্তি হত না, প্রতি মুহূর্তে মনে হত যেন আয়নার ভেতর দিয়ে নিজেকে নব নব রূপে আবিষ্কার করছি—যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হত আয়নার 'আমি' ও বাইরের 'আমি' ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই,—মনে হত আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত এক বিরাট আয়নার সামনে শুধু দাঁড়িয়ে আছি আমি—সেই আয়নার সামনে আর ক্ষণিকের জন্যেও দাঁড়াতে ইচ্ছা করে না, ভয় করে, মনে হয় অস্তগামী আমির গোধূলিরঙে যেন ভরে গেছে আয়না—এবং আয়নায় প্রতিফলিত 'আমি', আয়নায় পরিবর্ধিত 'আমি' ক্রমে এক বিলীয়মান ধূসর 'আমি'তে পরিণত হচ্ছে।

মনে হয়—

আয়না—আয়না,
একবার আর কি রে
ফিরে পাওয়া যায় না?

সেই মুখ, সেই আমি!
একবার বল্ না—
ফিরে পাওয়া যায় না?
আয়না, আয়না—

এই আয়না মেয়েরা ভ্যানিটিব্যাগে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা গোঁফে চাড়া দিই, বুকের ছাতি ফোলাই, ব্যাকব্রাশ করি। অথচ আয়না এমন কি আর জিনিস! আয়না কাচের তৈরি এবং কাচ তো হাজার হাজার বছর আগে মানুষ আবিষ্কার করেছে। বালি দিয়ে কাচ তৈরি করেছে মানুষ। যে-বালির উপাদান শুধু স্ফটিক বা বিল্লোর, যার দানা বর্ণহীন ও প্রায় সমান, তাই দিয়ে অনেক উৎকৃষ্ট কাচও তৈরি হয়েছে। কাচের তৈরি নানারকমের শৌখিন পাত্রে আমরা অনেক শখ মিটিয়েছি মধ্যযুগে। কাচের ঝাড়লণ্ঠনে আলো জ্বেলে ধাঁধিয়ে দিয়েছি চারিদিক, কাচের সার্শীর ভিতর দিয়ে বাইরের আলো এনেছি ঘরে। কিন্তু তাহলেও, যতদিন না এই কাচ দিয়ে আমরা ভাল আয়না তৈরি করতে পেরেছি, ততদিন পর্যন্ত মাটির পৃথিবীটাকে কাচের পৃথিবীতে পরিণত করতে পারিনি। সে খুব বেশিদিনের কথা নয়, ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর কথা—অর্থাৎ বর্তমান ধনতান্ত্রিক যুগের গোড়ার কথা।

মধ্যযুগের কাচ, নানারকমের স্বচ্ছ স্ফটিকের কাচ, রঙ বেরঙের কাচ, ধনতান্ত্রিক যুগে আয়নায় পরিণত হল। মানুষের সমাজে ও ব্যক্তিগত জীবনে যুগান্তর আনল এই আয়না। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির এক মৌলিক রূপান্তর ঘটল। মধ্যযুগ পর্যন্ত আমরা শুধু আমাদের কায়ার ছায়া দেখেছি বাইরে, স্বচ্ছ সরোবর ও দীঘির জলে, চকচকে পালিশকরা ধাতুর পাতের উপর, অথবা কালো পটভূমির ঝাপসা আয়নায়। তাই মধ্যযুগে বাস্তব জগৎ কেবল ছায়াময় ধোঁয়াটে ও ঝাপসা বলে মনে হত আমাদের কাছে। সেই ছায়াময় জগতে অনেক কিছুই আমরা কল্পনায় সৃষ্টি করতাম এবং নিজেদের অস্তিত্ব পর্যন্ত ঠিক ঐ ছায়ার মতন মিথ্যা বলে মনে হত। ধনতান্ত্রিক যুগের আয়নায় আমরা প্রথম আমাদের অস্তিত্বকে আবিষ্কার

করলাম, খুঁজে পেলাম আমাদের অস্তিত্বকে, ব্যক্তিত্বকে এবং তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে-চেয়ে মুগ্ধ হলাম। এযুগে আমি আর কায়াহীন ছায়া নই, আমি হলাম কায়াময় 'আমি' এবং সকলের মধ্যে আমিই স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত ও স্ফীত হয়ে ভেসে উঠলাম আয়নায়। মধ্যযুগের ছায়াময় একাকার জগতের বদলে এযুগের জগৎ হল একার জগৎ। আমির জগৎ সৃষ্টি করল আয়না।

সুতরাং আয়না শুধু আয়না নয়, সামান্য জিনিসও নয় আয়না। ব্যাগের মধ্যে যদি আজ টাকার সঙ্গে আয়না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, এই টাকা ও আয়নাই হল আধুনিক জীবনের প্রতীক। মধ্যযুগের রাজারাজড়ারা তাঁদের রাজকীয় প্রসাধন করতেন ভৃত্যের পরিচর্যায় এবং মোশাহেবদের মুখের বাহবায় নিজেদের রূপগরিমা উপলব্ধি করতেন। স্বর্ণশিরস্ত্রাণ, অঙ্গদ ও কুন্তল পরিধান করে, তীরধনুক বল্লম তলোয়ার হাতে নিয়ে সে-যুগের বীর যোদ্ধারা হয়ত বড়জোর একবারটি কোন সরোবরের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়া দেখতেন জলের উপর, কিন্তু এ যুগের কোন শিল্পসম্রাট দীঘির জলে নিজের ছায়া দেখে খুশি হন না। আয়নাজোড়া বিশাল হলঘরে তাঁরা ঘুরেফিরে নিজের মুখভঙ্গি, চলার ভঙ্গি, এমনকি হাসি ও কথা বলার ভঙ্গি পর্যন্ত অভ্যাস করেন। শিল্পমালিক থেকে চিত্রজগতের অভিনেতা অভিনেত্রী, সকলেই এখন আয়নাজোড়া ঘর চান। সখিরা সাজিয়ে দিলে এ-যুগের তরুণীদের মন ওঠে না। ড্রেসিং টেবলের দীর্ঘ ঝকঝকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, বসে বসে, নীলডাউন হয়ে, ঘুরেফিরে নিজের অঙ্গসজ্জা নিজেই করা চাই। তবে সাধ মেটে। ভ্রূজোড়া ভোমরার মতন কালো ও ধনুকের মতন টানাটানা হল কি না, ঠোঁটজোড়া টিয়াপাখির মতন লাল হল কি না, শাড়ির সঙ্গে ব্লাউস, ব্লাউসের সঙ্গে জুতো এবং জুতোর সঙ্গে কপালের টিপ ম্যাচ করল কিনা—এসব কি সখিদের উপর ভরসা করে ছেড়ে দেওয়া যায়? কখনই না। একমাত্র আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আধুনিক নারীর নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়। অঙ্গসজ্জার কথা ছেড়ে দিয়ে প্রকাশভঙ্গির কথাই ধরুন না কেন। চোখের নানারকম চাউনি আছে, ভ্রূর বিভিন্ন কুঞ্চন আছে, হাসির

তারতম্য আছে—প্রত্যেক ভঙ্গির আবেদনের ভিন্নতা আছে—রীতিমত ড্রেস-রিহার্সাল দিয়ে যা ঠিক করতে হয় এবং আয়নার সামনে ছাড়া কেবল সখিদের দ্বারা যা কোনমতেই সম্ভব নয়। তাই আধুনিক নারী অন্য সব কিছু বর্জন করতে রাজী হলেও, আয়না বর্জন করতে রাজী নয়। কারণ একমাত্র আয়নার সামনে দাঁড়িয়েই আধুনিক নারীর ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে ফুলের মতন ফুটে ওঠে। আয়না তাই এযুগের স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ব্যক্তিত্বের জন্মদাতা। আধুনিক যুগ তাই আয়নার যুগ, আয়নায় প্রতিফলিত 'আমি'র যুগ, আয়নায় পরিবর্ধিত অহমিকার যুগ।

হাততালি

There is no human sound so universally moving as that of applause. It begins very often with scattered clapping, gradually increases, droops for a moment and then gaining, as it were a second wind, swells and swells till it bursts into tempestuous shouts. It is a wave that having gained its utmost volume breaks inevitably with a great crash.

—The Times. 24-9-42.

জীবনে প্রত্যেক পদে পদে 'হাততালি'র জন্যে আমরা যেরকম লালায়িত হয়ে থাকি, সেরকম বোধ হয় আর কিছুর জন্যে হই না। তার কারণ 'এক হাতে তালি বাজে না', তালির জন্যে হাজার হাজার হাতের প্রয়োজন হয় এবং হাততালির শব্দতরঙ্গে জনতার সম্মিলিত হর্ষধ্বনির যে অভিনব প্রকাশ আমরা দেখতে পাই, তাতে আমাদের ব্যক্তিসত্তা বেলুনের মতন ফুলে ফেঁপে উঠে ফেটে পড়তে চায়। ছেলেবেলায় 'ভানুমতীর খেল' দেখবার সময় জীবনে প্রথম হাততালির জাদুকরী শক্তির প্রভাব

উপলব্ধি করেছি। চোখের সামনে দেখেছি, জাদুকর কাঠের ঢাকনির তলায় সচল টাকা চাপা দিয়ে রাখল, তারপর সমবেত বালকদের দিকে চেয়ে বলল, 'বাচ্চালোক, এক দফে হাততালি লাগাও!' সকলে মিলে যেমনি হাততালি দিলাম অমনি চোখের সামনে সেই ঢাকনির তলা থেকে টাকাটা অদৃশ্য হয়ে গেল। মনে হল যেন হাততালির শব্দতরঙ্গের সঙ্গে ঢাকনাবদ্ধ সেই টাকার ডানা-ঝাপটানি শুনতে পেলাম এবং আমাদের তালির তালে তালে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বিহঙ্গের মতন জাদুকরের 'রুপিয়া' দিগন্তে মিলিয়ে গেল, দেখতে পেলাম না। সেইদিন থেকে বুঝেছি হাততালি কাকে বলে, হাততালি কি জিনিস, হাততালির কি প্রচণ্ড জাদুকরী শক্তি এবং ভানুমতীর খেলায় হাততালি কেন অপরিহার্য উপকরণ। তারপর যখন বড় হয়েছি, বুদ্ধি হয়েছে, তখন দেখেছি, বাস্তব জীবনের রঙ্গমঞ্চে যখন আমরা যে অভিনয় করি তখন তার প্রত্যেক রঙ্গভঙ্গির জন্যে পদে পদে আমরা হাততালি চাই। মঞ্চে অবতীর্ণ হবার সময় একদফা হাততালি, অঙ্গভঙ্গিমার সময় আর একদফা হাততালি, বাচিকাভিনয়ের সময় হাততালি এবং মঞ্চ থেকে বিদায়কালে আর একদফা হাততালি। জীবনের প্রত্যেক পর্বের পটভূমিকাটা যদি এই-ভাবে হাততালি দিয়ে রচনা করা যায় তাহলে সুদক্ষ অভিনেতার মতন আমরা সার্থক অভিনয়ও করতে পারি, তা না হলে সমস্ত অভিনয় ব্যর্থ হয়ে যায়। যদি এই হাততালির ধ্বনিতরঙ্গের ঐন্দ্রজালিক শক্তি না থাকত, তাহলে সমাজের জাদুকরেরা এমন সুন্দরভাবে সকলকে ভানু-মতীর খেলা দেখাতে পারতেন না।

আমাদের এই আজব কলকাতা শহরে সাধারণত অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে 'হাততালি' ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছয়, মধ্যে মধ্যে সুপার ক্লাইম্যাক্সেও পৌঁছয়। যেমন সভা-সমিতি, সম্মেলন-অধিবেশন, সিনেমা-খেলাধুলা, প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন ইত্যাদি চিরাচরিত হিড়িকের বিচিত্র কোলাহল একত্রে মিলিত হয়ে, এই বিরাট কলকাতা শহরকে এক বিরামহীন হাত-তালি-প্রতিধ্বনিত প্রেক্ষাগৃহে পরিণত করে। হাততালির উত্থানপতনের, উৎপত্তি-পরিণতির একটা নিজস্ব তরঙ্গায়িত ছন্দরেখা বা 'সাইক্লিক কার্ভ'

আছে। প্রত্যেকেই সেটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। সভাগৃহের এককোণ থেকে হয়ত একজোড়া হাত থেকেই তালি বাজা প্রথমে শুরু হয়। তারপর তালে তালে হাত থেকে হাতান্তরে একাধিক হাতে সেই তালি ধ্বনিত হতে থাকে। অবশেষে সেই বিক্ষুব্ধ ফেনায়িত উচ্ছ্বসিত তালিতরঙ্গ চূড়াকারে ধ্বনিশীর্ষে আরোহণ করে ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর শব্দায়নে পুনরায় একজোড়া হাতে অবরোহণ করে নিস্তরঙ্গ নিঃশব্দতায় বিলীন হয়ে যায়। গ্রাফের সাহায্যে হাততালির তরঙ্গায়িত গতির এই কার্ভ এঁকে দেখান যায়। হাততালির এই উত্থান-পতন-মুখর গতিতরঙ্গ কলকাতা শহরে অদ্ভুতভাবে আত্মপ্রকাশ করে। পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ দিক থেকে কলকাতায় এই হাততালি শুরু হয় অলিতে-গলিতে। সাপ খেলানোর হাততালি, বাঁদর নাচের হাততালি, রাস্তায় অসংখ্য জাদুকরদের ভেলকি খেলার হাততালি, কলকাতার অলিগলি থেকে খালনালা-বিলের স্রোতোধারার মতন এসে মিলিত হয় প্রত্যেক পার্কে পার্কে, পাড়ার খোলা মাঠে. রাজনৈতিক সভার হাততালির নদনদীতে। হাততালির ভলিউম বাড়তে থাকে। তারপর সেই হাততালির নদীস্রোত চতুর্দিক থেকে প্রচণ্ড বেগে এসে কলকাতার কেন্দ্রস্থলে ক্রিকেট-মাঠের হাততালি এবং মনুমেণ্ট ও ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের সভার হাততালির মহাসমুদ্রে মিলিত হয়। এর সঙ্গে এপাশ-ওপাশ একোণ-সেকোণ থেকে আর্ট-প্রদর্শনীর হাততালি, সাহিত্যসভা ও বিজ্ঞান কংগ্রেসের হাততালি, সিনেমা হলের হাততালি, ছোট ছোট বিদায়সভা ও সম্বর্ধনাসভার হাততালি, হোটেলের নৈশ-নৃত্যের হাততালি, টি-লাঞ্চ-ডিনার পার্টির হাততালি—সব রকমের বিচিত্র হাততালি, নানারকমের নরম তুলতুলে ও কড়াহাতের হাততালি, পেলব লীলায়িত ওরিয়েন্টাল হাতের ও কুৎসিত শক্ত শিরা-ওঠা হাতের হাততালি, ছোট বড় মাঝারি সব সাইজের হাতের হাততালিও এই মহাসমুদ্রে মিশে যায়। মনে হয় যেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা কলকাতা শহর এক হাততালি-মুখর বিশাল প্রেক্ষাগৃহে পরিণত হয়েছে। একদিকের হাততালির সঙ্গে অন্যদিকের হাততালির কোন সম্পর্ক নেই। একই হাততালি, কিন্তু বিভিন্ন উৎস থেকে তার উৎপত্তি,।

সেই ভানুমতীর খেলওয়ালার 'একদফে হাততালি লাগাও'-এর এত-রকমের বিচিত্র প্রকাশভঙ্গি জীবনে এর আগে কোনদিন দেখিনি। হাততালি শুনে শুনে হতভম্ব হয়ে গেছি, মনে হয়েছে এই হাততালির ফ্রিকশনের চোটেই বোধ হয় কলকাতা শহর থেকে শীত পালিয়েছে। শীতকালেও আবহাওয়া গরম হয়ে ওঠে কেবল বক্তৃতা ও হাততালির ঘর্ষণের জন্যে। একদিকে ভানুমতীর ভেল্‌কির হাততালি, অন্যদিকে বিজ্ঞান-কংগ্রেসে বিখ্যাত বায়োকেমিস্টের বক্তৃতায় হাততালি, একদিকে রাজনৈতিক সভার বক্তৃতায় হাততালি, অন্যদিকে তার সম্পূর্ণ বিরোধী বক্তৃতায় সেই একই হাততালি, মনে হয় যেন হাততালির অদৃশ্য বন্ধনে আমাদের প্রত্যেকের প্রাণটি বাঁধা। একমাত্র এই হাততালির অপূর্ব মহামিলন থেকেই বোঝা যায় যে, বাইরের বিরোধ ও বৈষম্যের মধ্যেও মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে। এই ঐক্য ঠিক হাততালির মতনই সনাতন সত্য।

হাততালির মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খেয়ে, হাততালির গতিতরঙ্গে ওঠানামা করতে করতে, একটা কথা আমার বারবার মনে হয়েছে—হাততালির পরিণতি কোথায়? হাততালির ও হর্ষধ্বনির এই যে তরঙ্গ-বিক্ষোভ, এইটাই কি একমাত্র সত্য? দেখলাম তা নয়, সব জিনিসের যেমন দুটো দিক আছে, হাততালিরও তেমনি দুটো দিক আছে। হাততালির একটি সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য না দেখলে হঠাৎ একথাটা আমার মনে হত না। ময়দানের এক বিরাট জনসভায় তুমুল হাততালি শুনে ফিরে আসছি, দূর থেকে তার প্রতিধ্বনি তখনও কানে পৌঁছচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ শুনলাম কাছেই হাততালির শব্দ। দেখলাম দীর্ঘকায় এক প্রায়নগ্ন ক্ষিপ্তোন্মাদ নির্ভীক পদক্ষেপে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মতন রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে, আর তার পিছন পিছন একদল লোক (ছেলে বুড়ো সকলে) যাচ্ছে হাততালি দিতে দিতে। আশপাশের বাড়ির ছাদে ও বারান্দাতেও অসংখ্য দর্শকের ভিড় জমেছে, রাস্তাতেও ভিড় বাড়ছে। ক্রমে হাততালির ভলিউম বাড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে পাগলটি ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে: 'হাততালি দিচ্ছিস—আমাকে পাগল পেইছিস—না?' তারপর চারিদিকে

তাকিয়ে আঙুল দেখিয়ে বক্তা (পাগল) বললে ঃ 'এই যে সব দেখছিস, সব পাগল, সব ব্যাটাই পাগল, আমি শুধু ক্ষেপে ঠকেছি।' সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হর্ষধ্বনি হল, আবার হাততালি পড়ল।

একটি চায়ের দোকানে বসে বসে হাততালির সুগভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করলাম। হাততালি দু-রকমের আছে—সামনের হাততালি ও পিছনের হাততালি। শ্রোতা ও দর্শকরা যখন আপনার সামনে দাঁড়িয়ে বা বসে হাততালি দেয়, তখন আপনি মহৎ ব্যক্তি, জননেতা, পণ্ডিত, বিজ্ঞানী অনেক কিছু। কিন্তু মনে রাখবেন, হাততালির এইখানেই শেষ নয়। এই শ্রোতা ও দর্শকরা যদি হঠাৎ ঘুরে গিয়ে আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে থাকে, তাহলেই জানবেন আপনি পাগল ছাড়া আর কিছুই নন। সুতরাং সামনের হাততালির শব্দতরঙ্গে আনন্দে আত্মবিস্মৃত হবার আগে পিছনের সেই ভয়াবহ হাততালির কথা মনে রাখা উচিত, তাহলেই দেখবেন কোন হাততালিতেই আত্মহারা হবেন না।
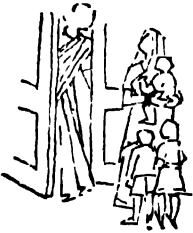
গরীব আত্মীয়

'A poor relation is the most irrelevant thing in Nature—a Lazarus at your door—a Lion in your path—a frog in your chamber,—a fly in your ointment,—a mote in your eye.'
—Charles Lamb.

সংসারে ধনী লোকের গরীব আত্মীয়ের সংখ্যাই বেশি। আমার পাঠকদের মধ্যে অধিকাংশই যে তাই, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ

নেই। আমরা, অর্থাৎ বড়লোকের এই গরীব আত্মীয়রা, যেন প্রকৃতির সারপ্লাস্ সৃষ্টি। কোন প্রয়োজন ছিল না আমাদের সৃষ্টি করবার, তবু যেন আমরা অসংখ্য পরগাছার মতন চারিদিকে গজিয়ে উঠেছি। ছেঁটে ফেললেই আপদ চুকে যায়, কিন্তু ছাঁটা যায় না, কারণ বাস্তবিকই তো আমরা চুল নই, ঘাস নই, কাঁটাগাছ নই,—মানুষ। অর্থাৎ 'মানুষ আমরা, নহি তো কেশ!' সুতরাং ছাঁটাকাটা আর হয় না। পরগাছার মতন সংখ্যা আমাদের বেড়েই যায়। আমরা ঘুরে বেড়াই, দরজায় দরজায়, বনেজঙ্গলে নয়। অন্যের খোলা দরজায় নয়, ধনিক আত্মীয়ের বন্ধ দরজায়। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনলেই নাকি আমাকে চেনা যায়। বিরক্তির সুরে তিনি আমার সম্বন্ধে বলেন ঃ

'He is known by his knock.'

সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের স্বরূপ যেমন এক ও অভিন্ন, দ্বিতীয় নাস্তি, তেমনি বড়লোকের গরীব আত্মীয় আমি, আমিও এক, অদ্বিতীয় ও অবিভাজ্য। আমাকে চেনার জন্যে চোখে দেখবার প্রয়োজন হয় না, কারণ ভক্তিভরে আমাকে স্মরণ করবার আগেই আমি দেখা দিই। শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ ভালবাসা—এসব আমি জীবনের জঞ্জাল বলে মনে করি। সমস্ত জঞ্জাল সাফ্ করে আজ তাই আমি নির্বিকার। আমার কিছুতেই কিছু আসে যায় না। আমি জানি, কত লোকে কতভাবে দরজার কড়া নাড়ছে, কতরকমের ভঙ্গিতে, আমার নাড়ার মধ্যে সত্যিই কোন বিশেষত্ব নেই, তবু নাকি দরজার শব্দ শুনলেই বোঝা যায়, আমি এসেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই ধনিক আত্মীয়ের মুখ শুকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যায়। আমি জানি আমার কণ্ঠে বাগ্‌দেবীব কৃপায় কোন বিশেষ স্বরগ্রাম সংযোজিত হয়নি, তবু কোলাহলমুখর উৎসবপ্রাঙ্গণে অন্যান্য আরও অনেকের মতন আমিও যখন—'কি হে রমেশ, বাড়ি আছ নাকি!'—বলে আমার উপস্থিতি (সবংশে) অত্যন্ত অনাড়ম্বরে ঘোষণা করি, তখন 'এই আবার এসেছে' বলে আমার পরমাত্মীয়ের প্রায় বাকরোধ হবার উপক্রম হয়। জানি না, আমার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে কি জাদু আছে, যার স্পর্শে সমস্ত উৎসবটাই যেন ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু কি করব বলুন! না গিয়েও

তো পারি না। রমেশ আমার একমাত্র পিসতুতো ভাই এবং শুধু তাই নয়, রমেশের মা আমার একমাত্র পিসিমা। ছেলেবেলায় আমরা একসঙ্গে পড়েছি, খেলেছি, মাছ ধরেছি, খেজুররস খেয়েছি। আজ না হয় সে ভাগ্যচক্রে হাজার টাকার মাইনের বড় অফিসার, আর আমি সেলাইকলের ক্যানভাসার। কিন্তু তবু সে তো আমার পিসতুতো ভাই, নিজের ভাইয়ের মতনই আপন। তার মেয়ের বিয়েতে আমন্ত্রিত না হলেও, না গিয়ে আমি থাকি কি করে! সংসারে কর্তব্য করতে আমরা এসেছি। অন্যে তার কর্তব্য করল কিনা, তার জন্যে নিজের কর্তব্য অবহেলা করা যায় না। একথা আমার পিসতুতো ভাইকে আমি অনেকবার বলতে বাধ্য হয়েছি। সে যে রীতিমত অবস্থাপন্ন এবং আমার অত্যন্ত নিকট আত্মীয়, একথা বাইরের অনাত্মীয়দের কাছে দস্তুরমতো বুক ফুলিয়ে আমি বলে বেড়াই, অবশ্য নিজের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কাছে তার নিন্দা না করে আমি জলস্পর্শ করি না। এটা আমার স্বভাব। শুধু আমার নয়, বিশ্ব-সংসারের সমস্ত গরীব আত্মীয়েরই এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

রক্তসম্পর্কিত কেউ, কোন নিকট বা দূর আত্মীয় যদি অবস্থাপন্ন ও প্রতিপত্তিশালী হন, তাহলে বাইরের সমাজে গরীব আত্মীয়রা সবার আগে সবচেয়ে বেশি তাঁর ঢাক পিটিয়ে থাকেন। মনে মনে সবচেয়ে বেশি যাঁদের আমরা হিংসা করি, অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কাছে যাঁদের নিন্দা না করলে আমাদের তৃপ্তি হয় না, বাইরের লোকের কাছে সেই ধনিক আত্মীয়দের কথা বলবার জন্যে আমরা সবচেয়ে বেশি উন্মুখ হয়ে থাকি এবং বলে গর্ববোধ করি। কোন পিসতুতো ভাই পোস্ট-মাস্টার জেনারেল হলে তাঁর কথা যত বলি, নিজের ভাই পোস্ট-আপিসের কেরানী হলে একবারও তার নাম মুখে আনি না। মামার যদি সাতখানা বাড়ি থাকে তাহলে নিজের কেরানী বা স্কুলমাস্টার বাবার পরিচয় দিতে আমরা সঙ্কোচবোধ করলেও, মামার পরিচয় সবার আগে সর্বত্র জানাতে গর্ববোধ করি। দূর সম্পর্কের কোন জ্যেঠতুতো বোনের স্বামী যদি সিভিলিয়ান হন, তাহলে যত তাড়াতাড়ি তাঁর শ্যালক বলে আমরা বুক ফুলিয়ে পরিচয় দিয়ে ফেলি,

নিজের বোনের 'মালগাড়ির গার্ড' স্বামীর বেলায় তা দিই না। এমনকি, মালগাড়ির গার্ডকে যেন আমরা নিজের ভগিনীপতি বলে পরিচয় দিতেই কুণ্ঠাবোধ করি কিন্তু সিভিলিয়ানের দূর সম্পর্কের খুড়তুতো শ্যালক হলেও, আমরা তাঁর নিজের 'শ্যালক' বলে মিথ্যা পরিচয় দেবার জন্যে যেন উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকি। এ সংসারে হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়, ধনিক শ্বশুরের জামাই হয়ে কতলোক নিজের গরীব বাবার কথা ভুলে গেছেন। তাঁরা জানেন না যে ধনিক শ্বশুরের জামাই হলেও, তাঁরা 'গরীব আত্মীয়' ছাড়া কিছু নন। তাঁরা জানেন না যে গরীব আত্মীয়ের মতন করুণার পাত্র সংসারে আর কেউ নেই। তবু বড়লোকের জামাইরা পথেঘাটে শ্বশুরেরই গুণগান করে বেড়ান এবং নিজেরা গরীবের ছেলে সেকথা যেন ভুলেই যান।

বাস্তবিক, মনুষ্যচরিত্র যে কি বিচিত্র রহস্যময়, তা শুধু গরীব আত্মীয়দের দেখলেই বোঝা যায়। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—Nothing succeeds like success,—কথাটা বড়লোক আত্মীয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ঠিক তেমনি বলা যায়—Nothing fails like failure—কথাটা গরীব আত্মীয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জীবনে সাফল্যের চেয়ে বড় সফলতা যেমন আর নেই, তেমনি ব্যর্থতার চেয়ে বড় বিফলতাও আর নেই। আর্থিক ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে জীবনে যাঁরা সার্থক হয়েছেন, সেই সব বড়লোক আত্মীয়দের কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই, কারণ তাঁরা জানেন যে আমরা, তাঁদের গরীব আত্মীয়রা, যতই তাঁদের মনে মনে হিংসা করি বা পরিবারের মধ্যে নিন্দা করি না কেন, বাইরের সমাজে আমাদের চেয়ে বড় ক্যানভাসার তাঁদের আর কেউ নেই। আর আমরাও জানি, আমাদের মতন করুণার পাত্র আর কেউ নেই। আমাদের উপস্থিতি অপ্রীতিকর, আমাদের কণ্ঠস্বর অশ্রাব্য, অপমান আমাদের দৈনন্দিন পুরস্কার, উপেক্ষা ও উদাসীনতা আমাদের নিত্যসঙ্গী—তবু কোন অপমানেই আমরা বিচলিত হই না, কারণ আমরা ব্যর্থতার প্রতিমূর্তি, লক্ষ লক্ষ স্তূপীকৃত অপমানের জীবন্ত স্মৃতিস্তম্ভ। জীবনে ব্যর্থতার চেয়ে বড় অপমান আর কিছু নেই, তাই সংসারে সমস্ত তুচ্ছ অপমান আমরা স্বচ্ছন্দে গলাধঃকরণ করে নীলকণ্ঠ হতে পারি। আমরা

জানি, আমাদের উপস্থিতি অশুভ, আমাদের কণ্ঠস্বর কটু, তবু বারবার আমরা আপনাদের দরজায় উপস্থিত হই এবং সাড়া না পেলেও নিয়মিত ডাক দিয়ে যাই। আমরা, অর্থাৎ গরীব আত্মীয়রা।

আমরা যাবই, আমাদের কেউ ঠেকাতে পারবে না। যেদিন ভাববেন, আমরা কেউ না এলেই মঙ্গল, ঠিক সেইদিনই আমরা যাব। একজন না-একজন যাবই। ছুটির দিনে মশগুল হয়ে খানাটেবলে বসে হয়ত বন্ধুবান্ধব নিয়ে গল্পগুজব করছেন, এমন সময় দরজায় শব্দ হবে 'ঠক্, ঠক্, ঠক্'। যেন এই শব্দটার জন্যেই আপনি কান পেতেছিলেন, তাই আসরের হট্টগোলের মধ্যেও সেই ঠক্ঠকানি ঠিক আপনার কানে পৌঁছল, অমনি মুখের রঙ গেল বদ্‌লে। আবার 'ঠক্ ঠক্ ঠক্'! দরজা না খুলে রেহাই নেই। আমাদের একজনকে দেখে আপনি খুব বিব্রত হলেন, তাড়াতাড়ি ছেলেপিলেদের কাউকে ডেকে অন্যঘরে আমাকে চালান করে দেবার চেষ্টা করলেন, আমিও গেলাম। আমার জন্যে বসার একটা নির্দিষ্ট কোণ, একটা বিশেষ ভাঙা চেয়ারও আছে আমি জানি। এও জানি, সেদিন আপনার ঘরে নানারকমের খাবার তৈরি হচ্ছে, ছেলেপিলেদের খুব বেশি মেলামেশার হুকুম নেই আমার সঙ্গে, যদিও আমি তাদের পিসেমশাই। তাও আমি জানি। আমার সামনে খেতে আপনার অসুবিধা হবে জেনে আমি মুখ ঘুরিয়ে থাকি। পরিত্যক্ত একখানা চপ্ আর একটু চা হয়ত আমি পাই এবং কোন উচ্চবাচ্য না করে মনের আনন্দে খাই। দরকার হলে হয়ত আরও একখানা চেয়ে যথেষ্ট মুশ্‌কিলে ফেলি। আপনি পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করেন সেই ফাঁকে, এমন সময় সকলের সামনে আমি একেবারে আপনার ডাকনাম ধরে ডেকে ফেলে দিই। অর্থাৎ জব্দ যেমন আপনি করতে জানেন, তেমনি আমিও জানি। আমি যদি সেই সময় আপনার সমস্ত বন্ধুবান্ধবের সামনে বলতে আরম্ভ করি, 'তাহলে ধোনা, কি করা যায় বলো তো! তোমার সিস্টারের তো এই অষ্টম গর্ভ—হাত-পা ফুলে উঠেছে, আমি তো আর পারছি না—চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা করতে—ইত্যাদি'—তাহলে সাপ্লাইয়ের ডেপুটি-ডিরেক্টর আপনি, বন্ধুবান্ধবের সামনে আপনার কি

অবস্থা হয় বলুন তো! সুতরাং আমাকে দেখলেই, নিয়মিত দক্ষিণা দিয়ে আমাকে হাতে-হাতে বিদায় করা ভাল, জব্দ করা বা এড়াবার চেষ্টা করা উচিত নয়। আপনি বড়লোক, আমি আপনার গরীব আত্মীয়। বোধ হয় জানেন না, জব্দ করবার ক্ষমতা আপনার চেয়ে আমার অনেক বেশি। যদি না জানেন তাহলে জেনে রাখুন, সাফল্যের দম্ভের চেয়ে ব্যর্থতার প্রতিহিংসা অনেক বেশি ভয়াবহ ও বীভৎস। কিন্তু শুধু কি ভয়াবহই আমরা, কেবল করুণার পাত্র! নিশ্চয় না। যদি বলি, যা সুন্দর, মানুষ তাকেই ভালবাসতে চায়। সার্থক জীবনের চেয়ে সুন্দর আর কি আছে পৃথিবীতে? আপনাদের জীবন সেই সার্থকতার প্রতিমূর্তি বলে তার প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই, ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের প্রতি আমাদের কোন আকর্ষণ নেই। তাহলে কি খুব মিথ্যা বলা হয়? বোধ হয় না। ভেবে দেখবেন কথাটা এবং আমাদের শুধু করুণা করবেন না, চেষ্টা করবেন ভালবাসতে। জানি, গরীব আত্মীয়দের ভালবাসা খুব শক্ত, কারণ তারা ঠিক বড়লোক শ্বশুরের গরীব জামাইয়ের মতন, যারা নিজের দরিদ্র পিতার পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে, কিন্তু ধনিক শ্বশুরের কথা বুক ফুলিয়ে বলে বেড়ায়। তবু আমাদের, অর্থাৎ এই গরীব আত্মীয়দের এড়াবার চেষ্টা করে লাভ নেই, কারণ নিয়মিত তারা আপনার দরজায় গিয়ে ডাক দেবেই দেবে। আপনার দুর্দিনে নয়, সুদিনে—এবং সেই ডাক শুনে, দরজার কড়ানাড়ার শব্দ শুনেই আপনি বুঝতে পারবেন, আমি এসেছি, আপনার সেই গরীব আত্মীয়। কারণ—

'He is known by his knock.'

আমি জানি, একদা আপনিও গরীব ছিলেন, গরীবের পরিবারে আপনিও মানুষ হয়েছেন এবং নিজের ক্ষমতা ও প্রতিভার বলে সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিজেই অর্জন করেছেন। তাহলেও যেহেতু আমাদের সকলকে আপনি আপনার স্তরে টেনে তুলতে পারেন নি, আমরাও তার প্রতিশোধ নেব। জানেনই তো, আমরা নিম্ন-মধ্যবিত্ত, আমাদের কোন নীতি বা আদর্শের বালাই নেই। সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতার মূর্তিমান দানব আমরা। তাই আপনার প্রতিষ্ঠার ধাপে ধাপে আমরা আপনাকে নানাভাবে টেনে-

হেঁচড়ে নিচে নামাবার চেষ্টা করেছি। এই আমাদের চরিত্র। কেবল গরীব আত্মীয়দের নয়, আপনার মধ্যবিত্ত বন্ধুবান্ধবদের চরিত্রও তাই। বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁর জীবনে সবচেয়ে বেশি শত্রুতা করেছেন কারা? গরীব পরিবারে জন্মেও তিনি বড় হয়েছিলেন বলে, তাঁর দরিদ্র আত্মীয়রাই সবচেয়ে বেশি তাঁর শত্রুতা করেছে, তারপর ব্যর্থ ক্ষুব্ধ প্রতিহিংসাপরায়ণ বন্ধুবান্ধবরা। আরও অনেকে, যাঁরা জীবনে এরকম বড় হয়েছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করলে ঐ একই উত্তর পাবেন।

চেষ্টা করেও আমরা আপনাকে নিচে টেনে নামাতে পারিনি। মিথ্যা কুৎসা নিন্দায় আপনাকে বিচলিত করতে পারিনি। তাই সারাজীবন ধরে আপনাকে জ্বালিয়ে মারব ঠিক করেছি, জানেনই তো—Poverty is the worst of all crimes—। তা যদি হয় তাহলে—Poor relations are the worst of all criminals। সুতরাং আমাদের হাত থেকে আপনার মুক্তি নেই। কেবল আপনার সান্ত্বনা এইটুকু যে, আমরা ক্ষেত্রবিশেষে আপনার নিকৃষ্ট স্ল্যাণ্ডারার হলেও, আমরাই আবার আপনার উৎকৃষ্ট ক্যানভাসার। আপনি আমার পিসতুতো বোনের ছেলে হলেও, আপনি বড় হয়েছেন বলে আমরা সামাজিক ব্যাপারে আপনারই পরিচয় দিই, নিজের গরীব পিতার পরিচয় দিতে লজ্জা পাই। আমরা, গরীব নিম্ন-মধ্যবিত্ত আত্মীয়রা, সত্যিই—

'A lion in your path, a frog in your chamber, a fly in your ointment, a mote in your eye.'

কিন্দারগার্টেন কলকাতা

কলকাতা শহরে জনৈক ভদ্রলোককে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম: 'আপনি কি করেন?' তিনি একমুহূর্তও কোন দ্বিধা না করে উত্তর দিয়েছিলেন: 'দম দিই।' উত্তর শুনে প্রথমটা আমার নিজের দমবন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। কি দম, কিসের দম কিছুই বুঝতে পারিনি। আমার অবস্থা দেখে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি ঘড়িতে দম দেন। ঘড়িতে দম দেওয়া যে একটা রীতিমত অনরেবল প্রফেশন হতে পারে, তা তখনও পর্যন্ত আমার জানা ছিল না। সেইদিনই প্রথম জানলাম যে কলকাতা শহরে অনেক ধনী লোকের শুধু যে ঘোড়ার শখ আছে তা নয়, ঘড়ির শখও আছে। হরেকরকমের ঘড়ি তাঁরা বাড়িতে সংগ্রহ করে রাখেন, পিয়ানো বা জলতরঙ্গের মতন তাদের বিচিত্র বাজনা শোনেন এবং সেগুলোতে সময়মতো নির্দিষ্ট দিনে দম দেওয়ার জন্যে তাঁদের লোকও আছে।

আর এক ভদ্রলোককে 'কি করেন' জিজ্ঞাসা করতে তিনি প্রম্‌টলি উত্তর দিয়েছিলেন—'টিউশনি'। ঘড়িতে দম দেওয়ার মতন এটা তেমন বিচিত্র ব্যাপার না হলেও, যেরকম কন্‌ফিডেণ্ট ভঙ্গিতে তিনি উত্তরটা দিয়েছিলেন, তাতে বাস্তবিকই ঘাব্‌ড়ে যেতে হয়। তরুণ যুবক ছাত্র নন, রীতিমত বয়স্ক সংসারী লোক, পুত্রকন্যাদি নিয়ে বেশ বড় পরিবার—অথচ তিনি যে কেবল টিউশনিই করেন, আর কিছু করেন না, এটা চট্ করে যেন ভাবা যায় না। তাই তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম: 'আর কি করেন? কাজ করেন কোথায়?' তিনি কথাটা শুনে একটু যেন বিরক্ত হয়েই বললেন: 'শুধু টিউশনি করি'। হুবহু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই

'শুধু লিখি' উত্তর দেওয়ার মতন। কোন স্কুলের মাস্টার নন, কোন কলেজের অধ্যাপক নন, তার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রীও নেই, শুধু একখানা ম্যাট্রিকের (এন্ট্রান্স) সার্টিফিকেট সম্বল। তাতে কি এমন টিউশনি তিনি করতে পারেন যাতে হাইকোর্টের জজের মতন এরকম নির্বিকার ভঙ্গিতে 'প্রফেশন' সম্বন্ধে উত্তর দেওয়া যেতে পারে, ভেবে কিনারা পেলাম না। আমি কিনারা না পেলেও, একমাত্র প্রাইভেট টিউশনির পান্‌সিতে জীবন-সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে তিনি যে কূল ও কিনারা দুটোই পেয়েছেন, তা তাঁর পরমনিশ্চিন্ততা এবং টিউটর (প্রাইভেট) হিসেবে রীতিমত গর্ববোধ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। জীবনে কোনদিন স্কুল বা কলেজের গেটের মধ্যে না ঢুকে সারা কলকাতা শহরের মধ্যে সবচেয়ে স্বনামধন্য 'মাস্টার মশাই' হওয়া সহজ কৃতিত্বের ব্যাপার নয়।

আপাতদৃষ্টিতে হয়ত মনে হতে পারে যে ঘড়িতে দম দেওয়ার সঙ্গে প্রাইভেট টিউশনির সম্পর্ক কোথায়, এবং কোন সম্পর্ক না থাকলে গোড়াতে তা উল্লেখ করারই বা প্রয়োজন ছিল কি? একটা সম্পর্ক আছে, সেটা এই মাস্টার মশাই বলেছিলেন। সাধারণত তিনি ছোট-ছোট পাঁচছয় বছরের ছেলেমেয়েদেরই পড়ান, হাতেখড়ি থেকে শুরু করে নামতা শেখা, ছড়া বলা পর্যন্ত। কাজটা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন: 'আমার কোনদিন টিউশনির ভাবনা হয় না, আজ পর্যন্ত জীবনে একটা দিনও বেকার বসে থাকিনি। তার কারণ কি জানেন? বাচ্চাদেরই টিউটর দরকার বেশি। ঘড়িতে যেমন রোজ দম না দিলে ঘড়ি চলে না, তেমনি বাচ্চাদেরও রোজ একবার সময়মতো দম দিতে হয়, তা না হলে পড়াশুনায় তাদের কোন ইন্টারেস্ট জাগে না। সেটা আমাদের ঐ বুনিয়াদী শিক্ষার 'কাজই' হোক, আর ফ্রোবেল মণ্টেসরীর 'খেলাই' হোক, সবাই হচ্ছে ঐ ঠিকমতো দম দেওয়ার ব্যাপার। সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়—যখনই হোক, একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাচ্চাদের দম দিয়ে আসাই আমার কাজ।'

যাই হোক, প্রাইভেট টিউশনির কাজটা অনেকটা সেকালের গুরুমশাইদের কাজের মতন। 'সেকাল' বলতে আমি প্রাচীনকালের কথা

বলছি না, গত শতাব্দীর কথা বলছি। ইংরেজ আমলে শহরে যাঁরা নতুন বড়লোক হলেন তাঁদের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে তাঁরা 'প্রাইভেট টিউটর' রাখতেন। কলকাতা শহরে 'প্রাইভেট টিউশনের' পেশাটা তখন থেকেই প্রচলিত হয়েছে বলে মনে হয়। নতুন যুগের বাবুদের তখন বাংলা ফারসী ও ইংরেজী, তিনটেই শিখতে হত, তা না হলে মুচ্ছুদ্দিগিরির সুযোগ পাওয়া যেত না। তাই বাবুদের বাবাদের তিনরকমের টিউটর রাখতে হত ; প্রথমে একজন গুরুমশাই, তারপর একজন মুন্‌শী এবং শেষে একজন ফিরিঙ্গি সাহেব। 'কৈবর্তাদি নানাজাতীয় প্রায় অনেকেই গুরুমশাই অনেক স্থানে দৃষ্ট হইয়াছেন', 'সময়দোষে দুঃস্থ কায়স্থ-জাতীয় মহাশয়েরা গুরুমশাইয়ের কর্ম করিতেছেন,' 'ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়েরাও গুরুমশাইয়ের কর্ম করিয়া থাকেন'। সুতরাং গুরুমশাইয়ের কাজ যে অনেকেই করতেন তা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গুরুমশাইয়ের কাছে বাবুরা বানান করে নাম লিখতে শিখতেন এবং দু-চারটে শ্লোক বলতে পারলেই শিক্ষা তাঁদের শেষ হয়ে যেত। যেমন ঃ

'অবু তবু গিরিস্সূত
মায় বলে পড়ে পূত,
পড়িলে শুনিলে দুদিভাতি
না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি।'

এই ধরনের দু-চারটে শ্লোক শুনলেই কর্তা খুশি হতেন এবং গুরুমশাইকে শেষ দক্ষিণা দিয়ে বিদায় দিতেন।

এর পর মুন্‌শীর কাছে শিক্ষা আরম্ভ হত। 'কর্তা কহেন, শুন মুন্‌শী, আমার সন্তানদিগকে পারসী পড়াইবা এবং বহির্দ্বারে থাকিবা, যে দিবস বাবুরা কোনস্থানে নিমন্ত্রণে যানারূঢ় হইয়া গমন করিবেন, সঙ্গে যাইবা, মায় খোরাকি তিন তঙ্কা পাইবা।—' মুন্‌শীর জবান দোরস্ত কিনা একবার পরীক্ষা করে নিয়ে তাঁকে কাজে বহাল করা হত। প্রায় দু-বছরের মধ্যে গোলেস্তাঁ বোস্তাঁ ইত্যাদি শিখে ফারসীর পালা শেষ হয়ে যেত। তারপর কর্তা 'একজন সাহেব আনিয়া বাবুদিগের পাঠকরণ' নিযুক্ত করতেন। 'সাহেবের মেজের সজ্জা এবং খানা ও টিফিন খাওয়া দেখিয়া বাবুদিগের

প্রায় তদনুরূপ ব্যবহার হইল আর সাহেবদের সহিত সর্বদা কথোপকথন দ্বারা গাডামী, রাসকেল, বেরিগুড, হুট, ছোট, নানসেন্স, গোটে হেল—এইরূপ কতকগুলিন কথা অভ্যাস করিয়া বাংলা কথায় মিশাইয়া কহিতে লাগিলেন এবং ইংরাজী ভাষাতে কোন লোক কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ঐ সাহেবের মতো শব্দ উচ্চারণপূর্বক উত্তর করেন যথা, তোমার পিতার নাম কি, 'টোটারাম ডট্ট অর্থাৎ তোতারাম দত্ত—'। এইভাবে সবরকম শিক্ষা পেয়ে বাবুবৃক্ষের অঙ্কুর পল্লবিত হয়ে উঠতো, বাবুরা লায়েক হতেন।

টোটারাম ডট্টরা আজও কলকাতা শহরে যথেষ্ট আছেন। আজকালকার বাঙালী শিশুরা সেকালের আরাতুন পিৎরুস, ডিক্রুস, কালল্, শেরবোর্ণ সাহেবদের স্কুলের মতন একালের অনেক ফিরিঙ্গী স্কুলে যায় এবং সেখানে কিছু ট্যাঁসফিরিঙ্গী, কিছু টি প্ল্যাণ্টার্স ও বৃটিশ মার্চেন্টদের বংশধর আর কিছু উন্নাসিক 'ভারতীয়' সন্তানদের সাহচর্যে একটা জ্যান্ত 'লীগ অফ নেশন্‌স' হয়ে বেরিয়ে আসে। বাঙালী ছেলেমেয়ের চরিত্র সবচেয়ে নাকি ভাল তৈরি হয় ফিরিঙ্গী স্কুলে। টোটারাম ডট্টরা সেইজন্য অনেক বাড়িতে মেমসাহেব গভর্নেস রাখেন এবং সাহেব প্রাইভেট টিউটরও রাখেন। কিন্তু তা রাখলেও আমাদের 'প্রাইভেট টিউটরে'র কোনদিন 'টিউশনে'র অভাব হয় না। তা ছাড়া এযুগে শিক্ষার প্রণালীই বদলে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলেই তিনি বলতেন: 'আপনারা কি মনে করেন যে, টিউশনি আমার পেশা বলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি ঘণ্টা নেড়ে টিউশনি করে বেড়াই? সেরকম আপনাদের মতন বি-এ এম-এদের দরকার হতে পারে, আমার হয় না। আগেই তো বলেছি, বাড়ি-বাড়ি বাচ্চাদের দম দিয়ে বেড়ানোই আমার কাজ। তা ছাড়া, আমার বাচ্চারাও ভাল, বাচ্চাদের বাবারাও ভাল। আজকালকার বাচ্চাদের এডুকেশন মানেই হল 'প্লে মেথড', কিংবা 'এ্যাকৃটিভিটি মেথড'। একবাড়ির বাচ্চাদের নিয়ে সারা দুপুর হয় জু-তে, মিউজিয়মে, বোটানিক্‌সে, না হয় গড়ের মাঠে বসে থাকি। তাতে জুলজি ও বোটানি সম্পর্কে বাচ্চাদের বই ছাড়াও জ্ঞান হতে থাকে, আমিও মাস গেলে যা

পাই তাতে মোটামুটি চলে যায়। অন্য এক বাড়িতে ভোরে উঠে যাই। বাচ্চাদের নিয়ে পার্কে বা মাঠে বেড়াতে যাই, খেলা করি। খেলার ভিতর দিয়ে তাদের পড়তে শেখাই, গুণতে শেখাই, এমন কি ইতিহাস পর্যন্ত শিখিয়ে দিই। যেমন মনে করুন,—হয়ত কর্নওয়ালিস স্ট্রীট দিয়ে একদিন চলেছি, চট্ করে ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলাম, বলো তো যাঁর নামে এই রাস্তা, সেই কর্নওয়ালিস কে ছিলেন? ছেলেরা জানবে কোথা থেকে? সেই ফাঁকে তাদের বৃটিশ যুগের খানিকটা ইতিহাস শিখিয়ে দিলাম। অথবা হয়ত 'গিরিশ পার্কে' গেলাম, বললাম 'গিরিশ ঘোষ' কে ছিলেন জানো? সেই ফাঁকে বাংলা থিয়েটারের একটু গল্প বলে দিলাম। এই আর কি! তাছাড়া, বর্ণপরিচয়ও আমি কলকাতার রাস্তাতে করাই। কলকাতা শহরে বাইরে বেরুলে সাইনবোর্ড বা পোস্টারের অভাব হয় না। বড় বড় কাঠের, পিতলের অক্ষর, বা ছাপানো অক্ষরের ছড়াছড়ি চারিদিকে। চট্ করে একটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, এটা কি বলো তো? অক্ষরটা 'অ', শিখিয়ে দিলাম, সেইদিনই আরও দু-চার জায়গায় ঐভাবে জিজ্ঞাসা করে রপ্ত করিয়ে নিলাম। মনে করুন, কারও যদি ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক থাকে, তাও কলকাতার রাস্তায় অভাব নেই। বিশ গজ অন্তর কলকাতার রাস্তায় সিনেমা হাউস, তার বাইরের দেয়ালে শিল্পীদের প্রাচীরচিত্র আঁকতে হয় বিজ্ঞাপনের জন্যে। একেবারে আঁকার সময় বাচ্চাদের ফুটপাথে দাঁড় করিয়ে দিলাম—তুলিতে করে রঙ নিয়ে কিভাবে আঁকা হচ্ছে, যতক্ষণ খুশি তারা দেখল। এ সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যাবে বলুন, বাড়িতে তো সম্ভব নয়ই, কোন কিন্দারগার্টেন নার্সারীতেও সম্ভব নয়। আমার তো মনে হয়, গোটা কলকাতা শহরটাই একটা বিরাট কিন্দারগার্টেন, যার তুলনা হয় না।'

এর পর আমারও অবশ্য তাই মনে হল। টিউটর ভদ্রলোক আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলেন।

তাকিয়ে দেখলাম, চারিদিকে অসংখ্য কুৎসিত সাইনবোর্ড, দেয়াল-বিজ্ঞাপন ও পোস্টার কলকাতার রাস্তাঘাটকে সত্যিই 'কিন্দারগার্টেন' করে তুলেছে। কতরকমের মলম, পিল ও ফিল্ম যে—তার ইয়ত্তা নেই।

অনেস্ট প্রাইভেট টিউটর বোধ হয় জানেন না, কলকাতার কিন্দারগার্টেনে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিলে, আমাদের বংশধরেরা কি তৈরি হবে? মানুষ? না, ক্রিমিনাল?

হিন্দী বৈশাখ

কৈ আসে সেই কালবৈশাখ
যে বৈশাখের গোপন ডাকে
বার বার মোরা ক্ষমা ক'রে চলি
পাঁজির পাতার অবৈশাখে?
ছু'মুঠো ধূলি ও ক'টা ছেঁড়া পাতা
উড়ায়ে ঘুরায়ে তুলিবে সে কি
মামুলি মোদের প্রলয়ঝঞ্ঝা—
যারে কহি মোরা 'কালবোশেখী'?

—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

মেঘের ভেঁপু বাজিয়ে ১৩৬০ সনেও সেই গতানুগতিক ধারায় মৃত চৈত্রের একত্রিশের পর পয়লা বৈশাখ এসেছে। কালবৈশাখীর পায়ের চিহ্ন অবশ্য মেঘের বুকে ফুটে ওঠেনি। গত কয়েকবছর ধরে যেন বাংলাদেশের আবহাওয়াই বদ্‌লে গেছে। ক্রমেই যেন একটা হিন্দুস্থানী আবহাওয়া বাংলার বুকে চেপে বসছে বলে মনে হয়। বাংলার যে একটা প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ছিল তাও যেন আর থাকছে না। স্যাঁতসেঁতে ভিজে আবহাওয়ার

বদলে একটা শুক্‌নো খট্‌খটে আবহাওয়ায় আমরাও যেন ঝুনো নারকোলের মতন শুকিয়ে যাচ্ছি। ব্যাপারটা হঠাৎ বিচিত্র বলেই মনে হয়, কিন্তু আসলে বিচিত্র নয়। এককালে সিন্ধুদেশও শস্যশ্যামলা ছিল, কিন্তু এখন সেখানে মরুভূমির ব্যাদান বাড়ছে ক্রমে। তেমনি গত কয়েকশ' বছরের মধ্যে বাংলার আবহাওয়াও অনেক বদলেছে, এখনও বদলাচ্ছে। বাংলার আর্যীকরণ বোধ হয় এতযুগ পরে এবারে সম্পূর্ণ হচ্ছে। আর্থিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আর্যীকরণ অনেক আগেই সম্পূর্ণ হয়েছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে এবারে রাষ্ট্রভাষার কৃপায় হয়ত শেষ হবে। শুধু রাষ্ট্রভাষা নয়, উত্তরভারতীয় রাষ্ট্রীয় পোশাক-পরিচ্ছদও বাঙালীর ছেলেমেয়েরা বেশ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বাকি থাকে 'ডায়েট' বা খাওয়াদাওয়া এবং সেখানেও রাষ্ট্রীয় খাদ্য রুটিতে ও চা-পার্টিতে ক্রমেই আমরা বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। সবার উপরে আবহাওয়া পর্যন্ত বদলে গিয়ে উত্তরভারতীয় রাষ্ট্রীয় আবহাওয়ায় পরিণত হচ্ছে। অর্থাৎ আবহাওয়াও হিন্দী-হিন্দুস্থানী হয়ে উঠছে। ভিজে ঘেমো গরমের বদলে শুকনো গরম হাওয়া বইছে বাইরে। এইভাবে আবহাওয়া থেকে খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পর্যন্ত যদি দ্রুত হিন্দীকরণ বা রাষ্ট্রীকরণ চলতে থাকে, তাহলে বাঙালীর কাব্যিক মন ক্রমেই গাদ্যিক হয়ে উঠবে, এবং হচ্ছেও তাই। ডাহুকীর গান ও দাদুরীর ডাক শুনে খুব বেশিদিন আর বাংলার কবিকে বলতে হবে না 'ফাটি যাও তো ছাতিয়া'। তার বদলে বলতে হবে—'ফাটি যাও তো চাঁদিয়া', কারণ চটাফাটা রোদ্দুরে, তালুতাতানো গরমে, আর পশ্চিমা 'ল্যু'র স্পর্শে যা ফাটবে তা বুকের ছাতি নয়, মাথার চাঁদি। মাথার ঘিলু ক্রমেই শুকিয়ে যাবে, শেপ ও সাইজ পর্যন্ত বদলে দিয়ে একটা লম্বাটে ধরনের নীরেট খট্‌খটে রাষ্ট্রীয় সাইজে পরিণত হবে। মাথা দেখলে শ্রদ্ধায় আর মাথা হেঁট হয়ে আসবে না, কেবল খটাখট গাঁট্টা ও চটাপট চাঁটি মারতে ইচ্ছে করবে। বাঙালীর এই ভবিষ্যৎই আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। প্রাকৃতিক আবহাওয়ার পর্যন্ত যখন হিন্দীকরণ শুরু হয়েছে তখন বোধ হয় "ভগবানও" বাঙালীর প্রতি সদয় নন।

তাই কালবৈশাখীর কোন চিহ্ন নেই বিশেষ। দু-একটা 'নরওয়েস্টার' প্রত্যেক বছরেই আসে, কিন্তু দেখেই বোঝা যায় যেন তাদের হঠাৎ-আসাটা কতকটা ছন্দপতনের মতন। গত দু-তিন বছর ধরে বাংলাদেশে বৈশাখের আসা-যাওয়া কেউ বিশেষ বুঝতে পারিনি আমরা। না এসেছে রবীন্দ্রনাথের বৈশাখ, না যতীন্দ্রনাথের। কোথায় সেই বৈশাখ, 'ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল' নিয়ে 'মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল' যে ডাক দিয়ে যায়? কোথায় সেই বৈশাখ, দীপ্তচক্ষু শীর্ণ সন্ন্যাসীর মতন 'পদ্মাসনে বসি' যে রক্তনেত্র ললাটে তুলে ধরে? কোথায় সেই বৈশাখ, বৈরাগীর মতন যার শান্তিপাঠ নদনদী পার হয়ে, গ্রাম থেকে গ্রামে চলে যায় 'পূর্ণ করি মাঠ'? রবীন্দ্রনাথের সে বৈশাখ আর নেই, যার ডাক শুনে আমরা—

ভাঙিয়া মধ্যাহ্নতন্দ্রা
জাগি উঠি বাহিরিব দ্বারে
চেয়ে রব প্রাণীশূন্য
দগ্ধতৃণ দিগন্তের পারে
নিস্তব্ধ নির্বাক।

সেই রাবীন্দ্রিক বৈশাখও যেন বাংলাদেশ থেকে আজ বিদায় নিয়েছে। এমনকি বাংলার শ্যামল স্যাঁতানো কোলে 'আমে আর জামে, ঘামে আর প্রেমে বৈশাখী সে-জীবন', তাও যেন আজ কয়েকবছর ধরে নেই। কোথায় সেই টিপিকাল বাঙালী বৈশাখ—?

জলে ও আগুনে আপোষ করিয়া
যে বোশেখ হেথা আসে,
যার তেজ মোরা মাপি কুপোদকে,
শুক্‌নো ডাঙার ঘাসে,
যে আসে মোর রন্ধনশালে
ভিজা কাঠে চূলা জ্বালি—

—সেই বাঙালী বৈশাখও আজ নেই। আজ এক ধরনের নতুন বৈশাখ আমরা বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছি—যার নাম দেওয়া যেতে পারে,

'হিন্দা বৈশাখ'—তথা 'রাষ্ট্রীয় বৈশাখ'। এখন 'জয় হিন্দ' বলে বাংলা দেশের 'হিন্দী বৈশাখকে' অভিনন্দন জানানো উচিত।

আগেই বলেছি, এই হিন্দী বৈশাখের আবহাওয়ায় আমরা ক্রমেই যেন ঝুনো নারকোল হয়ে যাচ্ছি। আমাদের জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ১৩৫৮ সালের বাঙালীব জীবনের বর্ষফল দেখলেই তা বোঝা যায়। যেমন ১৩৫৮-সালে (বাংলা সালে) বাংলা সাহিত্য আগের চেয়ে অনেক বেশি শুকিয়ে গেছে বলে মনে হয়। কবির প্রাচুর্য এখনও অবশ্য আছে, কিন্তু সম্পাদকরা বলেন যে, সাতান্ন সনের তুলনায় আটান্ন সনে কবি ও কবিতার সংখ্যা নাকি অনেক কমে গেছে। কোন জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকার সম্পাদক বলছিলেন যে, সাতান্ন সনে যেখানে প্রত্যেক মাসে প্রায় দেড় হাজার করে কবিতা আসত ছাপার জন্যে, সেখানে আটান্ন সনে এসেছে গড়ে মাসে মাত্র সাত-আট শ'। এক বছরে অর্ধেক কবি ও কবিতার সংখ্যা কমে যাওয়া রীতিমত একটা চাঞ্চল্যকর ব্যাপার, বিশেষ করে বাংলাদেশে। শুধু কবিতা নয়, সাধারণভাবে বাংলা রসসাহিত্যই যেন শুকিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। তাছাড়া লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাংলা গানের যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল তা আর বজায় রাখা যাচ্ছে না। আজকাল শুভ-বিবাহেই হোক, শ্রাদ্ধেই হোক বা পূজা পার্বণেই হোক, সব সময় দেখবেন বাঙালীর ঘরে হিন্দী গজল বা খেম্‌টা চলছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত কিছুটা এখনও বাংলা গানের ধারা বাঁচিয়ে রেখেছে বটে কিন্তু 'লারে লাপ্পা' ও 'বন কি চিড়িয়া' জাতীয় গানের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয়, খুব বেশিদিন বাঁচানো যাবে না। ফিল্মের ক্ষেত্রেও তাই। কিছুদিন পরে বাংলাদেশ থেকে বাংলা ফিল্ম উঠে যাবে, হিন্দী ফিল্ম চলবে। অবশ্য হিন্দী ফিল্ম দেখলে আজকাল আর কেউ বলতে পারবেন না যে সেটা হিন্দুস্থানে তোলা, না হলিউডে তোলা। বাংলার যেমন হিন্দীকরণ চলছে, তেমনি হিন্দীরও আবার মার্কিনীকরণ চলছে। তাই বাংলা বাউল ভাটিয়ালের বদলে আমরা আজকাল হিন্দ্‌-আমেরিকান গজল 'লারে লাপ্পা' শুনছি। একসময় বাংলা-ইংরেজী মিশিয়ে কথা বলা বাঙালীর বিশেষত্ব ছিল, এখন তার বদলে হিন্দী-বাংলা মিশিয়ে বলাটা হয়েছে ফ্যাশন।

১৩৬০ সনে তাই আমি বাঙালীর জীবনে কোন নতুন সম্ভাবনা কিছু দেখছি না। বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যন্ত যখন বদলাতে শুরু করেছে তখন আর ভরসা কোথায়? এ-বছরে বাঙালীর আর্থিক রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের আরও অবনতি হবে বলে মনে হয়। সমগ্র বাঙালীর জীবন যেভাবে দ্রুত 'ন্যাশনালাইজ্‌ড' হচ্ছে তাতে আর আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সম্ভব হবে না। পয়লা বৈশাখে তাই বাইরে আমরা 'হিন্দী বৈশাখে'র উত্তপ্ত পদধ্বনি শুনছি। সেই রাবীন্দ্রিক বৈশাখ, বা খাঁটি বাঙালী বৈশাখ কোনটাই আজ নেই। আর সেই বৈশাখ—

মহাসূর্যেরা যে-বৈশাখের শঙ্খধ্বনি শুনে, অন্তরীক্ষ ভরি, নব নব জগতের বীজ বুনে—

তার আবির্ভাব বাঙালীর জীবনে আর হবে কি কোনদিন?

বেশর-স্মরণে

উলার মেয়ে কুল কুন্টী।
নদের মেয়ের খোঁপা॥
শান্তিপুরে নথ নাড়া দেয়।
গুপ্তিপাড়ার চোপা॥

বাঙালী মেয়েদের কয়েকটি গুণের কথা এখানে বলা হয়েছে। উলার মেয়েরা কুলগর্বে গর্বিতা, কৌলিন্যের দম্ভে তাঁদের মাটিতে পা পড়ত না। নদের মেয়েরা খোঁপার অহংকারে ঘাড় বেঁকিয়ে থাকতেন। শান্তিপুরের

মেয়েদের নথ নাড়া দেওয়ার এমন একটা অভিজাত ভঙ্গি ছিল যা দেখলে কোন পুরুষের আর নড়াচড়ার শক্তি থাকত না, হাঁ করে একদৃষ্টে সেই বেশরদোলায়িত চাঁদবদনের দিকে চেয়ে থাকতে হত। আর গুপ্তিপাড়ার মেয়েদের চোপা—তথা বাগ্‌যুদ্ধ শুধু যে কানের ভিতর দিয়ে মরমে পৌঁছত তা নয়, একেবারে সোজা পাঁজরে গিয়ে বিঁধত। একালের বিধানসভার যে-কোন অপোজিশন লীডার সেকালের গুপ্তিপাড়ার মেয়ের চোপার কাছে ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন। কিন্তু গুপ্তিপাড়ার সেই মেয়েরা আর নেই, তাঁদের বংশধর যাঁরা আছেন তাঁদের চোপা আর দাঁড়িয়ে শোনবার মতন নয়। নদের মেয়েদের সেই খোঁপাও অন্তর্ধান করেছে। উলার মেয়েদের কুলের গর্বও কালের ধাক্কায় প্রায় চূর্ণ। এমন কি শান্তিপুরের মেয়েদের সেই নথ নাড়া দেওয়ার ভঙ্গি, কখন ঘোমটা ফেলে, কখন বা ঘোম্‌টা টেনে তার ফাঁক দিয়ে—এখন আর দেখা যায় না। কালের যাত্রায় পরিবর্তনের স্রোতে খোঁপার ও চোপার পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং তার জন্যে তেমন দুঃখ নেই। খোঁপার আধুনিক আলুলায়িত বা আঙুরগুচ্ছরূপ কম উপভোগ্য নয়। সশব্দ চোপা হয়ত নিঃশব্দ কথার বৃশ্চিক দংশনে পরিণত হয়েছে। সুতরাং তার জন্যেও আক্ষেপ নেই। কুলগর্বের বদলে শিক্ষা ও রূপের গর্ব মেয়েদের আজও যথেষ্ট আছে, চিরকাল থাকবেও। কিন্তু কোথায় সেই বেশর, সেই নথ? কিছুকাল আগেও নাক-ছাপির মধ্যে তার 'রুইন্‌' মাত্র পড়েছিল, এখন তাও নেই। বেশরের বা নথের কোন যুগোপযোগী রূপান্তর ঘটেনি, তার সমস্ত অবশেষ নাক থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মেয়েদের নাক এখন নিরাভরণ ও নগ্ন। অর্থাৎ সেকালের ঠাকুমারা যাকে 'খেঁদা নাক' বলতেন তাই। কানে দু'টো অবশ্য আজও ঝুলছে এবং কর্ণাভরণের আধুনিক বৈচিত্র্য দেখে মনে হয়, কানের অস্তিত্ব এখনও বেশ কিছুদিন থাকবে। তবে নাকের পুনরুজ্জীবনের কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। বিশেষ করে বাঙালী মেয়ের নাসিকা অলঙ্কৃত করার বিরোধী বলে মনে হয়, যদিও অন্যান্য ভারতীয় মেয়েরা আজও তেমন বিরোধী নন।

বাঙালী মেয়েদের এই বেশরবৈরাগ্যের কারণ কি? আমি অন্তত

কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাইনি। আর্থিক কারণ বা সোনার অগ্নিমূল্য যদি কারণ হয়, তাহলে বলবার কিছু নেই। চলাফেরার স্বাচ্ছন্দ্যের যুক্তিও সমর্থনযোগ্য। কারণ ঘরের বাইরে যাঁদের চলে-ফিরে বেড়াতে হয়, তাঁদের পক্ষে নাকে নথ টানা দিয়ে চলা সত্যিই বিপজ্জনক। হঠাৎ যদি কোথাও একটু আটকে যায় তাহলে নাকের ডগা পর্যন্ত উপড়ে যেতে পারে। সুতরাং চাক্‌রি-বাক্‌রি বা চলাফেরা করতে হলে নাকে নথটানা দেওয়া চলে না, স্বীকার করতেই হবে। নথ তো দূরের কথা, কয়েকদিন আগে কর্ণকুণ্ডলের যা অবস্থা দেখেছি তা অত্যন্ত ট্রাজিক। বস্তার মতন লোক-ঠাসা চলন্ত বাস চলতে চলতে একটু থামল, জনৈকা মহিলা উঠলেন। বাস ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা করুণ মর্মস্পর্শী নারী-কণ্ঠের আর্তনাদ শুনে তো যাত্রীরা সকলে হতভম্ব। ব্যাপারটা তদন্ত করে জানা গেল, এমন কিছুই না। সেই মহিলার কানে প্রায় একইঞ্চি রেডিয়াসের একটি কর্ণকুণ্ডল ছিল, ভিড়ের ভিতর দিয়ে গলে গিয়ে তিনি মহিলাদের সীটে বসতে যাচ্ছিলেন। বর্ষাকাল, যাত্রীদের অধিকাংশের হাতে ছাতি। কেউ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ অভ্যাসদোষে বগলে গুঁজে রেখেছেন, শিক ও বাঁট দুইই যাত্রীদের গায়ে বিঁধছে। কিন্তু বাঁট তো একরকমের নয় এবং সব স্ট্রেট নয়। স্ট্রেট বাঁট আছে, কোলন বাঁট আছে, আবার বেতের ও বাঁশের সেমিসার্কুলার বাঁটও আছে। একটি অর্ধবৃত্তাকার বাঁশের বাঁট (বগলে গোঁজা) চুপিসাড়ে মহিলার কর্ণকুণ্ডলের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। এবং সে কি ভয়ানক কাণ্ড! গোটা বাসটা মুহূর্তের মধ্যে বিতর্কসভায় পরিণত হয়ে গেল। একদল ছাতি বগলে গোঁজার বিরুদ্ধে, আর একদল বড় ডায়ামিটারের কর্ণকুণ্ডল পরার বিরুদ্ধে। আমি নিজে কদিন ধরে নথ সম্বন্ধে ভাবছিলাম, কিন্তু হঠাৎ কানের কুণ্ডলের এ অবস্থা দেখে নাকের নথের পক্ষে আমার সমস্ত যুক্তি যেন উবে গেল। তাই নাকে নথ টানা দেওয়ার পক্ষে আর আমি ওকালতি করতে সাহস করি না। অবশ্য যাঁদের নিজেদের মোটর আছে, বা বিমানে চলাফেরা করেন, তাঁরা একবার নথটা রিভাইভ্‌ করবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। কিন্তু আমাদের মতন থার্ডক্লাসের ও বাস-ট্রামের

যাত্রী যাঁরা তাঁরা অন্তত নথের বদলে নাকছাপি পরতে পারেন। একেবারে নিরাভরণ নাকের পক্ষপাতী আমি নই। অবশ্য নাক সম্বন্ধে অথরিটিও আমি নই। তবু যত সুন্দরীই হন না কেন এবং নিজের নাক যত উঁচু করেই চলুন না কেন, নিরাভরণ নাকে সামান্য একটুক্‌রো সোনার উপর একটা পাথরের কুচি বসিয়ে দেখবেন, সমস্ত মুখমণ্ডলের দীপ্তি কত শতগুণ বেড়ে যায়।

মধ্যে কানের একবার খুব শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল, এমন কি হাতেরও। কানে কেবল ফুল ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং ফোটা ফুল ক্রমে কুঁড়িতে পরিণত হচ্ছিল। অর্থাৎ কানের প্রায় যায়-যায় অবস্থা আর কি! এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে যাবতীয় প্রাচীন কর্ণাভরণের একটা 'রিনেসন্সে'র হাওয়া বইল। প্রথমে বইল ঝুম্‌কোর মৃদুসমীরণ, তারপর নানারকমের কানবালা থেকে একেবারে কুণ্ডল, মাকৃড়ি পর্যন্ত একটা সাইক্লোন। হাতেরও সেই ইতিহাস। হাতের চুড়ি ক্রমে সরু হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় 'উইথ ফুল ভেন্‌জীয়ান্স' দেখা দিল সেকালের কঙ্কণ, খাড়ু চূড় পর্যন্ত। ভেবেছিলাম, রিনেসান্সের এই দম্‌কা হাওয়াটা স্বাভাবিক নিয়মেই নাক পর্যন্ত পৌঁছবে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা পৌঁছল না দেখে হতাশ হয়েছি। মনে হচ্ছে যেন বাঙালী মেয়েরা নাকটিকে চিরকালের মতন বর্জন করে দিলেন। কিন্তু কেন দিলেন তার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

তবু যদি কোনদিন আবার মেয়েদের নাক তার যোগ্য মর্যাদা ফিরে পায়, যদি কোনদিন অলঙ্কারক্ষেত্রের রিনেসান্সের হাওয়া হাত ও কান থেকে নাকের ডগা পর্যন্ত পৌঁছয়, সেই আশায় আগেই অনুপ্রাণিত হয়ে এই 'বেশরস্মরণে' লেখা। কানের কানবালা আছে, কুণ্ডল মাকড়ি ঝুম্‌কো ঢেঁড়ি আছে এবং তারা সবাই ফিরে এসেছে। হাতের কঙ্কণ খাড়ু চূড়ও পুনরভিষিক্ত। কিন্তু নাকের কি ছিল যা ফিরে আসতে পারে? নাকের জন্যে খুব বেশি দূর টেনে নিয়ে যেতে চাই না, বৈদিক, বৌদ্ধ বা হিন্দুযুগে গিয়েও দরকার নেই। মাত্র একশ' বছর আগেকার কথা বলব, প্রায় আমাদের ঠাকুমা-দিদিমাদের যুগের কথা। যেমন কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'মধ্যযুগের বাঙ্গলা'র মধ্যে লিখেছেন:

'আমরাই বাল্যে যে গোটা এবং বাঁকমল ও গুজরী, পঞ্চম, হাঁসুলী ও গোট, পঁইছে খাড়ু কঙ্কণ প্রভৃতি মোটা মোটা রুপার গহনা এবং ছয় আঙ্গুলি ব্যাসযুক্ত সোনার নথ ও বেঢপ ঝুম্‌কো ঢেঁড়ি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার কারিগর একালে বর্তমান থাকিলে কি পুরস্কার লাভ করিত, সেকথা নাই ভাবিলাম ; কিন্তু সেই সমস্ত অলঙ্কার পরাইয়া উল্‌কীশোভিত কপালের ঊর্ধ্বদেশে সিন্দূরের ঘটার সাজন দিয়া, দাঁতে মিসি, কাজলে নয়ন উজল করিয়া স্বয়ং রম্ভাকে আনিয়া উপস্থিত করিলেও একালের যুবকদল যে চমকাইয়া উঠিবেন, তাহা হল্‌ফান্‌ বলা যাইতে পারে।'

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। এর মধ্যে কিছু অবশ্য বাদ দিতে হবে, যেমন মল গোট হাঁসুলী ইত্যাদি। মল তো একেবারে অচল, কারণ ওটা ডাণ্ডাবেড়ির চিহ্ন। উল্কী ও মিসিও চলবে না, কাজল নিশ্চয়ই চলবে। এইটুকু সংস্কার করলে অনেকেই রম্ভার মতন আকর্ষণীয় হবেন যুবকদের কাছে। কালীপ্রসন্নবাবু প্রায় একশ বছর আগেকার কথা বলেছেন, তখনও প্রায় ছ-আঙুল ব্যাসের সোনার নথ ছিল। এখন নথ পরলেও তার ব্যাস কমাতেই হবে, কারণ অত সোনা কোথায়? পাবনার হরিপুরের বিখ্যাত জমিদার 'চৌধুরী' পরিবারের স্বনামধন্যা কন্যা প্রসন্নময়ী দেবী তাঁর 'পূর্বকথা'তে লিখেছেন ঃ

'তখন গহনা পরা এখনকার মত ছিল না, সাজসজ্জাও অন্যরূপ। আমার হাতে রুপার বালা, গলায় সুবর্ণ কণ্ঠমালা, মাথায় সোনার চূড়া ও পায়ে নুপুর ছিল। ঘাঘরা কুর্তা চাদর এবং নানাবর্ণের নাগরা জুতা পরিতাম। কপালের উপর থরকাটা ও কানের পাশে জুলপি ছিল। বিবাহের পরে সে সব সাজের পরিবর্তে অন্য অলঙ্কার পরিতে হইত। হাতে বেঁকি চুড়ি, নারিকেল ফুল, পৈঁছে, গলায় চাঁপকলি, তুলসীদানা, কানে কদমফুল, পিপুঁলপাতা, নাকে বেসর, কোমরে গোট ও পায়ে মল, গুজরী পঞ্চম। জুল্‌পি তখন আর থাকিত না। কপালে সিঁথিপাটি থাকিলেও, সন্তান না হওয়া পর্যন্ত থরকাটা রাখা হইত।'

এও প্রায় একশ' বছর আগেকার কথা। বিয়ের আগে নথের কথা

নেই, কিন্তু অভিজাত পরিবারের মেয়েরা রুপোর গহনাও পরতেন। তাঁরা তখন কানের পাশে জুল্‌পিও রাখতেন। বিয়ের পরে জুল্‌পি তুলে দিয়ে, নাকে বেশর দেওয়া হত। নাটকে রামনারায়ণ মেয়েদের সাজসজ্জার বিবরণ দিয়েছেন ঃ

শ্রবণযুগলে দোলে কাহার কুণ্ডল।
হেরি শোভা চমকিত যুবকমণ্ডল॥
ভালেতে শোভিছে ভাল কারো স্বর্ণস্মিতি।
যাহা হেরি যুবগণের বিস্মৃতি॥
মুক্তাফলে শোভা পায় যাহার নাসিকা!
বোধ হয় সেই নারী নিতান্ত রসিকা॥

(কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক)

কানের কুণ্ডল দেখে চমকিত হত যুবকমণ্ডল, কপালে স্বর্ণসিঁথি দেখে তাদের বিস্মৃতি ঘটত। হয়ত তাই হত, কিন্তু সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তর্করত্ন মশায়ের নাসিকার উক্তি। মুক্তাফলে শোভা পেত যার নাসিকা, সে নারী নাকি নিতান্ত রসিকা। এখানে কোন ছ-আঙ্‌ল ব্যাসযুক্ত নথের কথা নেই, অথচ নাসিকা আছে এবং তাতে মুক্তাফলও একটি আছে এবং যার আছে 'সেই নারী নিতান্ত রসিকা।' এও তো একশ বছর আগেকার কথা। সুতরাং নাকে নথটানা দিতেই হবে যে তার কোন মানে নেই, ছোট্ট একটা মুক্তোর ফলেই ভীষণ কাণ্ড হতে পারে। তর্করত্ন মশায় ছাড়াও আমার যুক্তির সমর্থনে উলোর কবি গঙ্গাদাস তাঁর 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'তে লিখে গেছেন ঃ

নাসিকাতে নথ করে মুক্তা চুণী ভাল।
লবঙ্গ বেশরে কার মুখ করে আল॥
কিবা গজমুক্তা কারও নাসিকায় ঝোলে।
দোলে সে অপূর্বভাবে হাসির হিল্লোলে॥

এখানে নথ আছে, গজমুক্তার নলক পর্যন্ত আছে। তবে হাসির হিল্লোলে গজমুক্তার নলকের দোলন দেখার আকাঙ্খা বিশেষ নেই কারও আজকাল। কিন্তু কবি গঙ্গাদাস 'লবঙ্গ বেশরে কার মুখ করে আল'

বলেছেন। আমিও সেই কথাই বলতে চাইছি। নাসিকার কোণে একটা লবঙ্গের মতন বেশর যদি মুখটা আলো করে দেয়, তাহলে লাভ কি সেটা অন্ধকার করে রেখে? অথচ ছ-আঙুল ব্যাসযুক্ত নথ ছাড়াও নাকের লবঙ্গের মতন বেশরেরও একটা ঐতিহ্য আছে আমাদের দেশে। কঙ্কণ চূড় খাড়ু কানবালা ও মাকড়ির যুগে নাকের এই 'লবঙ্গ বেশরে'র পুনরুজ্জীবন হবে না কেন? অবশ্য তা যদি হয়ও কোনদিন, তাহলেও সেই শান্তিপুরের মেয়েদের মতন নথ-নাড়ার ভঙ্গি আর আমরা দেখতে পাবো না কোনোদিন। গুপ্তিপাড়ার 'চোপা' হয়ত এপাড়া-ওপাড়ায় এখনও মধ্যে মধ্যে শোনা যায়, কিন্তু শান্তিপুরের নথ নাড়া 'is lost for ever'।

ফলাহার

'পাঠক! আমরা প্রকৃত ফলারদাস। লোহার সঙ্গে চুম্বুক পাথরের যে সম্পর্ক, আমাদের সহিত লুচিরও সেইরূপ—তোমার বাড়িতে ফলারটা আসটা জম্‌লে অনুগ্রহ করে আমাদের ভুলো না—আমরা মুন্‌কে রঘুর ভাই! ফলারের নাম শুনে আমরা নরক ও জেলে পর্যন্ত যাই!'—

হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা

মুন্‌কে রঘু কে জানি না। মনে হয় কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের কোন ঐতিহাসিক পুরুষ, অল্ বেঙ্গল ফলার কম্পিটিশনে নাকি রেকর্ড করেছিলেন। অগ্রজ হুতোমের মতে আমরা বাঙালীরা এই মুন্‌কে রঘুর ভাই এবং ফলারের নাম শুনে আমরা নরক ও জেলে পর্যন্ত যাই। কথাটা মিথ্যা নয়। তার একটা প্রমাণ দিয়ে হুতোম বলছেন যে কলকাতার ব্রাহ্ম-সমাজের জন্মতিথি উপলক্ষে ১১ই মাঘ 'পোপ' দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

বাড়িতে বছর বছর একটা অন্নক্ষেত্র হত, তাতে তিনি যোগ দিতেন এবং প্রসাদও পেতেন। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মভোজের (ব্রাহ্মণ ভোজ নয়) দিন তাঁর মাঠের মতন চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্ম ধরত না, অথচ প্রতি বুধবারে উপাসনার সময় সমাজে কেবল জন-দশ-বারোকে চক্ষুবুজে ঘাড় নাড়তে ও সুর করে মন্ত্র পড়তে দেখা যেত। অতএব একমেবাদ্বিতিয়মের সন্তান আমরা হই বা না-হই, আমরা যে মুন্‌কে রঘুর ভাই তাতে কোন সন্দেহ নেই। সত্যিই আমাদের মতন পেটুক ও ভোজনবিলাসী জাত ভারতবর্ষে কেন ,বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আছে কি না সন্দেহ। 'ভোজন' আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির একটা ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য। অবশ্য সব-জাতেরই, তবু বাঙালীর মতন বোধ হয় কোন জাতের নয়! যুগে যুগে বিশুদ্ধ আর্য—তথা হিন্দুস্থানী—তথা রাষ্ট্রীয় ভোজনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি, ছাতু ডাল রুটি ও লাড্ডুর অপ্রতিহত প্রতিপত্তি মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের আমল থেকে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের আমল পর্যন্ত একভাবে রয়েছে। টিকির মতন ভোজনান্তের 'খাট্রা' আজও প্রচলিত। কিন্তু বাঙালীর 'কিচেন কালচার' যুগে যুগে বদলেছে। কালচারের বিভিন্ন উন্নতিশীল উপাদান বাঙালীরা যেমন সর্বাগ্রে সাগ্রহে গ্রহণ করেছে, তেমনি ভোজনের নতুন নতুন সুস্বাদু উপকরণও তারা বিনা-দ্বিধায় আত্মসাৎ করেছে যুগে যুগে! অর্থাৎ আমরা যাকে 'কালচারাল্ সিন্‌থিসিস' বা 'সংস্কৃতি সমন্বয়' বলি, যুগে যুগে বাঙালীর ইতিহাসে বাইরের 'সমাজ' থেকে ভেতরের 'রান্নাঘর' পর্যন্ত সেই সমন্বয় যেমন ঘটেছে, তেমন আর অন্য কোন জাতের ইতিহাসে ঘটেনি। শুধু মনের দরজা নয়, বাইরের সমাজের দরজা নয়, আমরা রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত চিরদিন খুলে রেখেছি লেনদেনের জন্যে। আর্যহিন্দুস্থানীর ছাতু ও ছোলার ডাল শাশ্বত, সনাতন, কিন্তু বাঙালীর ঝোল-ঝাল-চচ্চড়ি-অম্বল নিত্য-পরিবর্তনশীল। হিন্দুযুগের পর মুসলমানযুগে আমরা যে শুধু পোশাক বদলেছি তা নয়, খাবারও বদলেছি। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-কবি ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গলে' তার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করে গেছেন। যেমন :

কচি ছাগ মৃগ-মাংসে ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া কোলমা বাগা সেকটী সমসা॥

অন্য মাংস সিকভাজা কাবাব করিয়া।
রান্ধিলেন মুড়া আগে মশলা পুরিয়া॥

নবাবীখানা হিন্দু জমিদারের ঘরে ঢুকে পড়েছে, সিককাবাব পর্যন্ত। একালের খবরের কাগজের মহিলা রন্ধনবিশারদদের তুলনায় সেকালের বাঙালী মেয়েরা নানারকমের নবাবীখানা রাঁধতে জানতেন। একালের চপ্-কাটলেট-স্টু-ফ্রাইয়ের মধ্যে বৃটিশ ও আমেরিকান প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। খবরের কাগজের রান্নায় আমেরিকান প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে উঠছে দিন-দিন। জামরুলের স্টু বা কালিয়া কোনটাই খাদ্য নয়, অন্তত খাইয়ে কন্‌ভিন্স করাবার আগে পর্যন্ত কিছুতেই তা মানতে রাজী নই। ওটা বিশুদ্ধ ইয়াংকি স্টাণ্ট বা ধাপ্পা। তেমনি এঁচোড়ের ডেভিল, পটলের কাট্‌লেট, চ্যাড়োশ ও চিচিঙের সিককাবাব, মানকচুর ফ্রাই, বেগুনের কাবাব, কুমড়োর চপ ইত্যাদিও। এগুলোর উপকরণের তেরহাত ফিরিস্তি দিয়ে খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় রান্না চলে, কিন্তু রান্নাঘরে রান্না চলে না এবং তা ভোজ্যও নয়। চার আনার জামরুলের জন্যে যদি চার টাকার আধসের ঘি লাগে, তাহলে তার কালিয়া খাওয়ার চেয়ে চিবিয়ে খাওয়া অনেক ভাল। তবু, খবরের কাগজের রান্না দেখে মনে হয় আমাদের বাঙালী মেয়েরা সত্যিই প্রগতিশীল এবং খাদ্যের ব্যাপারে রীতিমত উদার। তবে সংবাদপত্রের রান্না কেউ যেন ঘরে রাঁধবার চেষ্টা করবেন না। সবচেয়ে ভাল হয় যদি সম্পাদকরা খাদ্যের নমুনা আগে চেখে দেখে তারপর সেটা কাগজে প্রকাশ করেন। কেউ কেউ তাও করেন শুনেছি, অবশ্য লেখিকার বাড়ি গিয়ে, কিন্তু সকলে তা করতে সাহস পান না।

অন্যান্য সবরকমের আহারের মধ্যে 'ফলাহারে'র একটা বিশেষত্ব আছে। ফলাহার বাঙালীর এক অপূর্ব সৃষ্টি। এককালে মুনিঋষিরা বিশেষ তিথিনক্ষত্রে হয়ত শুধু ফলমূলাদি আহার করতেন এবং তখন থেকেই ফলাহারের উৎপত্তি। কিন্তু শুকনো ফলমূলের গণ্ডী ছেড়ে বাংলার মাটিতে ফলাহার শেষে ফলারে পরিণত হয়েছে। চিঁড়ে-দই-দুধ-কলা-চিনি-বাতাসা ও সন্দেশ—এই হল সাধারণত ফলারের সব আইটেম। কিন্তু

বাংলার রসাল মাটিতে শেষ পর্যন্ত ফলার ছত্রিশ ব্যঞ্জন ও ছাপ্পান্ন রকমের মিষ্টান্নে পরিণত হল এবং ছত্রিশ ও ছাপ্পান্ন অর্থাৎ বিরানব্বুই রকমের ভোজ্য ভিন্ন কোন ফলারই নাকি ভদ্রোপযোগী বলেই গণ্য হত না। এই কারণে 'ফলার' বাঙালীর কাব্যে পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশায় ছাত্রজীবনের ফলার দেখে উৎফুল্ল হয়ে লিখেছিলেন ঃ

লুচি-কচুরী-মতিচুর-শোভিতং
জিলেপি-সন্দেশ-গজা-বিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তম্॥

সরস্বতী-পুজোর সময় ফলারের আয়োজন হয়েছে, তারই প্রেরণায় এই স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যঝংকার। গুরু জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ছাত্রের এই কবিতা এত উপভোগ করেছিলেন যে, তিনি অনেককে ডেকে ডেকে পড়িয়েছিলেন। অবশ্য গুরু নিজেই একজন ফলারে বামুন ছিলেন, সুতরাং তাঁর ভাল লাগবারই কথা। তখন নাকি সংস্কৃত কলেজে ফলারের লেক্‌চার দিতেন পণ্ডিতমশায়রা। 'সংস্কৃত কলেজের ফলারের প্রোফেসর রকমারি ফলারের লেক্‌চার দিতে আরম্ভ কল্লেন—বৈদিক ছাত্রেরা ভলম্‌নস্‌ নোট লিখে ফেল্লে।' কথাগুলো হুতোমের, কতটা সত্যি জানিনে। তবে সত্যি হওয়া আশ্চর্য নয়, কারণ সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের উপর 'ফলারে'র প্রভাব অত্যধিক দেখা যায়। শুধু বিদ্যাসাগর মশায় নন, 'নাটুকে' রাম-নারায়ণ (রামনারায়ণ তর্করত্ন) তাঁর' কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে ফলার সম্বন্ধে আরও চমৎকার কবিতা লিখেছেন। রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, পরে অধ্যাপকও হন। তাঁর ফলারের শ্রেণীভেদ ও বর্ণনা পড়ে মনে হয়, সংস্কৃত কলেজে লেকচারের কোন ব্যবস্থা হয়ত ছিল। রামনারায়ণ উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিন-রকমের ফলারের কথা বলেছেন। যেমন ঃ

উত্তম ফলার

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি,
দু'চারি আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান-দুই।

ছকা আর শাকভাজা,
মতিচুর বঁদে খাজা,
ফলারের যোগাড় বড়ই ॥
নিখুঁতি জিলাপি গজা,
ছানাবড়া বড় মজা
শুনে সক্‌সক্ করে নোলা।
হরেকরকম মণ্ডা,
যদি দেয় গণ্ডা-গণ্ডা,
যত খাই তত হয় তোলা ॥
খুরী পুরী ক্ষীর তায়,
চাহিলে অধিক পায়
কাতারি কাটিয়ে সুখো দই।
অনন্তর বাম হাতে,
দক্ষিণা পানের সাথে,
উত্তম ফলার তাকে কই ॥

মধ্যম ফলার

সরু চিড়ে সুখো দই,
মত্তমান ফাকাখই
খাসামোণ্ডা পাত পোরা হয়
মধ্যম ফলার তবে,
বৈদিক ব্রাহ্মণে কবে,
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয় ॥

অধম ফলার

গুমো চিঁড়ে জলো দই,
তিতগুড় ধেনোখই
পেটভরা যদি নাই হয়।

রৌদ্দুরেতে মাথা ফাটে,
হাত দিয়ে পাত চাটে,
অধম ফলার তাকে কয়॥

উত্তম ফলার মনে হয় বিদ্যাসাগর-রামনারায়ণের যুগের পর থেকে উঠে গেছে। তার আগে কৃষ্ণচন্দ্র-নবকৃষ্ণের আমলে ছিল বিরানব্বুই ব্যঞ্জন-মিষ্টান্নের ফলার এবং তার দক্ষিণাও বাম হাতে কুলোত না, ভক্তরা মাথায় করে বাড়ি বয়ে দিয়ে আসত। সেটা বোধ হয় 'সর্বোত্তম ফলার'। তারপর উত্তম ফলারের যুগেও ঘিয়েভাজা গরম গরম লুচির সঙ্গে দু-চারটে আদার-কুচি ও কচুরি পাওয়া যেত, ছকাশাকভাজা মতিচুর বঁদে, খাজা জিলেপি-গজা মণ্ডা দেখে নোলা সক্‌সক্ করত, খুরীভরা ক্ষীর থাকত এবং চাইলে বেশিও পাওয়া যেত, বাঁ-হাতের ব্যাপারও ছিল। মধ্যমফলার অর্থাৎ সরু চিঁড়ে সুখো দই, তার সঙ্গে মত্তমান কলা ও মোণ্ডা সেদিন পর্যন্ত আমরা খেয়েছি। কিন্তু যেদিন থেকে আমরা স্বাধীন হয়েছি সেদিন থেকে মধ্যম ফলারও উঠে গেছে। বর্তমানে অধম ফলারের যুগ চলেছে, অর্থাৎ গুমোচিঁড়ে আর তিতগুড়ের। তাও শেষ পর্যন্ত বজায় থাকবে বলে মনে হয় না। ক্রমে গম-মাইলো-ভুট্টা-ছাতুর ভিতর দিয়ে শেষে আমরা হয়ত ঘাস পর্যন্ত পৌঁছব। ফলারের প্রেরণায় এককালে যেমন বিদ্যাসাগর ও নাটুকে রামনারায়ণ কবিতা লিখেছিলেন, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে 'ঘাস' খাওয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একালে 'পরশুরাম' (রাজশেখর বসু) একটি কবিতা লিখেছেন। কবিতাটি উদ্‌ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারলাম না—

মাননীয় ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোকগণ
এবং আর সবাই যাঁদের এ পাড়ায় বাস,
মন দিয়ে শুনুন আমার অভিভাষণ,
আজ আমাদের আলোচ্য—
Eat more grass।
অর্থাৎ আরও বেশি ঘাস খান প্রতিদিন,
কারণ ঘাসেই পুষ্টি, স্বাস্থ্য, বলাধান

দেদার ক্যালরি, প্রোটিন ও ভাইটামিন
ঘাসেই হবে অন্ন-সমস্যার সমাধান।
এই দেখুন না, হরিণ, গো-মহিষ ছাগ
সেরেফ ঘাস খেয়েই কেমন পরিপুষ্ট,
আবার তাদেরই গোস্ত খেয়ে বাঘ
কেমন তাগড়াই কেঁদো আর সন্তুষ্ট।
যখন ঘাস থেকেই ছাগল ভেড়ারপাল
তথা ব্যাঘ্র-শৃগালাদি জানোয়ার পয়দা,
তখন বেফায়দা কেন খান ভাত-ডাল
মাছ-মাংস ডিম, দুধ, ঘি, আটা, ময়দা ?

সর্বোত্তম ও উত্তম ফলার থেকে মধ্যম ও অধম ফলারের মধ্য দিয়ে শেষে ঘাস পর্যন্ত গড়ানো নিশ্চয় বৈপ্লবিক পরিণতি। কিন্তু তাতেও আমাদের আপত্তি ছিল না যদি ঘাসের আর অন্য কোন প্রভাব না থাকত। আহার ও ফলারের সঙ্গে আমাদের জাতীয় কালচার এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, একটি নিশ্চিহ্ন হলে অন্যটিও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এর মধ্যে হতে শুরু করেছে। মেয়েরা ক্রমেই সুখাদ্য রান্না ভুলে যাচ্ছেন এবং সেইজন্যই খবরের কাগজের সব উদ্ভট রান্না তাঁদের মাথায় গজাচ্ছে। তাঁদের দোষ নেই, কারণ রান্নার অভ্যাস না থাকলে তার সুযোগ না পেলে, উপকরণ না পেলে, তাঁরা রাঁধবেন কোথা থেকে ? ক্রমে অনভ্যাসের ফলে রান্না তাঁরা ভুলে যাবেন। রান্নাঘর থেকে রান্না উঠে গিয়ে ক্রমে খবরের কাগজের ছাপার অক্ষরে ভর করবে, অর্থাৎ প্র্যাক্‌টিস না হয়ে, রান্না হবে বিশুদ্ধ থিয়োরী। এবং থিয়োরী অনুযায়ী ঘাসের কাবাব-কোর্মা-স্টু সবই তৈরি করা যাবে, কাগজে তার ফরমুলা বেরুবে। যেমন ঃ 'আধপোয়া ঘাস প্রথমে ভাল করে ধুয়ে নিন পরিষ্কার জলে— তারপর সামান্য একটু হলুদ মেখে আধসেরটাক ঘিয়ে ছেঁকে ভেজে তুলে আলাদা রাখুন। ঘাসগুলো একেবারে খড়ের মতন গুঁড়ো গুঁড়ো করে নিন। আদাবাটা পিঁয়াজ বাটা দিয়ে তাকে চটকান—চট্‌কে লাড়ু পাকান। একসেরটাক আলু (নৈনীতাল) সিদ্ধ করে একটু মরীচগুঁড়ো

দিয়ে চট্‌কে রাখুন। এইবার ঐ আলু দলাদলা করে তার মধ্যে ঘাসের পুর দিন, দিয়ে গোল গোল করে আলাদা পাত্রে রাখুন। পরে সেগুলো ছাঁকা ঘিয়ে ভেজে নিন। এখন এগুলো এমনিতেই খেতে পারেন, অথবা কালিয়াও তৈরি করা যেতে পারে।'

ছাতু মাইলো ভুট্টা ও ঘাস সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি এই কারণে। এগুলো চালু করলে মেয়েরা হাতাখুন্তী ছেড়ে কাগজে-কলমে এমনভাবে রাঁধতে শুরু করবেন যে, আমাদের তিষ্ঠানোই দায় হবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অনভ্যাসের ফলে অতিথিসেবা, আদর আপ্যায়ন, মিষ্টি কথা বলে সাটেপাটে বসে খাওয়ান ইত্যাদি ভুলে যাবেন এবং ক্রমেই অতিরুক্ষ উগ্রমূর্তি ধারণ করবেন। তাতে শেষ পর্যন্ত বায়োলজিকাল বিপ্লব পর্যন্ত ঘটতে পারে। সুতরাং ফলারের ট্রেডিশানাল কালচারটা না-ছাড়াই ভাল। তবে ছত্রিশ ব্যঞ্জনের জায়গায় ছয় ব্যঞ্জন এবং ছাপ্পান্ন রকনের মিষ্টান্নের জায়গায় মাত্র তিনরকম মিষ্টান্ন দিয়ে নতুন একরকমের মডিফায়েড ফলারের প্রবর্তন করা যেতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশে।

বই-চোর

লেখনী পুস্তিকা কান্তা পরহস্তগতা গতা

লেখনী পুস্তক ও স্ত্রী অন্যের হাতে গেলেই গেল। প্রাচীন প্রবচনের এই ওয়ার্নিং সম্বন্ধে আমরা সকলেই মোটামুটি সচেতন, তবু নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে যতটা সচেতন, লেখনী বা বই সম্বন্ধে ততটা নই। কিন্তু

মতন, পুস্তক ও লেখনীও একবার যদি ঘটনাচক্রে পরহস্তগত হয়, তাহলে তা নিশ্চিত 'গত' হয়েযায়, মাথা খুঁড়েও আর ফিরে পাওয়া যায় না। বই পড়েন, বই সংগ্রহ করেন, বই ভালবাসেন, অথচ ভুল করে অন্যের বই অন্তত একখানা আত্মসাৎ করেননি, এমন লোক কেউ জন্মেছেন কিনা আজ পর্যন্ত জানি না। আমার ধারণা, ভবিষ্যতের 'সব-পেয়েছি'র সমাজেও এমন মহৎ লোক কোনদিন জন্মাবেন না। যাঁরা এ-ব্যাপারে, অর্থাৎ পরের বই আত্মবৎ মনে করার ব্যাপারে, নিজেদের নিশ্ছিদ্রচরিত্র বলে মনে করেন, তাঁরা একবার ভাল করে নিজেদের ব্যক্তিগত 'প্রাইভেট পাঠাগারটি' খুঁজে দেখবেন, অন্তত দু-চারখানা অন্যের বই ভুল করেও বুক শেল্‌ফে গুঁজে রেখেছেন কি না। সুতরাং বইচোর আমরা সকলেই এবং এ ব্যাপারে কারও অভিমান থাকা উচিত নয়। পরের দ্রব্য না-বলে নিলে যদি চুরি করা হয় তাহলে অবশ্য অধিকাংশ বইচুরি চুরির পর্যায়েই পড়ে না। কারণ অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য চুরি আর বই চুরির মধ্যে পার্থক্য এই যে, মালিককে জানিয়ে শুনিয়ে বলে-কয়ে তবে বইদ্রব্য চুরি করা হয়, অন্য দ্রব্য চুরি করা হয় না-বলে নিয়ে। বই সম্পর্কে চুরির সংজ্ঞা তাই সংশোধন করা দরকার। সংশোধিত সংজ্ঞা এই :

পরের দ্রব্য বলিয়া-কহিয়া লইলেও তাহা চুরি করা হইতে পারে, যেমন বই চুরি। পরের বই বলিয়া লইলে এবং অতঃপর একেবারে চুপ করিয়া থাকিলে, অথবা ফিরাইয়া দিবার কথা সজ্ঞানে ভুলিয়া গেলে, তাহাকে বই চুরি করা বলে।

একটা চালু কথা আছে : মূর্খরা বই কেনেন, জ্ঞানীরা সেই বই পড়েন। কথাটার বিস্তৃত টীকা করলে অর্থ হয় : যাঁদের পয়সা আছে তাঁরা বই কেনেন, ঘরের আসবাবপত্র, ছবি, ফুলদানি, কিউরিওর মতন সেগুলো শেল্‌ফে সাজিয়ে রাখেন, কিন্তু ভুলেও কোনদিন পাতা খুলে দেখেন না, কোন্ বই-এর মধ্যে কি আছে। যাঁরা বই পড়তে ভালবাসেন, অথচ বই কেনার সামর্থ্য নেই, তাঁদের উচিত এই শ্রেণীর বই-এর মালিকদের কাছ থেকে বই চেয়ে নিয়ে পড়া এবং পারলে না-ফেরত দেওয়া। কথাটা আমিও অনেকটা সমর্থনযোগ্য বলে মনে করি। বই

যিনি লেখেন তিনিও চান তাঁর বই বেশি লোকে পড়ুক। যদি কোন লেখকের দশ হাজার কপি বই কোন মহারাজা কিনে নিয়ে 'গ্রন্থমেধ' যজ্ঞ করতে চান, তাহলে অনেক বই বিক্রি হল বলে প্রকাশক হয়ত বা খুশি হতে পারেন, কিন্তু কোন লেখক নিশ্চয়ই হবেন না। বই-কেনা ও বই-লেখা, দুয়েরই চরম সার্থকতা বইপড়ার মধ্যে। যাঁরা শুধু বই কেনেন, কস্মিনকালেও পড়েন না, তাঁদের বই চিরকাল পড়ুয়ারা বলে-কয়ে চুরি করেছেন এবং অনন্তকাল ধরে চুরি করবেন। বইচুরি এমনিতেই আইনের চোখে অপরাধ নয়, এই শ্রেণীর লোকের বইচুরি তো নয়ই। অপরাধ নয় তার কারণ, বই সব সময় বলে-কয়ে নেওয়া হয় এবং বলে নেওয়া জিনিস না-ফেরত দিলেও আইনত চুরি করা হয় না। সুতরাং বই যাঁরা পড়েন না অথচ বিলাসদ্রব্য হিসেবে কেনেন, তাঁদের বই এইভাবে আইন বাঁচিয়ে সব সময় চুরি করা যেতে পারে, তাতে বরং সমাজের কল্যাণ হয়। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এই জাতের বই-কিনিয়ের সংখ্যা খুব অল্প, সুতরাং নিরপরাধ চুরির সুযোগও কম। বই-কেনার অভ্যাসই এখনও আমাদের হয়নি, তার উপর আমাদের দেশ, গরীব দেশ, চাল-ডাল-নুন-তেলের বদলে বই কেনাটা সত্যিই এখানে বিলাসিতা। সুতরাং আমাদের দেশে যাঁরা বই কেনেন তাঁরা অধিকাংশই বই ভালবাসেন ও পড়েন। আমরা যেসব বই চুরি করি তা হল এঁদেরই বই। আমাদের দেশের সেকালের রাজা-মহারাজা ও জমিদার যাঁরা অনেক বড় বড় গ্রন্থাগারের মালিক ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই যে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি একটা আন্তরিক অনুরাগ ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। সেকালের ধনিক জমিদারদের ঘরে ঘরে যে গ্রন্থ-সংগ্রহ ও গ্রন্থাগার ছিল, একালের ক-জন ধনিক ব্যবসায়ী ও মিল-মালিকের গৃহে সেরকম আছে? সেকালে অর্থের অঙ্গ ছিল কালচার, একালে অর্থ কেবল অর্থের জন্যে, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জন্যে, অর্থাৎ অঙ্গহীন ও একক কালচারের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেকথা থাক, বইচুরির কথা বলা যাক। আমাদের দেশে মূর্খরাই শুধু বই কেনেন না এবং বইচোর যাঁরা তাঁরাই যে কেবল জ্ঞানীগুণী, তাও

নয়। সুতরাং পরের বই বলে-কয়ে চুরি করাও এখানে অন্যায় এবং সম্ভব হলে না-করাই উচিত।

এ ছাড়াও নানারকমের বই চুরি আছে এবং কলকাতা শহরে তা প্রায় হতে দেখা যায়। মাত্র কয়েক বছর আগে একরকমের বই চুরির কথা শুনেছিলাম যা বাস্তবিকই অভিনব। আপনি বই সংগ্রহ করেন এবং ঘরে আপনার একটি গ্রন্থাগার আছে। চোর এ খবর রাখে। আপনি কখন কোন্‌দিন বাড়ি থাকেন না, তাও তার জানা। আপনার অনুপস্থিতিতে সে গাড়ি চড়ে আপনার বাড়িতে এল, সোজা আপনার নামধরে ডাকল। বাড়ির লোক হাবভাব দেখে বুঝল নিশ্চয়ই আপনার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু। তারপর সে জিজ্ঞাসা করল, আপনি বাড়ি আছেন কি না। নেই শুনে হতাশ হয়ে বললেঃ 'তাই তো, কি করা যায়! কখন আসবে জানেন কি? আজকে এই সময় তো থাকার কথা ছিল। আমাকে কয়েকখানা বই দেবার কথা ছিল, সেই জন্যে আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। অনেক দূর থেকে আসছি—ইত্যাদি।' বন্ধু ভেবে আপনার বাড়ির লোক তাকে বসতে বলবে, দরকারী বইও বেছে নিতে বলবে। সেও তখন বসে বসে ভাল দামী বইগুলো বেছে নিয়ে একটা লিস্ট করে আপনার নামে একখানা চিঠিও লিখে রেখে যাবেঃ 'আমি এসেছিলাম, কিন্তু তোর দেখা পেলাম না। বাড়ি থাকার কথা ছিল, ভুলে গেছিস বোধ হয়। যাই হোক, বইগুলো আমি নিয়ে গেলাম আবার তিন দিন পরে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।'—ইত্যাদি চিঠি পড়ে বাড়ির লোকের কোন সন্দেহই রইল না যে সে আপনার বন্ধু নয় শুধু, বাল্যবন্ধু। আপনি বাড়ি ফিরে সব কাহিনী শুনলেন, চিঠি পড়লেন এবং দেখলেন যে দামী ও দুষ্প্রাপ্য বইগুলো সব সাফ হয়ে গেছে। এই চুরি আমার নিজেরই এক বন্ধুর বাড়িতে হয়েছিল, আমি জানি। আর একরকম বইচুরির কথা কয়েকদিন আগে শুনলাম। জনৈক ভদ্রবেশী লোক বেশ বড় একটা পোর্টফোলিও নিয়ে হাইকোর্টের অ্যাটর্নিদের আফিসে ঘোরাফেরা করতেন। সব সময় নয়, বেলা ঠিক সাড়ে নয়টা থেকে দশটার মধ্যে, যখন আপিস খুলে বেয়ারারা ঝাড়মোছ করে এবং কর্তাও আপিসে এসে পৌঁছান না। সোজা এসে তিনি নাকি

নিজেকে মক্কেল হিসেবে পরিচয় দিতেন এবং বেয়ারারা খুব খাতির করে তাঁকে অ্যাটর্নির ঘরে বসতে দিত। তিনি সেই ফাঁকে দু-একখানা দামী আইনের বই পোর্টফোলিওয় পুরে বেরিয়ে পড়তেন, 'ঘুরে আসছি' বলে। বেশ কয়েকদিন এইভাবে তিনি এক একজন অ্যাটর্নির আপিসে মক্কেল সেজে কাজ হাঁসিল করছিলেন, অবশেষে নাকি ধরা পড়েছেন। আইনের বই, প্রতিদিন খানদুই করে সাফ করতে পারলেই পঞ্চাশ-ষাট টাকা রোজগার এবং বিনা ক্যাপিটালে ও মেহনতে। ভদ্রলোকের বুদ্ধি আছে, কিন্তু আরও একটু যদি বেশি বুদ্ধি থাকত তাহলে তিনি একজায়গায় অ্যাটর্নি মহলে না ঘুরে, বিরাট কলকাতা শহরের অ্যাটর্নি ও বড় বড় আইনজীবীদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরতেন। ভবিষ্যতে হয়ত তাঁর পার্টনাররা তাই করবেন। সুতরাং উকিল ব্যারিস্টার ও অ্যাটর্নিরা মক্কেল সম্বন্ধে সাবধান! ডাক্তাররাও নিশ্চিন্ত হবেন না, কারণ মক্কেলের মতন তাঁদেরও রুগী আছে। বাইরে Call-এ বেরিয়ে যাবার পর কোন রুগী যদি তাঁর চেম্বারে এসে একখানা অ্যানাটমি সার্জারির বই সাফ করে একটা বোগাস Call দিয়ে চলে যায়, তাহলে সেটা খুব মর্মান্তিক ব্যাপার হবে। বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপকরাও সাবধান হবেন, কারণ ছাত্র সেজে এসে কেউ যদি বই নিয়ে চলে যায়, তাহলে আফসোসের আর সীমা থাকবে না। ক্লাইম্যাক্স হল দফ্‌তরী সেজে এসে কেউ যদি আপনার সবচেয়ে দামী ও দুষ্প্রাপ্য জীর্ণ বইগুলি বাঁধিয়ে দেবার নাম করে নিয়ে যায়, তাহলে আপনার আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না। এই ধরনের বইচুরির হাত থেকে বাঁচবার উপায় কি?

মানুষের সমাজে যেদিন থেকে চুরি ও চোরের আবির্ভাব হয়েছে, সেইদিন থেকে বইচুরিও আরম্ভ হয়েছে। অনেকে বলবেন, তা কি করে হবে, কারণ আগে তো বই-ই ছিল না, তাহলে বইচুরি হবে কি করে? কথাটা ঠিক। খুব বেশি হলে বইয়ের বয়স দু'শ বছর, তার আগে ছাপা বই ছিল না, সুতরাং বইচুরিও হত না। কিন্তু তার আগে তো হাতে-লেখা নানারকমের 'পাণ্ডুলিপি' ছিল! এই সব পাণ্ডুলিপিও রীতিমত চুরি হত। এই সব প্রাচীন পাণ্ডুলিপি যদি কেউ কোন গ্রন্থশালায় ঘেঁটে ঘুঁটে দেখেন,

তাহলে দেখতে পাবেন তার মধ্যে বই চোরদের কিরকম রূঢ় ভাষায় গালাগাল ও অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। এমনি গাল নয় বাপ-চোদ্দপুরুষ তুলে গালাগাল দেওয়া হয়েছে এবং নির্বংশ হবে, নরকে যাবে ইত্যাদি বলে বইচোরদের অভিশাপও দেওয়া হয়েছে। যেমন কেউ বলছেন—

পুস্তকং হরতে যস্তু কাণো দুঃখী
ভবেন্নরঃ
মৃতঃ স্বর্গং ন গচ্ছেতু
পিতরং নরকং নয়েৎ ॥

কেউ বলছেন—

অর্জিতং ভূরিকষ্টেন পুস্তকং যচ্ছ
মেনঘ।
হর্তুমিচ্ছতি যঃ পাপী তস্য
বংশক্ষয়ো ভবেৎ ॥

গালাগাল ও অভিসম্পাতের বহর এই থেকে বোঝা যায় যে হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপির আমলেও বইচোরের কিরকম উপদ্রব ছিল। যে পাপী বই চুরি করবে তার বংশক্ষয় হবে, সে নরকযন্ত্রণা ভোগ করবে। এত অভিসম্পাত দিয়েও বইচুরি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি সেকালে। তাই সেকালের গ্রন্থকাররা জঘন্য ভাষায় বইচোরদের গালিও দিয়েছেন। সযত্নে লেখা বই—যে হতভাগ্য চুরি করবে তাঁকে তাঁরা বলেছেন—

শূকরী তস্য মাতা চ পিতা তস্য চ গর্দভঃ

খোলাখুলি পাণ্ডুলিপির মধ্যে এইভাবে গালাগাল ও অভিশাপ দেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না তখন। একখানা ছাপা বই চুরি যাওয়া আর হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি চুরি যাওয়ার মধ্যে তফাত অনেক। প্রাচীনকালে যাঁরা ঘরে পাণ্ডুলিপি কপি করিয়ে রাখতেন তাঁরা হয়ত কপি করাবার সময় চুরির ভয়ে এই সব কথা লিখে দিতেন। সব সময় যে লেখকই লিখতেন তা নয়। তখন তো আর দোকান থেকে বই কেনা যেত না, ছাপাও যেত না. যাঁর দরকার হত তিনি প্রচুর পয়সা খরচ করে কপিস্ট দিয়ে বহুদিন ধরে হয়ত একটা পাণ্ডুলিপি কপি করিয়ে নিতেন। সেটা চুরি গেলে তার,

অভাব পূরণ করা আর সম্ভব হত না। সুতরাং বইচোরদের পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রকাশ্যে গালাগাল দিতে হত। কিন্তু গালিগালাজ ও অভিসম্পাতের মাত্রা থেকে বোঝা যায়, বই চোরদের সহজে দমন করা যেত না। এখন ভেবে দেখুন, সেই সময় কারা বই চুরি করত। পণ্ডিত গুরু ও আচার্যদের মধ্যে হয়ত অনেকে করতেন, অথবা তাঁদের ছাত্র ও শিষ্যরা, অথবা রাজামহারাজা, জমিদারদের অনুচরেরা। তা ছাড়া আর কারা করবে? জ্ঞানের রাজ্য তখন সাধারণ মানুষের কাছে রূপকথার রাজ্য ছাড়া কিছু নয়, সুতরাং পাণ্ডুলিপি তারা চুরি করত না। তবে কারা করত?

তাই বলছি, বইচোর বহুকাল ধরে সমাজে আছে এবং বইচুরির একটা প্রাচীন অভিজাত ঐতিহ্যও আছে। সেকালের পণ্ডিতদের সংখ্যা যখন কম ছিল তখনই যখন বইচোরের অত উপদ্রব ছিল, এখন শিক্ষিতের সংখ্যা যখন বেড়েছে তখন বইচোরের উপদ্রব যে আরও বাড়বে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে! অর্থাৎ শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বই চুরিরও বিস্তার হয়েছে। লজিকটা মারাত্মক হলেও, অগ্রাহ্য করা যায় না। সুতরাং শিক্ষিতের সংখ্যা যত বাড়বে, বইচোরের সংখ্যাও তত বাড়বে। এই হল বইচুরির 'সোশিওলজি'। অতএব শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। আর সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে যাঁরা বইচুরি করেন তাঁরা পূর্বপুরুষদের অভিসম্পাতের কথা মনে রাখবেন—অর্থাৎ 'তস্য বংশক্ষয়ো ভবেৎ'। সজ্ঞানে যাঁর বই না-বলে চুরি করেছেন তাঁকে ফেরত দিয়ে আসুন। যাঁর বই বলে-কয়ে নিয়ে অজ্ঞানে আত্মবৎ মনে করছেন, তাঁর বই আজই ফেরত দিয়ে আসুন। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করবেন।

প্রথম স্তবক

যাঁরা বিবাহ করেছেন অথবা করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন, তাঁদের এ লেখা না পড়াই ভাল। যাঁরা বিবাহ করেননি এবং করবেন কি-না স্থির করেননি, তাঁরা নিজেদের দায়িত্বে পড়তে পারেন। যাঁরা চিরকুমার ও চিরকুমারী থাকা সাব্যস্ত করেছেন তাঁরা অবশ্যই পড়বেন। বাকি সকলে খুশি হয় পড়বেন, না হয় পড়বেন না। আমার নিজের দিক থেকে এ বিষয় লেখার ঝক্কি থাকলেও, তা কাটিয়ে নিয়ে লিখছি। অতএব লেখক সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

বিবাহ প্রসঙ্গে প্রথম প্রশ্ন হল, বিয়ে করা উচিত কি না? বায়োলজিকালি ও কাল্‌চারালি এ প্রশ্ন উত্থাপন করাই অন্যায়, একেবারে অবান্তর প্রশ্ন। 'বায়োলজি' প্লাস 'কাল্‌চার' মিশিয়ে যে প্রেম, তার স্বাভাবিক পরিণতি হল বিবাহ। কিন্তু এ হল বিবাহ সম্বন্ধে গম্ভীর তত্ত্বকথা। তত্ত্বকথার ধার ঘেঁষে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। সাধারণ লোক এবং নানারকমের লোকের মনের কথা বুঝিয়ে বলাই আমার উদ্দেশ্য। কথাও অবশ্য একরকমের কথা নয়, নানারকমের কথা। যেমন সেদিন দেখলাম একজন উত্তেজিত হয়ে বলছেন: 'বিয়ে করা কোন্ ভদ্দরলোকের উচিত নয়।' আর একজন বিয়ের জন্যে পাগল হয়ে ঘুরে শেষকালে এক খ্যাতনামা গণৎকারের কাছে হাত দেখাতে গেছেন। ভীষণ অদৃষ্টবাদী লোক এবং সংস্কারে বিশ্বাসী। বেপরোয়া হয়ে তিনি তাই শেষ পর্যন্ত জানতে চান যে, তাঁর ভাবী স্ত্রী আদৌ কারও কন্যা হিসেবে কোথাও জন্মগ্রহণ করেছেন কি না। বিবাহ সম্বন্ধে এই দু-জনের মত নিশ্চয়ই এক নয়, যদিও বিয়ে করা কোন 'ভদ্দরলোকে'র উচিত নয় যিনি বলছিলেন তিনি বিবাহিত। জনৈক আধুনিক কুমার একটু ফরাসী স্টাইলে হেসে বললেন: 'বিয়ে জিনিসটাই একটা দীর্ঘদিনের কুসংস্কার,

এখনও ওটা আঁকড়ে থাকার কোন মানে হয় না। স্ত্রী-পুরুষের সম্পূর্ণ মেলামেশার স্বাধীনতা থাকা উচিত এবং কোন বন্ধনে কাউকে বাঁধা ঠিক নয়। যেহেতু আমরা মানুষ, কুকুর বেড়াল নই, আমাদের মেলামেশার মধ্যেও একটা রুচিবোধ ও শ্লীলতাবোধ থাকবে। তার জন্যে বিয়ের কোন দরকার নেই। মানুষ তো বহুকাল ধরে বিয়ে করছে, কিন্তু তার ফলে কি আমাদের রুচিবোধ ও শালীনতাবোধ বেড়েছে? একেবারেই বাড়েনি। অসভ্য বর্বরদের সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে যেটুকু নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আছে, আমাদের সভ্যসমাজে তার শতাংশের একাংশও নেই। সুতরাং মানুষের সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা আনার উপায় হিসেবে 'বিবাহ' একেবারে অচল, 'একটা গতানুগতিক কুসংস্কার ছাড়া কিছু নয়।' ভদ্রলোক দীর্ঘদিন প্যারিসে ছিলেন এবং চলাফেরায়, কথাবার্তায় একেবারে প্যারিসিয়ান। তবু বিবাহ সম্বন্ধে আধুনিক মতামত ও মনোভাবের একজন প্রতিনিধি তাঁকে বলা যায়। আর একজন যুবক ছিলেন, তিনি বললেন: 'নিজের পরিবার, নিজের সন্তান, এইসব বোধ থেকেই সম্পত্তির লোভ, অর্থলোভ ইত্যাদি দেখা দেয় এবং সমাজে নানারকমের বিরোধ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। সুতরাং সামাজিক সাম্য ও শান্তির জন্যে বিয়ের ব্যাপারটাই তুলে দেওয়া উচিত। পরিবার হবে পরিবর্তনশীল, সন্তানাদি হবে রাষ্ট্রের এবং স্ত্রী-পুরুষের জীবন-যাত্রায় পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।' এও একদল আধুনিকের মত। কিন্তু এ সব তর্কের মধ্যে গিয়ে লাভ নেই। এ নিয়ে অনেক তর্কাতর্কি হয়ে গেছে, অতএব তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। 'বিয়ে করা উচিত কি না?' এই প্রশ্নই যে আধুনিক মানুষের মনে জেগেছে, এইটাই সব চেয়ে বড় কথা। সুতরাং কেন এই প্রশ্ন জেগেছে তার উত্তর আগে দেওয়া উচিত, তারপর দেখা যাবে সত্যিই বিয়ে করা উচিত কি না? যদি উচিত বলেই সাব্যস্ত হয় তাহলে কিভাবে ও কখন বিয়ে করা উচিত এবং একবার করে ফেললে সামলানো যেতে পারে কি না? সামলাবার উপায় কি? বিয়ে করলেও অবিবাহিতের মতন স্বাধীন থাকা যায় কি না? প্রেম করলেই বিয়ে করতে হবে কি না? প্রেম বাদ দিয়েও

বিবাহিত জীবন বেশ হেসেখেলে-খেয়েদেয়ে-নেচেগেয়ে কেটে যেতে পারে কি না ?

এরকম অনেক প্রশ্ন একে একে উঠবে এবং যথাস্থানে তার উত্তরও দেওয়া যাবে। তবে কোন উত্তরকে কেউ যেন তত্ত্বকথার মতন সিরিয়াস্‌লি নেবেন না, নিছক একটা একতরফা আলোচনা হিসেবে গ্রহণ করবেন। একতরফা আলোচনা এইজন্যে বলছি যে, এখানে বিতর্কের কোন অবকাশ দিতে আমি রাজী নই, দেওয়া সম্ভবও নয়। কারণ বিয়ে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত এবং কার কি মত তা জানবার কোন দরকার নেই। যাঁর যা মত তাই আঁকড়ে ধরেই পরম নিশ্চিন্তে তিনি থাকুন, আমার মতামত গ্রহণ করবার আবশ্যকতা নেই। তা ছাড়া, যা লিখব এখানে তা যে সত্যিই আমার নিজস্ব মতামত তাই বা কে বললে ? এটা অনেকটা হঠাৎ একটা জমাটি আড্ডায় বসে আলোচনার মতন, তাও আবার একতরফা আলোচনা। সুতরাং বিয়ে ভবিষ্যতে করুন বা নাই করুন, অথবা অতীতে করে বর্তমানে পস্তান বা আরামে থাকুন, 'বিবাহ প্রসঙ্গে' আলোচনার এই কথাটা মনে রাখবেন। এইবার প্রথম প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা যাক্—'বিয়ে করা উচিত কি না।' এ প্রশ্ন আজকাল আমাদের মনে জেগেছে কেন ?

এ প্রশ্ন মনে জাগবার প্রথম কারণ আর্থিক, দ্বিতীয় কারণ মানসিক। খুব বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র একশ' বছর আগেও এই 'বিবাহ' আমাদের সমাজে কি বস্তু ছিল তা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে আজ। পুরুষরা তখন গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে করত, কুলীন হলে তো কথাই নেই। বিবাহ জিনিসটা কি ছিল তখন ? বিবাহের সঙ্গে প্রেমের কোন সম্পর্ক ছিল কি ? প্রেমের সঙ্গে বিয়ের যদি কোন সুদূর সম্পর্কও থাকে, তাহলে সেকালে প্রেম বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য সতীদাহের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ কেউ যদি খুঁজে বার করেন তাহলে আর বলবার কিছু নেই। আমার কিন্তু মনে হয় সতীদাহই সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে প্রেম বলে কিছু ছিল না সেকালে, বিয়েটা ছিল বহুদিনের পুরনো একটা বদভ্যাসের মতন এবং সতীদাহটা

ছিল একটা কুসংস্কার। সতীদাহের দু-একটা বিবরণ থেকে ব্যাপারটা আরও সহজে বুঝতে পারবেন।

মার্শম্যান ও কেরী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুরের ছাপাখানার কর্মচারী এক সতীদাহ স্বচক্ষে দেখে এই রকম বর্ণনা করে গেছেন: নদীয়া জেলার বাঘনাপাড়া গ্রামের অনন্তরাম শর্মার মৃত্যুতে তাঁর সাঁইত্রিশজন স্ত্রী সহমৃতা হন। ব্যাপারটা ১৮০০ সালে ঘটে। অনন্তরাম কুলীন বলে একশটা বিয়ে করেছিলেন। মৃত্যুর পরে তাঁর চিতাগ্নি জ্বললে প্রথমে তিনজন স্ত্রী তাঁর সহমৃতা হন। এই তিনজনই তাঁর কাছে ছিলেন। অন্যান্য স্ত্রীরা দূরে ছিলেন। অর্থাৎ বাপের বাড়ি। তাঁদের খবর দেবার পর যাতে তাঁরা এসে পৌঁছতে পারেন, তার জন্যে চিতাগ্নি তিন দিন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল। নানা জায়গা থেকে স্ত্রীরা এসে উপস্থিত হতে থাকলেন এবং চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিতে লাগলেন। এইভাবে প্রথম দিনে তিনজন, দ্বিতীয় দিনে পনের জন এবং তৃতীয় দিনে উনিশ জন স্ত্রী সহমৃতা হন। চিতা নিভে যাওয়ার আগে বাকি তেষট্টিজনের পক্ষে বোধ হয় পৌঁছান সম্ভব হয় নি, অথবা স্ত্রীর তালিকায় তাঁদের নাম-ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায়নি। যাঁরা সহমৃতা হয়েছিলেন তাঁদের বয়স ষোলো থেকে চল্লিশ-এর মধ্যে। তার মধ্যে মাত্র তিনজন স্বামীর সঙ্গে বাস করতেন, বাকি চৌত্রিশ জন বিয়ের দিনের একদিন ছাড়া স্বামীর সঙ্গ পাননি। এইরকম আরও অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উল্লেখ করা যায়, কিন্তু করে লাভ নেই। একটি কাহিনীই যথেষ্ট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে বিবাহ, এটা কি বস্তু? এর মধ্যে বায়োলজিও নেই, কাল্চার তো নেই-ই। আছে কেবল ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের বিকৃতমস্তিষ্ক শাস্ত্রকারদের কতকগুলো অনুশাসন। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মনের কোন সম্পর্কই ছিল না, প্রেম তো বহুদূরের কথা। অন্যান্য স্ত্রীদের কথা ছেড়েই দিলাম, অনন্তরামের যে তিনজন স্ত্রী সর্বদা স্বামীর সঙ্গে বাস করতেন এবং যাঁরা প্রথম সহমৃতা হয়েছিলেন, তাঁরা কি অনন্তরামকে ভালবাসতেন? মনে হয় না, সম্ভব নয় ভালবাসা। সহমরণটা কি প্রেমের নিদর্শন ছিল? উৎপীড়নের ভয়ে তাঁরা সহমৃতা হতেন। সহমরণের

জন্যে উপস্থিত হলে, জনতা হরিধ্বনি দিত, ঢাকঢোল বাজাত। সে ঢাকের বোল্ই ছিল আলাদা—

ঘিনাক্ গি গিনি ঘিনাক্ গি
ঘিনাক্ গি গিনি ঘিনাক্ গি

ঢাকের বোল্ শুনে দূর থেকে লোক সতীদাহের কথা বুঝতে পেরে এসে জমা হত। অনেক ক্ষেত্রে কাঁসরও বাজানো হত। এই যে ঢাকের শব্দ, একে নিশ্চয় কোন উন্মাদ 'প্রেমের জয়ঢাক' বলবেন না। মেয়েরা তো বলবেনই না, পুরুষরাও বলবেন না। আজকাল ঢাক বাজিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কোন সম্পর্ক জাহির করা হয় না বটে, কিন্তু ঢাকুরিয়া লেকের প্রাক্-বৈবাহিক সহমরণের মধ্যে প্রেম আছে, রোমান্সও আছে, সেকালের সহমরণের মধ্যে কোনটাই ছিল না। সামাজিক, মানবিক, জৈবিক বা সাংস্কৃতিক, কোন মূল্যই তখন স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে ছিল না, বিবাহেরও ছিল না। কদর্য মুদ্রা-দোষের মতন বিবাহটাও একটা মুদ্রাদোষ ছিল।

দীনবন্ধুর 'বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো'র মতন অনেক বুড়ো তখন সমাজে ছিল। আজকাল বুড়ো তো দূরের কথা, যুবকই নেই। বিয়েটা যে-সমাজে মুদ্রাদোষ ও বদভ্যাসের মতন ব্যাপার, যবন হরিদাস প্রবর্তিত হরির লুটের বাতাসার মতন যে-সমাজের মেয়েরা অত্যন্ত সুলভ ও সহজলভ্য, সে-সমাজের মৃতদার বুড়োরাও যে বিয়ের জন্যে পাগল হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? স্কুলের ছেলেপিলেরা যদি কোন পুরুষকে স্ত্রীলোক বানিয়ে বিয়েপাগলা বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একটু কৌতুক করে, তাতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো যে এখনও দু'চারজন নেই তা নয়, আছেন, এবং এখনও তাঁদের মাথায় হাত বুলিয়ে, মেয়ে দেখিয়ে বেশ দিব্যি রেস্টুরেন্টে খাওয়া যায়। তবে তাঁদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে, এবং ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এখনকার তরুণরাই একেবারে বিয়েপাগ্‌লা নয়, বরং বিয়ে-বৈরাগী। এখন যদি বিয়েপাগ্‌লা তরুণ বলে কোন নাটক কেউ লেখেন, তাহলে সেটা সমাজের মিথ্যা প্রতিচ্ছবি হবে। তেমনি 'জামাইবারিক' প্রহসনও এখন আর লেখা

সম্ভব নয়। এখন আর বিজয়বল্লভের মতন শ্বশুর পাওয়া যাবে না, যিনি কুলীন সন্তানদের কন্যাদান করে তাদের ঘরজামাই রাখবেন এবং তাদের সুখে বসবাসের জন্যে বিরাট একটি অট্টালিকা তৈরি করে দেবেন। এই ধরনের ঘরজামাইদের বসবাসের গৃহকেই লোকে জামাইবারিক বলত। জামাইরা সব সেই বাড়িতে থেকে গাঁজাগুলি খেতেন, তাসপাশা গোলকধাম খেলতেন এবং দিনক্ষণ দেখে পাসপোর্ট পেলে তবে অন্দরমহলে যার-যার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। অর্থাৎ সেকালের ঘরজামাইদের জন্যে শ্বশুরদের আলাদা একটা ধর্মশালা গোছের গৃহ তৈরি করতে হত। সেখানে ধর্মের ষাঁড় ঘরজামাইরা থাকতেন, স্ত্রীরা থাকতেন না। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও সবসময় তাঁদের হত না। বাড়ির নায়েব মশাই বা সরকার মশাই-এর কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে তবে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে হত। অভয়কুমার এইরকম একজন ঘরজামাই ছিলেন। একদিন অনেক কষ্টে বলে-কয়ে ছাড়পত্র সংগ্রহ করে তিনি অন্দরমহলে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বোধ হয় কিছু বেফাঁস কথা বলে ফেলেছিলেন। তাতে তাঁর স্ত্রী কামিনী তাঁকে পদাঘাত করে বিতাড়িত করবে বলেছিল।

এইবার বুঝুন, বিবাহ কাকে বলে এবং বিয়ের ঠ্যালাটা কি? মাত্র একশ' বছর আগে, আমাদের ঠাকুরদাদের আমলে, বিবাহ এই বস্তুই ছিল, এর চেয়ে উচ্চস্তরের কিছু ছিল বলে মনে হয় না। বিয়ে করে ঘরজামাই হয়ে যদি ধর্মশালায় থাকতে হয় এবং দিনের পর দিন যদি গোলকধাম ও বাঘবন্দী খেলে হাঁই তুলে প্রহর গুণে কাটাতে হয়, ন'মাসে ছ'মাসে যদি ছাড়পত্র নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি মেলে, তাহলে কাজ কি অমন বিয়ে করার, এবং বিয়ের জন্যে পাগল হওয়ার, বুঝিনে। তবু লোকে তখন পাল্লা দিয়ে বিয়ে করত এবং বিয়ে করাটা কতকটা পথচল্‌তে কল্‌কে চেয়ে তামাক খাওয়ার মতন ব্যাপার ছিল। বিয়ের যখন এই অবস্থা অনেককাল ধরে ছিল, তখন প্রেমের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। তাহলে বিয়ে সম্বন্ধে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে, বিয়েটা কি? বিবাহ ও প্রেম এক বস্তু কি না এবং বিবাহের কোন প্রয়োজন আদৌ আছে কি না?

অভয়কুমার অবশ্য অভিমান করেই প্রতিবেশী পদ্মলোচনের সঙ্গে বৃন্দাবন চলে গিয়ে বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছিলেন। পদ্মলোচনও তাঁর সহযাত্রী হয়েছিলেন দুই স্ত্রীর কলহে অতিষ্ঠ হয়ে। তারপর অবশ্য অভয়কুমারের স্ত্রী কামিনী এক প্রতিঘেশিনীর সঙ্গে বৃন্দাবন গিয়ে অভয়কুমারের সঙ্গে কণ্ঠীবদল করেন। কিন্তু যতই কণ্ঠীবদল করুন, সেটা যে তিনি প্রেমের তাড়নায় বা প্রেরণায় করেছিলেন তা মনে হয় না। নাট্যকার জোর করে কণ্ঠীবদল করিয়েছিলেন। বিয়েটা যে কি ভয়াবহ ছিল তা পদ্মলোচনের অবস্থা দেখে সবচেয়ে ভাল বোঝা যায়। পদ্মলোচনের দেহ দুই সতীনে দুই ভাগ করে নিয়েছিল এবং দরকার মতন যে যার ভাগে উত্তম মধ্যম কিল ঘুষি লাগাত। বিবাহের বহরটা একবার কল্পনা করুন। আমরা যখন সেই অভয়কুমার ও পদ্মলোচনদেরই বংশধর তখন এই ধরনের বিবাহের প্রতি আমাদের একটা হেরিডিটারী বায়াস থাকা আশ্চর্য নয়। হয়ত আছে, তবে চাপা আছে। তবু অভয়কুমাররা শ্বশুবাড়ির ধর্মশালায় থাকলেও দুধে-ভাতে ছিলেন, পদ্মলোচনদের আমলে তেল ঘি এত খাঁটি ও সস্তা ছিল যে তেল তাঁদের গা দিয়ে চুঁইয়ে পড়ত এবং সতীনদের দু-চার ঘা প্রহার সহ্য করবার মতন হিম্মৎও ছিল তাঁদের। সুতরাং নির্বিবাদে তাঁরা একটার পর একটা বিয়েও করতেন, কিল-চড়-ঘুষিও খেতেন, কিছু পরোয়া করতেন না, প্রেমের ধারও ধারতেন না। এখন আর সেকাল নেই। বহুবিবাহ তো দূরের কথা, একবিবাহেই এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি। তাছাড়া আগে প্রেম ছিল না, অন্তত ছিল বলে আমি বিশ্বাস করি না, কালিদাস চণ্ডীদাসের সব মনগড়া কল্পনা। সুতরাং প্রশ্ন উঠেছে বিবাহ করা উচিত কিনা? নিঃসন্দেহে এটা এযুগের প্রশ্ন। অনন্তরাম শর্মা, অভয়কুমার বা পদ্মলোচনের মনে এ-প্রশ্ন জাগেনি। এখন জেগেছে, কারণ এখন প্রেম আছে, কিন্তু তেল ঘি আর সস্তা নেই না-খেয়ে প্রেম করা যায়, বিয়ে করা যায় না, একটাও না।

দ্বিতীয় স্তবক

'লভ' কথার অর্থ 'দি কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিক্‌শনারী'তে লেখা আছে ঃ Warm affection, attachment, likeness or fondness, paternal benevolence, affectionate devotion ইত্যাদি। রাজশেখর বসু 'চলন্তিকা' অভিধানে বলেছেন ঃ 'প্রেম (প্রেমন)—ভালবাসা, প্রণয়, অনুরাগ, স্নেহ, প্রীতি, Love (পত্নী সন্তান বন্ধু দেশ ঈশ্বর ইঃর প্রতি)'। ফরাসী কবি বোদ্‌লেয়ার বলেন যে, প্রেমের আনন্দ হল 'misunderstanding'-এর আনন্দ—'The man cries : Oh, my angel! The woman coos : Mamma! Mamma! And these two imbeciles are persuaded that they think alike,' একথা কবি তাঁর 'Intimate Journals'-এ লিখে গেছেন। বাৎস্যায়ন বলেন, প্রেম তিন রকমের নায়িকার সঙ্গে করা যায়—নায়িকাস্তিস্রঃ কন্যা পুনর্ভূর্বেশ্যা চ—কুমারী, পুনর্ভূ ও বারবনিতা। স্ত্রী ধর্মের সঙ্গিনী, প্রেমের নায়িকা নন। লেনিন বলেন, প্রেম হল 'Biology plus Culture.'

কালিদাস চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি থেকে রবীন্দ্রনাথ, সেক্সপীয়র থেকে বার্নাডশ', প্লেটো থেকে রাসেল, অনেকের মতামত 'প্রেম ও বিবাহ' সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় এবং তাতে বিরাট একখানি গ্রন্থও স্বচ্ছন্দে সঙ্কলন করা যেতে পারে। এখানে তা সম্ভব নয় বলেই নিজের খেয়ালে কয়েকজনের মতামত শুধু উদ্‌ধৃত করলাম। প্রথমেই অভিধানের আশ্রয় নিয়েছি এই জন্যে যে, এ-ব্যাপারে কবি ও সাহিত্যিকদের উপর নির্ভর করা যায় না, কারণ তাঁরা মনগড়া কথা এত বেশি ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলেন যে, শেষ পর্যন্ত তার সলিড তলানি কিছু খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বিজ্ঞানীদের শরণাপন্ন হইনি এই জন্যে যে, 'প্রেম' কি প্রশ্ন করলেই তাঁরা হয়ত বলবেন যে, প্রেম হল থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অত্যধিক ক্ষরণজনিত একটা চুল-বুলুনি এবং তা শুনে হয়ত অনেক নিরীহ নিষ্ঠাবান প্রেমিক-প্রেমিকার পাকস্থলী পর্যন্ত কেঁপে উঠবে। সুতরাং তাঁদের একেবারে বাদ দিয়েছি। কেবল একজন ব্যক্তির কথা বলেছি বোদ্‌লেয়ারের, কারণ অনেকের

অনেক কথার মধ্যে তাঁর কথাটা সত্যিই মনে রাখবার মতন কথা: 'প্রেমের আনন্দ পরস্পরের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণার আনন্দ। পুরুষ বলে: ওগো সুন্দরী,, প্রিয়তমে! নারী তাই শুনে উম্ উম্ করে, গুঞ্জন করে, মার্জারের ঘড়ঘড়ানির মতন। তারপর একদিন এই অপদার্থ জীব দু'টি ভাবতে আরম্ভ করে যে তাদের চিন্তাধারা এক, কর্মধারা এক, বাসনা-কামনা এক ইত্যাদি। এই যে মারাত্মক ভুল ধারণা এবং এই ভুল ধারণার যে আনন্দ-শিহরণ, একেই বলে প্রেম।' একটা কথার মতন কথা নয় কি? বাৎস্যায়নের কথা বলেছি, কারণ তিনি আমাদের দেশে প্রেমের শাস্ত্র বা 'কামশাস্ত্র' লিখেছেন, তাঁকে বাদ দেওয়া যায় না। লেনিনের কথা বলবার কারণ, বিপ্লবের চিন্তার মধ্যেও তিনি যে 'প্রেম' সম্বন্ধে ভেবেছিলেন এবং প্রবাদবাক্যের মতন এমন সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন, এইটাই আশ্চর্য! কিন্তু বাৎস্যায়নের কথা বললে, আরও একজন ভারতীয় কবির কথা বলা উচিত, তিনি তামিল কবি তিরুবল্লুবর্। 'কামশাস্ত্রের' মতন তাঁর 'কুরল' গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। তামিল 'অকম্' শব্দের অর্থ 'প্রেম', আর 'পুরম্' শব্দের অর্থ প্রেম ছাড়া জীবনের অন্যান্য দিক, বিশেষ করে 'লড়াই'। এই অকম্ ও পুরমই প্রাচীনতম তামিল সাহিত্যের অন্যতম বিষয়বস্তু। অর্থাৎ দু'টি মাত্র বর্গে জীবন ভাগ করা—প্রেম ও লড়াই। একেবারে আদিম মানুষের কথা যেন তামিল সাহিত্যে বলা হয়েছে। পরে উত্তরভারতের ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে চারটি বর্গ এসেছে—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ। কিন্তু আশ্চর্য হল, বাৎস্যায়ন 'কাম-শাস্ত্রের' গোড়ায় ত্রিবর্গকে নমস্কার করেছেন—ধর্মার্থকামেভ্যো নমঃ—এর মধ্যে 'মোক্ষ' নেই।

এইবার তত্ত্বকথা ছেড়ে নিজের কথায় আসা যাক। কথাগুলো হয়তো নবদ্বীপের ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনার মতন শোনাবে, তবু শুনতে ক্ষতি কি? প্রেম ও বিবাহ কি এক বস্তু? প্রেমিকা ও স্ত্রী কি একই জীব? আভিধানিক অর্থে নয়, অক্সফোর্ড ডিক্‌শনারীর মতেও নয়, সুপণ্ডিত ও সুরসিক রাজশেখর বসুর মতেও নয়। অক্সফোর্ডের মতে paternal benevolence-ও লভ্—'চলন্তিকা'র মতে পত্নী সন্তান বধূ দেশ ঈশ্বর

ইত্যাদির প্রতি ভালবাসা প্রণয় অনুরাগ স্নেহ প্রীতি সবই 'প্রেম'। সুতরাং 'প্রেম' কথাটাই 'misnomer' দেখা যাচ্ছে। হয় কথাটাকে বর্জন করতে হয়, অথবা তার আভিধানিক অর্থকে আরও সীমাবদ্ধ ও গণ্ডীবদ্ধ করতে হয়। বাংলা ভাষায় অন্তত সাধারণ মানুষের কাছে 'প্রেম' কথাটা নারী-পুরুষের একটা বিশেষ সম্পর্কের ক্ষেত্রে গণ্ডীবদ্ধ এবং সেখানে কাম ও প্রেম এক, অবিভাজ্য ও অভিন্নসত্তা। এই সীমাবদ্ধ অর্থেও কি 'প্রেম ও বিবাহ' এক? বাৎস্যায়ন, এমন কি তিরুবল্লুবর্‌ও বলেন নি যে এক। বাৎস্যায়ন, প্রেমের যে নায়িকা নির্বাচন করেছেন তার মধ্যে স্ত্রীর কোন স্থান নেই। তাঁর মতে স্ত্রী জীবনের সঙ্গিনী, ধর্মের সঙ্গিনী, প্রেমের পাত্রী নন। তাই বলে বাৎস্যায়ন বা তিরুবল্লুবর্ কেউ বিবাহের বিরোধী ছিলেন না, বরং বিবাহের প্রয়োজন ও দাম্পত্যজীবনের গুরুত্ব সম্পর্কে দু-জনেই অনেক ভাল কথা বলে গেছেন। তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা একটা হেঁয়ালির মতন মনে হচ্ছে না কি? প্রেমই বা কি, বিবাহই বা কি? দু'য়ের মধ্যে যদি কোন যোগাযোগ না থাকে তাহলে জীবনটাই বা কি?

এইবার আমরা আসল কথার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম। কথাটা হল, যুগে যুগে প্রেম বলে কিছু নেই। প্রেম মধ্যযুগেও ছিল না—প্রাচীন যুগেও ছিল না। অন্তত প্রেম বলতে আধুনিক যুগে যা বোঝায়, লেনিনের ভাষায় 'কাম ও কৃষ্টির সমন্বয়', তা কোন যুগেই ছিল না। কাম ও প্রেম একই বস্তু ছিল, তাই শাস্ত্রকাররা 'কামশাস্ত্র' লিখেছেন। হয়ত প্রাচীন যুগেরও আগে, কোন এক আদিম যুগে 'প্রেম' বলে কিছু ছিল এবং জীবনে যখন দু'টি বর্গ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, অকম্ ও পুরম্। তারপর যেদিন থেকে মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ বর্ণভেদ জাতিভেদ ইত্যাদি এসেছে সেদিন থেকে 'প্রেম'ও সমাজ থেকে বিদায় নিয়েছে। সমাজে যেদিন থেকে নারীর স্থান পুরুষের নিম্নস্তরে নেমে গেছে, নারীর সমস্ত আর্থিক স্বাধীনতা পুরুষপ্রধান সমাজ হরণ করে নিয়েছে, সেদিন থেকে নারী হয়েছে পুরুষের দাসী, ভোগের বস্তু, পণ্য। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সেদিন থেকে পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের বদলে ভগবান ও ভক্তের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। পুরুষ স্বামী হয়েছেন দেবতা, আর

তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী তাঁর দেবদাসী ও সেবাদাসা। বাৎস্যায়ন বিবাহ সম্বন্ধে দু-চারটে ভাল কথা মধ্যে মধ্যে বলে ফেলেছেন, যেমন একই সামাজিক স্তরের, একই গুণসম্পন্ন একই মনোভাবের পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ হওয়া উচিত, স্তরভেদ হলে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক হয়ে যায়। তাতে দাম্পত্য-জীবন সার্থক হয় না। খুব মূল্যবান কথা, কিন্তু 'কামশাস্ত্রে'র মোদ্দাকথার কাছে একথার কোন মূল্য নেই। বাৎস্যায়নের যুগে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্ক ছিল না, তিনি তা কল্পনা করতেও পারেননি, তাই কাম ও প্রেম তাঁর কাছে একবস্তু ছিল এবং পুরুষের প্রেম-তথা-কাম চরিতার্থের জন্যে তিনি স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য নায়িকাদের কথা বলে গেছেন। আদর্শ স্ত্রীর গুণাগুণ যা বাৎস্যায়ন ব্যাখ্যা করে গেছেন তা যেমন বিস্তৃত, তেমনি অসহ্য। প্রথমেই তিনি বলেছেন : 'ভার্যৈকচারিণী গূঢ়বিশ্রম্ভা দেববৎ পতিমানুকূল্যেন বর্তেত'—একচারিণী ভার্যা প্রগাঢ় বিশ্বাসী হয়ে পতিকে দেবতাজ্ঞানে তাঁর অনুকূল বিষয়ের অনুবর্তন করবে। তারপর যা যা তিনি করবেন তার একটা বিস্তারিত তালিকা আছে, তা উদ্‌ধৃত করার প্রয়োজন নেই। ভগবানের সন্তুষ্টির জন্যে ভক্তের যা করা উচিত, তাই তিনি করবেন। এমন কি স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্যে সব সময় সেজে গুজে থাকবেন, অথচ বাইরের লোকের চোখের আড়ালে। কারণ বাইরের লোক যদি হঠাৎ দেখে ফেলে মনে মনে খুশি হয়ে যায়, তাহলে স্ত্রী তা না জেনেও ভ্রষ্টা হয়ে যাবেন। 'নায়কস্য চ ন বিমুক্তভূষণং বিজনে সন্দর্শনে তিষ্ঠেৎ'—নায়কের (স্বামীর) সামনে একলা কখন অনলঙ্কৃত থাকা উচিত নয়। কেন নয়? এখানে বাৎস্যায়ন পরিষ্কার বলে ফেলেছেন—পণ্যস্বধর্মত্বাৎ—অর্থাৎ পণ্যের স্বধর্মই তাই। সুতরাং স্ত্রী যে পণ্য বা ভোগের সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নন, তা বাৎস্যায়ন বলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। সমাজের যা অবস্থা ছিল তখন, তাতে তাঁর কুণ্ঠাবোধ করার কোন কারণও ছিল না। শুধু বাৎস্যায়ন কেন, বেদব্যাস বাল্মীকি সকলেই এই একই কথা বলে গেছেন এবং সহধর্মিণী ও ধর্মকথার অনেক বড় বড় গালভরা বাণীর মধ্যেও আসল সারকথার এই জীর্ণ কঙ্কালটি বেরিয়ে পড়েছে। সারকথা হল : স্বামী

দেবতা, স্ত্রী সেবাদাসী, স্বামী প্রভু, স্ত্রী পরিচারিকা। সম্মান শুধু এইটুকু যে তিনি গৃহিণী, বা গৃহের কর্ত্রী, অর্থাৎ সংসারের ম্যানেজার, চাবি-তালা তাঁর কাছে থাকে।

স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক যখন প্রভু্য-ভৃত্যের সম্পর্ক, ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক ছাড়া কিছুই নয়, তখন প্রেম ও বিবাহের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। বিবাহ তখন সংস্কার এবং প্রেম তখন কামেরই নামান্তর মাত্র। বাড়ির ভৃত্য তার প্রভুকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে পারে, দীর্ঘদিন ভরণ-পোষণের জন্যে হয়ত প্রভুর উপর তার মায়ামমতাও থাকতে পারে, কিন্তু ভালবাসতে সে পারে না। ছোট-বড়র মধ্যে আর সব ভাবের সঞ্চার হতে পারে, প্রেমের সঞ্চার হয় না। সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের যদি সমান স্বাধীনতা (আর্থিক ও সামাজিক), সমান মর্যাদা, সমান অধিকার এবং সমান শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ না থাকে তাহলে তাদের মধ্যে প্রেমের বিকাশ হবে কি করে? সেইজন্যই বলেছি, প্রেম বলে কিছু কোন কালে ছিল না, ছিল কাম এবং কাম চরিতার্থ করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। ইতিহাসে তাই দেখা যায়, অধিকাংশ প্রেমের কাব্য, প্রেমের সাহিত্য কবিরা রচনা করেছেন রাজা-রাজারাজড়াদের মনোরঞ্জনের জন্যে, প্রেমের জন্যে নয়। এ ছাড়া, হয়ত ভগবদ্‌প্রেমকে অনেকে কল্পনায় নরনারীর উপর আরোপ করেছেন এবং প্রেমের সুমধুর কাব্য রচনা করে নিজেদের অবদমিত বাসনাকামনাকে চরিতার্থ করেছেন। বাস্তব জীবনে আসল প্রেমের প্রেরণায় কোন কবি কোন কাব্যরচনা করেননি। যে জিনিস নেই, যার অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তা নিয়ে কাব্যরচনা করাও সম্ভব নয়। তবু আমরা ভুল করে তাকে প্রেমের কাব্য বলি, কিন্তু আসলে তা কামের কাব্য অথবা ভক্তিকাব্য ছাড়া কিছু নয়। রাম-রাবণের যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের কত যুদ্ধ বিগ্রহ ও সিংহাসনত্যাগকে আমরা কল্পনার রঙে রাঙিয়ে প্রেমের রূপকথা রচনা করেছি। কিন্তু সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ ও সিংহাসনত্যাগের জমকালো ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে যে নির্মম সত্যের কঙ্কালটি উঁকি মারছে, তার নাম প্রেম কখনই নয়, নিছক কাম ও কামনা।

তাই মনে হয়, প্রেম আধুনিক যুগের একটা আইডিয়া মাত্র এবং এখনও

অনেকটা আইডিয়াই আছে, জীবনের বাস্তব সত্যে পরিণত হয়নি। তবু এই আইডিয়ারই মূল্য অনেক, কারণ তার আগে তাও ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার দাবির মধ্যে এই 'প্রেমে'র জন্ম হয়েছে এবং প্রেম ও বিবাহের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপনের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম হলেও, দীর্ঘকালের সংস্কারের জন্যে প্রেমের বিকাশ সম্ভব হয়নি অনেকদিন পর্যন্ত। শুধু সংস্কার নয়, সমাজে মেয়েদের আর্থিক ও সামাজিক স্বাধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই বিগত শতাব্দীর অধিকাংশ লোকের জীবনে দেখা যায়, প্রেম পদে পদে ব্যাহত হয়েছে। সাহিত্যেও তার প্রমাণের অভাব নেই। আমাদের দেশের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন ঃ

'বাবা আমাকে বিবাহ দিতে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে লইতে ভবানীপুরে··· আসিলেন এবং আমাকে লইয়া গেলেন। পথে আমার দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে বুঝাইতে চলিলেন।··· অবশেষে··· আমি বাবাকে বলিলাম,—বাবা আপনি মনে করিয়াছেন আমার স্ত্রীকে (প্রথম স্ত্রী) বিদায় করিয়া দিয়া'···ইত্যাদি। যেই এই কথা বলা, অমনি বাবা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিজের পায়ের জুতা হাতে লইয়া বলিতে লাগিলেন—তুই এখান হ'তে ফিরে যা, আর এক পা তুলেছিস্ কি এই জুতা মারবো।'

তরুণ যুবক—সেকালের প্রগতিশীল ভাবাপন্ন হয়েও বাবার জুতোর ভয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই অবস্থায় বিবাহের মধ্যে প্রেম থাকবে কোথা থেকে, অথবা প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতি বিবাহেই বা হবে কি করে? জন্মাবার পর কয়েক মাসের মধ্যেই তো পাত্রী ঠিক হয়ে যেত, হাঁটতে আর কথা বলতে শিখলেই বিয়ে হত। তারপর হয়ত আম-জাম, জামরুল খেয়ে, হা-ডু-ডুডু খেলে বিবাহিত জীবনের আদিকাল কেটে যেত এবং সংসার সম্বন্ধে জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের বাপ-মা হয়ে মিটে যেত দাম্পত্য জীবনের কৌতূহল। এর মধ্যে প্রেমের স্থান কোথায়, তার বিকাশেরই বা সুযোগ কোথায়?।

সুতরাং প্রেম ও বিবাহের মধ্যে কোন সম্পর্ক কোন কালে ছিল না, প্রেমের অস্তিত্বই ছিল না। প্রেম আধুনিক আইডিয়া এবং আধুনিক প্রেমের অর্থ 'বায়োলজি প্লাস কালচার'। তাই বিবাহ করা না-করার প্রশ্ন পরের কথা, কিন্তু যদি বিবাহ করেন তাহলে প্রেম করে বিবাহ করবেন। বিবাহের পর প্রেম করবার স্বাধীনতা থাকবে কি থাকবে না, তাও পরে বিবেচ্য, কিন্তু প্রেমশূন্য বিবাহ দুর্বিষহ অভিশাপ ছাড়া কিছু নয়।

তৃতীয় স্তবক

To marry is to domesticate the Recording Angel. Once you are married there is nothing left for you, not even suicide, but to be good—

R. Louis Stevenson .

বিবাহ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে করতে অনেকটা অজ্ঞাতসারে তত্ত্বকথার গভীর অরণ্যে পৌঁছে গেছি। অনেকে ভাবছেন হয়ত, ব্যাপারটা যেরকম জমবে মনে হয়েছিল, সেরকম জমল না। কিন্তু হঠাৎ বৈঠকখানার কফির আড্ডা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে এই অরণ্যদর্শন করানোর প্রয়োজন ছিল। বিবাহ বা প্রেমের আসল কথা বুঝতে হলে তত্ত্বকথার ঐ মহারণ্যে একটুখানি প্রবেশ করতেই হবে। অথচ সেই আসল কথা বোঝানোর কোন বাসনা আপাতত আমার নেই। তাই দূর থেকে শুধু অরণ্য দেখিয়েই সরে পড়ছি। শুধু এইটুকু মনে রাখা দরকার যে, বিবাহ করা মানে গহনা পরা নয়, সিনেমা দেখা নয় বা দুটো পয়সা কামিয়ে, না খেয়েদেয়ে একটা বাড়ি তৈরি করে ঘরে বসে বক্-বকম্-বকম্ করা নয়। সত্যিকারের বিবাহিত জীবন এ সবের বাইরে এবং সেটা গোলাপফুলের বাগান নয়, ভয়াবহ যুদ্ধক্ষেত্র। নিজের বিরুদ্ধে, আশপাশের বিরুদ্ধে অনবরত আপনাকে লড়াই করে বিবাহিত জীবনে জয়ী হতে হবে। যদি আদর্শ প্রেমিক হতে চান, আদর্শ স্বামী বা স্ত্রী হতে চান, তাহলে জীবনের কুরুক্ষেত্রে আপনাকে ক্ষতবিক্ষত সৈনিক হতে হবে। পারবেন হতে? পারুন, আর নাই-পারুন, তত্ত্বালোচনা থেকে

আমাকে মুক্তি দিন। বাইরেটা মনুসংহিতার মতন গম্ভীর হলেও, ভেতরটা আড্ডাবাজ। সুতরাং আবার বৈঠকখানার কফিম্ন আড্ডায় আপনাদের সাদরে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে খুব জোর একটা লেক্‌চার দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

জ্যেঠিমা-জ্যাঠামশাইরা বলেন, বিবাহের প্রয়োজন আছে। নিশ্চয় আছে, আমিও বলি। পাঠকদের মধ্যে ভোট নিলে দেখা যাবে বিবাহের সমর্থকের সংখ্যাই বেশি। জন্মালে একদিন মরতেই হবে যেমন, তেমনি বিবাহও করতে হবে। স্বীকার করি, একশবার স্বীকার করি। আমি তো সামান্য মানুষ, দেবতারাও একথা স্বীকার করবেন! মানুষের মধ্যে কেন, দেবতাদের মধ্যেই বা ক-জন ব্যাচিলার আছেন? একমাত্র 'কার্তিক' ছাড়া আমার তো আর কারো নাম মনে পড়ছে না, তাও পৌরাণিক কার্তিক নন, লৌকিক কার্তিক, এবং শ্রীকার্তিক এমন কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী নন যে তাঁকে কাউণ্ট করতে হবে। বিবাহের অবশ্যই প্রয়োজন আছে, অনেক কিছুর জন্যে আছে। জ্যেঠিমারা বলেন, কুলরক্ষা করা জীবনের অন্যতম কর্তব্য। সুতরাং বংশে বাতি দেবার ব্যবস্থা করার জন্য বিবাহ প্রয়োজন। শুভাকাঙ্ক্ষীরা বলেন, নিঃসঙ্গ জীবন অভিশপ্ত জীবন। অসুখ-বিসুখ হলে দেখবে কে? অতএব অসুস্থ অবস্থায় শুশ্রূষার ব্যবস্থার জন্যে বিবাহের প্রয়োজন। সত্যিই তো, বিবাহ না করলে দুধবার্লি করে দেবে কে? তা ছাড়া দু-বেলা আহার যোগাবে কে? আপিস যাবার সময় পান ও পরটার কৌটো হাতে তুলে দেবে কে? জীবনের গ্লানি, অপমান, বিরক্তি ও ব্যর্থতার আক্রোশ সহ্য করবে কে? অদ্ভুত বিচিত্র শখ খেয়াল, পছন্দ অপছন্দ, রুচি অরুচির সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে চলবে কে? চাকরিতে পদোন্নতি হলে আনন্দে আত্মহারা হবে কে এবং চাকরি থেকে বিতাড়িত হলে রাগে ও দুঃখে মুশড়ে পড়বে কে? নতুন চাকরি যোগাড়ের জন্যে উঠতে-বসতে খেতে-শুতে অনবরত খোঁচাবেই বা কে? এই বিশ্বসংসারে অন্তত একজন লোক তো থাকা চাই, যিনি এত সব গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নেবেন? সুতরাং বিবাহের প্রয়োজন আছে, একশবার আছে। আনতশিরে আমি স্বীকার করছি।

'But marriage, if comfortable, is not at all heroic.' বিবাহ আরামের হলেও, তার মধ্যে বীরত্বের কিছু নেই। বিবাহ করেছেন বলে 'বিরাট কিছু করে ফেলেছেন' ভাববেন না। নববিবাহিত (অথবা পুরাতন) স্ত্রীকে নিয়ে রাস্তায় হেলেদুলে লটরপটর করে চলবেন না এবং ভুলেও মনে করবেন না যে, আপনি যা করেছেন তা আর কেউ করেনি, যা পেয়েছেন তা রীতিমত 'এ্যাকুইজিশন্', আর কেউ পায়নি। করেছেন, রাম শ্যাম যদু মধু সকলে যা করে তাই, এবং পেয়েছেন যা তাও অন্য সকলের মতন বিশুদ্ধ রম্ভা। স্ত্রী ভাবছেন, কি স্বামী পেয়েছি,—স্বামী ভাবছেন, কিবা স্ত্রী পেয়েছি। পেয়েছেন যা তা তো জানেনই। যদি বুঝে থাকেন তাহলে তা প্রকাশ করেন না, আর যদি না বুঝে থাকেন তাহলে পরে বুঝতেই হবে। সে যাই হোক, এই মহৎ কাজটা করে, অর্থাৎ বিবাহ করে কি হয়েছেন ও হচ্ছেন তা ভেবেছেন কি ? কি ছিলেন, আর কি হয়েছেন ? প্রাক্‌বৈবাহিক যুগের আপনি (স্ত্রী পুরুষ উভয়েই) এবং বিবাহোত্তর যুগের আপনি—দু-এর মধ্যে তফাত আকাশ ও পাতাল। বিবাহের আগে আপনি লঙ্কাজয়ের কথা না ভাবলেও, গৌরীশৃঙ্গ জয় করবেন ভেবেছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন, দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতচূড়া অতিক্রম করার। কিন্তু এখন ? উইঢিবিতে উঠতেও ভয় পান, পাঁজি দেখে চৌকাঠের বাইরে পা বাড়ান, কেউ হাঁচ্‌লে ফিরে আসেন। কাল ছিলেন দুঃসাহসী মাউণ্টেনীয়ার, আজ হয়েছেন জীবনের হাটে অক্‌শনীয়ার ! কি প্রচণ্ড অধঃপতন ! বিশ হাজার ফুট উপর থেকে একেবারে তিনশ ফুট পাতকুয়োর তলায় ! কি জন্যে এই পতন—স্বর্গ থেকে মর্ত্যে, মর্ত্য থেকে একেবারে পাতালে ? কারণ আপনি বিবাহ করেছেন। বারমাসে তেরবার বনভোজন করা, হোটেলে রেস্টুরেণ্টে নিজে খাওয়া ও অন্যদের খাওয়ানো, মশ্‌গুল হয়ে ঘড়ির দিকে না চেয়ে আড্ডা দেওয়া, অকৃপণভাবে দান করা ও কর্জ দেওয়া—এগুলি ছিল আপনার অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সেই প্রাগৈতিহাসিক-তথা-প্রাক্‌বৈবাহিক যুগে। সেই 'আপনি' এখন পাছে এক কাপ চা খাওয়াতে হয় তাই বন্ধুবান্ধবদের বিশেষ বাড়ি আসতে বলেন না, অমুক জায়গায় দেখা হবে'খন বলে কথা সেরে দেন

এবং বারোয়ারী আমোদের জন্যে পয়সা চাইলে বিজ্ঞের মতন বলেন যে, আপনার 'ফ্যামিলি' আছে, দায়িত্ব আছে, একটা ভবিষ্যৎ আছে ইত্যাদি। সত্যিই তো তাই, ভবিষ্যৎ তো একমাত্র আপনারই আছে, কারণ আপনি যে বিবাহিত। বিবাহ করলে আর অতীতও থাকে না, বর্তমানও থাকে না, থাকে শুধু ভবিষ্যৎ। ধোঁয়াটে কুয়াশাবৃত একটা ভবিষ্যৎ কাঁচকলার ছড়ার মতন দৃষ্টিপথে ঝুলতে থাকে, কোনকালে পুষ্টও হয় না, পাকেও না। তবু সেই কাঁচকলারূপী ভবিষ্যতের কথা ভেবে আপনি অতীতের রঙীন আপেল, এবং বর্তমানের আঙুরগুচ্ছের আস্বাদন বর্জন করেন। না করে আপনার উপায় নেই, আপনি বিবাহিত, আপনার নিরাপত্তা প্রয়োজন, আপনাকে ইন্‌সিওর করতে হবে, বাদ্‌লা দিনের জন্যে ব্যাঙ্কের অঙ্ক বাড়াতে হবে। তাই বলছি, যতই উদার ও মহৎ ব্যক্তি হয়ে জন্মান না কেন, বিবাহের পর আপনার সমস্ত উদারতা ও মহত্ত্ব জলাঞ্জলি দিতেই হবে। দিয়েছেনও তাই। পৃথিবীর অনেক মহৎ লোক বিবাহ করেছেন ঠিকই, কিন্তু আরও অনেকে যাঁরা করেননি তাঁদের না করবার কারণ আছে বৈকি! ডন্ কুইক্সোট্ যে অবিবাহিত ছিলেন, তার একটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।

'...there is probably no other act in a man's life so hot-headed and fool-hardy as this one of marriage.'

কথাটা স্টিভেনসনের। এমন মাথাগরম ও বোকার মতন কাজের নিদর্শন আর কিছু নেই মানুষের জীবনে, বিবাহ যেমন। কথাটা পুরুষ ও নারী উভয়ের ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য। সুতরাং বিবাহে পছন্দ-অপছন্দ, নির্বাচন ও বর্জন বলে যে একটা কথা আছে, সেটা একেবারে বোগাস্। বিবাহ যখন করবার ইচ্ছা হবে, করে ফেলবেন— শকুন্তলা, লীলাবতী, মৈত্রেয়ী, অর্জুন, দুষ্মন্ত—এসব অনর্থক খুঁজে বেড়াবেন না। যাঁরা অর্থের দিক থেকে বড়লোকের ছেলে বা বড়লোকের মেয়ে খোঁজেন, তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, কারণ তাঁরা খুঁজলে পেতে পারেন। এ ছাড়া বিবাহের বাজারে আর অন্য কোন বস্তু খুঁজে পাওয়া যাবে না। যাবে না এইজন্যে যে, কুমার কুমারীদের মধ্যে হয়ত একাধিক মৈত্রেয়ী ও

অর্জুন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বিবাহিত হবার পর সেই মৈত্রেয়ীরা হবেন চিরন্তন নগেন্দ্রনন্দিনী এবং অর্জুনেরা হবেন নীরেট বটকৃষ্ণ। অতএব খোঁজ করে বা খুঁজে পেয়েই লাভ কি? আজকাল একটা টেণ্ডেন্সী হয়েছে, যাঁর যা পেশা ও নেশা তিনি সেই জাতের স্ত্রী ও স্বামী খোঁজেন বা চান। উকিল-ব্যারিস্টার যিনি তিনি হয়ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি মুখরা স্ত্রী পেলে খুশি হন, গাইয়ে যিনি তিনি অন্তত বাজিয়ে চান, খেলোয়াড় যিনি তিনি খেলোয়াড়ই চান, অভিনেতা যিনি তিনি অভিনেত্রী অথবা স্কুল-কলেজে অন্তত থিয়েটার আবৃত্তি করা অভ্যাস ছিল এরকম স্ত্রী চান, লেখক চান লেখিকা, ব্যবসায়ী চান পাকা হিসেবী, ইত্যাদি। এই রকম স্ত্রী ও স্বামী চাওয়ার মতন বোকামি আর কিছু নেই। স্টিভেনসন নিজে বড় সাহিত্যিক ছিলেন, কিন্তু তিনি বলেছেন: 'Certainly, if I could help it, I would never marry a wife who wrote.'

স্টিভেনসনের মত ও যুক্তি অনেকটা সমর্থনযোগ্য, সবটা নয়। লেখকের অদৃষ্টে যদি লেখিকা জুটে যান ক্ষতি নেই, কিন্তু আমার মনে হয় যে, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের স্ত্রীদের সবার আগে 'রন্ধনে দ্রৌপদী' হওয়া দরকার। মাথার খাটনি খাটলে এমন খিদে পায় এবং এত রকমের জিনিস এতবার খেতে ইচ্ছে করে যে, রন্ধনে দ্রৌপদী না হলে লেখকদের খুশি করা শক্ত। পাকা রাঁধুনি হয়ে যদি তিনি লেখিকা হতে পারেন, খুব ভাল কথা! কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক হল নিজে লেখক বলে একজন নিরীহ নারীকে লেখিকা তৈরি করবার প্রাণপণ চেষ্টা, যেহেতু সেই নারীটি লেখকের স্ত্রী। নর্তকের স্ত্রী যদি বিজ্ঞানী হন তাহলেও যে তাঁকে নাচতেই হবে এমন কোন কথা নেই। কোন সুগায়িকার স্বামীর কণ্ঠে সুর যদি নাই বেরোয়, হ্রেষার মতন কণ্ঠস্বর হয়, তাহলেও যে তাঁকে সায়গল বানাতে হবে তার কোন মানে নেই। সুতরাং ওপথ দিয়ে যাবেন না, কোন লাভ নেই। বিয়ে একটা হলেই হল, তাই-রে-নারে করে জীবনটা দেখবেন ঠিক কেটে যাবে। কোথা দিয়ে কখন, কেমন করে কেটে যাবে, টেরও পাবেন না। তবে একটা কথা হয়ত মনে রাখা দরকার। যারা বাগান

করতে, তাস খেলতে, হুকুম খাটতে, সিনেমা দেখতে, ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়তে, মাছ ধরতে, কুটুম্বিতা করতে ভালবাসেন, সাধারণত তাঁদেরই সর্বশ্রেষ্ঠ 'স্বামী' হবার সম্ভাবনা বেশি, এবং স্টিভেনসনের ভাষায় বলতে হয়, 'No woman should marry a teetotaller, or a man who does not smoke.' তেমনি যাঁরা বেশি কথা বলেন না, একটু চিন্তাশীল ভাবুক ধরনের, তাঁরা স্ত্রী হিসেবে খুব ভাল হবেন বলে মনে হয় না।

বিবাহ প্রসঙ্গে এই হল শেষ কথা। বিবাহ করা মানে আকাশ থেকে পাতালে নেমে আসা, স্বপ্নের স্বর্গ থেকে বিদায় নেওয়া, রোমান্সের উড়োজাহাজে নভোমণ্ডলে বিচরণ করতে করতে জমাখরচের খাতা বগলে করে মাটিতে গো-যানে চলা। বিবাহের আগে স্বপ্ন দেখা ছিল যাঁর কাজ, বল্‌গাহীন দুরন্ত কামনার ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে দুর্ধর্ষ বেগে পথচলা ছিল যাঁর অভ্যাস—বিবাহের পর বোবায় ধরার চাপে গোঙানোই তাঁর ধর্ম হয়ে ওঠে এবং শম্বুকগতিতে পথচলা তাঁর অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। এই হল বিবাহ, স্বীকার করুন আর নাই করুন। অকারণে এই বিবাহের সঙ্গে প্রেমকে জড়ানো অন্যায়, কারণ প্রেম হল বন্য সিংহের প্যাশান, বিবাহ হল গৃহপালিত গরুর করুণ আবেদন। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। তবু বিবাহিত জীবনে বন্য সিংহের প্যাশানকে মিলিয়ে গৃহকে যাঁরা অরণ্যের মতন রোমান্টিক ও থ্রিলিং করে তুলতে পারেন এবং জীবনের প্রতি মুহূর্তে সেই থ্রিল্ অনুভব করেন, তাঁরাই হলেন আদর্শ স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত কম, আমাদের এই টাকা-আনা-পাই-এর সংসারে তাঁদের দেখাই যায় না। তাঁরা ভাগ্যবান ব্যক্তি, তাঁদের হিংসে করা ছাড়া উপায় নেই। তাঁদের কথা বলছিও না। আমরা যারা বিবাহ করি, সপ্তাহে একদিন সস্ত্রীক সিনেমা দেখে এবং বছরে একদিন কোন আত্মীয়ের বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে দাম্পত্যজীবনের কর্তব্যপালন করি, তাঁদের কথা বলছি। দেখবেন, তাঁদের মধ্যেই যাঁরা বিবাহের আগে কবিতা লিখতেন, বিবাহের পরে তাঁরা সেই কবিতার খাতাতেই সংসারের জমা-খরচ লেখেন। কুমার-জীবনের কল্পনার বিহঙ্গ যখন বাণবিদ্ধ হয়ে ভূতলে

পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে, জীবনের কবিতা যখন কর্কশ গদ্যে রূপান্তরিত হচ্ছে, তখন 'লাভক্ষতি টানাটানি, অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশ ভাগ কলহ সংশয়' নিয়ে তাঁরা বিবাহিত জীবন দিব্যি জাঁকিয়ে বসে আছেন।

কাব্যের উপেক্ষিতা

পারে না বহিতে লোকে জ্বর-ভার,
পেটে পেটে পিলে ধরে নাকো আর ;

নিশ্চয়ই কোন প্রেমিক-প্রেমিকা কবিতা হিসেবে গুঞ্জন করে আনন্দ পাবেন না, কিন্তু তবু এও তো কবিতা। জীবন নিয়েই যদি কাব্য হয়, তাহলে আমাদের জীবনের একটা মস্তবড় বাস্তব সত্য এর মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে না কি ? দুর্ভিক্ষ নিয়ে, অন্নকষ্ট নিয়ে, অভাব-অভিযোগ নিয়ে যদি কাব্যরচনা করা যায়, তাহলে ম্যালেরিয়া বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া কাব্যের বিষয়বস্তু হবে না কেন ? চর্বচোষ্য খেয়ে, আরামকেদারায় শুয়ে যদি বুভুক্ষু মানুষের মনের কথা বিপ্লবী কবি ইনিয়ে-বিনিয়ে তির্যক ছন্দে প্রকাশ করতে পারেন, তাহলে ম্যালেরিয়ায় না ভুগেও ম্যালেরিয়া-রোগীর প্রমত্ত প্রকম্পন কবির কাব্যে কেন অনুরণিত হবে না ? সাইকোলজি কি শুধু অন্নপীড়িতেরই আছে, ম্যালেরিয়া-পীড়িতের নেই ? ইমোশন কি শুধু প্রেমিকদেরই একচেটে, ক্রনিক ডিস্‌পেপ্‌টিকের থাকতে পারে না ? ম্যালেরিয়া-জ্বরের প্রথম দূর পদধ্বনির সঙ্গে যে মৃদুমন্দ শিহরণ জাগে, জ্বর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই শিহরণ যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রবল প্রভঞ্জনের মতন

সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্নায়ু-শিরা-উপশিরা প্রকম্পিত করে চলে যায় এবং অবশেষে অবসন্ন দেহে যখন কেবল ঘাম ঝরতে থাকে, তখন একমুহূর্তের জন্যেও কোন শিল্পীর, কোন কবির একথা মনে হয়েছে কি যে, প্রেমের পূর্বরাগ থেকে মান-মিলন-বিরহ পর্যন্ত গতির কতখানি সাদৃশ্য আছে এই ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ? ক্রনিক ডিস্‌পেপ্‌টিকের বর্ণহীন অবসাদ ও বিষণ্ণতা দেখে কারও কি মনে হয়েছে ব্যর্থ প্রেমিকের কথা ? হয়নি নিশ্চয়, কিন্তু প্রথমে প্রেমে যিনি পড়েছেন এবং পরে ম্যালেরিয়ায় ভুগেছেন, অথবা প্রেম করে ব্যর্থ হয়ে, পরে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভুগছেন, একমাত্র তিনিই বলতে পারবেন এই ভাবসাদৃশ্যের কথা। অথচ কবি ও শিল্পীরা চিরকাল উপেক্ষা করে এসেছেন ম্যালেরিয়া ও ডিস্‌পেপ্‌সিয়াকে, কাব্যের প্রেরণা-রূপে তাদের গ্রহণ করেননি। রোগের যন্ত্রণা, রোগীর বেদনা চিরদিনই যেন কাব্যের উপেক্ষিতা অথচ কেন, তার কোন যুক্তি নেই।

ভার্জিনিয়া উল্‌ফ ঠিকই বলেছেন যে, ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ে স্বচ্ছন্দে অনেক ভাল উপন্যাস লেখা যেত, টাইফয়েড নিয়ে অনেক স্মরণীয় মহাকাব্য, নিমোনিয়া নিয়ে 'ওড' 'দাঁতের ব্যথা নিয়ে গীতিকবিতা, কিন্তু লেখা হয়নি —'Novels would have been devoted to influenza ; epic poems to typhoid ; odes to pneumonia ; lyrics to toothache. But no.'

ইউরোপ সম্বন্ধেই যদি শ্রীমতী উল্‌ফ দুঃখ প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে আমাদের দেশের কথা ভাবলে তিনি কেঁদে ফেলবেন। বাংলাদেশে অন্তত 'ম্যালেরিয়া' নিয়ে স্বচ্ছন্দে একখানা 'মহাভারত' রচনা করা যেত এবং উড়িষ্যায় 'ফাইলোরিয়া' নিয়ে 'রামায়ণ'। অর্জুনের মতন বীরশ্রেষ্ঠ নায়ক যদি ঘন ঘন ম্যালেরিয়ায় ভোগেন এবং ভুগে ভুগে যদি পেটের পিলেটি তাঁর সার হয়, তাহলে স্বয়ম্বর সভায় বা কুরুক্ষেত্রে তাঁর কথা বর্ণনা করার যে সুযোগ বাঙালী কবির থাকে তা ব্যাসদেবের ছিল না, থাকতেও পারে না। সীতার মতন অনিন্দসুন্দরী যদি ফাইলেরিয়ায় ভুগতে থাকেন এবং ভোগার ফলে তাঁর পাছু'টো থামের মতন ফুলে ওঠে, তাহলে ওড়িয়া কবির হাতে 'রামায়ণ' এক বিশ্ববিখ্যাত ট্র্যাজিডি হতে পারে। শুধু

ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া নয়, কলেরা নিয়ে অনেক ছোট ছোট সনেট, কালাজ্বর নিয়ে লিরিক, ডিসপেপসিয়া নিয়ে মহাজন-পদাবলী ও কীর্তন রচনা করা যেত। কিন্তু কোন কবি তা করেননি। তার কারণ তাঁরা ব্যাধিকে কুৎসিত মনে করেন। ব্যাধি অবশ্যই কুৎসিত, কিন্তু সেরকম কুৎসিত আরও অনেক জিনিস আছে। শিল্পীর কারবার মানুষের মন নিয়ে, মনের বিচিত্র গতি নিয়ে। নিছক ব্যাধির প্রত্যক্ষ বীভৎস বর্ণনা কাব্যে বা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না, তার জন্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি আছে। একথা সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু পীড়িত মানুষের মনের কথাটা কবি প্রকাশ করবেন না কেন? কেন তিনি বুঝতে চেষ্টা করবেন না, ম্যালেরিয়া রোগীর চোখে মেঘের বর্ণচ্ছটা কেমন দেখায়? রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে কাছের মানুষ, বাইরের সমাজ, দূরের পৃথিবী কেমন মনে হয় রোগীর কাছে? রোগের কথা ও রোগীর মনের কথা শিল্পীরা ভাষায় প্রকাশ করেননি বলে আজও রোগীর কোন সহজবোধ্য ভাষা নেই। শ্রীমতী উল্‌ফ বলেছেন যে সামান্য একটা স্কুলের ছাত্রীও যদি প্রেমে পড়ে তাহলেও সে তার প্রাণের কথা ব্যক্ত করবার মতন ভাষা খুঁজে পায় সেক্সপীয়র, শেলী, কীট্‌সের মধ্যে, কিন্তু কোন রোগী যদি মনোবেদনা ও চিন্তাধারা প্রকাশ করতে চায় তাহলে মুখে তার ভাষা যোগায় না। বাস্তবিকই তাই। রোগীর মনের কথা ব্যক্ত করার মত ভাষা নেই, কারণ শিল্পীরা আজও ভাষায় তার রূপ দেননি। তাই রোগীর ভাষা আজও সেই আদিম অকৃত্রিম প্রাগৈতিহাসিক মানুষের ভাষা, যে-ভাষায় নিয়ানদার্থাল মানুষেরা কথা বলত, কেবল সঙ্কেত-প্রতীক ও ধ্বনি-সম্বলিত শিশুর ভাষা। ডাক্তাররা তাই থেকে যা বুঝবার বুঝে নেন, আত্মীয়বন্ধুরাও বোঝার চেষ্টা করেন, কিন্তু ভুল বোঝার অবকাশ শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়। সেইজন্যই দেখবেন, হাজার সমবেদনা জানিয়েও, হাজার আশার বাণী শুনিয়েও, রোগীর মন পাওয়া না। সকলের অলক্ষ্যে, সমস্ত সমবেদনা ছাপিয়ে তু-ফোঁটা চোখের জল তার গড়িয়ে পড়ে। আমরা বাইরের সুস্থ মানুষ যারা সমবেদনা জানতে যাই, তারা অনেক সময় অবাক হয়ে রোগীর রহস্যময় ব্যবহারের কথা ভেবে

বিরক্ত হই। আমাদের মাপাজোকা কর্তব্য শেষ হয়ে যায়, সমবেদনার ভাঁড় যায় ফুটো হয়ে। একবারও আমরা ভেবে দেখি না যে সমস্ত বিচারটা একতরফা হল, অন্যতরফের কথা কিছুই শোনা হল না, বোঝা গেল না। ভাষার মাধ্যমে মনের সঙ্গে মনের লেনদেনের সুযোগই নেই যেখানে, সেখানে সমবেদনা অনেক সময় হাস্যকর বলে মনে হয়। রোগীর কাছে তো হয়ই। রোগীর সমবেদনাই যদি না বুঝি, তাহলে সমবেদনা জানাব কাকে ?

প্রেমিকের মনের কথা শিল্পীরা যুগ যুগ ধরে নানাভাষায়, নানাচ্ছন্দে প্রকাশ করে আসছেন, আজও প্রকাশের পালা শেষ হয়নি, আজও যেন প্রেম ও প্রেমিকের নিত্য-নতুন মনে হয়-মনে হয় প্রেম প্রহেলিকা। তাই যদি হয় এবং রোগীর মনের কথা যদি আজও ভাষায় প্রকাশ করা না হয়ে থাকে, তাহলে ১০৪ ডিগ্রী টেম্পারেচারে রোগীর মনের অবস্থা কি হতে পারে তা জানতে ও প্রকাশ করতে কবিদের যে কত যুগ কেটে যাবে তার ঠিকানা নেই। সুতরাং প্রেমকে অন্তত 'সেকেণ্ডারী থীম' করে, ১০৪ ডিগ্রী টেম্পারেচারকে এখনই গল্প-সাহিত্যের 'প্রাইমারী' উপাদান করা যায়। এমন কি, শ্রীমতী উল্‌ফের মতন আমিও স্বীকার করতে রাজী আছি যে—'Love must be deposed in favour of temperature of 104.'

প্রেম নিয়ে অনেক কাব্যরচনা করা হয়েছে, কয়েক শতাব্দীর মধ্যে আর যে কিছু নতুন রচনা করা সম্ভব হবে তা মনে হয় না। কাব্যের উপেক্ষিতা অসুখ-বিসুখ, জ্বরজ্বারি নিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছুই আজ পর্যন্ত রচনা করা হয়নি। প্রেমই শুধু একমাত্র 'সোশ্যাল রিয়ালিটি' নয়, ম্যালেরিয়াও রিয়ালিটি, ১০৪ ডিগ্রী টেম্পারেচারেও। সুতরাং প্রেমের বদলে ১০৪ ডিগ্রী জ্বরের 'কবিতা' নয় কেন ?

জীবনের যাত্রাপথে মানুষ সব সময় মানুষের সঙ্গে কাঁধ ঘষাঘষি করে চলতে চায় না, যূথচারীর মতন। ওটা তথাকথিত প্রগতিশীল 'কলেকটিভ কাল্ট-পন্থী'দের মানুষকে ষণ্ড বানাবার তত্ত্ব। মধ্যে মধ্যে একলা চলতে হয়, একেবারে নিঃসঙ্গ। জীবনের কোলাহলমুখর জনপদ, শহর ছেড়ে

তখন আমরা প্রবেশ করি জীবনের গভীর অরণ্যে। সেই আদিম জনমানবহীন অরণ্যে আমরা একান্তভাবে নিজেদের হারিয়ে ফেলি। কর্মক্লান্ত মন সেখানেই অবাধে বন্য শ্বাপদের মতন বিচরণ করতে চায়, বিধিমুক্ত কানুনমুক্ত শাসন-বাঁধনমুক্ত হয়ে। তৃণহীন ধূ ধূ জীবনের প্রান্তরসীমা কোথা থেকে যেন তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া ভেসে ওঠে দৃষ্টিপথে, আর মনে হয় যেন ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া আমিকে খুঁজে পেয়েছি এতদিন পরে। তখন সেই গভীর অরণ্যের মধ্যে, সেই তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের দিকে, আমরা একলাই চলতে চাই, কোন সঙ্গী চাই না, কোন সমবেদনা চাই না, ভুল বোঝাবুঝি ভ্রূক্ষেপও করি না। অসুখবিসুখের কথা বলছি, ১০৪ ডিগ্রী জ্বরের কথা। রোগশয্যায় যখন আমরা শুয়ে থাকি তখন আর আমরা বাইরের জগতের বীর-যোদ্ধা নই। সাধু ও সত্যবানদের দল ছেড়ে তখন আমরা পলায়ন করেছি, একেবারে নির্জন ঘরের নিঃসঙ্গ শয্যায়। বিধানসভার বাগ্‌যুদ্ধে বা ন্যায়-অন্যায়ের তর্ক-বিতর্কে তখন আমরা মোটেই কৌতূহলী নই। আমরা তখন নিজেদের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। শুয়ে শুয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে দূরের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে অনেক সময় ভালই লাগে। হরিবাবু হন্তদন্ত হয়ে আপিসে যাচ্ছেন, মাস্টার মশাই ছাতি বগলে করে যাচ্ছেন স্কুলে, রামবাবু চলেছেন বাজারে, কেদারবাবু লোহাপটিতে, ট্যাক্সি করে কেউ ছুটছেন স্টেশনে ট্রেন ধরতে, কেউ বা কন্যার বিয়ের ধান্ধায়, কেউ নিজের মনে বিড়্‌বিড় করে চলেছেন, সংসারের ধাক্কায় মাথার কব্জা ঢিলে হয়ে গেছে—কারও মুখে সিনেমার গান, কারও মুখে হরিনাম—সব মিলিয়ে রাস্তার উপর জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রের এই যে দৃশ্য, এ যখন আমরা রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে দেখি, একমাত্র তখনই মনে হয় যেন পৃথিবীর এই বিরাট রঙ্গমঞ্চে আমরা সকলে ক্লাউনের অভিনয় করছি। বাইরের যোদ্ধারা সকলেই ক্লাউন একমাত্র 'আমি' ছাড়া, কারণ আমি তখন রোগশয্যায় শুয়ে আছি, আমার তখন ১০৪ ডিগ্রী জ্বর উঠেছে। মারাত্মক বীজাণুর সঙ্গে তখন আমি প্রাণপণ যুদ্ধ করছি, তাই বাইরের যুদ্ধ আমি পরিত্যাগ করেছি। জীবনযুদ্ধের কাছে প্রাত্যহিক যুদ্ধ অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়।

মনে হয়, আমিই তো আসল যোদ্ধা, মৃত্যুর সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে আমি মল্লযুদ্ধ করছি, আমার চেয়ে বড় যোদ্ধা কে? তাই তখন বাইরের যুদ্ধটাকে মনে হয় স্টেজের সাজানো যুদ্ধাভিনয়, আগাগোড়া হাস্যকর ও অর্থহীন। প্রেমের যুদ্ধ, পয়সার যুদ্ধ, স্বার্থের যুদ্ধ, দম্ভের যুদ্ধ—সুস্থজীবনের সমস্ত যুদ্ধের গৌরব তখন রোগশয্যায় মৃত্যুর মুখোমুখি যুদ্ধের কাছে ম্লান হয়ে যায়। আর রোগী যদি নিজেকে মনে করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর, তাহলেও কিছু অন্যায় হয় না। সত্যিই তো ম্যালেরিয়া বা টাইফয়েড-রোগীর চেয়ে বড় বীর বাইরের জগতে আর কে আছে?

এ-হেন বীরশ্রেষ্ঠ যিনি, তিনি যদি রোগশয্যায় রাজার মতন সেবাযত্ন ও সম্মান দাবি করেন, তাহলে অন্যায় হয় না কিছু। রোগীমাত্রই তাই করেন। চার্ল্‌স ল্যাম্ব সেইজন্যই বলেছেন—'to be sick is to enjoy monarchial prerogatives'—এবং রোগশয্যা থেকে উঠে আরোগ্যের পথে আরামকেদারায় বসাটা পদোন্নতি নয়—'a fall from dignity.' রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে আমরা যে রাজকীয় ব্যবহার করি স্বেচ্ছাচারী বাদশাহের মতন যে দিনগুলো কাটাই, রোগমুক্তির পর বাইরের সংসারের কড়া হিসেবী লোকরা কড়ায়গণ্ডায় তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকেন। তখন তাদের নির্মম উদাসীনতা ও নিষ্ঠুর বিরক্তির নমুনা দেখলে মনে হয়, চিররোগী হয়ে রোগশয্যায় শুয়ে থাকা ভাল, অথবা সোজা রোগশয্যা থেকে লাফ দিয়ে উঠে বাইরের যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেওয়া আরও ভাল, কিন্তু ঘরেও-নহে পারেও-নহে অবস্থায় কন্‌ভ্যালেসেন্টের দিন কাটানোর মতন মর্মান্তিক ব্যাপার আর কিছু নেই। রোগ থেকে আরোগ্যের পথে যাত্রাকালে মনে হয় আবার রোগশয্যায় ফিরে যাই, চাই না এই নিষ্ঠুর উদাসীন সমাজে সুস্থ হতে, সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকতে। সুস্থ সবল মানুষের জন্যে যে-সমাজে স্নেহ নেই, ভালবাসা নেই, অনুভূতি নেই, সেই রুগ্ন ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের রোগী হয়ে রোগশয্যায় শুয়ে স্নেহ মায়া মমতা ভালবাসা সমবেদনা জোর করে আদায় করে নেওয়া ছাড়া উপায় কি?

কালপেঁচার বৈঠকে

ধর্মের ষাঁড়

মেয়ে থেকে মশা পর্যন্ত অনেক বিষয় নিয়ে ভাববার আছে, ভেবেছেনও অনেকে। কিন্তু ষাঁড় সম্বন্ধে কেউ কিছু আজ পর্যন্ত ভেবেছেন কি না, আমার জানা নেই। হঠাৎ চলতে চলতে পথের সামনে ষাঁড় দেখে অনেকে হয়ত থমকে দাঁড়িয়ে তার 'মুড' বা মেজাজ সম্বন্ধে ভেবেছেন, বা ভাবতে বাধ্য হয়েছেন। আমি নিজেও যে ভাবিনি তা নয়। জীবনে অনেকদিন পথ চলতে অলিগলির মোড়ে বা রাস্তার বাঁকে আত্মসমাহিত বৃষভের ধ্যাননিমীলিত চক্ষুর দিকে চেয়ে তার মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা একাগ্রচিত্তে চিন্তা করেছি। করিনি যে তা নয়। ভেবেছি, কি এমন সর্বগ্রাসী বিষয় থাকতে পারে যে বাইরের দুনিয়ার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে, ধর্মের ষাঁড়ের পক্ষে দশনামী শৈবসন্ন্যাসীর মতন এরকম নির্মমভাবে উদাসীন থাকা সম্ভবপর। অথচ, বললে বিশ্বাস করবেন না, দিগম্বর জৈন শ্রমণের মতন ধর্মের ষাঁড়ের এই যে ধ্যানগম্ভীর উদাসীনভাব, এর আগাগোড়াই মনে হয় অবিমিশ্র ভণ্ডামি। অন্তত ভয়ঙ্কর শিঙ দুটির দিকে চেয়ে আমার এই কথা অনেকবার মনে হয়েছে। ধর্মের ষাঁড়ের নাসিকারন্ধ্রের বিস্ফোরণ যাঁরা দেখেছেন এবং তার সঙ্গে বিস্ফারিত চক্ষু ও ঘাড়বেঁকানো ভঙ্গি, তাঁরা অন্তত তার শ্রমণসুলভ নিস্পৃহতায় সন্দিহান হবেন।

ধর্মের ষাঁড় দেখলে আমার তাই হুতোমপ্যাঁচার সেই বকধার্মিকের কথা মনে পড়ে। শরীরটি মুচির কুকুরের মতন নাদুসনুদুস, ভুঁড়িটি বিলিতি কুমড়োর মতন, মাথায় কামানো চৈতনফক্কা ঝুঁটি করে বাঁধা (কতকটা ষাঁড়ের শিঙের মতন বলতে পারেন), গলায় কণ্ঠির মালা, হাতে ইষ্টিকবচ। গত বছর আশি পেরিয়েছেন, বাইরে অঙ্গ ত্রিভঙ্গ,

কিন্তু ভেতরে কচি প্রাণটি হামাগুড়ি দিচ্ছে। হুতোমী ভাষায়—'বাবাজী গেরস্তগোছের ভদ্রলোকের মেয়েছেলের পানে আড়চক্ষে চাচ্ছেন—আর হরিনামের মালার ঝুলিটি ঘুরুচ্ছেন।' ধর্মের ষাঁড় সম্বন্ধে আমারও তাই মনে হয়। ছেলেবেলায় একবার তারকেশ্বর গিয়েছিলাম। বিখ্যাত একটি ধর্মের ষাঁড় ছিল সেখানে। মন্দিরের সামনে শুয়ে থাকত, দাঁড়িয়ে থাকত, ঘুরেফিরে বেড়াত। যেখানেই থাকুক পুজোর ঘণ্টা বাজলে ঠিক এসে দাঁড়াত মন্দিরের সামনে। সকলে বলত—'বাবার ষাঁড়', কপালে ও শিঙে সিঁদুর দিত, বিল্বপত্র দিত মাথায়, গলকম্বলে হাত বুলিয়ে দিত, প্রণাম করত ক্ষুরে। আমারও ষাঁড়ের গলকম্বলে হাত বুলোতে লোভ হল। হাত বুলোচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ প্রচণ্ড নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। হয়ত শুধু নিঃশ্বাসত্যাগই হবে, কিন্তু আজও আমার মনে পড়ে, এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠে ভিড়ের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছিলাম যে সমবেত ভক্তমণ্ডলী ব্যাপারটা উপলব্ধি করার আগেই প্রায় আটশ আশি গজ দূরে দৌড়ে পালিয়েছিলেন। ঘটি করে বাবার মাথায় জল দিতে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধা পিসিমা। ঘটি ফেলে তিনি ছুটে এসে নিঃশ্বাসাহত ভাইপোকে রক্ষা করলেন। নিঃশ্বাস হয়ত অহিংস, কিন্তু ভয়াবহ ভঙ্গিতে প্রচণ্ডবেগে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করা ধর্মের ষাঁড়ের পক্ষে অমার্জনীয়। সেটা অবদমিত হিংস্রতার অসংযত আত্মপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। অন্তত আমার তাই ধারণা এবং বদ্ধমূল ধারণা। শুধু তারকেশ্বরে নয়, কাশীতেও দেখেছি। সকলেই জানেন, ষাঁড় ও সিঁড়ির জন্য কাশীধাম বিখ্যাত। সেখানেও দেখেছি, ধর্মের ষাঁড় হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে নিরীহ উত্তরভারতীয় বিশ্বনাথসেবককে অলিগলির ভিতর দিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত তাড়া করে গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করেছে। কাশীতেই বা কেন, কলকাতা শহরেও ধর্মের ষাঁড়ের অনেক কীর্তি দেখেছি। এককালে কলকাতা শহরে শতশত ধর্মের ষাঁড় ঘুরে বেড়াত। ক্লাইভ ও হেস্টিংসের আমলে তো বেড়াতই, পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও বেড়াত। সেকালের সাহেবরা কলকাতায় মজা করে ধর্মের ষাঁড়ের লড়াই দেখতেন, আর বাঙালী বাবুরা দেখতেন বুলবুলির লড়াই, বড় জোর মেড়ার লড়াই। আমরাও পঁচিশ-ত্রিশ

বছর আগে পর্যন্ত কলকাতার রাস্তায় ধর্মের ষাঁড়ের লড়াই দেখেছি, অবশ্য দূর থেকে। কালীঘাটে ভৈরব নকুলেশ্বর আছেন, তাঁর একটি স্বনামধন্য ষাঁড় ছিল। আজও সেই ষাঁড়টির কথা আমার মনে পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর তাকে আর দেখিনি। বোধ হয় 'খাদ্যের ঘাট্‌তি' তাকে দিয়ে পূরণ করা হয়েছে।

ধর্মের ষাঁড় সম্বন্ধে আমার মতামত যাই হোক, সাধারণ লোকের তার প্রতি বেশ সহানুভূতি আছে দেখেছি। অথচ পশুসমাজে ষাঁড় 'প্রলেটারিয়েট' শ্রেণীভুক্ত নয়। রীতিমত মধ্যযুগের জমিদারের মতন চেহারা ধর্মের ষাঁড়ের। একমাত্র দেখেছি ষাঁড়ের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা মেয়েদের। কেন, জানি নে। অনেকদিন গভীরভাবে চিন্তা করেছি, মেয়েদের এই বৃষভবিদ্বেষের কারণ কি? সাইকোলজির বই উল্টে-পাল্টে দেখেছি, বিশেষ কিছু খুঁজে পাইনি। অবচেতন মনের অতিরিক্ত অনুরাগ যদি সচেতন মনের তীব্র বিরাগে রূপান্তরিত হয়, তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু বিরাগেরও তো একটা সীমা আছে। পুরুষের মতন পুরুষ, হয়ত বেকার অবস্থায় বিভ্রান্তের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অপিসে 'কিউ' দিয়ে দাঁড়াচ্ছেন, কে না তাঁর জন্য বেদনা বোধ করবেন? বেকার জীবনের জন্য তাঁর পৌরুষকে কেউ অস্বীকার করবেন না। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, বেকার যুবকরাই সবচেয়ে বেশি হাটে-মাঠে-ঘাটে পৌরুষ দেখিয়ে বেড়ান। অনেকে আবার আখড়াতে কুস্তি লড়েন, বার্বেল তোলেন, ডম্বল ও মুগুর ভাঁজেন এবং হাতের গুলি ও বুকের ছাতি ফুলিয়ে ট্রামে-বাসে চলেন। পথেঘাটে তাঁরা যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়ে বেড়ান, তবু যেহেতু তাঁরা কোন মার্চেণ্ট অপিসে কেরানিগিরি বা টাইপিস্টের কাজ করেন না, সেই হেতু মেয়েরা নির্বিকারভাবে নাসিকা কুঞ্চিত করে তাঁদের 'ধর্মের ষাঁড়' বলে অভিহিত করে থাকেন। রোগা ডিগ্‌ডিগে কোন পুরুষ যদি চাকরিজীবী হন, তাহলেই মেয়েদের কাছে তিনি রূপকথার রাজকুমার হয়ে যান,—আর বলিষ্ঠ যুবক যদি চাকরির

সন্ধানে ঘুরে বেড়ান, অথবা নিতান্ত চাকরি না পেয়ে ক্লাব-বারোয়ারি-পলিটিক্স করে বেড়ান, তাহলেই মেয়েদের কাছে তিনি 'ধর্মের ষাঁড়' উপাধি পান। এর চেয়ে অন্যায় আর কিছু হতে পারে না। অথচ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে পুরুষেরা কোন প্রতিবাদ করেন না। ধর্মের ষাঁড়ের প্রতিবাদের ভাষা নেই কোন, তা না হলে প্রতিবাদ সেও করতে পারত। অন্তত মেয়েদের শিঙ দিয়ে গুঁতোতে পারত, নিদেন পক্ষে শিঙ নেড়ে তাড়াও করতে পারত। কিন্তু নির্বোধ ধর্মের ষাঁড় নির্বাক, তার ভাষা নেই, বোধশক্তি নেই। তা যদি থাকত, তাহলে তার করুণা হত মেয়েদের উপর। কারণ, যে-মেয়েরা তার মাথায় বিল্বপত্র ও ক্ষুরে গঙ্গাজলের অর্ঘ্য দিতে কুণ্ঠিত হন না, সেই মেয়েরাই আবার তাকে সামাজিক জীবনে উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধার পাত্র বলে মনে করেন। কি বিচিত্র জীব! ধর্মের ষাঁড়ের কথা বলছি না, মেয়েদের কথা বলছি। ধর্মের ষাঁড়কে বোঝা যায়, মেয়েদের বোঝা যায় না। ষণ্ডচরিত্রের চেয়ে নারীচরিত্র অনেক বেশি দুর্জ্ঞেয়।

শ্রদ্ধার পাত্র অর্থনৈতিক কারণে অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন বাস্তব জীবনে। ধর্মের ষাঁড় তার চিরন্তন সাক্ষী। অন্তত মেয়েদের কাছে যে হন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধর্মের ষাঁড় চিরকালই বেকার। সনাতন বেকার-জীবনের প্রতিমূর্তি ধর্মের ষাঁড়। তবু সে মেয়েদের কাছে শ্রদ্ধেয়, কারণ তখন সে মহাদেবের অনুচর, নিত্যসঙ্গী ও বাহন। সাংসারিক জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সাংসারিক জীবনে যখন সে বেকারত্বের প্রতিমূর্তি—তখন সে অশ্রদ্ধা ও করুণার পাত্র এবং মেয়েদের কাছে তখন পুরুষ ও ধর্মের ষাঁড় অভিন্ন। 'আমি মহাদেবের বাহন' বলে যদি কোন বেকার প্রেমভিক্ষা করেন, তাহলে এযুগের মেয়েরা তাচ্ছিল্য করে তা প্রত্যাখ্যান করবেন এবং বলবেন 'ধর্মের ষাঁড়'। শুধু ধর্মের ষাঁড় নয়, ষাঁড় ও ষণ্ডসহ অনেক 'শব্দ' মেয়েরা পুরুষদের উপর প্রয়োগ করে থাকেন। ক্রোধে বা অভিমানে নয়, অশ্রদ্ধায়। যেমন 'ষণ্ডামার্কা'। বিদ্যাবুদ্ধির চেয়ে বাইসেপের জোর বেশি, এরকম কোন বলিষ্ঠ যুবক দেখলেই মেয়েরা নিঃসঙ্কোচে তাঁকে 'ষণ্ডামার্কা' বলে থাকেন।

এই শ্রেণীর ষণ্ডামার্কাদের প্রতি অধিকাংশ মেয়েরই বিজাতীয় ঘৃণা আছে। তাই তাঁরা 'ষণ্ডামার্কা'র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পর্যন্ত একবারে ভুলে গেছেন। 'ষণ্ড' ও 'অমর্ক' নামে শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ছিল। কি কারণে শুক্রাচার্যের পুত্ররা ব্যঙ্গোক্তিতে পরিণত হলেন জানিনে। 'ষণ্ডামর্ক' ক্রমে আ-কারের টানে হয়ে গেল 'ষণ্ডামার্কা'। মুনিপুত্র হয়েও ষণ্ড তার ষণ্ডত্ব হারাল না। অমৃতের পুত্ররা মেয়েদের কাছে 'ষণ্ডামার্কা' হয়ে গেলেন।

ধর্মের ষাঁড়ের প্রতি একজন মেয়ের মাত্র অনুরাগের কথা শুনেছি আজ পর্যন্ত। নাম উমা, গিরিরাজের কন্যা। আমাদের শিব ধর্মের ষাঁড়ের খুব ভক্ত, ষাঁড় না হলে তাঁর একদিনও চলে না। গাঁজা ও ধর্মের ষাঁড় তাঁর নিত্যসঙ্গী। দিগম্বর বেশে তিনি ভূতপ্রেতসহ শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ান, যতসব কিরাত ডোম চাঁড়াল অসভ্যরা তাঁর অনুরক্ত সহচর। অভিজাতদের তিনি ধার ধারেন না, 'বুর্জোয়া' ভদ্রতাভব্যতাও জানেন না। ষাঁড়ের পিঠে চড়ে, ববম্ ববম্ বম্ শিঙা বাজিয়ে, পাকা 'বুর্জোয়া' আর্য মুনি-ঋষিদের যাগযজ্ঞ পণ্ড করে বেড়ান। একেবারে প্রলেটারিয়েটের দেবতা শিব, নিজেই প্রায় ধর্মের ষাঁড়, নিত্যসঙ্গীও তাঁর ষাঁড়। এ-হেন কোন আধুনিক বেকার শিবকে কোন উমা বা গৌরী জীবনসঙ্গীরূপে গ্রহণ করবেন না, ধর্মের ষাঁড় বলে ঘাড় বেঁকিয়ে চলে যাবেন। আমাদের শিবকে গিরিরাজকন্যা গৌরী পছন্দ করেছিলেন। সেটা যে সম্পূর্ণ নারদের ঘটকগিরির ক্রেডিট্ তা নয়, কিছুটা অনুরাগ গৌরীরও ছিল। তা না হলে বৃদ্ধ নারদের সরস প্রস্তাব শুনে তিনি মা মেনকার কোলে বসে গলা জড়িয়ে ধরে কথাটা বলতেন না। আসল ব্যাপার হচ্ছে, হিমালয়ের পাদদেশেও শিব ষাঁড়ের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতেন এবং গৌরী পাহাড়ের ফাঁকফোঁক দিয়ে দেখতেন। অনুরাগ বা পূর্বরাগ যাই বলুন, আগেই জন্মেছিল। তাছাড়া পাহাড়ীরা এ ব্যাপারে এমনিতেই ফ্রি। গৌরী গিরিরাজ-কন্যা, শিবও কিরাতবেশী ও কিরাতবংশীয়। কথা হচ্ছে ষাঁড় নিয়ে। জীবতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন, ষাঁড়ের জন্ম বা উৎপত্তি পার্বত্য অঞ্চলেই হয়েছিল। আমাদের ভারতীয় ষাঁড়ের পূর্বপুরুষরা এককালে শিবালিক পর্বতমালার পাদদেশে বিচরণ করে বেড়াত। বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে ষাঁড় ও গাভী উভয়েই

গৃহপালিত হয় আফগানিস্তান ও মধ্যএসিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে। পীক্ ও ফ্লুর মনে করেন যে পার্বত্য অধিবাসীরা ছাড়া ষাঁড় ও গাভীর মতন অমন ধীরস্থির প্রকৃতির পশুপালন অন্য কোন জাতির দ্বারা সম্ভব নয়। পার্বত্য অধিবাসীরা অত্যন্ত সরল প্রকৃতির, সেইজন্য তাদের পালিত ষাঁড় ও গাভীও ধীর স্থির শান্ত ও সরল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, গৌরী শিব ও তাঁর ষাঁড় সকলেই পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী। শিব যে ষাঁড়ের কেন এত ভক্ত তাও বুঝতে কষ্ট হয় না। স্বদেশবাসীপ্রীতিই শিবের বৃষভানুরাগের প্রধান কারণ। শিব ও ষাঁড় উভয়ের স্বভাবচরিত্রের সাদৃশ্যও সেইজন্য এত স্ট্রাইকিং। ধর্মের ষাঁড় এমনিতে অত্যন্ত নিরীহ, শান্তশিষ্ট, স্বল্পে তুষ্ট, ধ্যানগম্ভীর ও উদাসীন, কিন্তু কোন কারণে ক্ষেপলে আর রক্ষে নেই। শিবও ঠিক তাই। একেবারে সদাশিব, শান্ত, উদাসীন। কোন জুলুম নেই, দাবীদাওয়া নেই। সামান্য বিল্বপত্র ও একটু গঙ্গাজল মাথায় পড়লেই তুষ্ট। কোন 'ডিয়ারনেস অ্যালাউয়েন্স' চান না। কিন্তু ক্ষেপলে আর রক্ষে নেই। দক্ষযজ্ঞনাশের কাহিনী স্মরণ করলেই শিবের রুদ্রমূর্তি মনে পড়বে। তাছাড়া, ছোক্‌রা মদনের ইয়ার্কির ফলাফলের কথা তো সকলেই জানেন। মদন ফাজলামি করতে গিয়েছিলেন শিবের সঙ্গে, একেবারে ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম হয়ে গেলেন। ধর্মের ষাঁড়েরও অবিকল এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখেছি। জনৈক ছোক্‌রা একবার একটি ধর্মের ষাঁড়ের শিঙে হাত দিয়ে ইয়ার্কি করতে গিয়েছিল। ফঁস্‌ফঁস্ শব্দে শিঙ বেঁকিয়ে ধর্মের ষাঁড়টি তাকে মাইল তিনেক তাড়া করে নিয়ে গিয়ে একটা পাঁচিলের গায়ে খুব কষে চট্‌কান দিয়ে শেষে তুলে সজোরে ধোপাই আছাড় দিয়েছিল।

শিব ও ষাঁড়ের পারস্পরিক প্রীতির কারণ গভীর। উভয়েই একই পার্বত্যদেশের অধিবাসী, এবং উভয়েরই স্বভাব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এক। আমাদের দেশের পার্বত্য অঞ্চলের আদিম পুরুষ শিব এবং আদিম জন্তু তাঁর অনুচর ও বাহন ষাঁড়। গৌরীও পার্বত্য অঞ্চলের কন্যা। মহেনজোদড়োতে শিবও ছিলেন, ষাঁড়ও ছিলেন। ভারতের সর্বত্র যেখানে শিব আছেন, সেখানে ষাঁড়ও আছে। ষাঁড়ের প্রতি গৌরীরও অনুরাগ,

ছিল, ষাঁড়ের ভক্ত শিবের প্রতি তো ছিলই। শিব যখন গৌরীকে বিবাহ করতে গিয়েছিলেন তখনও ষাঁড়টিকে সঙ্গে নিতে ভোলেননি। শিব বিবাহ করতে চলেছেন, সঙ্গে বরযাত্রীরা চলেছে। বরযাত্রীরা হল ভূত-প্রেত-ব্রহ্মদৈত্যাদি। মহা ফূর্তিতে তারা চলেছে। গিরিরাজ পুরোহিত নিয়ে বসে অপেক্ষা করছেন।

এমন সময়—

বলদে চড়িয়া শিঙ্গা বাজাইয়া
এলা বর ভূতনাথ।
যত কন্যাযাত্র দেখিয়া সুপাত্র
বলে এ কেমন বর
বরযাত্রগণে দেখি ভয় মনে
না সরে কারো উত্তর।

(ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর)

শিবের বিবাহে ষাঁড়ের মহাফূর্তি। ঘাড় নেড়ে মহা উল্লাসে ষাঁড় নাচতে আরম্ভ করল, দাদাবাবুর বিয়েতে প্রভুভক্ত ভৃত্য যেমন নাচে তেমনি—

নেড়ে ঘাড় ভেঙে চাড় দিয়ে ষাঁড় নাচে।
কি উল্লাস ছেড়ে শ্বাস নাহি ঘাস যাচে॥

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

বিবাহ হল এবং বিবাহের পর যা আমাদের সকলের হয়ে থাকে তাই হল। হরগৌরীর প্রেমের রং ক্রমেই চট্‌তে লাগল। শুরু হল ঝগড়া। পাহাড়ী মেয়ে গৌরী, সুতরাং কোঁদলের ঝাঁঝও উগ্র। তিনি বলতে লাগলেন—

সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি॥

(ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর)

সেই অর্থনৈতিক কারণ, সনাতন কারণ, যার জন্য শাশ্বত প্রেমও শেয়ালকাঁটার মতন গায়ে বিঁধতে থাকে। শিব গালাগাল সহ্য করতে

পারলেন না। ধর্মের ষাঁড়ও 'বুড়া গরু' বক্রোক্তিতে বিরক্ত হল। শিব সংসার ছেড়ে ভিক্ষায় বেরিয়ে যাবেন মনস্থ করলেন—

হেঁট মুখে পঞ্চানন নন্দীরে ডাকিয়া কন
বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।

(ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর)

লক্ষণীয় হচ্ছে, ষাঁড়ের কথা শিব ভুললেন না। আবাল্য সহচরের নিন্দা নিশ্চয় তাঁর পছন্দ হয়নি। নন্দী আদেশ পালন করল। কেউ কেউ ক্ষুব্ধ শিবকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শিব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উত্তর দিলেন—

যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই
কিবা সুখ এঘরে থাকিয়া
এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষোপর
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া।

(ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর)

ধর্মের ষাঁড়ের রহস্য এবার নিশ্চয় পরিষ্কার হল। প্রেমিকের নিত্যসঙ্গী ধর্মের ষাঁড় যদি সাংসারিক জীবনে গৌরীর কাছেও 'বুড়া গরু'তে পরিণত হয়, তাহলে এযুগের বেকার পুরুষরা আধুনিক গৌরীদের কাছে 'ধর্মের ষাঁড়' হবেন না কেন? কারণ সবক্ষেত্রে একই। অর্থনৈতিক কারণ। সুতরাং বেকার পুরুষরা মেয়েদের 'ধর্মের ষাড়' বক্রোক্তিতে ক্ষুব্ধ হবেন না। মনে মনে এই কথা ভেবে সান্ত্বনা পাবেন যে—যে-মেয়েরা অর্থনৈতিক কারণে 'ধর্মের ষাঁড়' বলে তাঁদের উপেক্ষা করেন, সেই মেয়েরাই আবার আধ্যাত্মিক কারণে সেই ষাঁড়ের পায়ে অর্ঘ্য দিয়ে কৃতার্থ হন। বিচিত্র জীব! ধর্মের ষাঁড় নয়, এই মেয়েরা!
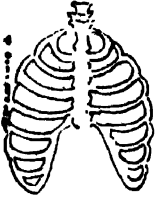
ছাইকোলজি

এতদিন একটা বস্তু ছিল, যা নিয়ে আমরা রঙবেরঙের কল্পনার সূক্ষ্ম মস্‌লিন বুনতে পারতাম। বস্তুটি হল 'মন'। অবশ্য মনটাকে বস্তু বললে আজও হয়ত কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হবেন। কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেও নিস্তার নেই। মন আর সে-মন নেই। মনোবিদ্‌রা মনের বোর্‌খাটি আজ খুলে ফেলে দিয়েছেন। 'কি জানি কার মনে কি আছে'—একথা আগেকার মতন আজ আর বলা যায় না। যার মনে যাই থাক না কেন, সবই আজ জানা যায়, বলা যায়। এমনকি, মনে যা নেই তাও সমীক্ষণ করে বলে দেওয়া যায়। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে ঠিক উল্টো। আগে 'কার কি মনে আছে, কে জানে' বলে আমরা বিস্ময় প্রকাশ করতাম ; এখন 'যার মনে যা আছে, সব জানা আছে' বলে মুচকি হাসি। আমরা জানি না আমাদের মনে কি আছে, অথচ মনোবিদ্‌রা জানেন। তাঁরা জানলেও ক্ষতি ছিল না, কারণ বিশেষজ্ঞ তাঁরা, মন নিয়ে কারবার করেন, জানাটা তাঁদের পক্ষে আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাঁরা ছাড়াও আরও অনেকে জানেন। সকলের জানাজানির ফলে মনের অবস্থা হয়েছে ঠিক মেসের বারোয়ারি ছাতির মতন—যার যখন খুশি টান দিয়ে মাথায় দিচ্ছেন। মনোবিদ্ আজ আমরা সকলেই, সমীক্ষণবিদ্যায় পারদর্শী। লক্ষদুয়ারী মনের অনেক রুদ্ধ দরজা মনোবিদ্‌রা খুলে ফেলেছেন ঠিকই, কিন্তু এখনও অনেক দরজায় তাঁরা মাথা খুঁড়ে মরছেন, ভিতরের গভীর অন্ধকারের রহস্য কিছুই জানেন না। অথচ আমরা সব জেনে ফেলেছি। জেনে ফেলে এত বেশি বাড়াবাড়ি করছি পথে-ঘাটে, বাসে-ট্রামে সর্বত্র,—যে 'মন' আজ ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছেড়েছে। এতদিন আমাদের মনের অন্দরমহল পর্যন্ত একজনের দৃষ্টিনিবদ্ধ ছিল, তিনি ভগবান। এখন মনের অলিগলি পর্যন্ত সকলের দৃষ্টিনিবদ্ধ, সকলেই

ভগবান। যাই হোক তবু নিজের বলতে ঐ মনটাই ছিল, অবশেষে তাও গেল।

বেশ বোঝা যায়, 'সাইকোলজি'র যুগে বাস করছি আমরা। হাড়ে হাড়ে প্রত্যেকেই সেটা বুঝতে পারছি। সাইকোলজির খৈ ফুটছে মুখে। 'সাইকোলজি' কথাটাই ধরুন না কেন। এমন জায়গা নেই এবং এমন মুখ নেই যে শোনা যায় না। বাজারে সাইকোলজি, বাসে সাইকোলজি, অফিসে সাইকোলজি, বৈঠকে সাইকোলজি। 'সাইকোলজি দেখলেন তো?' 'ভদ্রলোকের সাইকোলজি বুঝলেন?' 'মেয়েটির সাইকোলজি বুঝে ফেললাম'—। এই ধরনের সব কথা এবং কথায় কথায় কেবল সাইকোলজি। কথাটার অর্থ হল 'মনোবিজ্ঞান' বা 'মনস্তত্ত্ব'। কোন ভদ্রলোকের বা ভদ্রমহিলার 'মনোবিজ্ঞান' বলতে কি বোঝায় জানি না। আপনার শরীরটা একটু খারাপ দেখাচ্ছে—কথাটা এইভাবে না বলে যদি কেউ বলেন, 'আপনার ফিজিওলজিটা একটু খারাপ দেখাচ্ছে'— তাহলে কি রকম শোনায় বলুন তো? বাড়িতে আপনি পশুপক্ষী পোষেন, ওটা আপনার 'হবি'। কিন্তু সেটা আপনার 'জুলজি-প্রীতি' বলে যদি কেউ ব্যাখ্যা করেন তাহলে কি মনে হয় আপনার? 'সাইকোলজি'ও তাই। কথায় কথায় যখন আমার সাইকোলজিটা আপনি বুঝি ফেলেন তখন আমার মনে হয় আপনার ফিজিওলজিতে বেশ গণ্ডগোল আছে এবং আপনি জুলজির একটি বিচিত্র জীববিশেষ।

শুধু কি সাইকোলজি! মনঃসমীক্ষণের বাছা বাছা সব কথার অবস্থা হয়েছে ঠিক ঘষা পয়সার মতন। যেমন ধরুন, ম্যানিয়া, ফোবিয়া, কম্‌প্লেক্স, নিউরসিস, অবসেসন, পারভার্সান ইত্যাদি। ম্যানিয়া ফোবিয়া তো মুখের বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি যদি গান ভালবাসেন তাহলে বুঝতে হবে যে গান সম্বন্ধে আপনার ম্যানিয়া আছে, আর যদি অহরহ গুন্‌গুন্ করেন তাহলে তো কথাই নেই। যাঁরা ক্লাসিকাল গান শুনতে ভালবাসেন তাঁদের ক্লাসিকাল-ম্যানিয়া এবং যাঁরা রবীন্দ্র-সঙ্গীতানুরাগী তাঁদের রবীন্দ্র-ম্যানিয়া আছে। চোর-ডাকাত-গুণ্ডা সম্বন্ধে ভীতিটাও আপনার অসংখ্য ফোবিয়ার মধ্যে একটি। এইভাবে দেখতে পাবেন, চলার পথে পদে পদে আপনার

কত রকমের ম্যানিয়া ও ফোবিয়া আছে, যা আপনি জানেন না, অন্যেরা জানেন। ভিড় দেখলে বাসে ওঠেন না, সেটা আপনার সুস্থ মনের পরিচয় নয়, ক্রাউড-ফোবিয়া। পকেটমারদের পকেট-কাটার অভ্যাসটাকেও কতকটা 'ম্যানিয়া' বলে ব্যাখ্যা করতে পারেন। চুরি করাটাই তো একটা ম্যানিয়া। না বলে পরের দ্রব্য নিতে নিতে অভ্যাসটা এমন হয়ে যায় যে, পরে সদিচ্ছা থাকলেও বলে নেবার কথা আর মনে থাকে না। এইভাবে নিতে নিতে ক্রমে পরের দ্রব্য নিজের বলে মনে হতে থাকে। তখনকার অবস্থাটাকে তুরীয় অবস্থা বলতে পারেন। তখন চুরি আর চুরি থাকে না, ম্যানিয়া হয়ে যায়—'ক্লেপ্টোম্যানিয়া'। এই রকম, আমাদের সমস্ত কাজকর্মই দেখা যায়, হয় ম্যানিয়া, না হয় ফোবিয়া। অনেকে দেখবেন, ঘুরে ঘুরে সস্তায় জিনিস কিনে বেড়ান—পোস্তার বাজার থেকে আলু, মশলাপাতি, হাটখোলা থেকে ডাল, হাতিবাগান থেকে মাছ, হাওড়া-হাট থেকে কাপড় ইত্যাদি। সেটা তাঁদের রুচি বা বিলাসিতা নয়, ম্যানিয়া—'ওনিওম্যানিয়া' বলা যেতে পারে। আপনি প্রাণখুলে ঘুরে বেড়াতে চান—সেটা আপনার 'ড্রোমো-ম্যানিয়া'। পার্কেপার্কে বৃদ্ধরা যে চক্রাকারে ঘুরে বেড়ান, সেটা তাঁদের সুস্থ মনোবৃত্তি না হয়ে 'পোরিওম্যানিয়া' হতে পারে। রুদ্ধ ঘরে বন্দী হয়ে না থেকে মুক্ত আলোবাতাসে হাত পা ছেড়ে থাকতে চান, সেটাও আপনার সুস্থ বাসনা নয়—'ক্লস্ট্রোফোবিয়া'। এইভাবে যদি তলিয়ে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন, আপনি সুস্থ নর্মাল মানুষ নন, ম্যানিয়া ও ফোরিয়ার বাণ্ডিল মাত্র।

নিউরসিস ও কমপ্লেক্সেরও সেই অবস্থা। প্রতিদিন রেডিও শুনতে শুনতে আপনার মধ্যে যে রেডিও-কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে, তা আপনি নিজেই জানেন না। আর নিউরসিসের তো আপনার অন্ত নেই। কেবল খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেই যে কত লোকের কত রকমের নিউরসিস আছে তার ঠিক নেই। আমি এক ভদ্রলোকের 'ভেট্‌কি-নিউরসিস' দেখেছিলাম, ভুলব না কোনদিন। একদা একত্রে মধ্যাহ্নভোজনের সময় না-জেনে ভেট্‌কির ফ্রাইয়ের কথা বলতেই দেখলাম ভদ্রলোক হাতগুটিয়ে বসে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলেন। অপ্রস্তুত হয়ে চেয়ে আছি, এমন সময়

হোস্টেস্ হাসতে হাসতে বললেন : 'মিস্টার ব্যানার্জির ভেট্‌কি-নিউরসিস আছে, জানেন না ?' 'আজ্ঞে, না' বলে লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইলাম। তখন বুঝলাম, কেন মিসেস রায় নিমন্ত্রণ করার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 'আপনার কি কি নিউরসিস আছে বলুন !' হঠাৎ প্রশ্ন শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। আমার একটি মাত্র নিউরসিস সম্বন্ধে আমি বরাবরই সচেতন—কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে 'মাথা চুলকানো'—'হেয়ার-স্ক্র্যাচিং নিউরসিস' বলতে পারেন। অতএব মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললাম : 'এই যা দেখছেন, এই একটিই আমার আছে এবং এইটির জন্যে আমার কেরিয়ার একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, অর্থাৎ ইণ্টারভিউয়ে বাতিল হয়ে গেছি।' শুনে তিনি বললেন : 'ওসব না, ও দিয়ে আমার কি হবে ? আমি বলছি, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কিছু আছে কি না ! এই ধরুন যেমন—চিংড়ী-নিউরসিস, তোপ্‌সে-নিউরসিস, পটল-নিউরসিস ইত্যাদি।' বুঝলাম, নিউরসিস রান্নাঘরেও ঢুকেছে, আর রেহাই নেই।

তারপর ধরুন—'অবসেসন্'। বদ্ধমূল ধারণা বলতে যা বোঝায়, অবসেসন হল কতকটা তাই। কিন্তু ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ধারণা মাত্রই অবসেসন হয়ে উঠছে। আমার আপনার ধারণা আমরা 'ভদ্রলোক' এবং সেটা বদ্ধমূল ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কেউ যদি বলেন যে ওটা আমাদের একটা অবসেসন, তাতে সন্তুষ্ট হবার কোন কারণ আছে কি ? ভদ্রতা সম্বন্ধে আপনার একটা অবসেসন আছে বলেই আপনি সর্বদা ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করেন, এটা আর যাই হোক, কমপ্লিমেণ্ট নয়। পিতার 'সত্য কথা' সম্বন্ধে অবসেসন আছে বলে তিনি পুত্রকে সদা সত্য কথা বলতে বলেন—এমন কথা কোন পুত্রের পক্ষে বলা কি সমীচীন ? অবসেসন সম্বন্ধে একটি ছোট্ট গল্প বলি শুনুন। গল্প নয়, সত্য ঘটনা। আমাদের বটুদা তিন-তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করবার পর চতুর্থবার যখন পরীক্ষা দেন তখন বানান ভুলের জন্য জ্যাঠামশায়ের কাছে একদিন প্রচণ্ড কানমলা খান। বটুদার বানান সম্বন্ধে নিজস্ব একটা থিওরি ছিল। যেমন উচ্চারণ, তেমনি বানান, বোঝা গেলেই হল। 'হি গোজ'-এর গোজ্ বানান তিনি অবলীলাক্রমে জি-ও-এস্-ই লিখতেন এবং 'নোজ'

লিখতে হলেই এস্-এর আগে 'ই' বসিয়ে এন্-ও-ই-এস্ করতেন। এইরকম সব বানান ভুলের জন্য জ্যাঠামশায়ের কাছে একদিন কানমলা খেয়ে বটুদা দেখি গুম্ হয়ে বসে বইয়ের মার্জিনের সাদা কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাকিয়ে কান খুঁটছেন। এটা বটুদার অভ্যাস বা ম্যানিয়া বলতে পারেন! সেইজন্য তাঁর কোন পাঠ্যপুস্তকের ছাপান অক্ষরের অংশটুকু ছাড়া, মার্জিন বলে কিছু থাকত না। যাই হোক, বটুদার গুমোট ভাব দেখে জিগ্যেস করলাম: 'কি হয়েছে বটুদা?' গম্ভীরকণ্ঠে বটুদা উত্তর দিলেন: 'আর বলিস কেন? জ্যাঠামশায়ের বানান সম্বন্ধে একটা মারাত্মক অবসেসন আছে বুঝলি? তার জন্যে আমার কান চুল সব উপড়ে ফেলার উপক্রম করেছেন। কি করা যায় বল্‌তো?' স্তম্ভিত হয়ে বললাম: 'অবসেসন?' বটুদা বললেন: 'তা ছাড়া কি? দুনিয়াতে সব বদলে যাচ্ছে—আজ যা আছে, কাল তা নেই—স্বয়ং স্ট্যালিনই থাকছেন না—আর জ্যাঠামশায়ের ধারণা বানান fixed থাকবে।' খুব ঠিক কথা—সবাই যদি বদলায়, বানান বদলাবে না কেন? সত্যি বানান সম্বন্ধে কারও কোন অবসেসন্ থাকা ঠিক নয়, ব্যাকরণ সম্বন্ধে তো নয়ই। বটুদার কথায় সায় দিয়ে উঠে গেলাম।

ক্লাইম্যাক্স হল, স্নেহ ভালবাসা প্রেমের পরিণতি। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের নায়ক নায়িকার কাছে এসবও 'অবসেসন' বা 'ম্যানিয়া' ছাড়া কিছু নয়। নায়ক যদি নায়িকাকে বলেন: 'মেঘে মেঘে, গাছের পাতায় পাতায়, ফলে ফুলে, মাঠে মাঠে, জানলার গরাদে, ঘরের সিলিঙে—যেদিকে যখন চাই, তোমারই মুখ দেখতে পাই, সানাই!'—তখন নায়িকা সানাই ভীম-পলশ্রী রাগিণীতে ঝংকৃত হয়ে ওঠেন না। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বলেন: 'বলছ কি মৃদঙ্গ? এখনই কোন ক্লিনিকে যাও। তুমি তো মারাত্মক 'অবসেসনে' ভুগছ—প্যাথেটিক ইরটোম্যানিয়্যাক্!'

বুঝুন অবস্থা। মনঃসমীক্ষণ ভাল, কিন্তু তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ফল ভয়াবহ। বাড়াবাড়ি করে গোটা সমাজটাকেই আজ আমরা একটা 'মেণ্টাল হসপিটালে' পরিণত করেছি। কেউ ম্যানিয়ায়, কেউ ফোবিয়ায় কেউ নিউরসিসে, কেউ কম্‌প্লেক্সে, কেউ বা অবসেসনে ভুগছি। চিকিৎসা করার কেউ নেই।

ভদ্রলোক ভেসে

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটন কলেজের এক ছাত্র নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (স্বনামধন্য ইন্জিনিয়ার মনোমোহন গাঙ্গুলীর পিতা) লেখাপড়ার ব্যাপার শেষ করে, কাঠের ব্যবসা করতে আরম্ভ করেন। কলকাতায় নিমতলা অঞ্চলে তাঁর কাঠের গোলা ছিল। ব্যবসা বেশ ভালই করছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ একদিন আগুন লেগে কাঠের গোলা পুড়ে যায়। নগেনবাবু মুশ্‌ড়ে পড়েন। ছাত্রের এই দুর্ঘটনার কথা শুনে বিদ্যাসাগর মশায় একদিন নিমতলায় পাল্‌কি করে তাঁর কাঠের গোলা দেখতে যান। রাস্তায় তাঁকে দেখবার জন্যে দু-চারজন করে ক্রমে লোকের ভিড় জমতে থাকে। ভিড় দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'এত ভিড় কেন?' নগেনবাবু উত্তর দেন, 'আপনাকে দেখতে এসেছে'। 'তাই নাকি? ঘণ্টা বাজা, ঘণ্টা বাজা,' বলে বিদ্যাসাগর মশায় হাসতে থাকেন। এইভাবে কিছুক্ষণ হাস্যপরিহাসের পর তিনি গম্ভীর হয়ে তাঁর ব্যবসায়ী ছাত্রটিকে জিগ্যেস করেন—

'কিভাবে ব্যবসা করিস নগেন?'

'আজ্ঞে ধারেও বেচি, নগদেও বেচি'

'ধার কাকে দিস'?

'ভদ্রলোক দেখে দিই'

'কি করে বুঝিস ভদ্রলোক'?

'আজ্ঞে চেহারা দেখলেই বোঝা যায়'

'দূর মুখ্‌খু, তোর দ্বারা ব্যবসা হবে না, ছেড়ে দে। চেহারা দেখে ভদ্রলোক চেনা যায়? ভদ্রলোক চিনবি ব্যবহারে, চেহারায় নয়।'

১৮৮২-৮৩ সালের কথা। ভদ্রলোক-বিচারের মানদণ্ড তখন অনেক

বদলে গেছে। পরিবর্তনের সেই ধারার সঙ্গে বিদ্যাসাগর মশায়েরও প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। ১৮৮২ সালে তিনি তাঁর ছাত্রকে উপদেশ দিচ্ছেন, ব্যবহার দেখে ভদ্রলোক চিনতে, চেহারা দেখে নয়। চেহারা বলতে পোশাক-পরিচ্ছদের কথাও বোঝায়। অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলাদেশেও 'ভদ্রলোকের সংজ্ঞা' বা ডেফিনিশন বদলাতে আরম্ভ করেছিল দেখা যায়। ভদ্রলোকত্বের মানদণ্ডের মধ্যে জোর দেওয়া হচ্ছিল ব্যবহারের উপর, পোশাক বা চেহারার উপর নয়। কিন্তু—

পরিবর্তনের স্রোতে
ভদ্রলোক যায় ভেসে
কালের যাত্রায়—

পরিবর্তনশীল সমাজের ভদ্রলোকও পরিবর্তনশীল। অতীতে যাঁরা সমাজে 'ভদ্রলোক' বলে গণ্য হতেন, বর্তমানে তাঁদের বংশধররা অনেকেই আর তা হন না। ভদ্রলোকের এই পরিবর্তনশীতার তাৎপর্য নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীরা অনেক মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন তল খুঁজে পাননি। অতলস্পর্শ সামাজিক তাৎপর্য এই 'ভদ্রলোক' কথাটির। ভদ্রলোকরা তা নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাননি বলে ভদ্রতা বজায় রেখে চলতে পারছেন। 'ভদ্রলোক' সম্বোধনেই তাঁরা খুশি। কেন ভদ্রলোক তা তাঁরা জানেন না, জানবার প্রয়োজনবোধও করেন না। যাঁরা ভদ্রলোকের উৎসসন্ধানে যাত্রা করেছেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন।

বাঙালী সমাজের কথা পরে বিচার্য। তার আগে প্রথমেই প্রশ্ন করতে হয় মানুষের সমাজে 'ভদ্রলোক' নামে শ্রেণীর উৎপত্তি হল কোন্ সময় এবং কি কারণে হল? ভদ্রলোকরা কোন নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কিনা? কি কি গুণ থাকলে ভদ্রলোক হয়? কোন সমাজবিজ্ঞানী এসব কথার সঠিক উত্তর দিতে পারেননি, অথচ 'ভদ্রলোকতত্ত্ব' বা 'থিওরি অফ্ জেণ্টলম্যান' বলে নতুন এক তত্ত্বকথার উৎপত্তি হয়েছিল একসময়। সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধানীরা বিচার করে দেখেছেন, ভদ্রলোকের যতগুলি গুণ বা ক্রাইটেরিয়া আছে তার কোনটারই স্থিরতা নেই। যেমন, বিদ্যাসাগর মশায় বলেছেন, ব্যবহারে ভদ্রলোক চেনা যায়। ঠিক কথা।

পোশাক বা চেহারা ভদ্রলোকের মাপকাঠি নয়। তা যদি হয়, তাহলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতন অনেক শীর্ষস্থানীয় ভদ্রলোককে ভদ্রশ্রেণী ছাড়া অন্য যে-কোন শ্রেণীভুক্ত করতে হয়। কিন্তু এমন কোন অভদ্রলোক আছেন কিনা জানি না, যিনি চেহারা ও পোশাকের জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতন পুরুষকে 'ভদ্রলোক' বলতে রাজী হবেন না। চেহারা বা পোশাকের সঙ্গে ভদ্রলোকত্বের বাস্তবিকই কোন সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। তাই বলে, বিদ্যাসাগরের 'ব্যবহার' মানদণ্ডটিও যে খুব নির্ভরযোগ্য, তা মনে হয় না। মুখে যিনি মিছরির মতন মিষ্টি, মনে মনে শাণিত ছুরির মতন ভয়াবহ, তিনি কি ভদ্রলোক? সাধারণত যাঁকে আমরা ভদ্রলোক বলতে চাই না, তাঁর সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে বলি—'ব্যবহারটি এমন, একেবারে অমায়িক ভদ্রলোকের মতন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে লোকটি মূর্তিমান ছোটলোক, চামার।' সুতরাং বিদ্যাসাগর মশায়ও ঠিক কথা বলেননি। পোশাক বা চেহারা দেখে ভদ্রলোক চেনা যায় না—যেমন, ব্যবহার দেখেও তেমনি বোঝা যায় না। মানুষের সমাজে 'ভদ্রলোক' নামে জীবরা হলেন আলেয়ার মতন। তাঁদের কেবল চলে ফিরে বেড়াতে দেখা যায়, ধরাছোঁয়া যায় না। যত কাছে যাওয়া যায় তত তাঁরা ভদ্রলোকের কল্পিত সীমারেখা থেকে দূরে সরে যান, অর্থাৎ তত তাঁদের 'অভদ্র' বলে মনে হয় এবং যত দূরে যাওয়া যায় তত মনে হয় ভদ্রতার প্রতিমূর্তি। আরও আশ্চর্য হল, সকলকে তা মনে হয় না। একজাতের ভদ্রলোক আছেন, যাঁদের ঠিক উল্টো মনে হয়। অর্থাৎ যত কাছে যাওয়া যায় তত মনে হয় কত ভদ্র, আর যত দূরে সরে যাওয়া যায় তত মনে হয়, কি অভদ্র। পোশাক, চেহারা, ব্যবহার, অর্থ ও কুলকৌলীন্য কোনটাই ভদ্রলোকত্বের নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নয়। একটি ছেড়ে অন্যটি ধরা যায় না। সব কটি গুণ থাকলে পুরো ভদ্রলোক হওয়া যায়, কিন্তু সেরকম ভাগ্য করে খুব কম ভদ্রলোকই জন্মগ্রহণ করেন। যুগে যুগে তাই দেখা যায়, এইসব ভদ্রলোকত্বের মানদণ্ড অনুযায়ী ভদ্রলোকের সংজ্ঞা বদলেছে। এক একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি জোর দিয়ে বলা হয়েছে, এই গুণ থাকলে ভদ্রলোক হওয়া যায়। তারপর আবার সেই আপেক্ষিক গুরুত্ব বদলেছে এবং ভদ্রলোকেরও পরিবর্তন হয়েছে।

বাংলা 'ভদ্রলোকের' ইংরেজী কথা হল 'জেন্টলম্যান'। ফরাসী কথা 'Gentilhomme,' ইটালীয় কথা Gentiluomo'—দুয়েরই সম্পর্ক আছে কুলকৌলীন্যের সঙ্গে। ল্যাটিন 'Gentis' কথাও পরিবার ও কুলসূচক। সামাজিক ইতিহাসের দূর অতীতের দিকে যত পিছিয়ে যাওয়া যায়, তত দেখা যায় কুলকৌলীন্যের উপর গুরুত্ব বেশি আরোপ করা হয়েছে এবং শেষে 'কুল' আর 'ক্ল্যানে'র মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ট্রাইবাল সমাজেও ক্ল্যানভেদে মর্যাদাভেদ আছে, আমাদের সমাজের বর্ণগত পার্থক্য তারই একটু মার্জিত রূপ মাত্র। ফিউডালযুগে রাজাবাদশাহরা সম্পত্তি ও খেতাব দিয়ে এই মর্যাদাকে কুলানুক্রমিক করতেন। আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগে আভিজাত্যের কুলগত ভিত ভেঙে ফেলা হল, মানুষের ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ও প্রতিভার উপর গুরুত্ব দেওয়া হল বেশি। কিন্তু আর্থিক বা রাজনৈতিক ভিত যত সহজে ভাঙে, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক ভিত তত সহজে ভাঙে না। তাই নতুন যুগের সামাজিক ভাঙাগড়ার মধ্যেও পুরাতনের জের চলতে লাগল। আধুনিক ধনিকযুগের প্রথম পর্বে, সামাজিক রঙ্গমঞ্চে যাঁরা ভদ্রলোকের বেশ ধারণ করে অবতীর্ণ হলেন তাঁরা অনেকেই তাই ললাটে কুলতিলক পরেই এলেন। তাঁদের সঙ্গে আরও একদল এলেন বাণিজ্যলব্ধ বিত্তের জোরে, অথবা প্রতিভালব্ধ বিদ্যার জোরে। বিত্ত ও বিদ্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কৃতিত্বও সামাজিক মর্যাদা দাবি করল, কুলকৌলীন্যের মতন। দাবি গ্রাহ্য হল, কিন্তু কুলের সনাতন দাবি একেবারে বাতিল করা হল না। অর্থ, কৃতিত্ব ও কৌলীন্য,—তিনটিই নবযুগের ভদ্রলোক বিচারের মানদণ্ড হল।

কিন্তু তাতে ব্যাপারটা সহজ হল না, আরও জটিল হল এবং ফ্যাসাদও বাড়ল। ফিউডাল যুগে বরং ছিল ভাল। অভিজাত বংশের বংশধরদের চিনতে কষ্ট হত না। ভদ্রলোক নিয়ে তখন অত মাথাও ঘামাত না কেউ। ব্যক্তিগত কৃতিত্বের কোন বিশেষ বালাই ছিল না তখন। ধনতান্ত্রিক যুগের একাধিক পরস্পর-বিরোধী মানদণ্ডের ফলে ভদ্রলোক চেনা ও বাছাই করা রীতিমত দায় হয়ে উঠল। কেন হয়ে উঠল, বলছি।

বাবুরামবাবু কাঁচা সরষে পিষে তেল বার করে, তাই বেচে বেশ পয়সা

করেছেন। কলকাতা শহরে তাঁর চারখানা বাড়ি, তিনটে তেলের কল। ভদ্রলোকরা (বেকার) তাঁর কাছে গিয়ে ধর্না দেয়। বাবুরামবাবু নেঙটির মতো গামছা পরে থাকেন, ঘন ঘন পানদোক্তা খান এবং পিক্ ফেলতে ফেলতে অমার্জিত ভাষায় ইতরের মতন কথা বলেন। এহেন বাবুরামকে কেউ 'ভদ্রলোক' বলতে রাজি হবেন না, এমন কি যে-বেকার ভদ্রলোকরা দুবেলা চাকরির আশায় তাঁর কাছে ধর্না দেন, তাঁরাও না। তাহলে কেবল অর্থের সঙ্গে ভদ্রলোকের সম্পর্ক কোথায়? ভদ্রলোকত্ব অর্থের অতিরিক্ত কিছু। হেনরি পীচহ্যাম তাঁর 'পুরো ভদ্রলোক' (Compleat Gentleman, 1622) নামে বইয়ের মধ্যে তাই স্পষ্ট করে বলেছেন : 'Riches are an ornament not the cause of nobility.' এখানে বাবুরামবাবুর চাল-চলন, পোশাক, আচরণ ইত্যাদি হল ভদ্রলোকভুক্ত হবার অন্তরায়। কেবল অর্থের জোরে তাই তিনি ভদ্রলোক হতে পারলেন না। কিন্তু নববাবু গ্যাবাডিনের সুট পরে, মোটর হাঁকিয়ে বেড়ান। হঠাৎ চোরাবাজারের দালালি করে তিনি অর্থলাভ করেছেন। অর্থ, পোশাক, চেহারা সব থাকা সত্ত্বেও নববাবু ভদ্রলোকের সমাজে আপস্টার্ট বলে গণ্য হবেন, পুরো কেন, আধা-ভদ্রলোকের মর্যাদাও তাঁকে কেউ দিতে রাজি হবেন না। এখানে অভাব কিসের? চোরাবাজারের দালালি করে অর্থ রোজগার করাটাও এ-সমাজে ব্যক্তিগত কৃতিত্ব। নববাবুর চেহারা, পোশাক, অর্থ ছাড়াও কৃতিত্ব আছে। 'ভদ্রলোক' হতে কোন বাধা নেই। অথচ তাঁকে অবজ্ঞা করে আপস্টার্ট বলা হবে। এখানে বাধা হল বংশগত মর্যাদার। সুতরাং যেসব নীতিবাগীশরা বলেন, 'the clothes do not make the man', তাঁদের বাবুরামবাবুর কথা স্মরণ করে বোঝা উচিত, 'they do, however, make the gentleman' অর্থাৎ পোশাক দিয়ে লোক চেনা না গেলেও, ভদ্রলোক চেনা যায়। নববাবুর ক্ষেত্রে পীচহ্যামের কথাই ঠিক, কেবল টাকার জোরে ভদ্রলোক হওয়া যায় না। অথচ টাকা, বংশমর্যাদা, পোশাক, আচারব্যবহার, কৃতিত্ব সবই থাকা দরকার, ভদ্রলোক হতে হলে।

এইভাবে বিচার করলে দেখা যায়, ভদ্রলোকের ব্যাপারটাই

গোলমেলে। চাষীকে চিনতে দেরি হয় না, মজুরকেও সহজে চেনা যায়। ধনিক বা অভিজাত লোক চিনতেও কষ্ট হয় না। কিন্তু ভদ্রলোক আধুনিক লোকসমাজে চেনা ও বাছাই করা দুরূহ ব্যাপার। যেসব মানদণ্ডের কথা বলেছি, বিচারবিশ্লেষণে তার কোনটাই ধোপে টেঁকে না। প্রত্যেকটি মানদণ্ড পরস্পরনির্ভর। কৃতী লোক হলেই হবে না, সদাচারী হওয়া দরকার। আবার কৃতী ও সদাচারী হলেই হবে না, তার সঙ্গে অর্থেরও জোর খানিকটা থাকা দরকার। তবেই ভদ্রলোক হওয়া সম্ভব। আর্থার লিভিংস্টোন তাই বলেছেন :

'Achievement, however, has always been subject to good manners, and it must lead to wealth ; otherwise the genteel status is ephemeral.'

কৃতিত্বের সঙ্গে সদাচারের মিশ্রণ এবং আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে উভয়ের মিলন হলে ভদ্রলোকের স্ট্যাটাস স্থায়ী হয়। তা না হলে, দুদিনের ভদ্রলোক হবার সম্ভাবনা।

ভদ্রলোক সম্বন্ধে আমাদের যে সব নৈতিক ধারণা আছে তার অধিকাংশই ভুল। নীতিতত্ত্বের সঙ্গে ভদ্রলোকতত্ত্বের কোন যোগসূত্র নেই। ভদ্রলোক হতে হলে যে নীতিবাগীশ হতে হবে, এমন কথা কেউ বলেন নি কখনও। ওটা নীতিবাদীদের উদ্ভাবন মাত্র। ভদ্রলোকদের যেদিন থেকে উদয় হয়েছে সমাজে, সেদিন থেকে তাঁরা সনাতন নীতিবিচার জলাঞ্জলি দিয়েছেন। পীচহ্যাম তাই নিয়ে দুঃখ করেছেন। বলেছেন যে মদ্যপান, মিথ্যাচার, স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতি কোন চারিত্রিক দোষই 'gentility' বা ভদ্রলোকত্বের অন্তরায় হয়নি কোনকালে। আমাদের বাংলাদেশের আধুনিক কালের ভদ্রলোকদের মধ্যে রামমোহন রায় অন্যতম। তিনি প্রচলিত নীতিবাদের ধার ধারতেন না। সমাজের অগ্রগণ্য নেতা হয়েও বাড়িতে বাইজী নাচাতে সঙ্কোচ হয়নি তাঁর। ইয়ং বেঙ্গল দলের সকলে নিশ্চয় বাঙালীদের মধ্যে সেরা ও সাচ্চা ভদ্রলোক ছিলেন। 'মোর্যালিটি'র সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না বিশেষ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার চিত্র এঁকে গেছেন 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' প্রহসনের মধ্যে :

॥ নববাবু ॥ জেণ্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরস্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েচি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করিনে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর।

॥ সকলে ॥ হিয়ার, হিয়ার।···

॥ নববাবু ॥ কিন্তু জেণ্টেলম্যেন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল্—অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান; এখানে যার যে খুসি, সে তাই কর। জেণ্টেলম্যেন, ইন দি নেম্ অব ফ্রীডম, লেট অস এঞ্জয় আওরসেভল্ভস।

বাঙালী ভদ্রলোকের উৎপত্তির আভাস পাওয়া যায় এর মধ্যে। বিদ্যাবলে তাঁরা বলীয়ান, জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে তাঁরা অজ্ঞানের অন্ধকারে পথ চলেন এবং তাঁদের জীবনের লক্ষ্য ও নীতি হল—'In the name of freedom, let us enjoy ourselves'. তবে নববাবুর যুগের ভদ্রলোকদের সঙ্গে পার্থক্য কোথায়? লক্ষ্য ও নীতির দিক থেকে পার্থক্য নেই। সেকালের ভদ্রলোকরা গর্ব করতেন যে বিদ্যাবলে তাঁরা কুসংস্কারের শিকল কেটেছেন, এবং পুত্তলিকার কাছে দেবী বলে হাঁটু নোয়ান না। একালের ভদ্রলোকদের এইটুকুও বড়াই করে বলবার মুখ নেই। বাছা-বাছা ভদ্রলোকেরা সব সাধুবাবাদের সামনে বিদ্যাবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলেন নাড়ুগোপালের মতন।

এসব দিকে ভদ্রলোকের কোন পরিবর্তন হয়নি। যেটুকু হয়েছে তা অগ্রগতি নয়, অধোগতি। ভদ্রলোকের আসল যে সমস্যা, তারও যে কোন বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে, তা মনে হয় না। ভদ্রলোকতন্ত্রের সবচেয়ে বড় কথা হল—'No gentleman works for a living', নিছক জীবনযাপনের গ্লানির জন্য ভদ্রলোকরা কোন কাজ বা মেহনত করতে চান না। তাঁদের ভদ্রতার মর্যাদা তাতে ক্ষুণ্ণ হয়। ভেবলেন

(Thorstein Veblen) তাঁর বিখ্যাত বই 'Theory of the Leisure Class'-এর মধ্যে ভদ্রলোকের এই মনোভাব সম্পর্কে অনেক প্রণিধানযোগ্য তত্ত্বকথা বলেছেন। ভদ্রলোকরা হাতের কাজ চিরকাল ঘৃণা করেন। দৈহিক পরিশ্রম করে যে কাজ করতে হয় সে কাজ তাঁরা অভদ্রলোকের কাজ বলে মনে করেন। বিচিত্র মনোভাব! কিন্তু এই মনোভাবটুকু বাদ দিলে ভদ্রলোকের আর কিছুই থাকে না। যে হাত দিয়ে ভদ্রলোক কেরানীরা কলম পেষেন, সেই হাত দিয়ে মজুররা কারখানায় যন্ত্র চালায়, হাতুড়ি পেটে, চাষীরা মাঠে লাঙল চালায়। হাতের কোন মহিমা নেই। কলমের সঙ্গে হাতুড়ি আর হালের তফাৎ আছে। তার চেয়েও বড় তফাত হল, অপিসের সঙ্গে কারখানার তফাৎ, অপিসের সঙ্গে মাঠের তফাৎ। সবচেয়ে বড় তফাৎ হল, কাজ সম্বন্ধে ধারণার। কলম পিষতে পিষতে হাত আড়ষ্ট হয়ে গেলেও, কোন ভদ্রলোক সেই হাতে হাতুড়ি বা হাল ধরবেন না, স্ত্রীপুত্রপরিজন নিয়ে অনাহারে মরে গেলেও না। হাতের কাজ, দৈহিক মেহনতের কাজ, ভদ্রলোকের কাছে ট্যাবু। কেবল হাতের কাজ বা মেহনতের কাজ নয়, নিছক জীবনধারনের জন্য কোন কাজ করাকে একসময় ভদ্রলোকেরা অবহেলা করতেন। উকিল ডাক্তাররা এইজন্য একসময় ভদ্রলোক বলে গণ্য হতেন না, কারণ তাঁরা নিছক জীবিকার জন্য বিদ্যার ব্যবসা করেন বলে। ভদ্রলোকের ইতিহাসে তাই চাকরিজীবীরাই সম্মান পেয়েছেন বেশি, স্বাধীন বৃত্তিজীবী ও ব্যবসারীরা তা পান নি। ডাক্তারদের মধ্যে সার্জেনরা হাতে অস্ত্র চালাতেন বলে, তাঁদের পরামাণিকের স্তরে ফেলা হত। পরে ডাক্তার উকিলের উপর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যবসার প্রতি বীতশ্রদ্ধা মধ্যযুগে সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল বণিকশ্রেণীর প্রতি। আজও এই ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যবসায়ী-শ্রেণীকে ভদ্রলোকভুক্ত করতে ভদ্রলোকেরা রাজি নন দেখা যায়। বড়বাজারের বিভিন্ন পট্টির কজন ব্যবসায়ীকে ভদ্রলোকরা স্বশ্রেণীভুক্ত করতে রাজি হবেন, বলা যায় না।

ভদ্রলোকদের এইজন্যই মনে হয় আলেয়ার মতন। বিচারের কোন মানদণ্ড দিয়েই ভদ্রলোক যাচাই করা যায় না। অর্থ নয়, কুল-

কৌলীন্য নয়, ব্যক্তিগত কৃতিত্ব নয়, সদাচার শিষ্টাচার নয়, ভদ্র পোশাক পরিচ্ছদ নয়, সুনীতি দুর্নীতি নয়। ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে সব কটি মানদণ্ডই পরস্পর-নির্ভর। একটি ছাড়া অন্যটির কোন মূল্য নেই। আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে মানুষের সমানাধিকারের যুগে ভদ্রলোকের মানদণ্ড বদলাচ্ছে ও বদলেছে। ক্রমেই ব্যক্তিগত গুণ কৃতিত্বই ভদ্রলোকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত হচ্ছে। কিন্তু তা হলেও, সেই বিত্তকৌলীন্য ও বংশকৌলীন্যের মধ্যযুগীয় প্রভাব আজও ভদ্রসমাজে খুব বেশি। তার চেয়েও মর্মান্তিক সত্য হল, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যুগেও ভদ্রলোকেরা তাঁদের টিপিক্যাল শ্রমবিমুখ মনোভাব ত্যাগ করতে পারেন নি। নিছক জীবিকার জন্যে, জীবনযাপনের গ্লানির ধিক্কারে, তাঁরা আজ কারখানার মজুরশ্রেণীর সঙ্গে পা-মিলিয়ে মিছিল করছেন। পরিবর্তনশীলতাকে মেনে নিতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের ব্যাক্তিগত আচরণ ও মনোভাব বিশেষ বদলায়নি। ভদ্রলোকত্ব বজায় রাখবার জন্য সপরিবারে তাঁরা আত্মহত্যা করবেন, তবু 'gainful employment' ছাড়া অন্য কোন কাজ সানন্দে করতে চাইবেন না, কিছুতেই মজুরের মেহনতের সমান মর্যাদা দেবেন না নিজেদের মেহনতের সঙ্গে। আর্থিক দুর্গতির চাপে ভদ্রলোকেরা আজ পরিবর্তনশীল, কিন্তু তাঁদের মনোভাব প্রায় স্থিতিশীল। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর বাঙালী সমাজের ভদ্রলোকদের মধ্যে মনোভাব আরও প্রকট হয়ে উঠেছে মনে হয়। জেন্টিলিটির বাহ্য paraphernalia পর্যন্ত দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এখানে তা আলোচনা করার অবকাশ নেই। নির্দয় সামাজিক শক্তির চাপে ভদ্রলোকেরা আজ পরিবর্তনশীল হলেও, যেসব ধারণার সমাবেশে ভদ্রলোকের বিকাশ হয়েছিল সমাজে, তার কোন পরিবর্তন আজও হয়নি। বহুকালের সংস্কারের মতন মনের মধ্যে আজও তার শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে। রাজনৈতিক হাওয়া-বদল যত তাড়াতাড়ি হয়, সংস্কার-সংস্কৃতির পরিবর্তন তত তাড়াতাড়ি হয় না। মানুষের সমাজে ভদ্রলোকদের তাই রাজনৈতিক বাহ্য পরিবর্তন হয়েছে, মানসিক সংস্কার ও সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন হবে না বা হতে পারে না, এমন কথা সমাজবিজ্ঞানীরা অন্তত বলবেন না। কিন্তু সেটা অনেক সময়সাপেক্ষ

ব্যাপার। আদিপ্রস্তর যুগের 'অসভ্য' মানুষের বহু সংস্কার আজও এই বিজ্ঞানের যুগে আমরা নিশ্চিন্তে বহন করে চলেছি। সেই হিসেবে ভদ্রলোকের সংস্কার কবে বদলাবে বলা যায় না

দিজ্জই কান্তা, খাই পুণবন্তা

ওগ্গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা
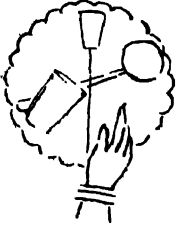
গাইক ঘিত্তা দুগ্ধসজুত্তা

মোইলি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা

দিজ্জই কান্তা, খাই পুণবন্তা।

ওগ্‌রা ভাত, রম্ভার পাত, গাইয়ের ঘি, দুগ্ধ সংযুক্ত—তার সঙ্গে মৌরলা (?) মাছ আর নালতে শাক, কান্তা দিচ্ছে আর পুণ্যবান খাচ্ছে। 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' নামে প্রাকৃত ভাষার ছন্দোগ্রন্থে প্রাকৃত-যুগের একটুক্রো ভোজন-চিত্র। বাঙালী মাত্রই চুক্‌চুক্ করবেন। কারণ গাইক ঘিত্তা বা মোইলি মচ্ছা কোনটাতেই আমাদের লোভ কম নয়। তার ওপর দিজ্জই কান্তার আলাদা আকর্ষণ তো আছেই। গাইক ঘিত্তার এখন পাত্তা পাওয়াই দায়। মোইলি মচ্ছা থাকলেও খুব সাচ্চা লোক ছাড়া কেউ তার কাছে ঘেঁষতে পারবেন না এবং আমাদের মতন লোক ঘেঁষলেই মচ্ছানীর (মেছুনীর) 'কচ্ছা' বা কেচ্ছা শুনে আসতে হবে। আছে কেবল রম্ভঅ পত্তা। কিন্তু শুধু শুধু রম্ভার পত্তা চেটে সুখ পাওয়া যায়

না। ওগ্‌গর ভত্তা যে লবণসজুত্তা খাবেন তারও উপায় নেই ('দুগ্ধসজুত্তা' স্বপ্নাতীত), কারণ ভত্তার মধ্যে প্রস্তরকংকরের (একসেরে আধপোয়া) এমন প্রচণ্ড 'গণ্থা' বা গাঁট্টা, যে ওগ্‌গর ভত্তা স্বর্ণকান্তি কান্তা-প্রদত্ত হলেও আপনি তা গলাধঃকরণ করার আগেই উগ্‌রে ফেলবেন। তাছাড়া, 'দিজ্জই কান্তার' যুগও অস্তাচলে। এখন কান্তারা অফিস-স্কুলের কর্মক্লান্তা এবং উদ্যত-নখদন্তা গদাধর রাঁধুনির যুগ। সুতরাং শোচনা বৃথা, অশোভনও। কান্তাদের সঙ্গে সঙ্গে 'পুণবন্তা'দের যুগও অস্ত যাচ্ছে। ভোজনক্ষেত্রে পাপিষ্ঠ নরাধমদের যুগ আসন্ন।

কথাটা তা নয়। খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে কান্তা দিচ্ছে আর পুণ্যবান খাচ্ছে কি-না সেটা বড় কথা নয়। একেবারে উড়িয়ে দেবার মতনও কথা নয় অবশ্য, কারণ কুদর্শন উগ্রমূর্তি কোন কান্তা খেতে দিলে যতটা পরিমাণে খাওয়া যায় এবং খেয়ে যেরকম তৃপ্তি পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি তৃপ্তি পাওয়া যায় সুদর্শন কমনীয় মূর্তি কান্তার পরিবেশনে এবং দেখা গেছে যে, পরিমাণেও অনেক বেশি খাওয়া যায়। খাওয়ার সঙ্গে দেওয়ারও যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, সেকথা সহজে ভোলা যায় না। কি করে ভুলব? বাস্তবক্ষেত্রে দেখেছি, সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ নয় শুধু, একেবারে অঙ্গাঙ্গী। সামান্য 'চা'-য়ের কথাই বলি। বন্ধুপত্নী বা বন্ধুভগ্নী মুখ 'বেজার' করে জিজ্ঞাসা করলেন: 'চা খাবেন না-কি?' নাকীসুরে ঐ 'খাবেন না-কি' বলার ভঙ্গি দেখেই চা'য়ের তৃষ্ণা আপনার মিটে যাবে, পান করার প্রবৃত্তি হবে না। চা-চাতক হয়েও আপনি বলতে বাধ্য হবেন: 'ধন্যবাদ! এইমাত্র খেয়ে আসছি, আর দরকার নেই।' কিন্তু আকণ্ঠ চা পান করে এসেছেন, একচুমুকও আর পান করতে চান না। এমন অবস্থাতেও মালবিকা দেবী যদি বলেন: 'বসুন, একটু চা' করে আনি' এবং 'এক্ষুণি আসছি' বলে হাসিমুখে সলজ্জ ভঙ্গিতে যদি উঠে চলে যান, তাহলে আকণ্ঠ পান করা সত্ত্বেও চা'য়ের তৃষ্ণায় আপনার কণ্ঠ পর্যন্ত শুকিয়ে উঠবে, এক কাপ কেন, আপনি এক পট চা'ও অনায়াসে খেয়ে ফেলবেন। সুতরাং দেওয়ার সঙ্গে খাওয়ার সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না কিছুতে।

শুধু 'দিজ্জই কান্তা' নয়, কি ভঙ্গিতে, কি মূর্তিতে ও মেজাজে 'দিজ্জই', সেটাও খাওয়া সম্পর্কে অত্যন্ত সিরিয়াস্‌লি ভাববার কথা। স্বচক্ষে দেখেছি, কান্তা-বিশেষে আহারের তারতম্য হয়, পরিমাণে ও পরিতৃপ্তিতে। কেন হয়, বৈজ্ঞানিকেরা ব্যাখ্যা করতে পারবেন, আমি পারব না। মনে হয়, খাদ্যগ্রন্থির ক্ষরণের সঙ্গে কান্তার পরিবেশনের সম্পর্ক আছে। আধুনিক 'গ্যাস্ট্রিক ট্রাবলে'র অন্যতম কারণ বোধ হয় কান্তা-স্পর্শশূন্য ভোজন। অনেক সময় খাবার না খেলেও কোন উত্তম খাদ্যের সুগন্ধে, অথবা মুখরোচক কোন খাদ্যের কথা মনে হলেও জিবে জল দেখা যায়। এই জিবের জল লালাগ্রন্থির রস ছাড়া কিছু নয়। তেমনি মিষ্টি কণ্ঠস্বর শুনলে, পরিবেশনকালীন আন্তরিক ভঙ্গিমাদি দেখলে, 'দিজ্জই কান্তা'র প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হয় 'পুণবন্তা'র দুইদিকের চোয়ালস্থ প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড এবং জিহ্বার 'সাব্-ম্যাক্সিলারি' ও 'সাব্-লিংগুয়াল' গ্ল্যাণ্ডের উপর। তার ফলে এই সব গ্ল্যাণ্ড থেকে অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ হতে থাকে এবং কান্তার দেওয়ার গুণে পুণবন্তা অনেক বেশি খেয়ে ফেলেন। ছেলেবেলায় যে কোন কারণেই হোক, ভুট্টা আর খোট্টার উপর আমার বিজাতীয় অনাসক্তি ছিল। তখন বোধ হয় বছর সাত-আট বয়স হবে। একদিন আমার ক্রীড়া-সঙ্গিনী দুটি ভুট্টা এক পয়সায় কিনে এনে একটি আমাকে হাসিমুখে উপহার দিয়েছিল খেতে। জীবনে সেই আমার প্রথম ভুট্টা খাওয়া এবং শেষও। বড় হয়ে প্রাদেশিকতা বর্জন করেছি। কিন্তু আজও সেই ভুট্টার স্বাদ মনে হয় যেন জিবে লেগে রয়েছে। প্রত্যেকটি ভুট্টার দানা তখন মনে হয়েছিল মিছরির দানা। অতিশয়োক্তি নয়, স্বীকারোক্তি। আর এখন? ঘোলাটে জলের অনেক বন্যা বয়ে গেছে জীবনগঙ্গায়, অনেক জোয়ার, অনেক ভাটার জল। তাই এখন মিছরির দানা মনে হয় যেন স্বাদগন্ধরসকষহীন ভুট্টার দানা। তবু কান্তার মিষ্টিকথায় এখনও যে কাঁকর-জর্জরিত নিয়ন্ত্রিত-চাল দুমুঠো বেশি খাই না, এমন কথা বলতে পারি না। 'দিজ্জই কান্তা'র মাহাত্ম্য, প্রাকৃত ও বিকৃত, সব যুগেই সত্য।

যে-খাদ্য নিয়ে প্রধানত এই গদ্য-রচনা, সেই খাদ্যের কথা বলি। কারণ খাদ্য খেলে তবে কান্তার গুণগান করা সম্ভবপর। খাদ্য না থাকলে কান্তার

শুধু 'দিজ্জই কান্তা' নয়, কি ভঙ্গিতে, কি মূর্তিতে ও মেজাজে 'দিজ্জই', সেটাও খাওয়া সম্পর্কে অত্যন্ত সিরিয়াস্‌লি ভাববার কথা। স্বচক্ষে দেখেছি, কান্তা-বিশেষে আহারের তারতম্য হয়, পরিমাণে ও পরিতৃপ্তিতে। কেন হয়, বৈজ্ঞানিকেরা ব্যাখ্যা করতে পারবেন, আমি পারব না। মনে হয়, খাদ্যগ্রন্থির ক্ষরণের সঙ্গে কান্তার পরিবেশনের সম্পর্ক আছে। আধুনিক 'গ্যাস্ট্রিক ট্রাবলে'র অন্যতম কারণ বোধ হয় কান্তা-স্পর্শশূন্য ভোজন। অনেক সময় খাবার না খেলেও কোন উত্তম খাদ্যের সুগন্ধে, অথবা মুখরোচক কোন খাদ্যের কথা মনে হলেও জিবে জল দেখা যায়। এই জিবের জল লালাগ্রন্থির রস ছাড়া কিছু নয়। তেমনি মিষ্টি কণ্ঠস্বর শুনলে, পরিবেশনকালীন আন্তরিক ভঙ্গিমাদি দেখলে, 'দিজ্জই কান্তা'র প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হয় 'পুণবন্তা'র দুইদিকের চোয়ালস্থ প্যারোটিড গ্ল্যাণ্ড এবং জিহ্বার 'সাব্‌-ম্যাক্সিলারি' ও 'সাব্‌-লিংগুয়াল' গ্ল্যাণ্ডের উপর। তার ফলে এই সব গ্ল্যাণ্ড থেকে অতিরিক্ত লালা নিঃসরণ হতে থাকে এবং কান্তার দেওয়ার গুণে পুণবন্তা অনেক বেশি খেয়ে ফেলেন। ছেলেবেলায় যে কোন কারণেই হোক, ভুট্টা আর খোট্টার উপর আমার বিজাতীয় অনাসক্তি ছিল। তখন বোধ হয় বছর সাত-আট বয়স হবে। একদিন আমার ক্রীড়া-সঙ্গিনী দুটি ভুট্টা এক পয়সায় কিনে এনে একটি আমাকে হাসিমুখে উপহার দিয়েছিল খেতে। জীবনে সেই আমার প্রথম ভুট্টা খাওয়া এবং শেষও। বড় হয়ে প্রাদেশিকতা বর্জন করেছি। কিন্তু আজও সেই ভুট্টার স্বাদ মনে হয় যেন জিবে লেগে রয়েছে। প্রত্যেকটি ভুট্টার দানা তখন মনে হয়েছিল মিছরির দানা। অতিশয়োক্তি নয়, স্বীকারোক্তি। আর এখন ? ঘোলাটে জলের অনেক বন্যা বয়ে গেছে জীবনগঙ্গায়, অনেক জোয়ার, অনেক ভাটার জল। তাই এখন মিছরির দানা মনে হয় যেন স্বাদগন্ধরসকষহীন ভুট্টার দানা। তবু কান্তার মিষ্টিকথায় এখনও যে কাঁকর-জর্জরিত নিয়ন্ত্রিত-চাল দুমুঠো বেশি খাই না, এমন কথা বলতে পারি না। 'দিজ্জই কান্তা'র মাহাত্ম্য, প্রাকৃত ও বিকৃত, সব যুগেই সত্য।

যে-খাদ্য নিয়ে প্রধানত এই গদ্য-রচনা, সেই খাদ্যের কথা বলি। কারণ খাদ্য খেলে তবে কান্তার গুণগান করা সম্ভবপর। খাদ্য না থাকলে কান্তার

একক্রান্তিও মূল্য নেই। খাদ্যপ্রসঙ্গে প্রথমেই মনে হয়ঃ যুগে যুগে সব বদলায়, কিন্তু জিব বদলায় কি? সব বদলালে, জিব বদলাবে না কেন? জিবও বদলায়। সরীসৃপের জিব আর মানুষের জিব এক নয়। কিন্তু কুকুরের জিবের সঙ্গে আমাদের জিবের পার্থক্য কোথায়? একমাত্র পার্থক্য, আমরা হাঁ করে জিব বার করে থাকি না। একেবারেই যে থাকি না, তা নয়। কেউ কেউ থাকেন, এবং তাঁদের ব্রেন আর কুকুরের ব্রেনে পার্থক্য খুব বেশি নেই। হঠাৎ দেখলে মনে হবে ওরাংওটাং শিম্পাঞ্জী গরিলা বা বনমানুষের সঙ্গে মানুষের জিবের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, সামান্য আকার ও রঙের পার্থক্য ছাড়া। কিন্তু জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের জিবও শ্রেষ্ঠ জিব। শুধু জিব নয়, জিব দাঁত সব। আমাদের পূর্বপুরুষদের মতন আজ আর আমাদের সঙ্গীনোদ্যত ছেদকদন্ত নেই। পেষকদন্তও অনেক ছোট ও ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। দাঁতের সঙ্গে চিবুক ও চোয়ালের যোগাযোগ আছে এবং তার সঙ্গে ব্রেনের। সুতরাং যুগে যুগে দাঁতের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিবুক ও চোয়ালের পরিবর্তন হয়েছে এবং তার ফলে গোটা মুখমণ্ডলের রূপান্তর ঘটেছে। এ সবই কিন্তু হয়েছে খাদ্যের জন্য। খাদ্য-সংগ্রহ এবং খাদ্য-ভোজন—প্রধানত এই দুই ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় আমরা বনমানুষ থেকে মানুষ হয়েছি এবং বর্বর মানুষ থেকে সভ্য মানুষ হয়েছি। পরিবর্তনের ধারাটা এইঃ

খাদ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা = সামনের দু-পায়ের মুক্তি, হাতের জন্ম
খাদ্য সংগ্রহের চিন্তা = মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও রূপান্তর
খাদ্যভোজন = দাঁত চোয়াল ও চিবুকের পরিবর্তন
খাদ্যরন্ধন = ছেদক ও অন্যান্য দাঁতের পরিবর্তন
চর্বণাল্পতা = পেষক ও চোয়ালের পরিবর্তন
চোষণ ও লেহনের অল্পতা = জিবের পরিবর্তন
চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় ভোজের রূপান্তর (রন্ধনের ফলে)
= দাঁত ও চোয়ালের পরিবর্তনের ফলে
মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যবৃদ্ধি।

সুতরাং, আমরা যে প্রধানত ভোজন করেই সভ্যমানুষ হয়েছি, তাতে

কোন সন্দেহ নেই। যদি ভোজন না করতাম এবং রন্ধনের ফলে ভোজ্যবস্তুর পরিবর্তন না হত, তাহলে আমাদের সুন্দর মুখের বিকাশ হত না এবং সুন্দর মুখের জয়ও হত না সর্বত্র। কথাটা পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের আরও বিশেষ করে মনে রাখা উচিত।

পুরুষের মুখমণ্ডল নিজের পছন্দমত বদলাবার জন্য নয়, ভোজন ও ভোজ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবার জন্য। অবশ্য পুরুষের সুন্দর মুখের জন্য নিছক এক্সপেরিমেণ্ট হিসেবে মেয়েরা বিশেষ 'ডায়েট' প্রয়োগ করে দেখতে পারেন। অত্যন্ত ভারি চোয়াল ও অগ্র-ভাগোন্নত চিবুক যেসব পুরুষের আছে, দেখলেই মনে হয় আদিম পিথিক্যানথ্রোপাসের সহোদর ভাই, তাঁদের জন্য যদি শুধু স্টিম-বয়েল্ড শাকসবজি ভোজ্যের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে হয়ত ক্রমে ভাল হতে পারে। লেহন ও চোষণের মাত্রা বাড়িয়ে চর্বণের মাত্রা তাঁদের বিশেষ-ভাবে কমিয়ে দেওয়া উচিত। তাতে চোয়াল ক্রমে চুপ্‌সে যেতে পারে এবং চিবুকও ক্রমে পশ্চাদপসরণ করে নাসাগ্রের ভার্টিক্যাল রেখার উপর সরে আসতে পারে। ভারি চোয়াল যেমন কাম্য নয়, দেখলেই চোয়াড় চোয়াড় মনে হয়, তেমনি প্রজেকটিং চিবুকও সুন্দর নয়, দেখলেই কেমন শুয়োর শুয়োর ধারণা হয়। ভারি চোয়াল যাঁদের আছে তাঁদের মাংসভোজন করা উচিত নয়, এমন কি ছোলা-মটরভাজা বা চিনেবাদাম পর্যন্ত নয়, কেবল পল্‌তার ঝোল, শুক্‌তো, আলুসেদ্ধ, শাকসবজিসেদ্ধ এবং একটু মাখন খাওয়া উচিত। রুগ্ন হলে দুগ্ধপান করা চলতে পারে, কিন্তু দুগ্ধজাত কড়াপাকের সন্দেশ সম্ভব হলে বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। যেসব পুরুষের মেয়েলী ধরনের চেহারা, মুখটা কতকটা মুরগীর ডিমের মতন, কথাবার্তা ভাবভঙ্গি পর্যন্ত মেয়েলী ঢঙের হয়ে গেছে, মাংসই তাঁদের প্রধান ডায়েট হওয়া উচিত। মাংস মানে আধুনিক কায়দায় মাংসের শুক্‌তো বা 'স্টু' নয়, শিকে ঝল্‌সানো আধকাঁচা মাংস। ছেলেবেলা থেকে যাঁরা খুব বেশি মাত্রায় চুষেছেন ও চেটেছেন এবং চিবিয়েছেন খুব কম, তাঁরাই শেষপর্যন্ত রমণীয় রূপ ধারণ করেন। একটু লক্ষ্য করে দেখবেন, মেয়েলী-ধরনের পুরুষরাই বুড়ো-খোকার মতন আঙুল চুষে থাকেন এবং চোষার মতন

কিছু একটা দেখলেই চুক্-চুক্ করেন। নানারকমের পদার্থ চুষেই শেষপর্যন্ত তাঁদের জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যায়। অর্থাৎ জীবনেও তাঁরা কলা চোষেন। যে সব পুরুষ রমণীতুল্য তাঁদের চোষ্য ভোজ্য একেবারে বর্জন করা উচিত, কান্তা দিলেও খাওয়া (অর্থাৎ চোষা) উচিত নয়। তাঁদের একমাত্র ভোজ্য হওয়া উচিত চর্ব্য পদার্থ, চোষ্য নয়, লেহ্যও নয়। চর্বণ-সাপেক্ষ খাদ্য যত বেশি তাঁরা খাবেন ততই মঙ্গল। মাংস তো খাবেনই, এবং সম্ভব হলে কচিপাঁঠা ছাড়া আরও অন্যান্য জানোয়ারের মাংস খাওয়া উচিত। মাংসের বদলে হাড় চিবুতে পারলে আরও ভাল হয়। পেষকের রীতিমত ব্যায়াম প্রয়োজন। তাহলে চোয়াল ক্রমশ চওড়া হবে এবং ডিম্বাকৃতি মুখের মধ্যভাগ হরাইজন্টালি বিস্ফারিত হয়ে লুপ্ত পৌরুষ পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে। মাংস ভোজনের সামর্থ্য না থাকলে কাঁচা পেয়ারা খাবেন, ঝুনো নারকোল খাবেন, ছোলা-মটরভাজা যতখুশি খাবেন, কিন্তু ভুলেও যেন চুষবেন না। তাহলেই পেষকের দৌলতে আবার পৌরুষ হয়ত ফিরে পেতে পারেন।

খাদ্যের জন্য মুখমণ্ডলের রূপ যদি বদলাতে পারে, তাহলে জিব বদলাবে না কেন? যুগে যুগে জিবও বদলায়। দেহতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন যে, কতকগুলো পেশী এবং তার উপরে ঝিল্লীর আবরণ দিয়ে মানুষের জিব তৈরি। উপরের এই ঝিল্লীর মধ্যে স্বাদেন্দ্রিয় থাকে। শুধু তাই নয়, কতকগুলি ছোট ছোট স্বাদকোরকও তার মধ্যে থাকে, ইংরেজীতে 'টেস্টবাড' বলে। কোন খাদ্য লালায় লালায়িত হলে এই সব কোরকের স্নায়ুতন্তু স্বাদ-অনুভূতিকে স্বাদকেন্দ্রে বহন করে নিয়ে যায়। তখন আমরা টক-মিষ্টি-কষার আস্বাদবোধ করতে পারি। স্বাদকোরকগুলি জিবের উপর ছড়িয়ে থাকে, তার ফলে জিবের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের স্বাদ অনুভূত হয়। জিবের দুইপাশের কোরক দিয়ে টক, পিছনের কোরক দিয়ে তেতো, কটু ও কষা, ডগা দিয়ে মিষ্টি এবং উপর দিয়ে নোন্‌তা আস্বাদ পাওয়া যায়। খাদ্যপ্রসঙ্গে সামান্য এই জিব-তত্ত্বটুকু (জীবতত্ত্ব নয়) জানা প্রয়োজন, এবং তার জন্য জীবতত্ত্ববিদ্ হবার প্রয়োজন নেই। জিবতত্ত্বের সারকথা হল এই:

জিবের তুইপাশ = টক
জিবের পিছন = তেতো, কটু ও কষা
জিবের ডগা = মিষ্টি
জিবের উপর = নোন্‌তা

এই জিবতত্ত্বের সঙ্গে পূর্বকথিত দন্ততত্ত্বের মোদ্দাকথাটা মনে রাখলে, একনিমেষে খাদ্যতত্ত্বের মহিমা প্রকট হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়। বর্তমান খাদ্যসঙ্কটের (বিশেষ করে বাঙালীর) আসল বৈকট্য যে কোথায়, তাও সহজে বোধগম্য হবে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হবে যে খাদ্যসঙ্কট শুধু কি খাদ্যের সংকট, তা ভোজনকলাকৈবল্য ?

জিবতত্ত্ব অনুযায়ী যাঁরা বেশি টক খান তাঁদের জিবের তুটি পাশ ট'কে যায়, অর্থাৎ অম্লাস্বাদনে অসাড় হয়ে যায়। যাঁরা তেতো ও কষা জিনিস খান বেশি, অর্থাৎ চিররুগ্ন তাঁদের জিবের পিছনদিকের কোন সাড় থাকে না। যাঁরা কেবল মিষ্টি খান, তাঁদের জিবের ডগায় কোন মিষ্টতাবোধ থাকে না। ঝাল-নোন্‌তা বেশি খান যাঁরা, তাঁদের জিবের উপরটা উকোর মতন খরখরে হয়ে যায়। জিবতত্ত্বের এই সূত্রটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে দেখা যায় : রাঢ়দেশের (বীরভূম, বাঁকুড়া বর্ধমান ইত্যাদি) লোকের জিবের তুপাশের বিশেষ কোন সাড় নেই, ঝোলে ডালে অম্বলে কেবল টক খেয়ে মেয়ে তাঁদের জিবের তুটি পাশ একেবাকে ট'কে গেছে। এই অতিরিক্ত টক খাওয়ার ফলে তাঁদের ভাষার মধ্যেও কেমন টক-টক ভাব এসেছে। অতিথি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কও রাঢ়দেশে মিষ্টিমধুর নয় অম্লমধুর। অবশ্য সম্পর্কের ব্যাপারে, মিষ্টিমধুর না অম্লমধুর, কোন্‌টির স্বাদ ভাল বলা কঠিন। সুতরাং সে-কথা না তোলাই ভাল। মনে হয় পোন্ড্রবর্ধনের লোকের মিষ্টিপ্রিয়তা খুব বেশি। নানারকমের মিষ্টান্ন তো আছেই, রান্নাবান্নাতেও মিষ্টির আধিক্য। প্রকৃত বঙ্গদেশীয় যাঁরা—তাঁরা ঝাল ও মুন একটু বেশি খান এবং তার ফলে জিবের উপরটা তাঁদের খর্‌খরে হয়ে যায়। পূর্ববঙ্গের অনেক জেলার ভাষাতে পর্যন্ত এই খরজিহ্বার প্রভাব খুব বেশি, যেমন বরিশালের।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এক বাংলাদেশেই (ভারতবর্ষে তো রীতিমত আছে) ভোজনকলার বিভিন্ন 'কালচার-জোন' আছে এবং প্রত্যেক 'জোনে'র লোকের জিবেরও একটা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে। রাঢ়ের লোকের জিবের দুটি পাশ অসাড় এবং তার টেস্টবাডগুলি বেশ পরিপুষ্ট। পৌণ্ড্রবর্ধনের লোকের জিবের ডগায় কোন সাড় নেই এবং নেই বলেই বোধ হয় তাদের স্বভাবচরিত্রে মহাপ্রভুভাব খুব বেশি, অর্থাৎ কথায় কথায় লজ্জা পেয়ে তাঁরা জিব বার করে থাকেন। প্রকৃত বঙ্গদেশের জিব বেশ খরখরে, জকার-ধ্বনি ও ঝগড়ার ঝঙ্কারের মধ্যে তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ভোজনকলার বিশিষ্টতার জন্য জিবের আঞ্চলিক বিকাশ তো হয়ই, দাঁত ও চোয়ালের বিশেষ ব্যবহারের জন্য মুখমণ্ডলের গড়নের উপরও তার প্রভাব পড়ে। মিষ্টান্ন ফলাহার ঘি দুধ ইত্যাদির পক্ষপাতী যাঁরা, তাঁদের নধরকান্তি চেহারার মধ্যেই তার সুস্পষ্ট ছাপ থাকে। গায়ের চামড়াটি দুধের সরের মতন তেল-চুক্‌চুকে হয়ে যায়, ভুঁড়িটি নেয়াপাতি ডাবের মতন। মাংসাশী যাঁরা তাঁরা সাধারণত বিস্ফারিত-চিবুক, উন্নত-চোয়াল ও রুক্ষমূর্তি। দেখলেই বোঝা যায়, জানোয়ারের হাড় ও হাড়ের গাঁট-চিবানো মুখ, দুধ কলা ও ননীর ধার তারা ধারেন না। সুতরাং ভোজন ও ভোজনকলা নগণ্য নয়, বহুদূর বিস্তৃত তার প্রভাব। সামান্য জিবের জন্য একটা জাত পর্যন্ত বদলে যেতে পারে।

ভোজনকলার যে কালচার-জোনের কথা বলেছি, কতকটা তাই নিয়ে কবিয়াল ভোলা ময়রার একটি ছড়া আছে। ছড়াটি এই ঃ

ময়মনসিংহের মুগ ভালো, খুলনার ভাল খই,
ঢাকার ভাল পাতক্ষীর, বাঁকুড়ার ভাল দই।
কৃষ্ণনগরের ময়রা ভাল, মালদহের ভাল আম,
উলোর ভাল বাঁদর পুরুষ, মুর্শিদাবাদের জাম।
হুগলীর ভাল কোটাল লেঠেল, বীরভূমের ভাল ঘোল,
ঢাকের বাদ্য থামলেই ভাল, হরি হরি বোল্।

ছড়াটি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না এবং যা পাওয়া যায় তাতে ভোজন-কালচারের আঞ্চলিক বিশেষত্বেরও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় নেই। মোটামুটি একটা

নির্দেশ আছে মাত্র। যেমন, বাঁকুড়ার দই, বীরভূমের ঘোল যে ভাল তাতে সন্দেহ নেই। ভোলা ময়রার মুখে ঘোল খেয়ে বলছি না, নিজের মুখে আকণ্ঠ খেয়ে বলছি। কিন্তু বীরভূম, বাঁকুড়া—তথা রাঢ়দেশের পোস্ত, কলাই-এর ডাল, মাছের টকের স্বাদ যাঁরা পান নি, তাঁরা রাঢ়ের ভোজন-কলা সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ বলতে হবে। রাঢ়ের প্রায় সর্বত্র ঘুরেছি, গ্রামের সাধারণ গরীব গৃহস্থের বাড়ি থেকে ধনী জমিদারগৃহে পর্যন্ত ভোজন করেছি—সর্বত্রই প্রধান উপকরণ ঐ পোস্ত, কলাই আর মাছের টক্। নিজে পূর্ববঙ্গের লোক, গোড়ারদিকে বেশ অসুবিধে হয়েছে, অপদস্থও হয়েছি। একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত গৃহে (বীরভূমে) খেতে বসেছি, যথেষ্ট আয়োজনও তাঁরা করেছেন। পোস্তর একাধিক মেনু শেষ করছি (কলাই ডালসহ) আর মাছের বাটির দিকে তাক্ করে আছি। খণ্ড খণ্ড মাছের টুকরো, গাঢ় গায়েমাখা ঝোল। মাছের টুক্‌রোর সাইজ আধইঞ্চির বেশি নয়। ভাবছি বিজয় গুপ্তের কথা: 'ডুম ডুম করিয়া ছেচিয়া দিল চৈ, ছাল খসাইয়া রান্ধে বাইন-মৎস্যের কৈ।' বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে অনেকটা ভাত মেখে নিয়ে মুখে দিতেই জিবটা ট'কে গেল। প্রস্তুত ছিলাম না। অপ্রস্তুত হয়ে ভাত সরিয়ে রেখে ঘোল খেয়ে উঠে পড়তে হল। এরকম আর দ্বিতীয়বার হয়নি। জয়দেব-কেঁদুলির মেলায় শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের গৃহেও ভোজন করেছি, কলাই পোস্তর গল্পও শুনেছি। বৃদ্ধবয়সে তাঁর অন্য-কিছুর প্রতি আসক্তি না থাকলেও, পোস্ত না হলে তাঁর একদিনও চলে না। রুটি লুচির সঙ্গেও পোস্ত প্রয়োজন। খাঁটি রাঢ়ের ভোজন।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে সেকালের ভোজন ও রন্ধনকলার বিস্তৃত বর্ণনা যেরকম পাওয়া যায় এরকম আর অন্য কোন সাহিত্যে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তার মধ্যে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বিশেষত্বেরও অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গের বিজয় গুপ্ত নানারকম আমিষ নিরামিষ ব্যঞ্জনের বর্ণনা করেছেন, যেমন—'নারিকেল-কোরা দিয়ে রান্ধে মশুরীর সূপ', 'কলার থোড় রান্ধিতে বাটিয়া দিল রাই', 'সরিষাবাটা দিয়ে রান্ধে

পানীকচুর চৈ', 'মরিচের ঝাল দিয়ে রান্ধে বটবটী", 'শুক্তাপাতা দিয়ে রান্ধে কলাইয়ের ডাল' ইত্যাদি নিরামিষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মাছ মাংসের মধ্যে—'রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলতার আগ', 'মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাছ গাছ', 'ভিতরে মরিচ গুঁড়া বাহিরে জড়ায় সুতা, তৈলে পাক করি রান্ধে চিঙড়ীর মাথা', 'ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল', 'মাংসেতে দিবার জন্য ভাজে নারিকেল, ছাল খসাইয়া রাঁধে বুড়া খাসীর তেল', 'ছাগ মাংস কলার মূলে অতি অনুপম' ইত্যাদি ফর্মুলা আধুনিকেরা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, যদি অবসর পান।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম পশ্চিমবঙ্গের লোক। খুল্লনার রান্নার মধ্যে রাঢ়ের বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু তা সহজে বোঝা যায় না, কারণ নিরামিষ ব্যঞ্জন বাংলাদেশে সর্বত্র প্রায় সমান। তবু দু-একটির কথা উল্লেখ করছি, যেমন—'ঘৃতে ভাজা পলা কড়ি, উনটা শাকে ফুলবড়ি', 'দুধে লাউ দিয়া খণ্ড, জ্বাল দিল দুই দণ্ড', 'মুগসূপে ইক্ষুরস', ইত্যাদি। মাছের মধ্যে চিতলের কোলভাজা, 'মান বড়ি মরিচে ভূষিত' রোহিত মৎস্যের ঝোল আছে এবং তার সঙ্গে 'রাঁধিত পাঁকল ঝস দিয়া তেঁতুলের রস'ও আছে। বিশেষ যে পার্থক্য আছে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তা মনে হয় না। তার একটা প্রধান কারণ হল, ইতিমধ্যে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে বাংলাদেশে ভোজনকলার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটছিল। আমিষভোজী বাঙালীর মধ্যে নিরামিষভোজনের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছিল এবং প্রচারের ফলে মধ্যবিত্ত ও ধনী বাঙালী সমাজে ভোজনের পরিবর্তনও হচ্ছিল ধীরে ধীরে। সাধারণ বাঙালী অবশ্য তখনকার মতন এখনও নিরামিষের প্রভাবমুক্ত। তান্ত্রিক ধর্মের পীঠস্থান রাঢ়ের কবিরাও নিরামিষের বৈষ্ণব প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, দাসীকে দিয়ে যেভাবে শাক সংগ্রহ করিয়েছেন—

নটে রাঙ্গা তোলে শাক পালঙ্গ নালিতা,
তিক্ত ফলতার শাক কলতা পলতা।
সাঁজতা বনতা বন পুঁই ভদ্র পলা,
হিঞ্জলী কলমী শাক জাঙ্গী ডাঁড়ি পলা।

নটিয়া বেথুয়া তোলে ফিরে ক্ষেতে ক্ষেতে,
মহুরী শূলকা ধন্যা ক্ষীর পাই বেতে।
ডগি ডগি তোলে যত সরিষার আড়া—ইত্যাদি

তাতে মনে হয় তিনি চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে বসেও শ্রীচৈতন্যের প্রভাব বর্জন করতে পারেন নি। বৃন্দাবন দাস 'শ্রীশাক ব্যঞ্জনে' গৌরচন্দ্রের তৃপ্তির কথা উল্লেখ করে শাকের সৌভাগ্য বর্ণনা করেছেন। হেলঞ্চাসালঞ্চায় ভক্তের 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি'র (আধ্যাত্মিক অর্থে, লৌকিক অর্থে নয়) কথাও তিনি বলেছেন। লৌকিক অর্থে, কেবল শাকব্যঞ্জন ভোজনে 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি' অবশ্য সব সময় ঘটতে পারে, কিন্তু শাকমাহাত্ম্যের সঙ্গে কৃষ্ণমাহাত্ম্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক কতটা আছে না-আছে তা কেবল শাক-জীবী ও শাকপন্থীরাই বলতে পারেন।

একটা কথা অবশ্য মনে হয়। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ উভয়েরই লীলাভূমি কাটোয়া থেকে বেশি দূর নয়। কাটোয়ার ডাঁটাই কি তাঁদের প্রগাঢ় শাকপ্রীতির কারণ? তাছাড়া কেশব ভারতীও ঐ অঞ্চলের লোক এবং শ্রীচৈতন্য তাঁর কাছে কাটোয়ায় সন্ন্যাস-দীক্ষা নিয়েছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনদিন অনাহারে থেকে তিনি গঙ্গা পার হয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে যা আহার করলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—নানারকমের 'বাস্তুক শাক', 'পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি', 'মান কচু', 'কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্তকী', 'পটোল ফুল বড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী', 'মোচাঘণ্ট', 'দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড', 'মধুরাম্ল, বড় অম্ল, অম্ল পাঁচ ছয়', 'মুদ্গ বড়া, মাষ বড়া, কলা বড়া মিষ্ট' ইত্যাদি ইত্যাদি। নিরামিষ আহার শেষ হবার পরে খেলেন—'ক্ষীর পুলি নারিকেল পুলি পিঠা ইষ্ট', 'সঘৃত পায়স মৃৎ- কুণ্ডিকা ভরিয়া', 'তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ' 'দুগ্ধ চিড়া, দুগ্ধ লকলকি, চাঁপাকলা দধি সন্দেশ' ইত্যাদি। শ্রীক্ষেত্রে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে গৌরচন্দ্র একদিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং ভট্টাচার্য-গৃহিণী সযত্নে যে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন পাক করেছিলেন তা সবই নিরামিষ। তার মধ্যে 'দশবিধ শাক', 'দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড, বেশারী নাফরা, মোচা ঘণ্ট, মোচা ভাজা, বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড নব নিম্বপত্র সহ ভ্রষ্ট বার্ত্তকী'

প্রভৃতি সবই আছে। মিষ্টান্ন ও ফলাহারের অভাব নেই। এসব কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা। বৃন্দাবন দাসও 'বিংশতি প্রকার শাক, নানা প্রকার শর্করা সন্দেশ' ইত্যাদির কথা বলে অবশেষে লিখেছেন—

ঘর দুই চারি প্রভু দেখে চিপিটক
সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক।

পরিষ্কার বোঝা যায়, বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের যুগ থেকে বাঙালীর খাদ্যের একটা বৈপ্লবিক রূপান্তর হতে থাকে। মাছ মাংসাদি আমিষ ব্যঞ্জন থেকে নিরামিষের দিকে ঝোঁক পড়ে বেশি। শ্রীচৈতন্যের যুগকে আমরা আমিষ-কালচার থেকে নিরামিষ-কালচারে রূপান্তরের যুগ বলতে পারি। নিরামিষ ভোজনের করোলারি' রূপে ফলাহার ও মিষ্টান্নের বৈচিত্র্যও এই সময় দেখা দেয়। শাক মানকচু কুষ্মাণ্ড এমন কি বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ডপ্রীতির সঙ্গে নারকোল সন্দেশ, পুলিপিঠা পায়স ও চিপিটক-কদলকানুরাগও বৈষ্ণব গোস্বামীদের গভীর হয়ে ওঠে। 'পীত ঘৃতসিক্ত অন্নস্তূপই' তখন রেওয়াজ ছিল, ঘি'য়ে ভাজা লুচির কথা শোনা যায়নি। বৈষ্ণব মহোৎসবই প্রধানত বাঙালীর নিরামিষ ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নকে বৈচিত্র্যে ও মনোহারিত্বে চারুকলার স্তরে উন্নত করে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের এও একটা উল্লেখ-যোগ্য দান। মনে হয়, এও যেন ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটা রূপ। বাংলাদেশ প্রাগার্য সংস্কৃতি-প্রধান দেশ, শক্তি পূজা, তান্ত্রিক আচার ব্যবহার বাঙালী জাতির মজ্জাগত। মাংসই বাংলার দেবদেবীর প্রিয়তম খাদ্য, বাঙালীরও। ইসলামের অভিযানের পর বিশেষ করে, মাংসের প্রাধান্য আরও বাড়তে থাকে এবং রীতিমত মাংস ভোজনের একটা হিড়িক আসে। চৈতন্য চরিতকাররা সকলেই প্রায় 'মদ্য মাংস' ভোজনপ্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। তাই মনে হয়, শুধু হিংসা বা বলিদান নয়, ইসলাম ও তন্ত্র উভয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাঙালী বৈষ্ণবরা মিষ্টান্ন, ফলাহার ও নিরামিষ ব্যঞ্জনবিলাসের প্রবর্তন করেছেন। নারকোলের নাড়ু, চিঁড়ের নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, সরের নাড়ু প্রভৃতি নানারকমের নাড়ু তৈরি করে যেন তাঁরা বাংলার জনসাধারণের মন

ভুলোনোর চেষ্টা, করেছেন। বাঙালীর মিষ্টান্নের তাই এত বাহার, এত বৈচিত্র্য! অনুপম শিল্পকলার পর্যায়ে তাই তার চূড়ান্ত বিকাশ সম্ভব হয়েছে। বাঙালীর নিরামিষ-ব্যঞ্জনও তাই শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়। বাংলাদেশে ভোজনকলাকে শিল্পকলার মর্যাদা দিয়েছেন প্রধানত বাঙালী বৈষ্ণবরা।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে মাছ মাংসের যুগ ছেড়ে আমরা চিপিটক-কদলক ও কচু-কুষ্মাণ্ডের যুগে পদার্পণ করেছি। শাক-কচুর প্রভাব যেমন চণ্ডীভক্ত হয়েও মুকুন্দরাম ছাড়তে পারেন নি, তেমনি রাঢ় দেশের 'ধর্মমঙ্গলে'র অন্যান্য কবিরাও মিষ্টান্ন বর্ণনার লোভ সামলাতে পারেন নি। ঘনরাম 'উড়ি চেলে গুঁড়ি কুটি সাজাইল পিঠা, ক্ষীর খণ্ড ছানা ননী পুর দিয়া মিঠা,' 'ঘৃতপক্ক লুচি', 'লাড়ু কলা চিনিফেণী', 'মজা মর্তমান মিছরি মনোহরা মতিচুর খাসামৃত' ইত্যাদির কথা বলেছেন। এমন কি, ভারতচন্দ্রের যুগে রীতমত বিলিতি খানা চালু হওয়া সত্ত্বেও 'আশিকা পিযুষী পুরী পুলি চুটী রুটী রাম রোট মুগের শ্যামুলী কলাবড়া ঘিওর পাপর ভাজা পুলী' 'সুধা রুচি মুচি মুচি লুচির' মরশুম শেষ হয়নি দেখা যায়।

বৈষ্ণব গোস্বামীরা বাঙালীর ভোজনকলাকে শিল্পকলার স্তরে নিয়ে গেছেন সত্যি, কিন্তু বাঙালী জাতিকে কেবল আর্টিস্টিক খাদ্য খাইয়ে দোদুল দে ও শিহরণ সেনের জাতিতেও পরিণত করেছেন। চিপিটক-কদলকের গুণগান বিদেশী সাহেবরাও করেছেন, খাদ্যগুণও তার অস্বীকার করা যায় না। মিষ্টান্ন যে শুধু মন হরণ করে তা নয়, বলও বৃদ্ধি করে। কিন্তু চিপিটক-কদলকের সঙ্গে যে দই চাই, যে ঘনাবর্ত দুগ্ধ চাই, তা কোথায় পাই? বাকি থাকে নিরামিষ ব্যঞ্জনবিলাস, বিবিধ শাক মোচা, কুষ্মাণ্ড মানকচু বড়ি ইত্যাদি। বৃন্দাবন দাস শাক-কচু-কুষ্মাণ্ডভোজনে 'কৃষ্ণ-প্রাপ্তি'র কথা বলেছেন। আধ্যাত্মিক অর্থে না হোক, লৌকিক অর্থে আমরা যে শাক-কচু-কুষ্মাণ্ডাহারের ফলে জাতিগতভাবে 'কেষ্ট পাচ্ছি', তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ কুষ্মাণ্ড-বিরোধী হলেও, শাক-কচুর বিরোধী নই। পাকা গিন্নীর রান্না হলে ভারতচন্দ্রের 'মুচি মুচি লুচি কতগুলি' ফেলে কচু খেতে হবে, এও স্বীকার

করি। কচু কিন্তু কচু ছাড়া কিছু নয়, কচুর আছে কি? শাকেই বা কি আছে? কাটোয়ার কবিরা যতই শাকের গুণগান করুন না কেন, দেহের হাড়ই যদি লিকলিকে কাঠি হয়ে যায়, তাহলে শাক খেয়ে লাভ কি? কাটোয়ার ডাঁটার তবু একটা ইউটিলিটি আছে, বেশ করে চিবুতে পারলে পেষকদন্তের ক্রিয়ায় চোয়াল ভারি হতে পারে এবং মেয়েলী ধরনের পুরুষের ডিম্বাকৃতি মুখমণ্ডলে পৌরুষের ভাব ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু শাক, তা সে যে শাকই হোক, ঘাসেরই সে মাসতুতো ভাই এবং ঘাস খেয়ে দুধ দিতে কোন মানুষই চায় না।

বাঙালী মাত্রই নিরামিষ ব্যঞ্জন ভালবাসেন এবং ঠাকুমা-পিসিমাদের যুগের নিরামিষ রান্না শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে আফসোস করেন। 'কোথায় গেল সেই মোচার ঘণ্ট আর এঁচোড়ের ডানলার যুগ' বলে অনেককে হাহুতাশ করতে দেখেছি। আমার কেবল মনে হয়, কোথায় গেল সেই বাঙালী মেয়েরা যারা—

কাউঠার রান্ধে মাংস তৈল ডিম্ব দিয়া,
তলিত করিয়া তুলে ঘৃতেতে ছাকিয়া॥
কৈতরের বাচ্ছা ভাজে. কাউঠার হাতা।
ভাজিছে খাসীর তৈলে দিয়া তেজপাতা॥
ধনিয়া সলুপা বাটি দারচিনি যত।
মৃগমাংস ঘৃত দিয়া ভাজিলেক কত॥
রান্ধিছে পাঁঠার মাংস দিয়া খর ঝাল।
পিঠালী বাটিয়া দিল মরিচ মিশাল॥

মনে হয় বলে এমন কথা অবশ্য আমি বলছি না যে তাঁরা যেখানেই যান ফিরে আসুন আবার সেই রান্নাঘরে এবং পাঁঠার মাংস 'খর ঝাল দিয়া' রান্না করে আমাদের খাওয়ান। 'দিজ্জই কান্তা খাই পুণবন্তা'র মতন আবার পরম তৃপ্তিতে খাই। না খেতে পেলেও অমন কথা বলব না। তার কারণ রান্নাঘরই মেয়েদের কারাগার এবং পৃথিবীর অর্ধেক মানবগোষ্ঠী ঐ রান্নাঘর-কারাগারে ক্রীতদাসের মতন বন্দী হয়ে থেকেছে। অতএব 'ডাউন উইথ রান্নাঘর!' আর 'ডাউন' না বলেই বা উপায় কি? কারণ

বিবাহের চেয়ে অনেক বড়

আমরা যারা 'সভ্য' মানুষ তারা নিজের জন্মদাতা 'বাবা'কে ছাড়া আর কাউকে 'বাবা' বলে ডাকতে রাজি নই। আধুনিক জামাইরা পর্যন্ত শাশুড়ীকে যত সহজে 'মা' বলে ডাকতে পারেন, নিশ্চয়ই তত সহজে শ্বশুরকে 'বাবা' বলতে পারেন না। নিজের বাবাকে ছাড়া অন্য কাউকে 'বাবা' বলে ডাকা যে কি ভয়ানক কঠিন ব্যাপার তা একটা চলতি প্রবাদ থেকেই বোঝা যায়, 'সাধে কি আর 'বাবা' বলি, গুঁতোর চোটে 'বাবা' বলি'। কিন্তু যাদের আমরা 'অসভ্য' বলতে অভ্যস্ত সেই আদিবাসীদের অনেকের মধ্যে 'বাবা' বলাটা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। এরকম আদি-বাসীদের মধ্যে গেলে আমরা আঁতকে উঠবো। মনে করুন, একদল আদিবাসীকে ডেকে একজনকে প্রশ্ন করা হল: 'এ তোমার কে হয়?' সে বলল 'বাবা'। তারপর তার পাশের ব্যক্তিটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হল ঐ একই প্রশ্ন, তাতেও সে জবাব দিলে 'বাবা' হয়। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, একজন লোকের দশজন বাবা তার সঙ্গেই উপস্থিত, আরও কতজন যে রয়েছে তার ঠিক নেই। এতে আমরা হয়ত দিশেহারা হয়ে যাব, কিন্তু নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা আবিষ্কারের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন। কারণ তাঁরা এই 'সম্বোধনে'র ভেতর দিয়ে সেই আদিম জাতির সমাজ ও সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট 'দিশে' পাবেন। এই 'আত্মীয়-সম্বোধন', ইংরেজীতে যাকে 'kinship terms' বলা হয়, নৃবিজ্ঞানীদের কাছে এটা অনুসন্ধানের মস্ত বড় কৌশল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, 'দিশে'টা তাঁরা কোথায় পেলেন, কি থেকে পেলেন এবং তা থেকে তাঁদের সামাজিক ব্যাপার অনুসন্ধানের সুযোগই বা কোথায়?

এইখানেই 'বিয়ে'র ব্যাপার আসে। প্রশ্ন ওঠে, গোড়া থেকেই কি মানুষ

আধুনিক গৃহিণীরা কেউ শিক্ষয়িত্রী, কেউ টেলিফোন গার্ল, কেউ স্টেনোটাইপিস্ট, কেউ কেরানী, কেউ ক্যানভাসার। রান্নাঘরে বসে মোচার ঘণ্ট বা মুগের সূপ রান্নার সময় কোথায় তাঁদের? কিন্তু রান্নাঘর ডাউন করে 'লঙ লিভ পাইস হোটেল' বলতেও আমি রাজি নই, পেটের ওপর দূর্বাঘাস গজিয়ে গেলেও না। তাহলে পুণবন্তাদের খাদ্যটা শেষ পর্যন্ত 'দিজ্জই' কে? যদি বলেন ভৃত্য বা রাঁধুনি বামুন, তাহলে বলব এখনও আপনি সেই 'পুরাতন ভৃত্যে'র যুগে বাস করছেন। পুরাতন ভৃত্যের যুগ নিশ্চিত অস্তাচলে। সুতরাং 'দিজ্জই কে' প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত থেকে যাচ্ছে। ঘুরে ফিরে 'দিজ্জই কান্তা'তে আসা ছাড়া উপায় নেই, কারণ দিজ্জই হোটেল বা দিজ্জই কেষ্টা, কোনটাই সম্ভব নয়। এটা একটা ট্রানজিশানাল ক্রাইসিস, যুগসন্ধির সঙ্কট! রান্নাঘর ছেড়ে বাইরের ঘরে যাবার মাঝপথের ভোজনসঙ্কট। অথচ কাজ করে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রেখেও কান্তারা দিতে পারেন এবং পুণবন্তারা খেতেও পারেন। সর্বমঙ্গলাকে স্মরণ করে নানারকমের নিরামিষ ও আমিষ ব্যঞ্জন তাঁরা রাঁধতে বসুন, এমন কথা বলছি না! 'ডালভাতে ভাত চড়িয়ে দেনা' গোছের কিছু একটা হলেই পুণবন্তারা 'ধিন্‌তা-তা-ধিনা' করে নেচে সানন্দে খেতে পারেন।

সুতরাং সঙ্কট শুধু খাদ্যসঙ্কট নয়, 'দিজ্জই কান্তার'ও সঙ্কট। খাদ্য ও কান্তা উভয়সঙ্কটে পড়ে বাঙালী পুণবন্তাদের এমন অবস্থা হয়েছে যে কিছুকাল পরে তাঁরা শাক আর মুগের সূপ ছাড়া আর কিছু খেয়ে হজমও করতে পারবেন না। অর্থাৎ বাঙালী জাতির অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। গোস্বামীযুগের শাক-কচু-কুষ্মাণ্ড খেয়ে খেয়ে একে চোয়াল চুপ্‌সে যাচ্ছে, তার উপর কান্তারা কর্মক্লান্তা, দেখবার কেউ নেই। মধ্যবিত্ত বাঙালীর সত্যিই দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে!

বিবাহের চেয়ে অনেক বড়

আমরা যারা 'সভ্য' মানুষ তারা নিজের জন্মদাতা 'বাবা'কে ছাড়া আর কাউকে 'বাবা' বলে ডাকতে রাজি নই। আধুনিক জামাইরা পর্যন্ত শাশুড়ীকে যত সহজে 'মা' বলে ডাকতে পারেন, নিশ্চয়ই তত সহজে শ্বশুরকে 'বাবা' বলতে পারেন না। নিজের বাবাকে ছাড়া অন্য কাউকে 'বাবা' বলে ডাকা যে কি ভয়ানক কঠিন ব্যাপার তা একটা চলতি প্রবাদ থেকেই বোঝা যায়, 'সাধে কি আর 'বাবা' বলি, গুঁতোর চোটে 'বাবা' বলি'। কিন্তু যাদের আমরা 'অসভ্য' বলতে অভ্যস্ত সেই আদিবাসীদের অনেকের মধ্যে 'বাবা' বলাটা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। এরকম আদি-বাসীদের মধ্যে গেলে আমরা আঁতকে উঠবো। মনে করুন, একদল আদিবাসীকে ডেকে একজনকে প্রশ্ন করা হল: 'এ তোমার কে হয়?' সে বলল 'বাবা'। তারপর তার পাশের ব্যক্তিটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করা হল ঐ একই প্রশ্ন, তাতেও সে জবাব দিলে 'বাবা' হয়। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, একজন লোকের দশজন বাবা তার সঙ্গেই উপস্থিত, আরও কতজন যে রয়েছে তার ঠিক নেই। এতে আমরা হয়ত দিশেহারা হয়ে যাব, কিন্তু নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা আবিষ্কারের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবেন। কারণ তাঁরা এই 'সম্বোধনে'র ভেতর দিয়ে সেই আদিম জাতির সমাজ ও সংস্কৃতির একটা নির্দিষ্ট 'দিশে' পাবেন। এই 'আত্মীয়-সম্বোধন', ইংরেজীতে যাকে 'kinship terms' বলা হয়, নৃবিজ্ঞানীদের কাছে এটা অনুসন্ধানের মস্ত বড় কৌশল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, 'দিশে'টা তাঁরা কোথায় পেলেন, কি থেকে পেলেন এবং তা থেকে তাঁদের সামাজিক ব্যাপার অনুসন্ধানের সুযোগই বা কোথায়?

এইখানেই 'বিয়ে'র ব্যাপার আসে। প্রশ্ন ওঠে, গোড়া থেকেই কি মানুষ

'একজন স্ত্রীর সঙ্গে একজন পুরুষের আজীবন যৌন সম্পর্কে'র অর্থাৎ একবিয়ের, না অনেক বিয়ের, অর্থাৎ স্বাধীন যৌন সম্পর্কের পক্ষপাতী ছিল? সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে এ নিয়ে প্রচণ্ড মতভেদ আছে, তর্ক-বিতর্কও হয়েছে প্রচুর। একদল বলেন যে, গোড়াতে স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সম্পর্কের মধ্যে স্বাধীনতা ছিল, 'অনেক বিয়ে'র প্রচলন ছিল। আর একদল বলেন, একবিয়েই মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি, বহুবিয়ের যে সব নমুনা দেখা যায় তা বিকৃতি মাত্র। দ্বিতীয় দলের (ওয়েস্টারমার্ক এঁদের মধ্যে প্রধান) যুক্তি ক্রমেই নৃবিজ্ঞানীরা বাতিল করে দিচ্ছেন। প্রথম দলের মধ্যে টাইলর, মর্গান, ব্রিফল্ট প্রভৃতি অন্যতম। দ্বিতীয় দলের যুক্তি বাস্তবিকই একেবারে অচল বলে মনে হয়। বিয়ের সম্পর্ক বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বিশেষ করে একবিয়ের ব্যাপার গোড়াতেই মানুষ চিন্তা করেছে,এমন কথা ভাববার কোন সঙ্গত কারণ নেই। জৈবিক তাগিদাটাই গোড়ার কথা এবং বড় কথা। বিয়েটা তার অনেক পরের আবিষ্কার। প্রথম যুগে জৈবিক তাগিদে যৌনসম্পর্ক স্বাধীন ও সহজ থাকাই স্বাভাবিক। তারপর বিয়ের প্রয়োজন বা স্থায়ী স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কের প্রয়োজন 'সমাজ' গড়ার প্রাথমিক তাগিদ থেকে এসেছে। ওয়েস্টারমার্ক অবশ্য জৈবিক তাগিদকে বাতিল করার জন্য গরিলাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, গরিলারাও একবিয়েতে সন্তুষ্ট থাকে। ব্রিফল্ট প্রচুর প্রমাণ দিয়ে বলেছেন যে গরিলাদের সম্বন্ধেও এ মন্তব্য ভুল। আজকালকার জুকারম্যান প্রমুখ প্রাণীবিজ্ঞানীরাও গরিলাদের একবিয়ের অনুরাগী বলেন না। যাই হোক, বহুবিয়েটাই যে গোড়ার কথা তা আজকাল অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী স্বীকার করে নিয়েছেন।

এখন দেখা যাক, 'বহুবিয়ে' কত রকমের হতে পারে। মোটামুটি তিন রকমের 'বহুবিয়ে' হতে পারে। একজন স্বামীর অনেক স্ত্রী, একজন স্ত্রীর অনেক স্বামী এবং একদল স্বামীর একদল স্ত্রী। বহুপতিত্ব (Polyandry) ও বহুপত্নীত্ব (Polygyny)-র মধ্যে কোন্‌টা সমাজে আগে বা পরে এসেছে তা বলা যায় না। সমাজের একই স্তরে, স্ত্রীপুরুষের সংখ্যানুপাতে, দুই প্রথারই প্রচলন হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু

'গোষ্ঠীবিয়ে' (Group-marriage) যে সকলের আগে মানুষের সমাজে প্রচলিত ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। এইবারে স্বচ্ছন্দে অনেককে 'বাবা' বলার ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে।

আদিবাসীদের মধ্যে যারা অনেককে 'বাবা' বলে, তারা কেন বলে? শুধু নিজের জন্মদাতা 'বাবা' নয়, গোষ্ঠীর মধ্যে আরও অনেকে যারা 'মা'র স্বামী হতে পারত, তাদের সকলকেই 'বাবা' বলাই তাদের রীতি। তেমনি আরও যারা তার 'বাবা'র স্ত্রী হতে পারত, তাদের সকলকে তারা 'মা' বলে। বাকি সকলে এদেরই ছেলেমেয়ে, অর্থাৎ 'ভাইবোন'। এখনও যে অনেক আদিমজাতির মধ্যে এই 'সম্বোধন' প্রচলিত আছে, এর থেকে নৃবিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, একসময় 'গোষ্ঠীবিয়ে' সমাজে চলিত ছিল, এগুলো তারই স্মৃতিচিহ্ন মাত্র। যে সমাজে বা যে কৌমের (tribe) মধ্যে একদল স্ত্রী-পুরুষের যৌনসম্পর্ক স্বাধীন, সেখানে কে 'বাবা' জানা কঠিন। সুতরাং পিতৃস্থানীয় সকলেই 'বাবা' এবং মাতৃস্থানীয়া সকলেই 'মা' হওয়া সেই অবস্থায় স্বাভাবিক। বাকি সকলে যে 'ভাইবোন' হবে তা বলাই বাহুল্য।

প্রথমে মানুষের মধ্যে 'গোষ্ঠীবিয়ে' ছিল যদি স্বীকার করা যায়, তাহলে প্রথমে 'মাতৃতান্ত্রিক' সমাজ এবং পরে 'পিতৃতান্ত্রিক' সমাজের বিকাশ হয়েছে, একথাও স্বীকার করতে হয়। কেন? যেখানে একদল স্ত্রীপুরুষের মধ্যে স্বচ্ছন্দ যৌনবিহার চলে, সেখানে বাবাকে না চেনা গেলেও মাকে চেনা যাবেই, কারণ 'মা' যে গর্ভধারিণী। মানুষের মধ্যে প্রাথমিক সমাজ গড়ার তাগিদ যখন এল এবং সন্তানদের বংশপরিচয় জানারও দরকার হল, তখন একটা 'মূল' বা 'কেন্দ্র' না থাকলে চলে না। কাকে এই 'মূল কেন্দ্র' করা যায়? 'বাবা'কে তো চেনার উপায় নেই, কিন্তু মাকে না চিনে উপায় নেই, তিনি সন্তান গর্ভে ধারণ করছেন, প্রসবও করছেন, পালনও করছেন। অতএব 'মা' হলেন মানুষের প্রথম গড়া সমাজের 'মূলকেন্দ্র', তিনিই প্রধান, তিনি অপ্রাকৃতিক শক্তির আধার, রহস্যবৃতা প্রথম 'দেবী'। তারপরে 'বাবা'দের ইতিহাস শুরু, বাবার আধিপত্য এবং দেবীর বদলে দেবতাদের প্রাধান্যের কাহিনী। সে সব কথা এখন থাক।

তাহলে সমাজবিকাশের ধারায় প্রথমে গোষ্ঠীবিয়ে, তারপর বহুবিয়ে এবং ধীরে ধীরে একবিয়ের দিকে একটা মোটামুটি আঁকাবাঁকা অগ্রগতি দেখা যায়। বহুবিয়ের মধ্যে প্রধানত যে 'বহুপতিত্ব' এবং 'বহুপত্নীত্ব' দেখা যায়, তার মধ্যে 'বহুপতিত্ব'-টাই প্রাচীনতম বলে অনুমান করতে কষ্ট হয় না। কারণ অনেককে 'বাবা' বলার রীতিটা যদি 'গোষ্ঠীবিয়ে'র চিহ্ন হয়, তাহলে সেটা 'বহুপতিত্বে'র চিহ্নও হতে পারে, কারণ এক স্ত্রীর অনেক স্বামী যেখানে, সেখানেও 'বাবা' চেনা মুশকিল। মা-কে কিন্তু সবসময় চেনা যায়। তাই নৃবিজ্ঞানীরা অনেকে নিছক তর্কের খাতিরে না স্বীকার করলেও, মোটামুটি বলা যায় যে, গোষ্ঠীবিয়ের পরে বহুপতিত্ব ও মাতৃতন্ত্রের বিকাশ হয় এবং বহুপত্নীত্বটা পিতৃতন্ত্রের সমসাময়িক। অবশ্য এ-যুক্তিও খণ্ডন করা যায় না যে, সমাজের একই স্তরের কোন জাতির মধ্যে মেয়ের সংখ্যা অল্প থাকলে সেখানে একস্ত্রীর বহুস্বামী এবং কোথাও পুরুষের সংখ্যা অল্প থাকলে সেখানে একপুরুষের বহুস্ত্রী—এই ধরনের প্রথার প্রচলন এককালেই হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের দেশে এইসব বিয়ের প্রচলন ছিল কিং না? ছিল যে তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ আমাদের দেশটাও দেশ এবং আমাদের দেশের মানুষও মানুষ। আমাদের ভারতবর্ষেও একদিন গোষ্ঠীবিয়ের প্রচলন ছিল, দুইরকমের বহুবিয়েও ছিল, একস্ত্রীর বহুস্বামী এবং একস্বামীর বহুস্ত্রী ছিল। এছাড়া আরও একটা ব্যাপার ছিল, সেটা হল পিসতুতো-মামাতো ভাইবোনের বিয়ে (Cross-Cousin marriage)। একসময় এই সব বিয়ে যে রীতিমত প্রথা হিসেবে ছিল, তার প্রমাণ আজও আমাদের দেশের মধ্যে রয়েছে, আর প্রাচীনকালে যে ছিল তার প্রমাণ শাস্ত্রসংহিতায় মহাকাব্য পুরাণাদিতে রয়েছে।

একজন পুরুষের অনেক স্ত্রী, আমাদের দেশে সেই বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। কি করলে সতীনের প্রতি স্বামীর প্রেমে ভাঁটা পড়বে, তার জন্য ঋগ্বেদে পর্যন্ত মন্ত্র রচনা করা হয়েছে। 'শতপথ ব্রাহ্মণে'র মধ্যে পরিষ্কার চাররকমের স্ত্রীর কথা আছে—যেমন মহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তা, পালাগলী। 'মহিষী' হল সর্বশ্রেষ্ঠা, 'বাবাতা' হল

সবচেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রী, ‘পরিবৃক্তা’ হল পরিত্যক্তা স্ত্রী আর ‘পালাগলী’ হল নীচকুলজাতা স্ত্রী। এতরকমের স্ত্রী-ই যদি থাকে, তাহলে কম্‌-সে-কম্‌ সেকালের মুনিঋষি ও রাজাদের গড়পড়তা সব রকমের একটি করে থাকলেও তো চারটি স্ত্রী হয়। এ-ছাড়া ‘মহাভারতে’ যে আটরকমের বিয়ের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে ‘গান্ধর্ব’, ‘রাক্ষস’ ও ‘পৈশাচ’ বিয়েও যখন একরকমের বিয়ে ছিল, তখন পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রেম বলাৎকার ইত্যাদি করতেও ব্রাহ্মণ মুনিঋষি ও ক্ষত্রিয় রাজাদের বাধত না। বেশি তর্ক না করেই বলা যায় যে, ভীষ্মের কাশীরাজকন্যাহরণ, দুর্যোধনের চিত্রাঙ্গদকন্যাহরণ, অর্জুনের সুভদ্রাহরণ, কৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ, এগুলো ‘রাক্ষসবিয়ে’ হলেও কিড্‌ন্যাপিং ছাড়া আর কি ? তাছাড়া ঘুমন্ত কন্যাকে বলাৎকার করে রমণ করাকে ‘পৈশাচ’ বিয়ে বলে সমাজে চালু করার চেষ্টা হয়েছে। সুতরাং অনেক স্ত্রী থাকাটা আমাদের দেশে সেকালে একটা বাহাদুরির ব্যাপার ছিল। মহাভারত রামায়ণে তার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। কারও বাবার যদি ৩৫০ জন স্ত্রী থাকে, তাহলে তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অন্তত গোটা ৩৫ স্ত্রী তো থাকা উচিত। কিন্তু রামচন্দ্রকে আদর্শ রাজা করার উদ্দেশ্যে দশরথের ৩৫০ জন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও রামকে একস্ত্রীর অনুরক্ত করতে বাধ্য হয়েছেন মহাকবি। আমাদের দেশের তথাকথিত কৌলীন্যপ্রথার শোচনীয় ইতিহাস যদি স্মরণ করা যায়, তাহলেই দেখা যাবে, আজ থেকে মাত্র একশ বছর আগেও একপুরুষের কয়েকশত স্ত্রী থাকাটাও আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। বিংশ শতাব্দীতেও বেশ কয়েকজন ‘বিবাহিতা স্ত্রী’ নিয়ে ঘর করেন এমন ভাগ্যবান (?) পুরুষের সংখ্যা নেহাত কম নেই। আর যাঁরা একটার বেশি বিয়ে করতে ভয় পান, তাঁরা যে লুকিয়ে-চুরিয়ে অন্য নারীর সঙ্গলাভ করেন না এমন নয়, অনেকে তো প্রকাশ্যে ‘রক্ষিতা’ রাখতেও সঙ্কুচিত হন না। একালে পৈশাচ বিয়ে বা রাক্ষসবিয়ে বলে কিছু নেই। তা যদি থাকত তাহলে অলিগালর অনেক ‘পালাগলী’ ও ‘পরিবৃক্তা’ স্বচ্ছন্দে হয়ত ‘বাবাতা’ ও ‘মহিষীর’ স্তরে উঠতে পারতেন।

একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকা যে একসময় আমাদের দেশে

অসম্ভব ছিল না এবং অন্যায় বলেও গণ্য হত না, তারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি আজও পর্যন্ত আমাদের 'সভ্য সমাজে'র মধ্যে এককালের এই বহুস্বামিত্বপ্রথার স্মৃতিচিহ্ন রয়ে গেছে। হয়ত আমরা তেমন সচেতন নই। সামাজিক শ্লীলতা ও সভ্যতার চেতনার তলায় গুহায়িত-প্রেতের মতন সেই আদিম চেতনাটা লুকিয়ে রয়েছে। একটা রীতির আজও আমাদের সমাজে চলন আছে যেটা সকলেই জানেন। বড়ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে ছোটভাইয়ের সম্পর্কটা আমাদের পরিবারে অত্যন্ত মধুর। সম্পর্কটা সবরকমের ঠাট্টা-তামাশা, মধুর রসিকতা ইত্যাদির রসঘন 'বৌদি-দেবর' সম্পর্ক। এটা আমাদের শাস্ত্র-সম্মত এবং প্রথানুগত দুই-ই। আমরা অনেকে জানিই না হয়ত যে এই বৌদি-দেবর সম্পর্কটা বহুকালের মৃত বহুস্বামিত্বপ্রথার প্রেতাত্মা মাত্র। 'দেবর' কথাটার অর্থই হল 'দ্বিতীয় বর'। এর থেকে একটা বিশেষ বিবাহপ্রথার হদিশ পাচ্ছি আমরা। প্রথাটা হচ্ছে, কয়েকজন সহোদর ভাই মিলে একটি স্ত্রী বিবাহ করার প্রথা। নৃবিজ্ঞানীরা এই প্রথাকে 'ফ্রেটার্নাল পলিয়্যাণ্ড্রি' বলেছেন। কয়েকভাই মিলে একবৌ বিয়ে করার প্রথা আজও আমাদের প্রতিবেশী তিব্বতীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাছাড়া ভারতবর্ষের মধ্যে নীল-গিরি পাহাড়ের টোডাদের ভেতর এই প্রথা এখনও চালু আছে। দক্ষিণভারতের নায়ারদের প্রথা ছিল, পরিবারের মধ্যে বড়ভাই যে, তার বিয়ে হবে নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণকন্যার সঙ্গে, আর অন্যান্য ভাইরা নায়ারকন্যাদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ যৌনবিহার করবে, পুত্রকন্যা যারই হোক না কেন তার পিতা হবে বড়ভাই। এগুলো সবই হল এককালে একবৌ-এর বহুস্বামী থাকার নিদর্শন, তবে স্বামীরা সকলে আপন ভাই হওয়া চাই। মহাভারতের 'দ্রৌপদী'র ব্যাপারটা একটা বড় দৃষ্টান্ত। মায়ের আদেশ অলঙ্ঘনীয় এই কথা প্রমাণ করার জন্য মহাকবি যতই অক্ষম চেষ্টা করুন না কেন, আসলে যে তিনি একটা প্রচলিত লোক-প্রথাকে ও সামাজিক রীতিকে অস্বীকার করতে পারেন নি সেইটাই বড় কথা। তা না হলে মহাভারতের নায়ক যাঁরা তাঁদেরই এমন বিয়ে তিনি দিতেন না। এছাড়া বেদব্যাসের দোহাই যুধিষ্ঠির নিজেই তো উড়িয়ে দিয়েছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন পর্যন্ত যখন

যুধিষ্ঠিরকে এই বিয়ে থেকে বিরত করতে ব্যস্ত তখনও যুধিষ্ঠির তাঁর উপদেশ না শুনে পূর্বপুরুষদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেন নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থনে। যুধিষ্ঠির বললেন যে এই প্রথা আগে ছিল এবং প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করলেন জটিলা গৌতমীর কথা, যার সাতজন ঋষি স্বামী ছিল, এবং বারক্ষীর কথা, যার দশজন স্বামী ছিল দশ ভাই।

বহুস্বামিত্বপ্রথা যে একসময় আমাদের দেশে রীতিমত চালু ছিল তা আমাদের ধর্মশাস্ত্রের 'নিয়োগ' বিধি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। আপস্তম্ব এই নিয়োগের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, সন্তানের জন্য নিজের স্ত্রীকে কোন অপরিচিতের কাছে অর্পণ না করে, সগোত্র কাউকে নিয়োগ করা উচিত। গৌতম বলেছেন যে, সপিণ্ড, সগোত্র বা সপ্রবর সম্পর্কের মধ্যে কাউকে না পাওয়া গেলে, স্বামীর অনুমতি নিয়ে বাইরের লোককেও 'নিয়োগ' করা চলে, তবে এইভাবে দুটির বেশি সন্তান হওয়া কাম্য নয়। এখানে স্ত্রী হল 'ক্ষেত্র', প্রকৃত স্বামী হল 'ক্ষেত্রিন্' বা 'ক্ষেত্রিক', যাকে সন্তান উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করা হল সে হল 'নিয়োগিন্' বা 'বীজিন্' (বীজ ছড়ায় যে) এবং এইভাবে যে পুত্র জন্মাল সে হল 'ক্ষেত্রজ'। মহাভারতের মধ্যেও 'নিয়োগপ্রথার' অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুজনেই তো 'ক্ষেত্রজ'। কে না জানে যে সত্যবতী নিজে ভীষ্মকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর ছোটভাই বিচিত্রবীর্যের বিধবা মহিষীদের গর্ভসঞ্চার করার জন্য? ভীষ্ম করেননি বলেই তো ব্যাসকে ঐ কাজটি করতে হল। পাণ্ডু নিজে কুন্তীকে অনুরোধ করেননি, ভাল ব্রাহ্মণ বা তপস্বী নিয়োগ করে পুত্রের জন্ম দিতে? শুধু অনুরোধ নয়, পাণ্ডু বুঝিয়েছিলেন কুন্তীকে যুক্তি দিয়ে যে এইভাবে অন্যকে নিয়োগ করে কুন্তী তিনটে পর্যন্ত সন্তানের স্বচ্ছন্দে জননী হতে পারেন, তাতেও তাঁর সতীত্ব যাবে না। তার বেশি, অর্থাৎ চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে হলে তবে তিনি 'স্বৈরিণী' ও 'বন্ধকী' হবেন। তাছাড়া পরশুরাম যখন ক্ষত্রিয়দের একেবারে নির্মূল করে দিলেন, তখন হাজার হাজার ক্ষত্রিয় বিধবা কেঁদেককিয়ে এসে কেন ব্রাহ্মণদের পায়ে ধরলেন সন্তানের জন্য?

এসব হল এদেশের বহুস্বামিত্ব-প্রথার নিশ্চিত নিদর্শন। বহুস্বামিত্ব

দু-রকমেরই ছিল। সহোদর ভাইদের মধ্যে স্বামিত্ব সীমাবদ্ধ রাখা এবং অনাত্মীয়দের 'temporary' স্বামী হিসেবে নিয়োগ করা। ফ্রেটার্নাল পলিয়্যাণ্ড্রি আজও হিমালয়ের পার্বত্য জাতের মধ্যে, গাড়ওয়ালদের মধ্যে, কুমাওনের রাজপুত ব্রাহ্মণ শূদ্রদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের নায়ার ও টোডাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। আর আমাদের সমাজের বৌদি-দেবর সম্পর্কের মধ্যে এর রেশটা আজও রয়ে গেছে। ম্যাট্রিয়ার্কাল বা নন্-ফ্রেটার্নাল পলিয়্যাণ্ড্রিও যে ছিল একসময় তাও বেশ বোঝা যায়, ধর্মশাস্ত্রের নিয়োগবিধির মধ্যে তার সুস্পষ্ট আভাস রয়ে গেছে।

এইবার মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের বিয়ের ব্যাপারটা দেখা যাক। বর্তমান সমাজে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অমান্য করেও এই ধরনের বিয়ে চলছে, সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মামা-পিসেদের মধ্যে বিক্ষোভও দেখা দিচ্ছে। হিন্দুশাস্ত্রের 'সপিণ্ড' সম্পর্কটা টেনে বাড়ালে বিয়ে করার মতন কোন ছেলে বা মেয়ে কাছাকাছি খুঁজে পাওয়া যাবে না। একই দেহ বা পিণ্ডের এক কণা পর্যন্ত যাদের মধ্যে থাকবে তারাই সপিণ্ড সম্পর্কিত। বাবা ও মায়ের দিক থেকে হিসেব করলে আত্মীয়স্বজনের বিরাট পরিধির মধ্যে কেউ বাদ যাবে না। কথায় বলে, এইভাবে বিচার করলে ব্রাহ্মণ কায়স্থের আত্মীয় সকলেই। তাদের মধ্যে যদি বিয়ে করা না চলে তাহলে বিয়ে করতে হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জে বা চন্দ্রলোকে যেতে হয়। তাই সপিণ্ড সম্পর্ক নিয়ে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ, এই দুই স্কুলের মতভেদ আছে। তা নিয়ে আলোচনার দরকার নেই এখানে। মোটকথা যাজ্ঞবল্ক্য যা বলতে চান তা হল এই যে, মায়ের দিক থেকে পঞ্চম, বাবার দিক থেকে সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত সপিণ্ড সম্পর্ক থাকে, তারপর থাকে না। বিয়ে-থা তারপরে দেওয়া যেতে পারে। মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনেরা দুই-পুরুষের মধ্যে এসে যাচ্ছে, অতএব ধর্মশাস্ত্রের মতে তাদের বিয়ে নিষিদ্ধ। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে যা নিষিদ্ধ মানবশাস্ত্রে তা নিষিদ্ধ নয়। সব দেশেই তা দেখা গেছে।

ঋগ্বেদের মন্ত্রের মধেই বলা হচ্ছে: 'হে ইন্দ্র! তুমি এস, যজ্ঞের ভোজ্য গ্রহণ করো, ভাগ্যবানেরা যেমন মাতুলকন্যা গ্রহণ করে তেমনি।' মহাভারতের রোমান্টিক নায়ক অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ দুজনেই মাতুলকন্যা

সুভদ্রা ও রুক্মিণীকে বিয়ে করেছিলেন। কাজটা যদি অত্যন্ত গর্হিত হত তাহলে শ্রেষ্ঠ নায়কদের দিয়ে মহাকবি কখনই তা করাতেন না, বিশেষ করে যখন কোন রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা ছিল না। এছাড়া সহদেব বিয়ে করেছিলেন মদ্ররাজকন্যাকে, শিশুপাল ভদ্রাকে, পরীক্ষিৎ উত্তরের কন্যা ইরাবতীকে—এবং এরা সকলেই পরিণেতাদের মামাতোবোন। এই ধরনের বিয়ের ব্যাপারটা যদি এদেশে অত্যন্ত অপরাধের হত তাহলে এতগুলো মামাতোবোনের সঙ্গে পিসতুতো ভাইদের বিয়ে মহাভারতের মধ্যে ঘটে যেতে পারত না। সুতরাং মামাতো-পিসতুতো ভাইবোনের বিয়ে এদেশে যে রীতিমত চলত তা বেশ বোঝা যায়। বৌধায়ন নিজেই তাঁর 'ধর্মসূত্রে' উল্লেখ করে গেছেন যে মামার ও পিসিমার মেয়েদের বিয়ে করাটা দক্ষিণ-ভারতের রীতি। এখনও কর্ণাটক মহীশূর প্রদেশের ব্রাহ্মণদের কোন কোন সম্প্রদায় নিজেদের ভাগনিকে পর্যন্ত বিয়ে করেন। অর্থাৎ মামাতো-পিসতুতো ভাইবোন তো অনেক ভাল কথা, মামা-ভাগনি বিয়ে পর্যন্ত এদেশে আজও চলে। চলে অনেক কিছুই, আমরা হয় জানি নে, না হয় জেনেও জানতে চাই না। ধর্মশাস্ত্র আমাদের আজন্ম ধাঁধিয়ে রেখে দিয়েছে। চোখ মেলে চেয়ে দেখার মতন শক্তি আমাদের নেই। মনুসংহিতার বাইরে আজও আমাদের দেশে যে বিরাট মানবসমাজ রয়েছে তার পরিচয় আমরা জানতে চাই না, জানিও না। চোখে ঠুলি পরে কলুর বলদের মতন মানুষের মধ্যে গিয়ে তাদের সমাজ ও সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় না। মুক্তমন আর মুক্তচোখ নিয়ে যদি আজও আমরা আমাদের সামাজিক বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশি, তাহলে আমাদের সামাজিক রীতি-নীতি প্রথার অনেক বৃত্তান্ত, তাদের ক্রমবিকাশের অনেক কাহিনী আমরা জানতে পারব। এই কাজই সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের সারাজীবনের কাজ।

বিয়ের ব্যাপার নিয়ে স্বল্প-পরিসরের মধ্যে সামান্য যেটুকু এখানে আলোচনা করা হল, তা বাইরে থেকে হাল্কা মনে হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এইসব বিবাহপ্রথার ভেতর দিয়ে বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে অনুসন্ধান করতে পারলে, আমাদের দেশের সমাজবিকাশের ধারা সম্বন্ধে

বিরাট একটা ইতিহাস লেখা যায়, যার মূল্য অনেক তথাকথিত ‘ইতিহাসে’র চেয়ে হাজারগুণ বেশি। বিয়েটা শুধু বিয়ে নয়, বিয়ের চেয়ে অনেক বড়। বিজ্ঞানীর কাছে বিয়েটা মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে বাইরের সমাজের সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি মাত্র। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে গোষ্ঠীবিয়ে, বহুবিয়ে (বহুপতিত্ব ও বহুপত্নীত্ব), মাতৃতন্ত্র, পিতৃতন্ত্র, যৌথ-পরিবার, একবিয়ে ইত্যাদি সমাজের বিভিন্ন স্তরের ছবি, বিভিন্ন সংস্কৃতিরও। সমাজে যখন মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ দেখা দেয়নি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির পূর্ণবিকাশ হয়নি, তখন গোষ্ঠীবিয়ে, বহুপতিত্ব ও মাতৃতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। শ্রেণীভেদ, সম্পত্তি ইত্যাদির জটিল প্রশ্নের সঙ্গে পিতৃতন্ত্র, একবিয়ে, সপিণ্ড, সগোত্র ইত্যাদি ব্যাপারের উদ্ভব হয়েছে। কিভাবে বিভিন্ন স্তরের ভেতর দিয়ে, যুগে যুগে ভারতবর্ষের সমাজের বিকাশ হয়েছে তা অনুসন্ধান করার এইসব উপাদান অত্যন্ত মূল্যবান। ধর্মশাস্ত্র যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা সাধারণের মঙ্গলের চেয়েও নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের দিকে নজর রেখেই যে লিখেছেন, তা যে-কোন শাস্ত্র অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। সুতরাং তার বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করার প্রশ্ন বাদ দিয়েও বলা যায়, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে ইতিহাসের অনেক লুপ্ত তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে। তার মধ্যে শুধু বিয়ের ব্যাপারটাই আমাদের অনেক কাজে লাগতে পারে, কারণ বিয়ে শুধু বিয়ে নয়, তার চেয়ে আরও অনেক বড়ো জিনিস।

উদাসীন স্বামী

'উদাসীন স্বামী' কে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সত্যিই মুশকিল। উদাসীন স্বামী নিয়ে সংসার করা মুশকিল তো বটেই, তার চেয়ে আরও বেশি মুশকিল তাঁকে ডিফাইন্ করা। কেন তাই বলছি।

মনে করুন, উদাসীন স্বামী হিসেবে আমাদের এই ক্ষুদ্র সংসারে যে ভদ্রলোকের সুনাম বা দুর্নাম আছে, বাইরের বিশ্ব-সংসারে তিনি হয়ত আদৌ উদাসীন না হতে পারেন। ঘরোয়া উদাসীনতাটা একেবারে 'ঘরোয়া' ব্যাপার বলে ভড়ংও হতে পারে। সাধারণত দেখা যায়, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিক যাঁরা, সাংসারিক জীবনে তাঁরাই 'declared' উদাসীন। কিন্তু মানুষ হিসেবে তাঁরা অনেকেই হয়ত উদাসীন নন। হাল ছেড়ে দিয়ে তাঁরা বসে থাকেন না, অনেক-কিছুর পিছনে অনেক কারণে ছোটাছুটি করে তাঁরা হয়রান হন, সুযোগ-কুযোগ কিছুই পেলে ছাড়েন না, উপরে চড়ার আকাঙ্ক্ষাও তাঁদের যথেষ্ট তীব্র, নিচুতে পড়ে থাকতে চান না। অথচ সংসারের মধ্যে এমন একটা ভাব দেখান তাঁরা, যেন সব সময় কাব্যের প্রেরণা খুঁজছেন তন্ময় হয়ে, অথবা গল্পের প্লট, অথবা বৈজ্ঞানিক কোন problem-এর সমাধান! দেখলেই মনে হয় যেন জিনিসপত্রের বাজারদর জানা বা স্ত্রীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার খোরাক যোগান দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এহেন ব্যক্তিদের কি বলবেন? উদাসীন? মোটেই নয়। তা যদি না হয়, অর্থাৎ আসল প্রকৃতির দিক থেকে যদি তাঁরা উদাসীন না হন, তাহলে কেবল স্বামী হিসেবে তাঁরা উদাসীন হবেন কেমন করে? সাংসারিক জীবনে উদাসীনতাটা তাঁদের একটা 'কামুফ্লাজ'। এই জাতীয় সজ্ঞান-উদাসীনদের tackle করা যে-কোন স্ত্রীর পক্ষে খুবই কঠিন। সম্পূর্ণ জেগে যিনি

ঘুমের ভাণ করেন, তাঁর ঘুম কখনও ভাঙানো যায় না। কানের কাছে কাড়ানাকাড়া বাজিয়েও তাঁর উদাসীনতার ঘুম ভাঙানো সম্ভব নয়। অতএব বচসা-বিতণ্ডা বা চেঁচামেচি করে কোন লাভ নেই। তাতে সংসারের অশান্তি বাড়ে, সমস্যার সমাধান হয় না। একমাত্র tit-এর বদলে tat কৌশল প্রয়োগ করে দেখা যেতে পারে। স্বামী যতটা উদাসীন হবেন, স্ত্রী হবেন তার দ্বিগুণ উদাসীন। বিষে-বিষক্ষয় হলেও হতে পারে। দুই উদাসীনের টানাটানিতে সংসার যখন অচল হয়ে পড়বে, তখন এই সব আত্মসচেতন স্বামীর উদাসীনতার মুখোসও খসে পড়বে। পড়বেই যে এমন কথা বলা যায় না, পড়তে পারে। তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয়ে খুব সাবধান হতে হবে। শিল্পী, বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিক স্বামীর জন্য বিশেষ করে যদি কোন স্ত্রী মনে গর্ব বোধ করেন, তাহলেই সমস্যা আরও জটিল হয়ে দেখা দেবে। স্বামীটি যদি কোনরকমে জানতে পারেন (জানতে পারাই স্বাভাবিক) যে তাঁর স্ত্রী তাঁকে 'দুর্লভ সামগ্রী' মনে করেন, তাহলে আর রেহাই নেই। 'সজ্ঞান-উদাসীন' যিনি তাঁর উদাসীনতা নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পৌঁছবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর উচিত, ভক্ত-ভগবানসুলভ মনোভাব স্বামীর কাছে ব্যক্ত না করা। অন্তরের আবেগ বা উচ্ছ্বাস সংসারের সচলতার স্বার্থে, কিছুটা অবদমন করাই বাঞ্ছনীয়। একটা কথা মনে রাখা উচিত, আমাদের এই সমাজে বা পরিবারে একবার যাঁরা ভগবানের পর্যায়ে উঠে ভক্তবৃন্দের স্তুতির আস্বাদ পান, তাঁদের লোভ ক্রমেই বেড়ে যায়। ষোড়শোপচারে পূজা ছাড়া তাঁরা সন্তুষ্ট হতে চান না। সংসারের সজ্ঞান-উদাসীন স্বামীরাও তাই। এই জাতীয় স্বামী নিয়ে যাঁদের ঘর করতে হয়, তাঁদের সর্বাগ্রে উচিত স্বামীকে 'অমূল্য রতন' মনে না করা। তাই বলে তাঁরা যে স্বামীকে হরিরলুটের বাতাসার মতন সুলভে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু মনে করবেন, তা নয়। স্বামীর সজাগ ভ্যানিটির কথাও ভাবতে হবে। সবচেয়ে ভাল কিছুই মনে না করা—অর্থাৎ স্বামীকে কেবল একটি স্বামীই মনে করা।

স্বামী হিসেবে এই 'সজ্ঞান-উদাসীনরা' প্রায় incorrigible স্তরের। আর একজাতের স্বামী আছেন যাঁরা বাইরে উদাসীন, কিন্তু ঘরে উদাসীন

নন। তাঁদের নিয়েও কম মুশকিলে পড়তে হয় না। চাকরি করেন, অথচ উমেদারি করতে জানেন না ; শখ আছে, সামর্থ্য নেই ; গুণ আছে, কিন্তু তাই ভাঙিয়ে দু-পয়সা করবার মতন যোগ্যতা নেই ; ঘরে তড়পান, বাইরে বোবা হয়ে থাকেন ; ভিড় দেখলে ভয় পান, গণ্ডগোল দেখলে দূরে সরে যান। এঁরা কতকটা রবীন্দ্রনাথের সেই 'উদাসীনে'র মতন :

উপরে চড়িতে যদি নাই পাই সুবিধা,
সুখে পড়ে থাকি নিচুতেই, থাকি নিচুতে।
যেথা-সেথা ধাই, যাহা-তাহা পাই ছাড়িনাকো
ভাই, ছাড়িনে
তাই বলে কিছু কাড়াকাড়ি করে কাড়িনে।
যাহা যেতে চায় ছেড়ে দিই তারে তখুনি,
বকিনে কারেও, শুনিনে কাহারো বকুনি,
কথা যত আছে মনের তলায় তলিয়ে
ভুলেও কখন সহসা তাদের নাড়িনে।

এঁদের নির্জ্ঞান-উদাসীন বা হাফ্-সংসারী বলতে পারেন। বাইরের সমাজ-জীবনের সঙ্গে যেখানে এতটুকু সংঘাতের সম্ভাবনা আছে, সেখানেই তাঁরা ডানা গুটিয়ে নীড়ে ফিরে আসেন। সংসারের নীড়টি তাঁদের জীবনের ভাঙা জাহাজের একমাত্র বন্দর। এছাড়া সমাজ-সমুদ্রে তাঁদের দুদণ্ড দাঁড়াবার স্থান নেই কোথাও। কি বলবেন এঁদের ? স্বামী হিসেবে এঁরা মোটেই উদাসীন নন ; বরং অতিঅনুরাগী। বাইরের উন্মুক্ত আকাশের চেয়ে স্ত্রীর চারফুট-বাই-দুফুট আঁচলটাই তাঁদের জীবনের বড় আশ্রয়। কিন্তু তবু সংসার তাঁদের দিয়ে চলে না। অভিজ্ঞ স্ত্রীরা একথা হয়ত স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না। এই জাতীয় নির্জ্ঞান-উদাসীন হাফ্-সংসারী স্বামীর চেয়ে পূর্ণবৈরাগী অনেক ভাল।

এই সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান-উদাসীন স্বামী ছাড়া আরও একজাতের স্বামী আছেন যাঁদের 'অজ্ঞান-উদাসীন' বলা যায়। এই অজ্ঞান-উদাসীনরাই জাত-উদাসীন স্বামী। সজ্ঞান-উদাসীন যাঁরা, উদাসীনতাটা তাঁদের ছদ্মবেশ। নির্জ্ঞান-উদাসীন যাঁরা, উদাসীনতাটা তাঁদের আত্মরক্ষার

বর্মবিশেষ। তাঁরা হয়ত স্টিভেনসনের মতন মনে করেন—'once you are married, there is nothing left for you, not even suicide, but to be good'। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে ঘরে too good, বাইরে অপদার্থ ও উদাসীন। আসলে ঘরে-বাইরে কোথাও তাঁদের কোন পদার্থ-ই নেই। তা যদি থাকত, তাহলে পরিবার ও সমাজের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য তাঁরা রক্ষা করে চলতে পারতেন। অজ্ঞান-উদাসীনরা তা নন। উদাসীনতাটা তাঁদের ছদ্মবেশও নয়, বর্মও নয়। যাঁদের সত্যিই সমাজ বা সংসার সম্বন্ধে একেবারেই কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, তাঁরাই অজ্ঞান-উদাসীন বা আসল উদাসীন স্বামী। তাঁরা ভোলানাথ মহাদেবের সগোত্র। তাঁদের চিনতে কোন স্ত্রীরই কষ্ট হয় না। হয়ত তাঁদের নিয়ে সংসার করা চলে না। সমাজ-সংসার পরিবার কোথাও তাঁরা খাপ্ খান না। মনে হয় অরণ্য থেকে তাঁরা যেন নির্বাসিত হয়ে এসেছেন সংসারে, প্রকৃতির অভিশাপে। তবু তাঁরা দুর্বোধ্য নন। ঘরে বা বাইরে কোথাও তাঁদের চরিত্রের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তাঁদের বোঝা যায়। আর ঘর যে তাঁদের নিয়ে একেবারেই করা যায় না তা নয়। ইচ্ছা করলেই করা যেতে পারে। তবে এই ভোলানাথের মতন কাণ্ডজ্ঞানহীন জাত-উদাসীন স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে হলে, হিমালয়দুহিতা পার্বতীর মতন শক্তির প্রতিমূর্তি ঘরণী হওয়া চাই।

তবু বর্তমান যুগে ও সমাজে এই ভোলানাথশ্রেণীর স্বামী নিয়ে ঘর করা সত্যিই খুব মুশকিল। পদে পদে তাঁকে নিয়ে বিড়ম্বনার সম্ভাবনা। একথা স্বজাতিবিরুদ্ধ হলেও, স্বীকার করতে আপত্তি নেই। পার্বতীর যুগ যে এটা নয় এবং হরপার্বতীর মিলনও যে এই বিবাহ-বিচ্ছেদের যুগে সম্ভব নয়, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। সমাজটাও কৈলাসধাম নয়। কমার্স ও ক্যালকুলাস-সর্বস্ব সমাজে কৈলাসের পরিবেশ কোথায়? হরেরা তাই এযুগের hopeless ক্রীচার। চেইন-স্টোর ও ডিপার্টমেণ্টাল-স্টোর-যুগের গৌরীরা তা বিলক্ষণ জানেন। যেমন ধরুন, এযুগের গৌরীদের সঙ্গে স্টোরে যেতে হবে, বিভাগ থেকে বিভাগান্তরে তাঁর অনুগামী হয়ে ঘুরতে হবে, প্রাইস ও প্রেস্টিজ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাঁর শপিং সম্বন্ধে কোন মন্তব্য

করা চলবে না। তা না করে যদি ভোলানাথ স্বামী এক-গেট দিয়ে ঢুকে অন্য গেট দিয়ে আপন মনে ববম্-ববম্ ব্যোম করতে করতে বেরিয়ে যান এবং বাইরে ফুটপাথে এককোণে পুরানো বইয়ের স্তূপ থেকে একখানা প্লেটোর জীর্ণ works নিয়ে দেখতে থাকেন—তাঁকে খুঁজে বার করতে যদি গৌরী দেবীর গলদঘর্ম হতে হয়, তাহলে শপিং-এর 'শো' বা 'থ্রিল' কিছুই থাকে কি ? কোন টি-পার্টিতে গিয়ে ভোলানাথ স্বামী যদি উস্‌খুস্ করেন এবং সিলিঙের দিকে চেয়ে থাকেন, স্ত্রীর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে freely আলাপ করতে না-পারেন, হাত-পা নেড়ে আনমনে টি-পট্‌টি টেব্‌ল থেকে ফেলে ভেঙে ফেলেন, তাহলে তাঁকে চায়ের আসর থেকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে খাঁচায় বন্দী করতে ইচ্ছা করে না কি ? সিন্‌থেটিক সিল্কের শাড়ির পাশে ভোলানাথ স্বামী যদি মোটা চটের মতন খদ্দরের জামাকাপড় পরে, ঠনঠনের চটি পায়ে দিয়ে চলতে থাকেন, তাহলে কার না মনে হয় যে দুরন্তগতি কমেটের পাশে যেন ছ্যাকরা গাড়ি চলেছে ? তাতে সম্ভ্রম-শালীনতাই বা রক্ষা করা যায় কি করে ? নতুন hit ফিল্ম এসেছে শহরে, পরিচিত ও প্রতিবেশীদের মধ্যে এমন কোন মিসেস্ নেই যিনি তাঁর মিস্টারের সঙ্গে গিয়ে দেখে আসেননি। অথচ এই ভদ্রলোক— মানে ঐ উদাসীন স্বামীটি যদি তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে thesis লিখতে বসেন এবং সেদিকে কোন নজর না দেন, তাহলেই বা কি করে চলে বলুন ? খবরের কাগজ পড়ুন না-পড়ুন, নতুন নতুন ফিল্ম না দেখলে 'ব্যাক্‌ডেটেড' হয়ে যাবেন। Cold Cream কিনতে গিয়ে উদাসীন স্বামী যদি ভুলে 'গাওয়া ঘি' কিনে আনেন, এবং শাড়ি কিনতে দিলে বই, তাহলে এই দুর্দিনে সেই ভুলের খেসারত দেয় কে বলুন তো ?

মুশকিল বৈ কি! ভোলানাথ-গোছের উদাসীন স্বামী নিয়ে ঘর করবার মতন মুশকিল এযুগে আর কিছু নেই। একথা একশবার সত্য। বেগের যুগে বোনাফাইড্ উদাসীনতার কোন মূল্য নেই। স্বামীর ক্ষেত্রে তো নেই-ই। এমন কি, তার কোন কাব্যিক মাধুর্যও নেই। ফ্যাশানের বেগ, স্টাইলের বেগ, আদবকায়দার বেগ, সংসারে প্রয়োজনীয়তার বেগ, ভদ্রতার paraphernalia বা সাজসরঞ্জামের বেগ, বাজারের তেজীমন্দী'র বেগ

ইত্যাদি যাবতীয় বেগের সঙ্গে যিনি সমান তাল রেখে চলতে না পারবেন বা চলার প্রয়োজনীয়তা বোধ না করবেন, তিনিই এযুগের উদাসীন স্বামী। উদাসীন স্বামীর এই হল মডার্ন ডেফিনিশন্। করিতকর্মা সর্বগুণসম্পন্না সচলা ও বেগবতী স্ত্রীর কাছে তিনি এমনই একটি মহা-মুশকিলের প্রতিমূর্তি-বিশেষ, যার কোন 'আসান' নেই। Curio-র মতন তিনি কৌতূহল জাগান বটে, কিন্তু কোন কাজে লাগেন না।

মামা ও ভাগ্‌নে

এ-লেখার শিরোনাম দেখে অনেকে হয়ত শিউরে উঠবেন, ভাববেন যে মামা-ভাগ্‌নে নিয়ে আলোচনা আবার কি বস্তু? কেউ হয়ত মনে করবেন যে হাস্যরস পরিবেশন করাই এ রচনার উদ্দেশ্য। গোড়াতেই বলছি, ব্যাপারটা মোটেই লঘু নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। একে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসের একটা প্রাচীন অধ্যায়ের আলোচনা বললেও ভুল হবে না। আজকের সমাজে ভাগনেদের সঙ্গে মামাদের যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, চিরকালই যে তা ছিল এমন কথা বলা যায় না। আমাদের সমাজে মামা-ভাগ্‌নের সম্পর্কটা পারিবারিক গণ্ডির বাইরে বৃহত্তম সমাজে রীতিমত ঠাট্টা-তামাশার সম্পর্কে এসে পৌঁছেচে। 'মামা' সম্বোধনটা 'পিতার শ্যালক' হিসেবে গালাগাল-বিশেষ বললেও মিথ্যা বলা হয় না। 'মামা' চিরদিনই তাই ছিলেন, কিন্তু এমন বিদ্রূপের পাত্র তিনি চিরদিন ছিলেন না।

জাতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এরা মাতৃপ্রধান হলেও মাতুল-প্রাধান্য এদের মধ্যে দেখা যায় না। না দেখা গেলেও রিভার্সের কথাই ঠিক বলে মনে হয়। এ-সব ব্যতিক্রম হল মাতৃপ্রধান ও পিতৃপ্রধান সমাজের যুগ-সন্ধিক্ষণের প্রমাণ। সমাজবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম হিসেবে আজ একথা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে মাতৃপ্রধান সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মাতুলকর্তৃত্ব এবং পিতৃপ্রধান সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পিতৃ-কর্তৃত্ব বা পিতৃব্যকর্তৃত্ব। পিতৃপ্রাধান্য যে মাতৃপ্রাধান্যের পরবর্তী নির্দিষ্ট সামাজিক স্তর এমন কথা আধুনিক নৃবিজ্ঞানীরা কেউ হলপ করে বলেন না। লাউই এরকম ধারাবাহিকতা বা স্তরভেদ অস্বীকার করেন। রিভার্সও অবশ্য এরকম স্তরভেদ পুরোপুরি গ্রাহ্য বলে মনে করেন না, কিন্তু তথ্যের দিক থেকে তিনি এই পর্যন্ত স্বীকার করেন যে প্রাথমিক সামাজিক স্তর হিসেবে মাতৃপ্রাধান্যের দাবি যুক্তিসহ বেশি। বাকোফেন, মর্গান, টাইলর থেকে শুরু করে এযুগের ব্রিফল্ট, হার্টল্যাণ্ড, কতকটা রিভার্স পর্যন্ত মাতৃপ্রধান সমাজকেই মানুষের আদি গোষ্ঠীসমাজ বলে স্বীকার করেছেন।

সুতরাং আমরা যদি বলি যে, মামা-ভাগনের সভ্যতাই মানুষের আদিসভ্যতার একটা রূপ, তাহলে বোধ হয় ভুল বলা হয় না। সভ্যতার নাট্যমঞ্চে 'মামা' একদিন যে-নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাতে কোন ভুল নেই। তিনি ছিলেন অন্যতম প্রথম নায়ক। মানুষের সমাজে মামার এই যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, এ সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানীরা অনেক চিন্তা, অনেক গবেষণা করেছেন। আধুনিক যুগে যাঁরা এই সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের মধ্যে রিভার্সের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আরও চমৎকার ব্যাপার হল এই যে, বাল্যকাল থেকে রিভার্স নিজে তাঁর মামা ডক্টর জেম্‌স হাণ্টের কাছে মানুষ হয়েছেন, এমন কি নৃবিজ্ঞানে তাঁর হাতেখড়িও হয়েছে এই মামার কাছে। জেমস হাণ্ট বিলেতের 'এ্যানথ্রপোলজিক্যাল্‌ সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রেসিডেণ্ট। মামা নিজে সে-যুগের একজন অন্যতম নৃবিজ্ঞানী হয়ে,

'মামা-ভাগ্নের সভ্যতাকে' ইতিহাসের একটা বিশেষ স্তর হিসেবে গণ্য করা যায়। সেইভাবে বিচার করলে আধুনিক সভ্যতাকে 'পিতা-পুত্রের সভ্যতা' বলা যায়। একদিকে পিতা-পুত্র, খুড়ো-ভাইপোর সভ্যতা, আর একদিকে মামা-ভাগ্নের সভ্যতা, এই হল সেই আদিম যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত মানুষের সভ্যতার দুটো যুগান্তকারী স্তর। পুত্রটিকে যদি 'কেন্দ্র' ধরা যায়, তাহলে একদিকে দাঁড়িয়ে থাকেন 'মামা' আর একদিকে 'বাবা'। সভ্যতার একটা বাঁকের মাথায় 'পুত্রে'র হাত ধরে একদিকে মামা টানছেন, ভাগ্নের উপর তাঁর কর্তৃত্ব তিনি ছাড়তে রাজি নন; আর একদিকে বাবা টানছেন তাঁর ঔরসজাত বংশধর সৃষ্টিধর পুত্রকে। মামা হাত ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন, বাবা তাঁর পুত্রের হাত ধরে এগিয়ে চললেন। সভ্যতার নতুন অভিযান শুরু হল। বাবা জয়ী হলেন, মামা বিদায় নিলেন। মামার যুগ অস্তাচলে গেল, আর বাবা-খুড়োর নতুন যুগের সেই উষাকাল থেকে আজ অপরাহ্নে পৌঁছেছি আমরা।

যাঁরা পাহাড় অঞ্চলে গেছেন বা থাকেন তাঁরাই মানুষের সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারবেন। দার্জিলিঙের জলা-পাহাড়ের মাথায় উঠে নিচের দিকে যত দূর দৃষ্টি যায় কেবল আঁকা-বাঁকা-ঢালু পথ আর এখানে-ওখানে গাছপালা, টুক্‌রো টুক্‌রো বস্তির গুচ্ছ দেখা যায়। দার্জিলিঙ জেলখানা অথবা হ্যাপি ভ্যালির চা-বাগানের কুলিবস্তি থেকে যদি সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছে ভাবা যায় তাহলে বুঝতে হবে আজ পর্যন্ত আমরা অনেক মেহনত করে জলা-পাহাড় বা 'টাইগার হিলে'র মাথায় উঠেছি। ওঠার পালা শেষ হয়ে গেছে যে তা নয়। এখনও সভ্যতা-হিমালয়ের অনেক উঁচু শিখর পার হতে হবে মানুষকে, অনেক নতুন আবিষ্কারের মুখোমুখি এসে আনন্দে অবাক্ হয়ে দাঁড়াতে হবে। সভ্যতায় কাঞ্চনজঙ্ঘা তো আছেই, এভারেস্টও আছে, হয়ত তার পরেও কিছু আছে। পৃথিবীর বিশাল মানবগোষ্ঠীর একাংশ কাঞ্চনজঙ্ঘায় পৌঁছেচে, বাকি আমরা যারা পৌঁছবার চেষ্টা করছি, তারা শুধু স্বপ্নাবিষ্টের মতন তার তরঙ্গায়িত তুষারশৃঙ্গে নতুন সূর্যোদয় দেখছি।

মামার কথা বলি। মামা আমাদের দার্জিলিঙ বাজারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছেন। হ্যাপি ভ্যালির কুলিবস্তি থেকে বাজার পর্যন্ত আমরা মামার হাত ধরে সভ্যতার পথে এগিয়ে এসেছি, আর বাজার থেকে জলা-পাহাড়ে পৌঁছেচি বাবা খুড়োর হাত ধরে। মামা শুধু একা বিদায় নিলেন না, তাঁর সঙ্গে সমাজের একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ সংস্থান বা গঠনও বিদায় নিল। সব চেয়ে বড় কথা হল, মামার সঙ্গে মা-ও বিদায় নিলেন। সভ্যতার রঙ্গমঞ্চ থেকে মা ও মামার এই বিদায় নেওয়ার ব্যাপার একটা যুগান্তকারী ঘটনা।

মা-র সঙ্গে মামার সম্পর্ক ভাই-বোনের সম্পর্ক। মা-র সামাজিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা মামা প্রয়োগ করেন। মাতৃ-প্রধান সমাজে এই বৈশিষ্ট্যই বেশি দেখা যায়। মা নিজে অথবা মাসিমারা প্রত্যক্ষভাবে শাসন করছেন, এ রকম নিদর্শন পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের মধ্যে নৃবিজ্ঞানীরা সামান্যই খুঁজে পেয়েছেন। উত্তর আমেরিকার দু-একটা আদিম জাতির মধ্যে মাতৃজাতির প্রত্যক্ষ সামাজিক শাসন-কর্তৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে ইরোকুয়ারা প্রধান। কিন্তু অধিকাংশ আদিম জাতির মাতৃপ্রধান সমাজে মাতুল-প্রাধান্যই দেখা যায়, অর্থাৎ মা-মাসিদের বদলে মামারা কর্তৃত্ব করেন। এই যে 'মাতুল-কর্তৃত্ব' প্রথা, একে নৃবিজ্ঞানীরা 'এভানকুলেট' (Avunculate) বলেন। অধিকাংশ নৃবিজ্ঞানীর মতে মাতৃপ্রধান সমাজ আর মাতুল-কর্তৃত্ব হল সভ্যতার একই স্তরের বিশিষ্টতা। এর ব্যতিক্রম যে আদিম সমাজে দেখা যায় না তা নয়। পিতৃপ্রধান সমাজে আজও-কোন কোন ক্ষেত্রে মাতুলপ্রাধান্য দেখা যায়। যেমন টোরেস স্ট্রেটস দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সমাজ পিতৃপ্রধান, কিন্তু সেখানে প্রাধান্য বা অধিকার পিতার চেয়ে আজও মামারই বেশি। আফ্রিকার আদিম জাতির মধ্যে এ রকম দৃষ্টান্ত আরও আছে। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের পিতৃপ্রধান সমাজে মামা একেবারে সর্বময় কর্তা। এই দৃষ্টান্তগুলি বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ডক্টর রিভার্স উল্লেখ করে বলেছেন যে, এই সব আদিম জাতি যে পূর্বেকার মাতৃপ্রধান সমাজ থেকে পিতৃপ্রধান সমাজে পৌঁছেচে, এই প্রথা তারই চিহ্নস্বরূপ আজও রয়েছে। ডক্টর লাউই এ-সম্বন্ধে ক্রো ও হিদৎস্তা

জাতির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, এরা মাতৃপ্রধান হলেও মাতুল-প্রাধান্য এদের মধ্যে দেখা যায় না। না দেখা গেলেও রিভার্সের কথাই ঠিক বলে মনে হয়। এ-সব ব্যতিক্রম হল মাতৃপ্রধান ও পিতৃপ্রধান সমাজের যুগ-সন্ধিক্ষণের প্রমাণ। সমাজবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম হিসেবে আজ একথা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে মাতৃপ্রধান সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মাতুলকর্তৃত্ব এবং পিতৃপ্রধান সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পিতৃ-কর্তৃত্ব বা পিতৃব্যকর্তৃত্ব। পিতৃপ্রাধান্য যে মাতৃপ্রাধান্যের পরবর্তী নির্দিষ্ট সামাজিক স্তর এমন কথা আধুনিক নৃবিজ্ঞানীরা কেউ হলপ করে বলেন না। লাউই এরকম ধারাবাহিকতা বা স্তরভেদ অস্বীকার করেন। রিভার্সও অবশ্য এরকম স্তরভেদ পুরোপুরি গ্রাহ্য বলে মনে করেন না, কিন্তু তথ্যের দিক থেকে তিনি এই পর্যন্ত স্বীকার করেন যে প্রাথমিক সামাজিক স্তর হিসেবে মাতৃপ্রাধান্যের দাবি যুক্তিসহ বেশি। বাকোফেন, মর্গান, টাইলর থেকে শুরু করে এযুগের ব্রিফল্ট, হার্টল্যাণ্ড, কতকটা রিভার্স পর্যন্ত মাতৃপ্রধান সমাজকেই মানুষের আদি গোষ্ঠীসমাজ বলে স্বীকার করেছেন।

সুতরাং আমরা যদি বলি যে, মামা-ভাগনের সভ্যতাই মানুষের আদিসভ্যতার একটা রূপ, তাহলে বোধ হয় ভুল বলা হয় না। সভ্যতার নাট্যমঞ্চে 'মামা' একদিন যে-নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাতে কোন ভুল নেই। তিনি ছিলেন অন্যতম প্রথম নায়ক। মানুষের সমাজে মামার এই যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, এ সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানীরা অনেক চিন্তা, অনেক গবেষণা করেছেন। আধুনিক যুগে যাঁরা এই সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের মধ্যে রিভার্সের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আরও চমৎকার ব্যাপার হল এই যে, বাল্যকাল থেকে রিভার্স নিজে তাঁর মামা ডক্টর জেম্‌স হাণ্টের কাছে মানুষ হয়েছেন, এমন কি নৃবিজ্ঞানে তাঁর হাতেখড়িও হয়েছে এই মামার কাছে। জেমস হাণ্ট বিলেতের 'এ্যানথ্রপোলজিক্যাল্ সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রেসিডেণ্ট। মামা নিজে সে-যুগের একজন অন্যতম নৃবিজ্ঞানী হয়ে

ভাগনেকেও নৃবিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করেন। রিভার্সের কিন্তু খুব বেশি এদিকে ঝোঁক ছিল না, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান তাঁর সাধনার বিষয় ছিল। মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ভিতর দিয়ে তিনি নৃবিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হন এবং ১৮৯৮ সালে হ্যাডনের অনুরোধে টোরেস স্ট্রেট্‌স্‌-এ কেম্ব্রিজ এ্যানথ্রপোলজিক্যাল অভিযানে যোগদান করেন। তারপর তিনি আরও অন্যান্য জায়গায় তাঁর গবেষণার কাজের জন্য যান, আমাদের ভারতবর্ষেও তিনি আসেন, দক্ষিণ-ভারতে টোডাদের মধ্যে থেকে তাদের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালান। ভারতবর্ষের আদিম সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে রিভার্সের গবেষণা অত্যন্ত মূল্যবান। আমাদের দেশের মাতৃপ্রধান সমাজ, মাতুল-প্রাধান্য, মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোন ও অন্যান্য আত্মীয়-বিবাহ, সগোত্র ও স্বজন-বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধে রিভার্সের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ভারতীয় সমাজ-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা অনুশীলনে আমাদের অন্যতম অবলম্বন বললেও ভুল হয় না।

সামাজিক নৃবিজ্ঞানে রিভার্স এক নতুন অনুসন্ধান-রীতির প্রবর্তক। মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হলে, রিভার্স বলেন, মানুষের স্বজন-সম্বোধন, স্বজন-ব্যবহার ইত্যাদির গুরুত্ব সব চেয়ে বেশি। প্রত্নবিদের অনুসন্ধানের উপায় যেমন মানুষের উৎপাদনের হাতিয়ার, ভূবিদ ও জীবাশ্মবিদের যেমন পাথর ও ফসিল, সমাজ-বিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীর তেমনি অনুসন্ধানের অন্যতম হাতিয়ার হল এই সব লুপ্ত ও বিলীয়মান স্বজন-রীতিনীতি (Kinship Usages)। বাবা, মামা, খুড়ো, ভাই-বোন ইত্যাদি স্বজন-সম্বোধনগুলি শুধু কথার কথা নয়, প্রত্যেক সম্বোধনের একটা ইতিহাস আছে, এবং প্রত্যেক সম্বোধনের সঙ্গে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন-ভাবে জড়িয়ে আছে সামাজিক ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব কর্তব্য ইত্যাদি পালনের একটা বাধ্য-বাধকতা। একথা আগের একটি রচনায় বলেছি। সুতরাং এই কথাগুলোও সমাজ-বিজ্ঞানীর কাছে অনেকটা জীবাশ্মবিদের ফসিলের মতন। সেগুলি অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করলে তিনি যাদের মধ্যে সেগুলি প্রচলিত তাদের সমাজ-

ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করতে পারেন। রিভার্সের আগে মর্গান, টাইলর এবং আরও অনেকে এর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু রিভার্সই সর্বপ্রথম এই অনুসন্ধান-রীতির ধারাবাহিক অনুশীলন করেছেন, আদিম মানব-সমাজের প্রত্যক্ষ গবেষণায়। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়, কারণ এর এত দিক আছে এবং তার প্রত্যেকটি দিক যে-কোন সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে এত বেশি আকর্ষণীয় যে, তার মধ্যে ডুবে যেতে হয়। আমি এখানে কেবল ঐ মামা-ভাগ্‌নের সম্পর্ক সম্বন্ধে বলব। স্বজন-রীতিনীতি অনুশীলনে রিভার্স কুল-বিচার-পদ্ধতির (Genaeological Method) সমর্থক। সেই পদ্ধতিতেই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে মামা-ভাগ্‌নের সভ্যতার বিশিষ্টতার বিচার করা যাক।

আমাদের সমাজের কথা বলি। আমাদের মধ্যে বাবা, কাকা, জ্যাঠা, দাদা-মশাই, ঠাকুরদা, দিদিমা, ঠাকুমা, দাদা, দিদি, মামা, মামিমা, মাসিমা, পিসিমা, পিসে-মশাই, মা ইত্যাদি যে-সব আত্মীয় সম্বোধন আছে, সেগুলির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যই প্রধান। তাই প্রায় প্রত্যেক আত্মীয়ের একটা বিশেষ ডাক-নাম আছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে আমরা এগুলো প্রয়োগ করি। আর আমরা সামাজিক ক্ষেত্রে যে-কোন মাতৃতুল্য মহিলাকে 'মা' বলে ডাকতে দ্বিধা করি না, কিন্তু পিতৃতুল্য কোন পুরুষকে আমরা হয় কাকাবাবু, না হয় জ্যাঠামশাই বা মেসোমশাই বলি, কিন্তু ভুলেও 'বাবা' বলে ডাকি না, এমন কি শ্বশুরকেও না। পুত্রবধূরা প্রাণের ভয়ে শ্বশুরকে 'বাবা' বলে ডাকেন। এর থেকে বোঝা যায়, 'বাবা' ডাকের মধ্যে আমরা একটা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি এবং তার মধ্যে একটা বিশেষ সামাজিক দায়িত্ব ও সম্পর্ক নিহিত আছে, যেমন বংশ-পরিচয়, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, কর্তৃত্ব ইত্যাদি। এ-সব পিতৃপ্রধান সমাজের বৈশিষ্ট্য। আমাদের সমাজ পিতৃপ্রধান ও ব্যক্তি-সর্বস্ব। তাই এত রকমের সম্বোধন, আর 'বাবা'র এত গুরুত্ব, এত

স্বকীয়তা। কিন্তু তাহলেও আমরা যে আগেকার বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে এই সমাজে এসেছি তারও চিহ্ন আজও আছে। তার পরিচয়, নৃবিজ্ঞানীরা যাকে সামাজিক বর্জন-প্রথা (Customs of Avoidances) এবং ঘনিষ্ঠতা-প্রথা (Privileged Familiarity) বলেন, তার ভিতর দিয়েই পাওয়া যায়। ঠাকুমা-ঠাকুরদা ও নাতি-নাতনীদের সম্পর্ক আমাদের দেশে রস-মধুর সম্পর্ক, 'বিয়ে' করবি বলে তাঁদের আদর করতেও শোনা যায়! যদি বলি, একসময় অতি প্রাচীন-কালে এ-রকম বিবাহপ্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহলে অনেকে হয়ত আঁতকে উঠবেন। নিউ হেব্রিডিসের পেন্টিকস্ট দ্বীপে আজও এই বিবাহপ্রথার প্রচলন আছে—ঠাকুমা-ঠাকুরদার সঙ্গে নাতি-নাতনীর বিয়ে। আরও রস-মধুর সম্পর্ক আমাদের সমাজে আছে যেমন—বৌদি-দেবর, জামাইবাবু-শালী ইত্যাদি। নিজের ভাইয়ের বিধবা 'বৌকে' বিয়ে করার রীতিকে (সাধারণত ছোটভাই বড়ভাইয়ের বৌকে) নৃ-বিজ্ঞানীরা 'লেভিরেট' (Levirate) বলেন এবং নিজের স্ত্রীর সহোদরাকে বিয়ে করার রীতিকে (সাধারণত স্ত্রীর ছোট বোনকে) 'সোরোরেট' (Sororate) বলেন। আমাদের রসিকতার সম্পর্ক থেকে বোঝা যায়, একসময় আমাদের দেশে লেভিরেট ও সোরোরেট—দুই বিবাহ-প্রথাই প্রচলিত ছিল। ঠিক তেমনি দেখা যায়, যৌবনকালে সহোদর ভাই-বোন এবং খুড়তুতো-জেঠতুতো ভাই-বোনের মধ্যে যাবতীয় সহজ সরল সম্পর্ক আমাদের পরিবারে নিষিদ্ধ বা 'ট্যাবু'। সাধারণত সম্ভাব্য যৌন সম্পর্কের মধ্যে (Potential Mates) পরবর্তীকালে এ-রকম ট্যাবু আরোপিত হতে পারে বলে নৃবিজ্ঞানীরা এই নিষেধ-প্রথাগুলিকে আগেকার সমাজের প্রচলিত যৌন সম্পর্কের স্মৃতি-নিদর্শন বলে মনে করেন। সুতরাং ভাই-বোন ও 'প্যারালাল কাজিনে'র মধ্যে বিবাহ-প্রথা প্রাচীন সমাজে যে ছিল তা এর থেকে আভাস পাওয়া যায়। তাছাড়া, নিজের ও খুড়তুতো-জেঠতুতো ভাই-বোন সম্পর্কে আমাদের এই নিষেধবিধি যতটা কড়া, 'ক্রস্‌-কাজিন' বা মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোন সম্পর্কে ততটা নয়। এমন কি ভয় বা নিষেধের দিক থেকে বিচার

করলে দেখা যায় যে, নিজের ভাই-বোনের চেয়ে মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনের স্বচ্ছন্দ মেলামেশায় ভয়টা হাজারগুণ বেশি। সুতরাং এই বিবাহপ্রথা দীর্ঘদিন সামাজিক রীতি হিসেবে যে এদেশে চালু ছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। আমি শুধু এখানে আমাদের 'সভ্য' পরিবারের স্বজন-সম্পর্ক নিয়ে বিচার করলাম। প্রকৃতপক্ষে এই সব বিবাহ-প্রথার অধিকাংশই যে আমাদের ভারতবর্ষে প্রাচীন ও আদিমযুগে প্রচলিত ছিল, তা আজও এ-দেশের আদিম অধিবাসীদের নানাবিধ সমাজপ্রথা থেকেই বোঝা যায়।

আমাদের আধুনিক পরিবারের মতন এত বিচিত্র স্বজন-সম্বোধন কিন্তু প্রাচীন বা আদিম মানব-সমাজে পাওয়া যায় না। সমাজের আদিস্তরের দিকে ধাপে-ধাপে যত নেমে যাওয়া যায় ততই দেখা যায়, স্বজন-সম্বোধনের 'শব্দগুলি' ক্রমেই সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়ে আসছে। স্বজন-সম্বোধনের একটা বিশেষ রীতি আদিম মানব-সমাজের ভিতর থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই রীতিকে নৃবিজ্ঞানীরা 'গোষ্ঠী-বিভক্ত রীতি' (Classificatory System) বলেছেন, আর আমাদের আধুনিক রীতিকে রিভার্স 'পারিবারিক রীতি' (Family System) বলেছেন। আদিম সমাজের এই 'গোষ্ঠী-বিভক্ত রীতি'র বৈশিষ্ট্য কি? মা, বাবা, ভাই-বোন ইত্যাদি কয়েকটি গোষ্ঠীতে সকলে বিভক্ত। একই 'মা' সম্বোধন, একই 'বাবা' সম্বোধন, একই 'ভাই' বা 'বোন' সম্বোধন শুধু পরিবারের মধ্যে নয়, গোটা ক্ল্যান্ বা সিব্-এর অন্তর্ভুক্ত সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন—

বাবা জ্যাঠারা কাকারা মামারা মেসোমশাইরা পিসেমশাইরা শ্বশুর	} সকলেই 'বাবা'

মা
মাসিমারা
মামিমারা
কাকীমারা
পিসিমারা
জ্যেঠিমারা
শাশুড়ী } সকলেই 'মা'

সহোদর
খুড়তুতো-জেঠতুতো ভাইবোন
মামাতো-পিসতুতো ভাইবোন
মাসতুতো ভাইবোন
শালা-শালী
স্বামীর ছোট ভাই-বোন } সকলেই 'ভাই ও বোন'

এইভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করে স্বজন-সম্পর্ক ও স্বজন-সম্বোধন আদিম মানব-সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় দেখা যায়। সাধারণভাবে এইটাই আদিম মানব-সমাজের স্বজন-সম্পর্কের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমেরিকার ডেকোটা জাতির মধ্যে প্রচলিত বলে লাউই একে 'ডেকোটা কিন্‌শিপ' বলেছেন, কিন্তু নৃবিজ্ঞানের ভাষায় একে 'ক্লাসিফিকেটরী কিন্‌শিপ' বলা হয়। এই পথ ধরে মামা-ভাগনের সভ্যতার বিশ্লেষণ করা যাক।

রিভার্স মেলানেসীয়া দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের সমাজ-ব্যবস্থা এই পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করে দেখেছেন, সেখানকার অধিকাংশ আদিম জাতির মধ্যে এই 'গোষ্ঠী-বিভক্ত' স্বজন-সম্বোধন রীতি প্রচলিত। লাউই এবং অন্যান্য বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানীরা আজ এই স্বজনসম্বোধন রীতিকেই আদিমসমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করেছেন। মামা ও বাবার সম্বোধন অধিকাংশ আদিম মানব-সমাজে তো একই, তা ছাড়া আরও একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রিভার্স লক্ষ্য করেছেন এই

সঙ্গে। যেমন ফিজি দ্বীপের আদিবাসীরা একই নামে এতগুলি মানুষকে ডাকে :

(ক)

মামা
পিসেমশাই
শ্বশুর
} = ভুঙ্গো

(খ)

পিসিমা
মামিমা
শাশুড়ী
} = ন্‌গেনাই

(গ)

পিসতুতো ভাই-বোন
মামাতো ভাই-বোন
শালা-শালী
দেবর-ননদ
} = ন্‌দাভোলা

গুয়াদালকেনাল দ্বীপপুঞ্জেও এই রীতি প্রচলিত, যেমন—'ক' গোষ্ঠীর জন্য 'নিয়া', 'খ' গোষ্ঠীর জন্য 'তারুঙ্গা' এবং 'গ' গোষ্ঠীর জন্য 'ইভা' শব্দ ব্যবহার করা হয়। এইরকম আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। রিভার্স বলেন যে, এই স্বজন-সম্বোধন থেকেই বোঝা যায় এগুলি সব মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনের বিয়ে থেকে উৎপত্তি। তবে এর মধ্যে কোথাও মামাতো বোনকে, কোথাও পিসতুতো বোনকে বিয়ে করার রীতি বেশি প্রচলিত, কোথাও দুই রীতিই সমান প্রচলিত। মামাতো এবং পিসতুতো উভয় বোনকে বিয়ে করার রীতিকে নৃবিজ্ঞানী র‍্যাডক্লিফ্‌ ব্রাউন 'বাইলেটারাল ক্রস্‌কাজিন ম্যারেজ' এবং শুধু মামাতো বোনকে বিয়ে করার রীতিকে 'ম্যাট্রিলেটারাল', পিসতুতো বোনকে বিয়ে করার রীতিকে 'প্যাট্রিলেটারাল, ক্রসকাজিন ম্যারেজ' বলেছেন। এর মধ্যে 'ম্যাট্রিলেটারাল ক্রসকাজিন ম্যারেজ' অর্থাৎ মামার মেয়েকে বিয়ে করার রীতি প্রচলিত বেশি দেখা যায় কেন?

মাতৃতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য মাতুলকর্তৃত্ব, ভাগনেরা মামার সম্পত্তি ভোগ করে, মামাদের সামাজিক কর্তৃত্বের অধিকার পায় এবং মাতৃকুল থেকেই বংশ পরিচয় হয়। 'বাবা' এই মাতুলালয়ে প্রায় অতিথির মতন, তাঁর কোন অধিকার পুত্রের উপর নেই, পুত্র তাঁর সম্পত্তিরও ভাবী মালিক নয়। মা তখনও বাবার 'দাসী' হননি বলেই এই সমাজব্যবস্থা। নারী ও পুরুষের অধিকার সামাজিক ক্ষেত্রে প্রায় সমান ছিল। বাবা সর্বময় 'প্রভু' হয়ে ওঠেননি। এ-ক্ষেত্রে এক-স্ত্রীর বহুস্বামী বা 'পলিয়্যাণ্ড্রি', 'গোষ্ঠীবিয়ে' এবং 'প্যারালাল কাজিন'দের বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকতে পারে। কারণ, প্রথমত নারী পুরুষের দাসী হয়নি, খুড়তুতো-জেঠতুতো ভাই-বোনরা তাদের মায়ের কুলান্তর্গত। একই কুলে বিবাহ নিষিদ্ধ হলে, অন্য কুলে বিবাহ করতেই হবে এবং যে সব জাতি মাত্র দুটি গোষ্ঠীতে বা 'ময়েটি'তে বিভক্ত, সেখানে মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনের বিয়েও স্বচ্ছন্দে হতে পারে। এ ছাড়া মামাতো বোনকে বিয়ে করার প্রথা সম্বন্ধে রিভার্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন।

মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রে পৌঁছবার যুগ-সন্ধিক্ষণে সম্পত্তির অধিকার নিয়ে সমাজে যে বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দেয়, ভাগনের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে মামারা সেই বিরোধ সাময়িকভাবে দূর করেন। ভাগনে হাতছাড়া শুধু নয়, কুলছাড়া হয়ে যাচ্ছে, মামার বদলে সে পিতার কবলিত হচ্ছে, মামার সম্পত্তির বদলে সে পিতার সম্পত্তির অধিকারী হচ্ছে। মামার সম্পত্তি থেকে ভাগনে বঞ্চিত হচ্ছে, কর্তৃত্ব থেকেও। যুগসন্ধিক্ষণের এই সম্পত্তির বিরোধ বিবাহপ্রথার ভিতর দিয়ে প্রচলিত করার চেষ্টা হয়। এইসময় মামাতো বোনকে বিয়ে করার রীতি খুব বেশি প্রচলিত হতে পারে বলে রিভার্স মনে করেন। সুতরাং 'ক্রস্-কাজিন' বিয়ের মধ্যেও প্রায় তিনটে স্তর নজরে পড়ে, দুটো তো স্পষ্ট।

বাইলেটারাল স্তর, প্যাট্রিলেটারাল স্তর, ম্যাট্রিলেটারাল স্তর-এর মধ্যে তিনটি স্তরই দুইটি 'ময়েটি'তে বিভক্ত আদিম মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হওয়া আশ্চর্য নয়, আর কেবল তৃতীয়টি মাতৃতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্রের যুগ-সন্ধিক্ষণের অন্যতম সামাজিক প্রথাও হতে পারে। মামা এই যুগ-

সন্ধিক্ষণ থেকে বিদায় নিচ্ছেন নিশ্চয়ই, এবং মানবসমাজে মামা-ভাগনের সভ্যতারও শেষ হয়ে যাচ্ছে এইখানে।

মানুষের সমাজ ও সভ্যতার এই সব বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য মিলিয়ে তার ক্রমবিকাশের ধারার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করাই নৃবিজ্ঞানী ও সমাজ-বিজ্ঞানীর কাজ। এই দুরূহ কাজে মানুষের 'টেক্‌নোলজি' বা উৎপাদন হাতিয়ারগুলি যেমন অত্যন্ত মূল্যবান, 'ইডিওলজি' বা ধর্ম, চিন্তা, দর্শন, পুরাণ-কথা, লোককথা ইত্যাদি যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি তার 'কিন্‌শিপ ইউসেজ' অর্থাৎ স্বজন-সম্পর্ক এবং স্বজন সম্বোধনের শব্দগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেমন 'ক্রস্-কাজিন' বিয়ের প্রথা যেখানে আছে, অথবা, 'লেভিরেট' ও 'সোরোরেট' প্রথা আছে, সেখানেই দেখা যাবে 'গোষ্ঠী-বিভক্ত' স্বজন-সম্বোধন বেশি—অর্থাৎ বাবা, খুড়ো, জ্যাঠা, পিসে, মামা ইত্যাদির বদলে 'বাবা', ঐ রকম 'মা' ও 'ভাই-বোন' ইত্যাদি সূচক শব্দের (kinship terms) প্রচলন বেশি। তাই যদি হয়, তাহলে তারপর দেখা যাবে এই সব বিবাহপ্রথা ও আত্মীয়তার সঙ্গে সম্পত্তি, কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব ইত্যাদির সমস্যা জড়িত আছে। সুতরাং এই ধারায় বিশ্লেষণ করলে আমরা সমাজের কাঠামোর পরিচয় পেতে পারি। এইভাবে আমাদের দেশেরও সামাজিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস লেখা যায়। এইজন্য আমাদের দেশের আদিম অধিবাসীদের স্বজন-সম্পর্ক ও স্বজন-সম্বোধন-সূচক শব্দগুলির অনুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাছাড়া বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদির মধ্যে যেসব বিভিন্ন বিবাহ-প্রথা, স্বজন-রীতি ইত্যাদির উল্লেখ বা অবশেষ পাওয়া যায়, সেগুলির পুনরুদ্ধার ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাহলে ভারতবর্ষের সামাজিক ক্রমবিকাশের স্তরগুলি আমরা স্পষ্ট জানতে পারি।

দ্বিপদ মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু

গরু ভেড়া ছাগল ঘোড়া কুকুর বেড়াল ও গাধার মতন 'মানুষ'ও এক জন্তু বিশেষ। এবং কে ভাল, কে মন্দ বলা সহজ নয়।

অন্তত প্রাণিবিজ্ঞানীরা তাই বলবেন। বলতে তাঁরা কুণ্ঠিত হবেন না, তাঁদের আত্মসম্মানেও বাধবে না। তবে জন্তুরও শ্রেণীভেদ আছে, ইতর-বিশেষ আছে। মানুষ স্তন্যপায়ী জন্তুর শ্রেণীভুক্ত এবং তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জন্তু। মানুষের যা-কিছু গর্বের বস্তু তা হল তার 'মস্তিষ্ক' এবং সামনের দুখানা 'শৃঙ্খলমুক্ত পা'—যার নাম দিয়েছি আমরা 'হাত'। মানুষের দেহের তুলনায় মস্তিষ্ক যে কত বড় তা অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদের সঙ্গে তুলনা করলেই বুঝতে পারা যায়। যেমন—

	দেহের ওজন	মস্তিষ্কের ওজন
	(কিলোগ্রাম)	
মানুষ	৬২	১'৩২
শিম্পাঞ্জী	৫৭	'৪৪
ওরাঙ ওটাঙ	৭৩	'৩৭
ঘোড়া	৩৭০	'৫৩
গরু	৫৭০	'৪২

	দেহের ওজন	মস্তিষ্কের ওজন
	(কিলোগ্রাম)	
বাঘ	১৮৫	'২৬
সিংহ	১৯০	'২৬
কুকুর	১৩'৫	'০৮
বেড়াল	৩'৩	'০২৫
জলহস্তী	১৩৫০	৫'৮
হাতি	৬৬৫০	৫'৭

এই তালিকাটা ভাল করে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে মস্তিষ্কের

দৌলতেই মানুষ নিঃসংশয়ে জীবশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছে। দাঁড়িপাল্লায় দেহ ওজন করলে একটা হাতির পাশে কম করেও একশ'জন মানুষ দাঁড় করাতে হবে, কিন্তু মাত্র চারজন মানুষের মস্তিষ্কের ওজন একটা বিশাল হাতির সমান। হাতিকে বশ করতেও মানুষের তাই বেগ পেতে হয়নি। আর কুকুর বেড়াল বাঘ সিংহ গরু ভেড়া ঘোড়া—এসব তো মানুষ বশীভূত করেছেই।

পাঠশালার গুরুমশাই আমাদের তোতাপাখির মতন বাল্যকাল থেকেই শিখিয়ে দেন যে কুকুর গরু ঘোড়া হল চতুষ্পদ জন্তু, গৃহপালিত প্রভুভক্ত, কেউ দুধ দেয়, কেউ পাহারা দেয়, কেউ গাড়ি টানে। ঠিক কথা, কিন্তু 'চতুষ্পদ' জন্তু সম্বন্ধে 'দ্বিপদ' জন্তুর এইটুকু জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। আমাদের সামনের পা দুখানা 'হাত' হয়েছে বলেই আমরা সোজা হয়ে চলতে শিখেছি, বাইরের ভয়ঙ্কর প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেছি। হাত আর মাথার দৌলতেই আমরা 'হাতিয়ার' গড়তে শিখেছি, সেই পাথুরে হাতিয়ার থেকে আজকের যুগের অ্যাটমিক হাতিয়ার পর্যন্ত। এই সংগ্রামের ফলে আমরা বাইরের বন্য প্রকৃতির রূপ বদলেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও অনেক বদলে গেছি। আমাদের মেরুদণ্ড সোজা হয়েছে, মস্তিষ্ক অনেক বড় ও শক্তিশালী হয়েছে, চেহারা বদলেছে। অন্যান্য জন্তুদের সংগ্রামের হাতিয়ার তাদের দেহের সঙ্গে সংলগ্ন, যেমন—দাঁত থাবা শুঁড় করাত ইত্যাদি। আমরা যে আজও নখ দিয়ে আঁচড়াই নে বা দাঁত দিয়ে কামড়াই নে তা নয়, তবু যে বন্য বর্বর হিংস্র জন্তুর মতন আমরা ব্যবহার করি নে তার কারণ নখ দাঁতের বদলে আমরা অন্তত লাঠি ছুরি বা ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারি। আমাদের ভাষা আছে, অন্য জন্তুর ভাষা নেই। আমাদের মুক্ত 'রূপান্তরিত পা' দিয়ে (হাত) আমরা লিখতে পারি, আঁকতে পারি, বীণাতন্ত্রে সুরের ঝঙ্কার তুলতে পারি, অন্য পশুরা তাদের 'শৃঙ্খলিত পা' দিয়ে তা পারে না। তাই আমাদের সমাজ আছে, সভ্যতা আছে, 'কালচার' আছে, জন্তুদের নেই।

তাহলেও মানুষ বা 'দ্বিপদ' জন্তুর কাল্‌চারের ইতিহাস লেখার সময় এই সব মূঢ় মূক ম্লানমুখ 'চতুষ্পদ' জন্তুর কাছে ঋণ না স্বীকার করে উপায়

নেই। এ-ঋণ সামান্য ঋণ নয়। যারা নিজেরা 'সভ্যতা' গড়তে পারল না, যাদের 'কালচার' বলতে কিছুই নেই, তারা তাদের দূর-সম্পর্কের 'ভাই-বোন'দের সঙ্গে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করল সভ্যতা ও 'কালচার' গড়তে। অবশ্য তারা যে স্বেচ্ছায় করেছে তা মোটেই নয়, তাদের পোষ মানিয়ে, বশ করে মানুষ তাদের দিয়ে করিয়ে নিয়েছে। সেটা মানুষেরই কৃতিত্ব, মানুষেরই বুদ্ধির বাহাদুরি, জন্তুদের নয়। যখন উড়োজাহাজ তো দূরের কথা, সামান্য গরুর গাড়ি পর্যন্ত আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি, ডুবোজাহাজ কেন, সামান্য জেলে ডিঙি পর্যন্ত জলে ভাসেনি, তখন শুধু মানুষের একমাত্র চরণই ভরসা, আর আশা হল ঐ পশু। কুকুর গরু ঘোড়া উট বশ করে তাদেরই পিঠে চড়ে অথবা টানা গাড়িতে চড়ে মানুষ এই মাটির পৃথিবীর এককেন্দ্র থেকে আর এককেন্দ্রে অভিযান করেছে। এইভাবে চলতে না পারলে সে-যুগের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত মানুষ। পশুর সবচেয়ে বড় দান হল—মানুষকে তারা এগিয়ে চলার শক্তি যুগিয়েছে। মানুষের আদিম বাহন হিসেবে পশু যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার তুলনা হয় না। শুধু চলার শক্তি হিসেবে নয়, খাদ্য হিসেবেও পশুর দান যথেষ্ট। যখন ফসল ফলাতে শেখেনি মানুষ, তখন এই সব বন্য পশু শিকার করে বনের ফলমূল আহার করেই তাকে বাঁচতে হয়েছে। তাছাড়া মানুষ বোধ হয় খাদ্য হিসেবে পশু লালন-পালন করতে শিখেছে ফসল ফলাবার আগেই। এইভাবে সভ্যতা ও কালচারের ভিত গড়ার সময় হাজার হাজার বছর ধরে যারা মানুষকে জীবনধারণের গতি, চলার শক্তি, সংগ্রামের প্রেরণা যুগিয়েছে, স্কুলপাঠ্য আদর্শ রচনার বইয়ে তারা 'চতুষ্পদ' বলে বর্ণিত হলেও, পরিচয় তাদের সেখানেই শেষ হয় না। অবশ্য কৃতিত্ব সবটাই মানুষের। বন্য হিংস্র জন্তুদের গৃহপালিত করে খাদ্য এবং মজুরশ্রেণীতে পরিণত করতে মানুষকে বুদ্ধি খাটাতে হয়েছে এবং সে-বুদ্ধি তার মস্তিষ্ক যুগিয়েছে। শুধু বুদ্ধি নয়, মানুষের হাতে-গড়া হাতিয়ার পশুর চাইতে তাকে শক্তিশালী করেছে। তবেই সভ্যতার বিরাট পিরামিড গড়ার কাজে মানুষ পশুকে কাজে লাগাতে পেরেছে।

সবরকমের পশু সব জায়গায় পাওয়া যায় না, তাই একই স্তরের

সভ্যতা একই সময় সর্বত্র গড়তে পারেনি মানুষ। উত্তর-আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা পেয়েছিল শুধু কুকুর, তাই যুগ যুগ ধরে তারা আদিম শিকারীর সভ্যতার চাইতে একধাপও উঁচুতে উঠতে পারেনি। মেক্সিকো, মধ্য-আমেরিকা, পেরু, বলিভিয়ার ইণ্ডিয়ানরা লামা ও আল্‌পাকাকে পোষ মানিয়ে চলে বেড়িয়েছিল, তাই তারা অনেক উন্নত সভ্যতা 'মায়া কালচার' গড়ে তুলেছে। আর খাদ্য এবং চলার বাহন হিসেবে গরু ঘোড়া ছাগল ভেড়া গাধা হাতি উট ইত্যাদি জন্তু লামা আলপাকাদের তুলনায় অনেক ভাল পুষ্টিকর, শক্তিশালী ও বেগবান, তাই মিশর মেসোপোতামিয়া চীন ও আমাদের ভারতবর্ষ জুড়ে এক বিশাল সভ্যতা প্রায় একই সময়ে গড়ে উঠেছিল, যা অন্যান্য সমসাময়িক সভ্যতার তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। শিকারী মানুষের সভ্যতা গড়েছে কুকুর, চাষী-কুমোরের কৃষিসভ্যতা গড়েছে গরু-ঘোড়া-মহিষ, আর এই সভ্যতাকে পিঠে করে দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে ঘোড়া ও উট।

আমাদের ভারতীয় সভ্যতার দৃষ্টান্ত দিয়ে পশুর দানের কথা বলছি। ভূগোলে আমরা ভারতবর্ষের যে মানচিত্র দেখতে পাই সেটা নিশ্চয়ই আকাশ থেকে এই আকারে মাটিতে পড়েনি। প্রকৃতিই ভারতবর্ষকে এই ভাবে গড়ে তুলেছে, হঠাৎ একদিনে বা একযুগেও নয়, যুগ যুগ ধরে শিল্পীর মতন খেয়ালী প্রকৃতি এই ভারতবর্ষের প্রতিকৃতি ভেঙেছে আর গড়েছে। ভারতবর্ষের ঠিক যে রূপটা আমরা এখন দেখতে পাই, খুব বেশি হলেও ছয় কোটি বছর আগে এইভাবে প্রকৃতি তাকে রূপায়িত করেছে। তারও আগে দক্ষিণভারত, অস্ট্রেলিয়া আর আফ্রিকা জুড়ে একটা বিশাল স্থলভাগ ছিল, আর বাকিটা ছিল মহাসমুদ্র। তারপর হিমালয়ের আবির্ভাব হয়—প্রায় ১৫০০ মাইল লম্বা, ১৫০ থেকে ২০০ মাইল চওড়া এবং কেন্দ্রীয় শিরায় প্রায় ২০,০০০ ফুট উঁচু একটা বিশাল পর্বতশ্রেণীর এই অভ্যুত্থানের ফলে ভারতবর্ষ কালক্রমে এই রূপধারণ করে। আগেকার সেই মহা-সমুদ্রের একটা অতিক্ষুদ্র অংশ আজও টিকে আছে—ভূগোলে তার নাম 'ভূমধ্যসাগর।'

হিমালয়ের অভ্যুত্থান আর স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব প্রায় একই

সময় ঘটে। তারপর স্তরে স্তরে মানুষ পর্যন্ত স্তন্যপায়ীর বিকাশ দেখেছে হিমালয়। হিমালয়ের পাঁজরে পাঁজরে কঙ্কালের (ফসিল) অক্ষরে লেখা আছে সেই ইতিহাস। যখন 'প্রথম মানুষে'র বিকাশ হল তখনও হিমালয়ের নিজেরই অভ্যুত্থানের পালা শেষ হয়নি। গা-মোড়া দিয়ে হিমালয় তখনও ঠেলে উঠছে ভূগর্ভ থেকে। সেই আদিম মানুষের আনাগোনা তখন হিমালয়ের গিরিপথ দিয়েই হয়েছে। এ ছাড়া আর অন্য কোনদিক থেকেই আদিম মানুষের যাতায়াত সম্ভব ছিল না তখন। চারিদিকেই তো সমুদ্র এবং কোন জলযানই তখন মানুষের জানা ছিল না। সুতরাং আজ নৃবিজ্ঞানীরা সকলেই প্রায় এ-বিষয়ে একমত যে হিমালয়ের গিরিপথ দিয়েই 'আদিম মানুষ' আনাগোনা করেছে এশিয়া মহাদেশ থেকে ভারতবর্ষে। তাছাড়া হিমালয়ের গিরিপথগুলো তখন (অর্থাৎ প্রায় পাঁচ থেকে দশ লক্ষ বছর আগে, আদিমতম মানুষের আবির্ভাবকালে) এতটা উঁচু ও দুর্লঙ্ঘ্য ছিল না। ভূবিজ্ঞানীরা বলেন যে গত পঞ্চাশ হাজার বছরের মধ্যেই হিমালয় আরও ৮০০০ থেকে ১০,০০০ ফুট ঠেলে উঠেছে। সুতরাং আদিম শিকারী মানুষের এই পথে আনাগোনা করা সম্ভব ছিল। তখন তার একমাত্র সঙ্গী ছিল কুকুর।

কুকুরের কঙ্কাল মহেঞ্জদড়ো-হড়প্পায় যা পাওয়া গেছে তা বিশেষজ্ঞদের মতে 'গ্রে-হাউণ্ড' এবং 'নেকড়ে' জাতীয়। অস্ট্রেলিয়ার 'ডিঙো' কুকুরের বংশধর বলেও অনেকে একে মনে করেন। ভারতের আদিমতম অধিবাসীরা নিগ্রো জাতীয় হলেও (?), আদিবাসীদের মধ্যে অস্ট্রেলীয় সাদৃশ্যই বেশি। অস্ট্রেলীয় আদিম শিকারী মানুষ তাদের কুকুর সঙ্গে করে কি তাহলে হিমালয়ের গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে আসতে পারে না? আমরা পাথুরে যুগের কথা বলছি, পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ বছর আগেকার কথা।

যখনকার কথা বলছি, তখন উত্তরভারতে মরুভূমি ছিল না। জল জঙ্গল যথেষ্ট ছিল, এমন কি মাত্র দু-তিন হাজার বছর আগেও ছিল। সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে গণ্ডার ও হাতির ছবি আঁকা শীলমোহর অনেক পাওয়া গেছে। কঙ্কালের টুকরোও যা পাওয়া গেছে তা থেকে

বিশেষজ্ঞরা আজ একবাক্যে স্বীকার করেন যে এ-অঞ্চলে জলাজঙ্গলই ছিল বেশি এবং হাতি, গণ্ডার ও মহিষ অসংখ্য ছিল একসময়। সিন্ধু অঞ্চলের মানুষই যে মহিষকে পোষ মানিয়েছিল তাও তাঁরা বলেন। উত্তরভারতের প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে গণ্ডার হাতি পরে আসাম সুন্দরবন ও টেরাই অঞ্চলে চলে গেছে। তবু সিন্ধু পাঞ্জাব অঞ্চলেই যে হাতি মহিষ ও গরু গৃহপালিত হয়েছে তাতে আজ আর কোন সন্দেহই নেই। গরুর চাইতে মহিষই এ-অঞ্চলের চাষীর জীবনে কাজে লেগেছে বেশি। সিন্ধু সভ্যতার এইসব পশুর দান অসামান্য, বিশেষ করে হাতি ও মহিষের।

আর্যদের আসার আগে (খৃস্টপূর্ব ১৬০০-১২০০) ভারতবর্ষে ঘোড়ার ব্যবহার দেখা যায় না। সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে ঘোড়ার কোন চিহ্নও পাওয়া যায়নি। অনেকে বলেন মধ্য-এশিয়ার স্টেপী অঞ্চলের ও দক্ষিণ রুশের আদিম জাতি প্রথমে ঘোড়া পোষ মানায়। এ নিয়ে মতভেদ আছে। তা থাক। আমরা দেখতে পাই, ভারতবর্ষে আর্যরাই প্রথমে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে এসেছে। এই বেগবান দুর্ধর্ষ ঘোড়া আর ধারালো লোহার অস্ত্রই তাদের জয়ী করেছে, হাতি-মহিষ ও তামার বিশাল সিন্ধুসভ্যতা তাদের কাছে হার মেনেছে। ঘোড়ার কাছে হাতির এই চরম পরাজয়ের ঘটনা ইতিহাসে আর একবার ঘটতে দেখা যায়—গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের দুর্ধর্ষ অশ্বারোহীদের কাছে যখন পুরুর হাতিরা সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পালায় তখন। আর্যদের কাছে শুধু ঘোড়া নয়, গরুও অন্যতম সম্পদ। সুতরাং আর্যসভ্যতাকে একদিক থেকে ঘোড়া ও গরুর সভ্যতা বলা যায়। 'সভ্যতা'র মাপকাঠিতে আর্যরা সিন্ধুবাসীদের চেয়ে অনেক নিম্নস্তরের ছিল, কিন্তু ঘোড়া বাহন হিসেবে এবং লোহা হাতিয়ার হিসেবে হাতি ও তামার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী বলে তারা জয়ী হল এবং পরে শত শত বছর ধরে এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে আদানপ্রদান করে তারা বিরাট 'হিন্দু কালচার' গড়ে তুলল।

এর পর সপ্তম শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে ইতিহাস, সে

হল ইসলামের ‘উট ও ছাগলের কাল্‌চারে’র ইতিহাস। উট অবশ্য ভারতবর্ষেও ছিল এবং সিন্ধুবাসীরা যে তাকে পালন করেছে তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু আরবদেশের ইসলামীয় সভ্যতায় সেরা দান হল উট ও ছাগলের। উট না থাকলে বিশাল মরুর বুকে পৃথিবীর এক অন্যতম সভ্যতা ‘ইসলামে’র বিকাশই হত না। তাই বোধ হয় এক উটেরই কয়েক হাজার প্রতিশব্দ আরবী ভাষাতে আছে যা আর কোন জন্তু বা জিনিসের নেই। উটের কাছে আরবী ভাষার ঋণ অসামান্য!

তারপর বৃটিশের আবির্ভাব আর এক যুগান্তকারী ঘটনা। তাদের জয় হল, কারণ গরু-ভেড়া-উট-ছাগলের শক্তি ও সভ্যতাকে তারা সহজেই হার মানাতে পারল ‘বাষ্প ও বিদ্যুৎ’ দিয়ে।

এইভাবে ইতিহাসের ধারা বিচার করলে দেখা যায় যে, চলার শক্তি মানুষের যত বেড়েছে, খাদ্য উৎপাদনের শক্তি যত বেড়েছে, তত সে ধাপে-ধাপে সভ্যতার আঁকা-বাঁকা পথে এগিয়ে গেছে। এগিয়ে চলার তার বিরাম নেই। একসময় পালিত পশু তার সভ্যতার সৌধ গড়তে সাহায্য করেছে, আজ করেছে বৈজ্ঞানিক শক্তি,—বাষ্প বিদ্যুৎ অ্যাটম্‌ ইত্যাদি। কিন্তু পশু যখন মানুষের একমাত্র সহায় ও সম্পদ ছিল, তখন অজস্র পশু ‘ব্যাঙ্কে’ সঞ্চয় করে বিত্তবান হবার উপায় ছিল না মানুষের। তাই বলে তখন মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদ যে ছিল না তা নয়, সবই ছিল, কিন্তু এত ভয়ঙ্কর, এত ব্যাপক ছিল না। এখন সমস্ত শক্তি কুক্ষিগত করার উপায় হয়েছে মুষ্টিমেয় মানুষের, করেছেও তাই তারা। আজ তাই মানুষে-মানুষে হানাহানির বিভীষিকা সর্বত্র এত বেড়েছে। ভবিষ্যতে আর আরও বাড়বে। শান্তি নেই মানুষের।
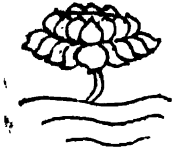
রূপ-দেখানো

রূপকথা নয়, কথার কথাও নয়, ইতিহাসের কথা। রূপকথা অর্থে রূপের কথা বলা যায় এবং রূপদেখানোর কথা ও রূপের কথা মিলিয়ে 'রূপ-দেখানোর রূপকথা' স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে। তবু এই নামের ও লেখার সামান্য একটু ইতিহাসে আছে, বলা প্রয়োজন। বিখ্যাত একটি ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে একদিন আমন্ত্রিত অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য মহৎ কিছু নয়, অসৎ কিছু তো নয়ই। সরল ভাষায় বলা যায়, উদ্দেশ্য পানভোজন ও রূপদর্শন। বিচক্ষণরা বলেন, তাতে হাড়গোড় পেশীস্নায়ু বেশ খানিকটা ঢিলে হয়ে যায়। দৈনন্দিন খাটা-খাটুনি ও চিন্তা-ভাবনাতে দৈহিক কলকব্জা যখন টাইট হয়ে থাকে, তখন ছেঁড়া তারের মতন সেগুলোকে আল্‌গা করার জন্য দরকার হয় ক্লাব-লাইফ। কথাটা একেবারে ব্লাফ নয়, কিছুটা সত্যি এর মধ্যে আছে। ক্লাবের উৎসবে তাই 'সভ্য' না হয়েও সভ্য ('মেম্বার') বন্ধুর অতিথিরূপে কতকটা 'অসভ্যে'র মতনই হন্তদন্ত হয়ে গিয়েছিলাম। বন্ধুটি অবশ্য আমার কিছু মনে করেননি, কারণ মনটা তাঁর মুক্তোর মতন ঝক্‌ঝকে জানি, কিন্তু বন্ধুরও বন্ধুরা ছিলেন। তাঁরা কে কি মনে করেছিলেন জানি না। বন্ধুটি যখন সোৎসাহে আমার সঙ্গে ক্লাবের বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তখন আমি 'ওর্‌সম্যান,' 'ব্যাট্‌সম্যান' এমন কি ভাল 'সেণ্টার ফরোয়ার্ড' নই বলে তাঁরা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে একটা সুদীর্ঘ 'ও—ও—' ধ্বনি করে হেসে অভ্যর্থনা করছিলেন, কেউ কেউ অভ্যাসবশত 'আই সি'-ও বলছিলেন। আমার অবস্থা তখন 'ইন্ দি সী'-র মতন, অথৈ জলে ব্যাঙাচির যেমন অবস্থা হয় তেমনি। কিন্তু তবু 'আই অ্যাম আই অ্যাম, ইউ আর ইউ আর, হি ইজ হি ইজ'—এই বীজমন্ত্রের জোরে মেরুদণ্ড খাড়া করে বসে পড়লাম ক্লাবঘরে।

খেলাধুলো শেষ হল, বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে কাপমেডেল বিতরণ করা হল। সন্ধ্যার পর মহিলারা প্রায় সকলেই এবং মহোদয়ারা কেউ কেউ চলে গেলেন। রাত্রি-আটটার সময় ফিরে এলেন তাঁরা নাইট-পোশাক পরে। পানভোজন, নৃত্যবাদ্যোৎসব শুরু হল। রূপদর্শনে বিভোর হয়ে গেলাম, কিন্তু বিভ্রান্ত বা উদ্‌ভ্রান্ত হইনি। দেখলাম, মহিলারা সকলে বাক্স-আলমারী উজাড় করে যাঁর যা সেরা পোশাক ও অলঙ্কার ছিল—সব পরে এসেছেন এবং এসেই শুধু ক্ষান্ত হননি, হাত নেড়ে, চোখ ঘুরিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে সেগুলি দেখিয়ে পরস্পরকে অভ্যর্থনা করছেন। মনে হল, সকলেই বলতে চান 'আমাকে দেখুন,' অথচ এই দেখাদেখির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কে-কাকে দেখে তার ঠিক নেই। আপনি যে বেশিক্ষণ কাউকে দেখবেন তারও উপায় নেই, অশিষ্টতা হবে। কারও কানের কুণ্ডল বা হীরের ভোমরা দেখছেন হয়ত তন্ময় হয়ে, এমন সময় আর-একজনের পেনড্যাণ্ট থেকে দ্যুতি ঠিকরে এল? না দেখে উপায় নেই। দ্যুতি ম্লান হতে না হতে তৃতীয় জনের মনসার ঘটের মতন সর্পফণাতুল্য খোঁপার 'ক্লোজ-আপ' দেখা গেল চোখের সামনে। আপনার মনে হল—'বিবিধ কুসুমে বাঁধিল কবরী শিথিল না ভেল ডোরী', মনে মনে আওড়ে নিলেন—

ধনী কানড়া ছাঁদে বাঁধে কবরী,
বন মালতী মালা তাহি উপরি।
দলিতাঞ্জন গুঞ্জ কলা কবরী,
ক্ষণ উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী।

একবার চেয়ে দেখলেন তাঁর দিকে। এমন সময় চতুর্থ জন এলেন—'নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরিটা, তাহে কাজর শোভিত নীল ছটা'—অতএব না দেখে উপায় নেই। দেখতে না দেখতেই, 'বাহুর বলয়া মো করিব শঙ্খচূড়' মনোভাব নিয়ে হাতঘুরিয়ে আর একজন এসে সামনে দাঁড়ালেন। গলায় গজমতি সাতসেরী হারের যুগ চলে গেছে, কিন্তু তবু তার আধুনিক সংস্করণটির দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যখন তিনি টেবিলের ওপর থেকে গলা বাড়িয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন, তখন তাঁর দিকেও একবার আপনার ফিরে চাইতে হল। কত আর দেখবেন? চোখ মাত্র

দুটো, তাই দিয়ে কি সব দেখা যায়? দেখতে দেখতে চোখ ক্রমে কপাল থেকে তালুতে উঠলেও দেখার আশা মিটবে না। নিউটন বলেছিলেন—'বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি নুড়ি কুড়ুচ্ছি, সামনে রয়েছে অসীম জ্ঞান-সমুদ্র, কূলকিনারা নেই তার।' আপনিও নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন—'আমি তো সেদিনকার শিশু, সোফায় হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে ফিডীং বট্‌ল চুষছি; সামনে আমার নারীর অগাধ রূপসমুদ্র, তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ, অমৃত-মন্থনের শক্তি নেই!'

রূপ-দেখানোর এই শহুরে মেলায় বসে কত কবির কত রূপের বর্ণনা, বেশভূষার বর্ণনার কথা আমার যে মনে পড়ছিল তার ঠিক নেই। পরোটায় জড়ানো শিককাবাব খেতে খেতে আবোল-তাবোল অনেক কথা ভাবছিলাম। এত পোশাকের বাহার, এত অলঙ্কারের বৈচিত্র্যের কারণ কি? আমি অবশ্য কোনদিনই গোঁড়ামির পক্ষপাতী নই। ক্লাবমহিলাদের সেকালের কুলমহিলাদের মতন কবিকল্পিত বেশে আমি কোনদিনই দেখবার প্রত্যাশা করি না—

শিরো যদবগুণ্ঠিতং সহজরূঢ়লজ্জানতং।
গতং চ পরিমন্থরং চরণকোটিলগ্নে দৃশৌ॥

অর্থাৎ ঘোমটা-ঘেরা মাথা, স্বতঃই লজ্জাবনত, চলন মন্থরগতি, চোখ চরণের দিকে নিবদ্ধ—এরকম কুলমহিলাদের এখনও যাঁরা দেখবার প্রত্যাশা করেন, আমি তাঁদের একজনও নই। সম্ভব নয় দেখা। কুলমহিলাদের যুগ কেটে গিয়ে ক্লাবমহিলাদের যুগ এসেছে এখন। লোকসংখ্যা বেড়েছে দশগুণ, রাস্তাঘাটে ট্রাফিক বেড়েছে। সুতরাং অবগুণ্ঠনের প্র্যাক্‌টিক্যাল অসুবিধা আছে এবং অবগুণ্ঠিতা মহিলা 'সেফ্‌টি ফার্স্টে'র নিয়ম পদে পদে লঙ্ঘন করে ঝামেলা বাড়াবেন। 'লজ্জানতং' হয়েও পথেঘাটে চলা সম্ভব নয়, কারণ বাসে-ট্রামের ভিড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। চরণকোটিলগ্নে দৃষ্টি নিবদ্ধ করাও অসম্ভব। আর বর্তমান যুগে চরৈবেতির স্পীড এত বেড়েছে যে 'গতং চ পরিমন্থরং' খাপ খায় না তার সঙ্গে, খট্‌খটিয়ে চল্‌তেই হয়। অতএব পোশাক বদলানো ছাড়া উপায় নেই। সেকালের কবিরা 'বচঃ পরিমিতং চ যন্মধুরমন্দমন্দাক্ষরং'

সম্বন্ধেও অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু পরিমিত মৃদুমধুর বাক্যে সবসময় কথা বলাও মহিলাদের পক্ষে এযুগে সম্ভব নয়।

টেবিলে ব কথাগুলো ভাবছি, এমন সময় 'ঝং' করে বাজনার শব্দ হল। নাচ আরম্ভ হবে। পুরুষ-নারীর যুগ্ম-নৃত্য—হাত তুলে বাজনার তালে তালে চতুষ্পদ নৃত্য। দুজনের চারখানি পায়ের সঞ্চালন-কৃতিত্ব রীতিমত উপভোগ করবার মতন। বাহু ঊর্ধ্বে উত্তোলিত-কেন্দুবিম্বের কবি জয়দেবের ভাষায় বলা যায়—'ভ্রূবল্লীকমলীকদর্শিত-ভুজামূলাদধর্বধৃষ্ট স্তনং'। টীকা করলে অর্থ হয়—'ছলেন দর্শিতভুজামূলাদ-ধর্বদৃষ্টঃ স্তনো যত্র তৎ অতএব মুগ্ধমনোহরং'। বাংলা ভাষায় বলা যায়—চঞ্চল ভ্রূযুক্ত নয়ন, ছলক্রমে ভুজমূলোত্তলনে স্তনমণ্ডলের অর্ধাংশ প্রদর্শনাদি দ্বারা বিচিত্র মনোহর ভাবমণ্ডিত চতুষ্পদ যুগ্মনৃত্য। মনে হয়, এতই যদি করলে ধনি, তাহলে আধাআধি কেন? সাঁওতালদের নাচ দেখেছি, মুণ্ডা-হো-কোল-ভীলদের নাচও দেখেছি, কোন আধা-আধির ব্যাপার নেই সেখানে, কোন ছলছলনাক্রমে ভুজামূলাধর্বধৃষ্ট স্তনং-এর কারিগরি নেই। নৃত্যের আরণ্যক উদ্দামতার সামনে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে মনে হয়, পরিস্ফুট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পিঙ্‌পঙ বলের মতন নাকের ডগায় ছিট্‌কে এসে লাগল বুঝি! এখানে তা মনে হয় না। অথচ তাই মনে করার জন্যই ক্লাব করা, ক্লাবে নৃত্যোৎসবের আয়োজন করা। নাগরিক জীবনের যান্ত্রিক রুটিন থেকে মুক্ত হয়ে নিরাভরণ আরণ্যক জীবনের অবাধ স্বচ্ছন্দতা একটু টেস্ট করে দেখার জন্যই তো ক্লাব! সদিচ্ছা আছে, সাহস নেই। ইচ্ছা আছে, জোর নেই মনের। সাহসের রঙচঙে মুখোস আছে, আত্মবিশ্বাস নেই। 'ড্যাশ্' আছে সকলের, কিন্তু 'ডেয়ারিং' কেউ নন। তাই সমস্ত উৎসবটা মনে হয় যেন কৃত্রিমতার সোনালি রাংতায় মোড়া, প্রাণের স্পর্শ নেই, রং নেই, তরঙ্গের ফেনিল উচ্ছ্বাস নেই, জীবনের বালুতটের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবার মতন বন্ধনহীন আবেগ নেই। অথচ বাসনা আছে, এইটাই ট্রাজিডি! জর্জেট-ক্রেপ-সিল্কের মসৃণতায় অঙ্গের তরঙ্গায়িত ভঙ্গী প্রতিফলিত করে ভুজমূলোত্তলন করে চতুষ্পদ নৃত্য করলেই যদি টাটকা সবুজ জীবনের স্বাদ পাওয়া যেত, তাহলে তো কথাই

ছিল না। জীবনটা মাইনে-করা মালীর হাতে তৈরি সবুজ ঘাসের লন্ নয় যে যখন খুশি 'মোয়ার' দিয়ে ছেঁটে ফেললাম এবং জলসিঞ্চন করে ঘাস গজিয়ে তুললাম। তা যদি হত, তাহলে লুকিয়ে চুরিয়ে আমার মতন কচিঘাসবঞ্চিত যারা তারাও একবার লনে ঢুকে একটু ঘাস চিবিয়ে আসত। শকুন্তলার হাতের ঘাস না হলেও ক্ষতি ছিল না, মালীর হাতের ঘাসেই চলত। কিন্তু—জীবনটা তা নয়, তা হতে পারে না, তা হয় না, তা হয়নি কোনদিন। কি করে ক্লাবের মহোদয় ও মহিলাদের বোঝাব এই সহজ কথাটা! আর বোঝালেই বা তাঁরা বুঝবেন কেন? পোশাক সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে হয়ত হ্যামলেটের মতন তাঁরা বলবেন—'The apparel oft proclaims the man', যদিও কি 'প্রক্লেম' করছে তা জ্রক্ষেপও করবেন না। রসেটির মতন বলবেন—

Fond of fun
And fond of dress and change and praise,
So mere a woman in her ways. —(D. G. Rossetti)

আমি যদি বলি: 'What a deformed thief this fashion is?' তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে সেক্সপীয়রের ভাষায় উত্তর দেবেন: 'All this I see, and I see that the fashion wears out more apparel than the man. But art not thou thyself giddy with the fashion too that thou hast shifted out of thy tale into telling me of the fashion?' —*Much Ado about Nothing*, iii 3)। বলবার নেই কিছু। সামান্য কিছু শোনবার আছে, শুনুন। পোশাক ও ফ্যাশান সম্বন্ধে দুচার কথা, অর্থাৎ সেই সনাতন রূপদেখানোর রূপকথা।

সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করে অনেকের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম। অস্পষ্ট, আধাস্পষ্ট, অনেক মুখ। একেবারে সেই আদিম অরণ্যের যুগ থেকে আধুনিক শহরের যুগ পর্যন্ত অনেক পুরুষ, অনেক মহিলার মুখ। মুখ দেখেই মনের ভাব বোঝা যায়। আদিম ঈভ আদমকে দেখে লজ্জায় জিব কেটেছিলেন কি না তা কেউ স্বচক্ষে দেখেননি। তবে আজও অরণ্যে,

পর্বতে আদিম জাতির অনেক ঈত বাস করেন। কেবল বনের লতাপাতা আজও যাঁদের অঙ্গের একমাত্র আভরণ, এরকম আদিম বন্য জাতিরও অভাব নেই। লজ্জাসঙ্কোচের কোন চিহ্ন নেই তাঁদের মনের মধ্যে কোথাও, মুখে তার রক্তিম আভাও ফুটে ওঠে না। তবু সর্বাঙ্গে লতা-পাতার আভরণ কেন? কেনই বা প্রায়নগ্ন দেহটাকে ক্ষতবিক্ষত করে অলঙ্কৃত করার চেষ্টা? ট্যাটুইং ইত্যাদির কথা বলছি। ব্লাউজ বা বুশ-শার্ট পরে আমরা জন্মাইনি এবং আমাদের আদিম পূর্বপুরুষরা বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় নি। তবু তারা অসহ্য কষ্ট সহ্য করেও দেহকে চিত্রিত করেছে কেন, কেন বনের ফুল লতাপাতা ছিঁড়ে অঙ্গের ভূষণ করেছে, নানারকমের জন্তুর হাড় ও পাথরের টুকরো সযত্নে গেঁথে গলার হার, মাথার অলঙ্কার তৈরি করেছে? কেন? এই 'কেন' নিয়ে অনেক বিজ্ঞানী, অনেক শিল্পী, অনেককাল ধরে মাথা ঘামিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। 'কেন'র উত্তর দিতে গিয়ে তাঁরা কেউ বলেছেন 'সঙ্কোচ' (Modesty), কেউ বলেছেন 'অলঙ্করণ' (Decoration), কেউ বলেছেন 'রক্ষণাবেক্ষণ' (Protection)। 'সঙ্কোচ' সম্পর্কে প্রথমেই বলা যায়, সঙ্কোচ থেকে আদিম তালীপত্রের কর্ণকুণ্ডল বা আধুনিক জর্জেট শাড়ি, কোনটারই উৎপত্তি হয়নি। অলঙ্করণের যুক্তি অনেক জোরালো অর্থাৎ রূপ-দেখানো ও রূপচর্চা, নিজেকে চলন্ত প্রদর্শনী করে তোলা মানুষের আদিমতম মনোবৃত্তি। তা না হলে বন্য যাযাবর শিকারীর স্ত্রীর বসে বসে বিনিয়ে বিনিয়ে লতাগুল্মের আভরণে অঙ্গসজ্জা করার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেহের উপর বন্য অলঙ্কার কেবল রূপ দেখানোর মনোভাবকেই প্রকাশ করে, সঙ্কোচ বা লজ্জার কোন বালাই নেই তার মধ্যে, রক্ষণাবেক্ষণের যুক্তিও ধোপে টেঁকে না। কিন্তু প্রচণ্ড শীতগ্রীষ্মের মধ্যে পোশাকের রক্ষণাবশ্যকতা অস্বীকার করা যায় না। কার্লাইলের কথা মনে পড়ে: '...and the clothes are not for triumph but for defence...Girt with thick, double-milled kerseys; half-buried under shawls and broadbrims, and overalls and mud boots, thy very fingers encased in doeskins and mittens...'—

কিন্তু কেবল বেঁচে থাকার জন্য যে খাওয়া, তার জন্য চপ কাটলেট কোর্মা কোপ্তার দরকার হয় না যেমন, তেমনি কেবল আচ্ছাদনের জন্য যে পোশাক তার জন্য কয়েকদিন অন্তর ব্লাউসের 'কাট্' পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না, অলঙ্কারের ডিজাইনও রাতারাতি বদলাবার দরকার হয় না। সুতরাং আচ্ছাদন একটা কারণ হলেও—খুব বড় কারণ বা আসল কারণ কখনই নয়। তা যদি হত তাহলে একালের এত 'ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স' চলত না এবং এত 'কাটার'ও বেঁচে থাকত না। তাহলে কারণটা কি? ঘুরেফিরে সেই একই প্রশ্ন। প্রধান কারণ অলঙ্করণ এবং অলঙ্করণের প্রধান উদ্দেশ্য রূপ-দেখানো ও রূপবাড়ানো। সঙ্কোচ, লজ্জা ব্রীড়া—এসব কি তাহলে একেবারেই নেই, এমন কি শালীনতা ও শ্লীলতাবোধ পর্যন্ত। শুধু-শুধুই কি কবিরা এত কল্পনা এবং এত বাক্য ব্যয় করেছেন? সুতরাং সঙ্কোচ, লজ্জা বা শালীনতা কিছু একটা বস্তু নিশ্চয় আছে, বিশেষ করে পোশাকী সভ্যসমাজে। কিন্তু এই শ্লীলতা ও লজ্জা বস্তুটি কি? রূপ-দেখানোর ঠিক বিপরীত মনোভাব থেকে শ্লীলতা ও সরমের জন্ম (লজ্জা-সরমের 'সরম' কথাটি মনে হয় modesty-র প্রতিশব্দ হওয়া উচিত)। বিজ্ঞানীরা বলেন: 'Modesty is in fact a reaction against self-display' এবং আত্মপ্রদর্শনই হল আসলে আদিমতম মনোবৃত্তি। সভ্যতার কয়েক ধাপ এগিয়ে সরমের উৎপত্তি হয়েছে এবং আত্মপ্রদর্শন বা রূপ-দেখানোর বিরুদ্ধে মানসিক প্রতিক্রিয়াই হল সরমের মূলকথা। এইবারই কিন্তু আসল গণ্ডগোল। পোশাক সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। অত্যন্ত জটিল, অত্যন্ত রহস্যময় প্রশ্ন। বড় বড় বিশেষজ্ঞরা এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঠোকাঠুকি করে অবশেষে চুপচাপ গম্ভীর হয়ে আছেন। সমস্যাটা কি?

অলঙ্করণের উদ্দেশ্য হল রূপ-দেখানো, পোশাকেরও উদ্দেশ্য প্রধানত তাই। ফ্যাশানেরও উৎপত্তি এই রূপ-দেখানো ও রূপসীদের আভিজাত্য-বোধ থেকে। কিন্তু শ্লীলতা ও সরমের উদ্দেশ্য হল রূপ না দেখানো, রূপ কেউ দেখে ফেলল মনে করে সসম্ভ্রমে সঙ্কুচিত হয়ে যাওয়া। গোপীচাঁদের গীতে উদুনা রানী যখন—

খসাইয়া ফেলে হার কেয়ূর কঙ্কণ
অভিমানে দূর করে যত আভরণ।
নাকের বেসর ফেলে পায়ের নূপুর
পুছিয়া ফেলিল সব সিঁথির সিঁদুর।

তখন তাঁর রূপ-দেখানোর দরকার নেই বলেই খুলে ফেলে দিলেন সব অলঙ্কার। কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের—'সিঁথির সিন্দূর নয়নে কাজল মুকুতা শোভিত নখে', 'মুকুতা প্রবাল মণিময় হার পোতিক মাণিক যত', 'কস্তুরি চন্দন অঙ্গের ভূষণ, দেখিতে অধিক জোরি', 'কিঙ্কিণী কিনি কিনি, কঙ্কণ কন কন, ঘন ঘন নূপুর বাজে', কৃষ্ণকীর্তনের 'কাঞ্চুলি ভাঙিয়া তন বিগুলিত', অথবা গোবিন্দদাসের—

বেনন পাটের জাদে বাঁধিয়া কবরী
বেড়িয়া মালতী মালে।
সিঁথায় সিন্দূর লোচনে কাজল, অলকা তিলকা
চারুভালে।
চরণ কমলে রাতুল আলতা বাজন নূপুর বাজে।

অথবা নীল বসন মণি বলয়া বিরাজিত, উচ্চ কুচ কুঞ্চকভার, শ্রবণহি টাকট মণিময় হাটক কণ্ঠে বিরাজিত হার' ইত্যাদি রূপ-দেখানোর রূপকথা ছাড়া কিছু নয়। এমন কি কপালে কাজলের টিপ, হাতে ইন্দুকিরণস্পর্ধী শাদা পদ্মডাঁটার বালা ও তাগা, কানে কচি রিঠা ফলের দুল, কেশ স্নানস্নিগ্ধ ও কবরীতে তিলপল্লব নিবদ্ধ করে পল্লীবধূরা যখন গ্রামের পথে যান তখন 'পান্থান্ মন্থরয়ত্যানাগরবধূর্বগসৎ বেশগ্রহ,'—বেশ দেখে পান্থদের পথচলার গতিও মন্থর হয়ে আসে। শ্রুতিমূলে চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল পরেই হোক, অথবা 'বকুলমালা দিয়া কুন্তল টানিয়াই' হোক, যে-কোন উপায়ে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তার উদ্দেশ্য। এই রূপ-দেখানোর আদিম প্রবৃত্তির সঙ্গে পরবর্তীকালের সম্ভ্রম ও সরমবোধ যুক্ত হয়ে এক প্রচণ্ড মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে রূপসীদের মনে। 'মডেস্টির' মূলকথা রূপ ঢেকে রাখা আর অলঙ্করণের বড় কথা রূপ জাহির করা। অনেকে বলেন, 'মডেস্টি' হল সূক্ষ্ম মনের আবিষ্কৃত

আকর্ষণের নতুন টেকনিক মাত্র। রূপ ঢেকে রাখবার ভাণ করে রূপ-দেখানোই তার আসল কথা। কাঁচুলির উপর ঘন ঘন কাপড় টেনে দেওয়ার দৃষ্টান্তটি এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সরমে ঢেকে রাখা এবং প্রদর্শনের প্রবৃত্তিবশে উদাসীনের আঙুল দিয়ে আত্মরূপ দেখানো—এই দুই উদ্দেশ্যই এখানে মনের কোণে লুকিয়ে থাকে। বিশেষ করে, রূপ-দেখানোর বয়সে, অর্থাৎ কৈশোরে ও যৌবনে এই দুই পরস্পর-বিরোধী বাসনা অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে এবং বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে কমে যায়। তার মানে যখন দেখাবার মতন অবস্থা থাকে তখনই দেখানো ও না-দেখানোর দ্বন্দ্ব সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। খুল্লনার যখন বয়স হচ্ছে—'খুল্লনা বাড়য়ে দিনে দিনে' তখন—

গলে শতেশ্বরী হার শোভে নানা অলঙ্কার
করে শঙ্খ শোভে তাড় বালা।
কুচশ্রী দাড়িম্ব ফল মাঝা মৃগরাজ তুল
উরু যুগ জিনি রামকলা॥
গুরুয়া নিতম্ব ভরে দিনে আন বেশ ধরে
চলে রাজহংসের গমনে।
রণে নূপুর বাজে নব নৃপ যেন সাজে
হেন মতে বাড়য়ে যৌবনে॥

(কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী)

গলায় 'শতেশ্বরী হার', হাতে 'তাড়বালা', আর 'গুরুয়া নিতম্ব ভরে' রাজহংসের মতন পথচলা—সবই কিন্তু খুল্লনার অজানা ধনপতির উদ্দেশে করা।

দেখানো ও না-দেখানো, অর্থাৎ 'ডেকরেশন' ও 'মডেস্টি'—এই দুয়ের দ্বন্দ্বই হল সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ অলঙ্কারের গোড়ার কথা। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ফ্লুগেল (J. C. Flugel) বলেন যে এই দুই বিরোধী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বই হল 'the most fundamental fact in the whole psychology of clothing'। পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে সবসময় আমরা এই বিরোধের মীমাংসা করার চেষ্টা করছি, চেষ্টার বিরাম নেই।

এই বিরোধের মোটামুটি সমন্বয় থেকে, ম্যাকডুগাল (Macdougall) বলেন, 'Coyness' বা 'ন্যাকামি'র উৎপত্তি হয়েছে। লজ্জায় ঘাড় বেঁকিয়ে খোঁপা দেখানো, বারংবার কাঁচুলির উপর কাপড় টেনে শ্লীলতাবোধ জাহির করা, কথায় কথায় হাত ঘুরিয়ে ঘোমটাটানার সময় সোনার চুড়ি-কঙ্কণের ঝঙ্কার শোনানো, অনুগামী সম্বন্ধে সচেতন হয়ে 'গুরুয়া নিতম্ব ভরে' রাজহংসের মতন চলা, অথচ লজ্জায় ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে থমকে যাওয়া—এসব হল অলঙ্করণ ও সরম, ডেকরেশন ও মডেস্টি, রূপ-দেখানোর ও না-দেখানোর দ্বন্দ্বজাত 'ন্যাকামি'র দৃষ্টান্ত। দুটি বিরোধী প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব যদি সবসময় মনের মধ্যে চলতে থাকে, তাহলে তা থেকে ক্রমে 'নিউরসিস' দেখা দেয় এবং তখন আর হাবভাব বা চলনধরন সম্বন্ধে কোন চেতনাই থাকে না। শুচিবায়ের মতন বিশেষ ভঙ্গিতে চলার বায়, ভ্রূভঙ্গির বায়, কাপড়ের আঁচল টানার বায় ইত্যাদি অনেক-রকমের বিচিত্র বায় দেখা দেয়। রূপ-দেখানোটা তখন আর সচেতন মনের ইচ্ছা থাকে না, অবচেতন মনের ইচ্ছা হয়ে ওঠে। ফ্লুগেল সাহেব এইজন্য পোশাকপ্রসঙ্গে একটি চমৎকার কথা বলছেনঃ······'it may indeed be said that clothes resemble a perpetual blush upon the surface of humanity.'

আগে বলেছি, একদিকে রূপ-দেখানোর প্রবৃত্তি আর একদিকে রূপ না-দেখানোর প্রবৃত্তি, এই দুই বিরোধী মনোবৃত্তির দ্বন্দ্বই পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের মূলকথা। এইদ্বন্দ্ব থেকেই আধুনিক 'ফ্যাশানে'র জন্ম। ফ্যাশানের ইতিহাস নৃবিজ্ঞানীরা ও মনোবিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছেন, প্রত্যেকটি ফ্যাশানের আবির্ভাব থেকে অবলুপ্তি পর্যন্ত এই দুই প্রবৃত্তির সংঘাতের উত্থান-পতন ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু নেই। ক্রোবারের (Krœber) মতন নৃবিজ্ঞানী, ফ্লুগেলের মতন মনোবিজ্ঞানী ইয়োরোপীয় স্কার্ট ও ফ্রকের ডিজাইন কিভাবে যুগে যুগে বদলেছে এবং কেন বদলেছে, তার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। যে-যুগে 'মডেস্টি' বা সরমবোধ প্রবল, সে-যুগে স্কার্ট ও ফ্রকের জবড়জং জোব্বার মতন ডিজাইনই প্রচলিত ছিল দেখা যায়। ক্রমে

আত্মপ্রচারের প্রবৃত্তি যত প্রবল হতে থাকে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মহিমা ও সৌন্দর্য জাহির করার বাসনা যত উগ্র থেকে উগ্রতর হতে থাকে, ততই শ্লীলতা ও সরমের সীমানা ছাড়িয়ে স্কার্ট ও ফ্রকের ডিজাইন বদলাতে থাকে এবং আভাসে-ইঙ্গিতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মহিমা প্রকট করার জন্য কাটাররা কাটিংও বদলান। ইয়োরোপীয় স্কার্ট বা ফ্রকের মতন, আমাদের দেশের মেয়েদের ব্লাউসের 'ফ্যাশানে'র উত্থান-পতন ও ডিজাইনের পরিবর্তন যদি কেউ অনুসন্ধানীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেন, তাহলে এই একই মনোবৃত্তির প্রকাশ তার মধ্যেও দেখতে পাবেন, অর্থাৎ সেই রূপ-দেখানো ও না-দেখানোর দ্বন্দ্ব। রূপ-দেখানোর প্রবৃত্তি বা বাসনা যখন উগ্র থেকে উগ্রতর হয়েছে তখন ব্লাউসের হাতা ও গলার কাটিং ছাঁটাই হতে হতে আভাসে দেখানোর সীমান্তরেখায় এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ হাত ছোট হতে হতে কাঁধ পর্যন্ত উঠেছে এবং গলা নামতে নামতে অনেক দূরে নেমে গেছে। তারপর এসেছে আবার উল্টো ভাবের স্রোত, অর্থাৎ সরম ও শ্লীলতাবোধের স্রোত। তখন আবার হাত নামতে আরম্ভ করেছে এবং নামতে নামতে একেবারে কনুইয়ে এসে ঠেকেছে এবং গলা উঠতে উঠতে কণ্ঠপ্রান্তে বোতামবন্দী হয়েছে। এও কিন্তু স্থায়ী নয়। এই যে দেখানো ও না-দেখানোর দ্বন্দ্ব, এইটাই হল ফ্যাশানের মূল কথা।

মূল কথা হলেও, ফ্যাশান সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হল প্রতিযোগিতা এবং সামাজিক প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফ্যাশানের কোন অস্তিত্ব ছিল না মধ্যযুগে, অর্থাৎ রাজা-রাজড়া, বাদ্‌শাহ-নবাবদের যুগে। রাজা-রাজড়ারা, নবাব-বাদ্‌শাহরা, আমীর-ওমরাহ-অমাত্যরা যে পোশাক পরতেন, রাজান্তঃপুরের রানী বা বেগমরা যে অলঙ্কার ব্যবহার করতেন, বাইরের সাধারণ লোকের তা ব্যবহার করবার ক্ষমতা তো ছিলই না, হুকুমও ছিল না। আমাদের দেশে রাজপরিবারের লোক বা রাজানুগৃহীত ব্যক্তি ছাড়া কেউ মূল্যবান পোশাক (যেমন কর্ণকুণ্ডল, কঙ্কণ, শিরোপা ইত্যাদি) পরতে পারতেন না, ইচ্ছা বা অর্থ থাকলেও না। রাজা খুশি হয়ে স্বর্ণকুণ্ডল বা কঙ্কণ পুরস্কার দিতেন, খেলাৎ দিতেন। ধনিক সদাগররা পর্যন্ত স্বাধীনভাবে পোশাক পরতে পারতেন না। এই প্রথা আমাদের

দেশে অন্তত প্রায় ইংরেজ আমলে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। সুতরাং ফ্যাশান বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি তার অস্তিত্ব ছিল না মধ্যযুগে। 'ফ্যাশান' নিঃসন্দেহে এযুগের ক্যাপিটালিস্ট ডেমক্রাসীর দান। ক্যাপিটালিজমের আর্থিক দম্ভ ও আভিজাত্যবোধ, শ্রেণীগত চেতনা ও ঔদ্ধত্যবোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবৃত্তি ইত্যাদি যেমন ফ্যাশানের মধ্যে আছে, তেমনি আবার ডেমক্রাসীর ব্যক্তিস্বাধীনতাবোধ ও স্বাতন্ত্র্য-বোধও তার মধ্যে আছে। দুয়ের মিশ্রণে 'ফ্যাশানে'র বিকাশ হয়েছে। কোটিপতি মিলমালিকের কন্যা যে শাড়ি বা অলঙ্কার পরবেন, তা পরবার অধিকার সামান্য কেরানী-কন্যারও আছে, যদি ক্ষমতা বা সামর্থ্য থাকে অবশ্য। কিন্তু মধ্যযুগে এরকম কোন অধিকারই ছিল না সাধারণ লোকের। ফ্যাশানের এই সর্বজনাধিকারটা খুব বড় কথা। তার জন্যই পোশাকের শ্রেণীগত সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা আধুনিক বুর্জোয়া ডেমক্রাসীর যুগে এত প্রবল। ফ্যাশানের দ্রুত পরিবর্তনের কারণও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা—সামাজিক শ্রেণীগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বাণিজ্যিক মুনাফাগত বা মনোপোলিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দুই-ই। ক্যাপিটালিজমের পথে যেমন ক্রমেই আমরা মনোপোলির যুগে এবং মনোপোলিস্টিক প্রতিযোগিতার (ধনিকদের ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা নয়) দিকে এগিয়ে গেছি, মুষ্টিমেয় লোকের ডেমক্রাসী থেকে যেমন আমরা 'ম্যাস্ ডেমক্রাসী'র দিকে অগ্রসর হয়েছি, ঠিক তেমনি ফ্যাশানের পরিবর্তনশীলতাও অনেক বেশি বাড়তে আরম্ভ করেছে। এখন ফ্যাশান প্রচলন করেন শুধু ধনিকশ্রেণীর লোকরাই নন, বড় বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের মালিকরাও। একটি ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর থেকে একটি ডিজাইন চালু করা হল, অমনি প্রতিদ্বন্দ্বী স্টোরের মালিকরা অন্যরকম ডিজাইন চালু করলেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ফ্যাশান দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, ইয়োরোপে সপ্তাহের মধ্যেও ফ্যাশান বদলাতে দেখা যায়। এছাড়া, অভিজাতদের কাছে 'ম্যাস্ ডেমক্রাসী'র সমস্যাও আছে। প্রিন্সেস্ বা ক্যাসানোভার ফ্যাশানদুরস্ত মহিলারা যে পোশাক শাড়ি ব্লাউজ পরে এলেন, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে যদি দেখা যায় সেইরকম ব্লাউস পরে টেলিফোন গার্লরাও চলেছেন, তাহলে তাঁদের আভিজাত্যে

সেটা বাধবে এবং তাঁরা আবার ব্লাউসের ডিজাইন বদলাতে বাধ্য হবেন। 'ম্যাস্ ডেমক্রাসী' ও 'মনোপোলিস্টিক প্রতিযোগিতা'র এই বিপদ, কোন ফ্যাশানকেই কেউ কুক্ষিগত বা শ্রেণীগত করে রাখতে পারেন না। রাতারাতি ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের মালিকরা সেই ফ্যাশানের বা ডিজাইনের ব্লাউস তৈরি করে চালু করে দেবেন। পরের দিনই টেলিফোন মহিলা থেকে আরম্ভ করে স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা পর্যন্ত যখন সেই ডিজাইনের ব্লাউস পরে রাস্তা দিয়ে চলবেন, তখন 'প্রিন্সেসে'র সম্ভ্রান্ত লেডীরা হতভম্ব হয়ে যাবেন। আবার দরজীর বাড়ি ছুটতে হবে ডিজাইন বদলাবার জন্য, কারণ আর যাই হন, তাঁরা 'লেডী', শিক্ষয়িত্রী বা টেলিফোন অপারেটারদের মতন সাধারণ 'মিস' বা 'মিসেস্' নন। এই লেডীত্ব বজায় রাখার জন্য হয়ত সপ্তাহের মধ্যেই আবার ডিজাইন বদলাতে হয়। ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরের মালিক তাই দেখে আবার সেটি বাজারে চালু করে দেন, গঙ্গাস্নান করতে এসে গ্রাম্যবধূরাও একটি করে কিনে নিয়ে গায়ে পরে মিউজিয়ামে, জ্যুগার্ডেনে ঘুরে বেড়ান। 'ম্যাস্ ডেমক্রাসীর' কাণ্ড দেখে লেডীদের চক্ষু চড়কে ওঠে। ফ্যাশান আবার বদলায়।

এইজন্য কতকাল আগে, ক্যাপিটালিস্ট ডেমক্রাসীর বাল্যাবস্থায়, ফ্যাশান সম্বন্ধে মহাকবি সেক্সপীয়র বলে গিয়েছিলেন: 'What a deformed thief this fashion is!' আজ সেক্সপীয়রের সেই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। সত্য যে তা ক্লাবের উৎসবগৃহে বসে প্রতিমুহূর্তে আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছিলাম। সিগারেটের ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে দেখছিলাম, মহিলারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের পোশাক ও অলঙ্কারের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আড়চোখে চেয়ে দেখছেন। মিসেস দত্ত দেখছেন মিসেস ঘোষকে, মিসেস বোস দেখছেন মিসের মুখার্জিকে। রূপ-দেখানোর এই প্রতিযোগিতার মধ্যে বসে আমি ভাবছিলাম, সকলের এই দেখাদেখির মধ্যে আসলে যিনি অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখছেন তিনি 'টেলার' ও 'কাটার'—এযুগের দেবতা তিনি। আগামীকালই তিনি নতুন ডিজাইনের অর্ডার পাবেন এবং আবার নতুন ফ্যাশান, অন্তত এ-পাড়ায় কিছুদিনের জন্য চালু হবে। রূপ-দেখানোর রূপকথার রাজকন্যাদের মহিমা বোঝা ভার! তাই

কেবলই মনে হয় 'fashion wears out more apparel than the man

নতুন বছর

[প্রতি ইংরেজী নববর্ষে পাঠ্য]

নতুন বছর পড়েছে, ইংরেজী মতে, নেহাত কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি, তাই। ইংরেজী নতুন বছর পড়েছে, বাঙালীরা তাকে যেমন ঠেকাতে পারেননি, তেমনি কিছুদিন পরে আবার যখন বাংলা নতুন বছর পড়বে, তখন ইংরেজরাও তাকে ঠেকাতে পারবেন না। বছরের গোণা দিন চিরদিন এমনি করে শেষ হয়ে যাবে, আবার সেই একই গোণা দিন নিয়ে নতুন নতুন বছর আসবে—পঞ্চান্ন'র পর ছাপ্পান্ন, ছাপ্পান্ন'র পর সাতান্ন। এর মধ্যে নতুনত্ব নেই কিছু। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন যেমন, যাঁহা পঞ্চান্ন তাঁহা ছাপ্পান্ন তেমনি। কেবল এক-দুই-তিন থেকে নিরানব্বুই পর্যন্ত সংখ্যার তারতম্য। তাও ঠিক নয়। সংখ্যার চক্রাবর্তন বললে অনেকটা ঠিক বলা হয়। এক-একটা শতাব্দীর কথা চিন্তা করলে মনে হয় যেন, শিশু-শতাব্দী যুগের পর যুগ ধরে ধারাপাত আবৃত্তি করছে, সামনে গুরুমশায় 'মহাকাল' বসে আছেন। বিংশ শতাব্দী যেমন করছে, ঊনবিংশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীও তেমনি করেছিল। তার আগে শত শত, হাজার হাজার শতাব্দী করেছে। হয়ত ভবিষ্যতেও করবে। 'হয়ত' বললাম, কারণ পারমাণবিক বোমার যুগে ভবিষ্যৎ খুব বেশি দূর পর্যন্ত ভাবা

সমীচীন নয়। নতুন বছরের আবির্ভাব তাই কালের পাঠশালায় শিশু-শতাব্দীর ধারাপাত আবৃত্তি ছাড়া আর কিছু বলে মনে হয় না।

বিংশ শতাব্দীর কণ্ঠে আজ উচ্চারিত হল—পাঁচের পিঠে ছয় ছাপ্পান্ন। কারণে-অকারণে কলকাতাশহরের রাস্তাঘাট লোকে লোকারণ্য হয়েগেল। কেউ হাত দেখাতে, কেউ বর্ষফল গোণাতে, কেউ ক্রিকেট, কেউ সার্কাস দেখতে, কেউ সিনেমায় কেউ চিড়িয়াখানায়, কেউ আর্ট-এক্সিবিশনে, কেউ বা বনভোজনে—সকলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এক-এক পাড়ায় এক-এক রকমের দৃশ্য দেখলাম। অর্থাৎ এক-এক culture zone-এ এক-একরকমের উৎসব। কোন পাড়ায় জয়নগরের মোয়া ও কমলালেবু নিয়ে ছেলেমেয়েরা নাচছে, কোথাও বেলুন কিনছে আর ফুঁ দিয়ে ফাটাচ্ছে। কোন এক পাড়ায় দেখলাম, রথের মতন সুসজ্জিত বিশাল একখানি মোটরগাড়িতে, দিব্যকান্তি এক সাধুপুরুষ বসে আছেন, রথ চলেছে এবং শত-সহস্র নরনারী তার পশ্চাদনুসরণ করছেন। হিমালয়ের গুহা থেকে বেরিয়ে নাকি বাবাজী 'নিউ ইয়ার ডে'-তে জোব চার্নকের কলকাতা শহরে এসেছেন। উদ্দেশ্য কি তিনিই জানেন। এ ছাড়া, অবিমিশ্র ইংরেজ এবং মিশ্র ইঙ্গ-ভারতীয় ও ইঙ্গবঙ্গ পাড়ায় যা দেখলাম, তা নতুন কিছু নয়। আমার আগে অনেকেই তা দেখেছেন। একশ বছর আগে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যা দেখে 'ইংরাজী নববর্ষ' রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন, সেই একই দৃশ্য—

> খৃস্টমতে নববর্ষ অতি মনোহর।
> প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত শ্বেত নর ॥
> চারু পরিচ্ছদযুক্ত রম্য কলেবর।
> নানাদ্রব্যে সুশোভিত অট্টালিকা ঘর ॥
> মানমদে বিবি সব হইলেন ফ্রেস।
> ফেদারের ফোলোরিস ফুটিকাটা ড্রেস ॥
> মনোলোভা কিবা শোভা আহা মরি মরি।
> রিবন উড়িছে কত ফরফর করি ॥

এই রকম সব দৃশ্য যা দেখলাম, তার মধ্যে 'সংকল্প' কোথাও খুঁজে পেলাম

না। এও এক তামাশা। সঙ দেখার ও সঙ সাজার তামাশা। সংকল্পের যুগ চলে গেছে। বুঝলাম, সমাজে ও সংসারে সঙের সংখ্যা যদি এরিথ-মেটিক্যাল গতিতে বাড়তে থাকে, সঙের বিকল্প সংকল্পের মাত্রা জিওমেট্রি-ক্যাল গতিতে কমতে থাকে।

একশ বছর আগেকার কথা বলেছি। ঠিক একশ বছর আগে, বিংশ শতাব্দীর মতন যখন উনবিংশ শতাব্দীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল—পাঁচের পিঠে ছয় ছাপ্পান্ন—তখনকার কথা, অর্থাৎ ১৮৫৬-র কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বয়স তখন ছত্রিশ বছর, বাংলার সমাজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা তিনি। তাঁর আন্দোলনের ফলে বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়েছে এই ছাপ্পান্নতে এবং ছাপ্পান্ন সালেই তিনি প্রথম বিধবাবিবাহ দিয়েছেন এই কলকাতা শহরে। কলকাতার রাস্তায় কৌতূহলী লোকের ভিড় সেদিনও হয়েছিল। রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রমুখ নবীন বাংলার মুখপাত্ররা বরের পালকির দুদিক ধরে শোভাযাত্রা পরিচালনা করেছিলেন। সেও এক দৃশ্য। এইরকম আর-এক ছাপ্পান্নর দৃশ্য। কিন্তু নবীন বাংলার মনে সংকল্প ছিল সেদিন, সাহস ছিল। আজকের বাংলায় সং আছে, সংকল্প নেই।

আরও একশ বছর আগেকার কথা বলি, অষ্টাদশ শতাব্দীর ছাপ্পান্নর কথা। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ।

সিরাজ সময়স্রোতে হইয়া পতন,
হারাল পলাশিক্ষেত্রে রাজ্য, সিংহাসন।

কবি নবীনচন্দ্রের একথা তখনও সত্য হয়নি। নবাব সিরাজদ্দৌলার সৈন্যদল ইংরেজদের কলকাতার দুর্গ আক্রমণ করেছে। বণিকের আবার দুর্গের প্রয়োজন কি? আলিবর্দি খাঁ বলেছিলেন। সিরাজের কলকাতা-অভিযানের কারণ তাই। ইংরেজরা বন্দী ও পলাতক। বিজয়ী সিরাজ কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ ফিরে গেলেন, মহাসমারোহে বিজয়োৎসব হল। ঠিক এমনি এক ছাপ্পান্ন সালে, দু'শ বছর আগে। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে তার বিবরণ শুনেছেন, খুঁজলে এরকম দু-চারজন লোক এখনও পাওয়া যেতে পারে।

তিন শতাব্দীর তিনটি ছাপ্পান্ন সাল। ১৭৫৬-১৮৫৬-১৯৫৬। যুগ হিসেবে তিনটি ছাপ্পান্ন'র নামকরণ করা যায়—সিরাজের যুগ, ইংরেজের যুগ, স্বরাজের যুগ। সিরাজের যুগ থেকে, ইংরেজের যুগের ভিতর দিয়ে, স্বরাজের যুগে আমরা এসেছি। কিন্তু অঙ্কে আর ইতিহাসে কত তফাৎ। ছাপ্পান্ন 'ইকুয়্যাল টু' ছাপ্পান্ন—অঙ্কের একথা সব সময় সত্য নয়। এক ছাপ্পান্নর সঙ্গে আর-এক ছাপ্পান্নর তফাৎ অনেক। প্রধানত সংকল্পের তফাৎ, আদর্শের তফাৎ। সমাজের তফাৎ, মানুষের তফাৎ।

১৯৫৬-র কোন সংকল্প নেই, এমন কথা আমি বলছি না! ঘোড়-দৌড়ের মাঠ আছে, সিনেমা আছে, ফাট্‌কা বাজার আছে, বড়বাজার আছে, চাকরি-বাকরি আছে, সাহিত্য আছে, সংবাদপত্র আছে, ময়দানের জনসভা আছে, সাধুবাবা আছে, অদৃষ্ট আছে যখন—তখন সেই সব ভিন্ন ভিন্ন পথের যাত্রীদের ভিন্ন ভিন্ন সংকল্পও আছে। একটা কিছু সংকল্প মনে-মনে না করে মানুষ বাঁচতে পারে না। যার কিছু নেই, আমরা বলি, তার স্বপ্ন আছে, কল্পনা আছে। তাও যার নেই, তার আছে সংকল্প। দুর্বল যে, পরাজিত যে, সে-ই 'দেখে নেব' বলে তার সংকল্প ঘোষণা করে। সংকল্প যখন দূর দিগন্তে ডানা মেলে দেয়, তখন হয় কল্পনা। অর্থাৎ শেলীর স্কাইলার্ক, রবীন্দ্রনাথের বলাকা—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে? কল্পনা যখন ডানা গুটিয়ে মাটিতে নামে, তখন হয় সংকল্প। তখন সে ওয়ার্ডস্বার্থের স্কাইলার্ক। সংকল্প নতুন বছরের হয়, বর্তমানের হয়, আগামী দিনের হয় না। যাঁরা ছাপ্পান্ন থেকে ছেষট্টি পর্যন্ত সংকল্প করতে পারেন, তাঁরা অসাধারণ মানুষ, তাঁদের কথা বলছি না। সাধারণ মানুষের কথা বলছি। যাঁরা প্রতি মাসের পয়লা তারিখে নিত্য নতুন সংকল্প করেন এবং মাসান্তে ছেঁড়া কাগজের টুকরোর মতন সব বাতিল করে দেন, তাঁদের কথা বলছি। ৩৬৫ দিনের বেশি চিন্তা করতে তাঁরা অক্ষম। তার উপর নতুন বছরে পাঁচ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত যাঁদের 'ইনক্রিমেণ্ট' হল, তাঁদের সকলের সংকল্প একরকমের নয়। অনেকের 'বাজেট' নতুন বছরেও 'ব্যালান্স' করা সম্ভব হল না, ডেফিসিট থেকেই গেল। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে 'ডেফিসিট ফিন্যান্সে'র যে জাদু আছে, পারিবারিক

ক্ষেত্রে তা নেই। নতুন বছরের 'One Year Plan'-ও তাতে বানচাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

নতুন বছরে যাঁরা পঁচিশ পেরিয়ে ছাব্বিশে এবং পঞ্চান্ন পেরিয়ে ছাপ্পান্ন বছরে পড়লেন, তাঁদের সংকল্পও এক হতে পারে না। ছাব্বিশের সংকল্প আর ছাপ্পান্ন'র সংকল্প এক নয়। তেমনি ষোল আর ছাব্বিশের সংকল্পেও অনেক তফাৎ। যতরকমের মানুষ ততরকমের মন এবং যেমন যার মন, তেমনি তার সংকল্প। সংকল্পের বৈচিত্র্যের শেষ নেই।

আরও আছে। মানুষের সংকল্পের উপরেও দেবতার সংকল্প আছে, গ্রহ-নক্ষত্রের সংকল্প আছে। সংবাদপত্রে তা ছাপাও হয়ে গেছে, দেখেছেন নিশ্চয়। দৈবাচার্যরা তা গণনা করে বলে দিয়েছেন। একশ বছর আগেকার সংবাদপত্রে এসব ছাপা হত না। ক্রমে দৈবাচার্যরা এদেশের ভাগ্যবিধাতা হয়ে উঠেছেন। শত শত মৃত সংকল্পের মহাশ্মশানে আজ কেবল শনি-মঙ্গলাদি গ্রহের ভৌতিক পদসঞ্চরণ শোনা যাচ্ছে।

সুতরাং সংকল্পের কথা নয়, সংক্ষেপে নতুন ছাপ্পান্নর বর্ষফল শুনিয়ে শেষ করছি।

রবিবারে পৌষ কৃষ্ণ চতুর্থায়াং ছাপ্পান্ন
খৃস্টসনের উৎপত্তিঃ।
তত্র অবতারঃ ক্ষ্যাপা বাবা ব্রজমোহনঃ।
পিপীলিকাবৎ অর্বুদাং মনুষ্যাং
তস্য পশ্চাদ্ধাবন্তি।
মশকবৎ গুণগুণন্তি মস্তকোপরি
পুষ্পকরথং মধ্যে মধ্যে,
যস্য জঠরাভ্যন্তরে হাইড্রোজেন-
বোমাঃ।
নাস্তি গোদাবরী-ভাগরথী-ভল্‌গা-
ক্যাসপিয়ান-মিসিসিপি-ইয়াংসি তীরে
শান্তিঃ-স্বস্তিঃ॥

ন পাপং ন পুণ্যং, ন্যায়ান্যায়ং
ভেদাভেদং।
সর্বতীর্থসারম্ ভেজালদ্রব্যসম্ভারম্
বড়বাজারম্।
পাদোনচতুর্হস্ত পরিমিত মানবদেহঃ,
প্রাণান্ত পর্যন্তং পরমায়ুঃ।
ইতি ইংরেজী ছাপ্পান্ন সালস্য লক্ষণং॥
অতএব সংকল্প মা কুরু, কেবল বক্তৃতায়াং
রতো নিত্যং। যতঃ পাপঃ ততঃ জয়ঃ।
ত্যজ সজ্জনসংসর্গম্ ভজ দুর্জনসমাগমম্॥

অবশেষে কেবল এইটুকু সংকল্প করুন—

Give us this year our Annual Bread
Lead us not to the Grave.

নাইট-ক্লাব

'ক্লাব' বলতে আমরা বাঙালীরা বিশেষ করে, একটা গা-ঢাকা মনখোলা আড্ডার জায়গা বুঝি। সেদিন কলকাতার এক অঞ্চলে পাশাপাশি দুটি চায়ের দোকান নজরে পড়ল—একটির নাম 'মজলিস', আর একটির নাম 'গুলটিস'। নামের টানে চা খেতে ঢুকে খোঁজ করে জানলাম,

'গুলটিসে'র জন্ম পরে হয়েছে, 'মজলিস'কে টেক্কা দেবার জন্য। কলকাতা শহরে অনেক-আধুনিক সব বাহারে নাম চায়ের দোকানের দেখেছি, কিন্তু এরকমটি আজ পর্যন্ত নজরে পড়েনি। 'মজলিস' ও 'গুলটিসের' মালিকদের টাকা বা শিক্ষা কোনটারই অহঙ্কার নেই, আছে কেবল আড্ডার বড়াই। তাই আড্ডার অন্যতম কেন্দ্র চায়ের দোকানের নামটি তাঁদের এত 'কাব্যিক' হয়েছে। এই আড্ডা থেকেই 'ক্লাবে'র জন্ম হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্লাবই প্রথম যুগে চায়ের দোকান কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে, আজও যে ওঠে না তা নয়। 'ক্লাব' বলতে আধুনিক কালে আমরা যা বুঝি তা পাশ্চাত্ত্য সমাজের দান। 'ক্লাব' বা 'ক্লাব লাইফ' বলতে ঠিক যা বোঝায় তা আমাদের দেশে কোনদিনই ছিল না। তবে কি আমরা আড্ডা দিইনি কোনদিন? নিশ্চয় দিইছি। ইয়োরোপীয়দের তুলনায় আমরা কোন-দিক থেকেই কম আড্ডাবাজ নই। আমাদের দেশের রাজারাজড়ারা চিরকাল আড্ডা দিয়েছেন। তাঁদের অনেকের রাজসভায় নবরত্ন সভার মতন নিয়মিত কাব্যের বিতর্কের ও রঙ্গরসিকতার সভা বসত। গোপাল ভাঁড় ও রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রকে নিয়ে এই রকম আড্ডা জমেছে। আমাদের দেশের রাজামহারাজারা নন শুধু, সাধারণ চাষী-কারিগররাও রীতিমত আড্ডা দিতে ভালবাসেন। গ্রামের মোড়ল ও মাতব্বরের চণ্ডীমণ্ডপে বা বাইরের প্রাঙ্গণে আড্ডা বসেছে চিরকাল এবং সেই আড্ডার বিশেষত্বটা এমনভাবে আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে যে আজও আমরা 'ক্লাব' বা 'সংঘ' গড়ার দিকে বিশেষ ঝোঁক না দিয়ে, কলকাতার মতন শহরেও পাড়ায় পাড়ায় কারও বাড়ির রোয়াক অথবা বৈঠকখানায়, বড় জোর কোন চায়ের দোকানে আড্ডা জমাই বেশি। এইভাবে আড্ডা দেওয়াটাই হল আমাদের জাতীয় ধারা। একটা ঢিলে আল্‌গা ভাব এবং কোন রকমের নিয়ম শৃঙ্খলার অভাবই হল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'ক্লাব' বলতে আড্ডার সঙ্গে একটা নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার ব্যাপারও জড়িত আছে এবং একটা সাংগঠনিক রূপও তার আছে। এইটাই পাশ্চাত্ত্য সমাজের দান এবং 'ক্লাব' কথাটার উৎপত্তিও সেখান থেকে। কথাটা আধুনিক অর্থে বলছি, সামাজিক

অর্থে নয়। সামাজিক অর্থে 'ক্লাব' বলতে যা আমরা বুঝি তার উৎপত্তি মানবসমাজের শৈশবকালে, পাশ্চাত্ত্য সমাজ বলতে যা বোঝায় তার বিকাশের অনেক আগে হাজার হাজার বছর আগে। নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা বলবেন, আধুনিক 'ক্লাব' বলতে যা কিছু বোঝায়, তা সবই সেই আদিম যুগের মানবসমাজের দান, পাশ্চাত্ত্যের বা প্রাচ্যের নয়। সে-কথা পরে বলব।

আধুনিক কালের যে 'ক্লাব' তার জন্ম ইয়োরোপে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে বলা চলে। ডক্টর জনসনের মতে, কয়েকজন স্বতঃপ্রণোদিত 'good fellows' যদি 'under certain conditions' মিলিত হন, তা হলেই সেটা 'ক্লাব' হয়ে ওঠে। শোনা যায়, মধ্যযুগের একজন এক নম্বরের বোহেমিয়ান টমাস্ হককিভ্ ১৪০০ সালে নাকি এই রকম একটি প্রথম 'ক্লাব' অর্গানাইজ করেন। তারপর মহারানীর রাজত্বকালে বেন জনসন যে মার্মেড ও অ্যাপোল্লো সরাইখানায় তখনকার বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের নিয়মিতভাবে জড়ো করতেন এবং অ্যাপোল্লোতে তাঁর এই সাহিত্যিক ক্লাবের জন্য যে আলাদা একটি ঘরও ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তা অনেকেই জানেন। কিন্তু সেকালের সরাইখানা ক্রমে লোপ পেয়ে যায় এবং তার বদলে 'কফি-হাউস' প্রথমে অক্সফোর্ডে ১৬৫০ সালে, তারপরে সমস্ত লণ্ডন শহরে ধীরে ধীরে অসংখ্য গজিয়ে ওঠে। 'কফি হাউস' গজিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক আড্ডাও নিয়মিত জমতে থাকে এবং ক্রমে তাসখেলা, পাশাখেলা, জুয়োখেলাও রীতিমত চালু হয়ে যায়। ১৬৯৭ সালে বিয়ানকো নামে এক ইটালীয়ান একটি 'চকোলেট-হাউস' খোলেন, কিছুদিন পরে এই চকোলেট হাউসই বিখ্যাত 'হোয়াইট ক্লাবে' পরিণত হয়। ক্লাবে লোকের ভিড় হচ্ছে দেখে সভ্য হবার চাঁদা ছয় পেনী করা হয়, নস্যের বদলে ভাল তামাক খাবার নিয়ম চালু করা হয় এবং বিশেষ অতিথিদের জন্য স্বতন্ত্র ঘরেরও ব্যবস্থা করা হয়। ১৭৩৬ সালের মধ্যে এই 'হোয়াইট ক্লাব' ধীরে ধীরে আর্ল ও ডিউকদের একটি প্রাইভেট ক্লাবে পরিণত হয় এবং তার নিয়ম-কানুনসহ সভ্য সংখ্যার বইও ছাপা হয়ে যায়। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই একই

রাস্তার অপর-পাশে 'ক্রুক্স ক্লাব' বলে আর একটি ক্লাব গড়ে উঠে এবং ধীরে ধীরে এই দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের একটি টোরীদের, অপরটি হুইগদের প্রাইভেট ক্লাবে পরিণত হয়। এইভাবে কফি-হাউস, চকোলেট-হাউস থেকে ক্লাবের উৎপত্তি হল এবং সাধারণের ক্লাব থেকে ক্রমে আধুনিক সমাজের ক্লাব অভিজাতদের গোষ্ঠী ও শ্রেণীকেন্দ্রিক ক্লাবে পরিণত হল। যে সমাজে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মানবিক সম্বন্ধের চেয়ে টাকা পয়সাটাই হল সমস্ত পদমর্যাদার সর্বশ্রেষ্ঠ মানদণ্ড, সে-সমাজের 'আড্ডাখানা'র বা ক্লাবের পরিণতি এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক। এর পর ইংলণ্ডে 'ক্লাব' ঠিক ব্যাঙের ছাতার মতন গজিয়ে উঠেছে এবং তার রূপের বৈচিত্র্যেরও অন্ত নেই। ১৯৩০ সালে ইংলণ্ডের ও ওয়েল্সের রেজিস্টার্ড ক্লাবের সংখ্যা হয়েছিল প্রায় ১৩, ৫১৩টি। এই হিসেব সম্পূর্ণ নয় এবং এর মধ্যে যে সমস্ত 'টাইপে'র ক্লাব ধরা হয়েছে, তাও ঠিক নয়। এ ছাড়া, প্রত্যেক রকমের ক্লাবের নানারকম ডালপালা আছে, স্ত্রীলোকদের হাজার রকমের সংঘ আছে, যার হিসেব এই তালিকায় নেই। তা সত্ত্বেও এই হিসেব থেকে ইংরেজদের ক্লাব-জীবন ও ক্লাব-সভ্যতার একটা হদিস পাওয়া যায় নিশ্চয়। 'পরিবারে'র চেয়ে 'ক্লাব'টাই যেন ইয়োরোপীয় সমাজে ধীরে ধীরে প্রাধান্য পাচ্ছে বলে মনে হয়। 'পারিবারিক' যৌন-জীবন, যৌননিষ্ঠা, প্রেম ভালবাসা ইত্যাদি সব ক্লাব জীবনের প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। 'নাইট-ক্লাবে'রও অন্ত নেই ইয়োরোপে। নাচ-গান-পান-ঢলাঢলির এক নম্বর আড্ডাখানা হল এই সব নাইট-ক্লাব। বোতলের পর বোতল মদ উজাড় হচ্ছে, মদের নেশায় চোখের সামনে জোনাকি জ্বলছে, নেশার টানে জুয়াখেলার ঝোঁক চাপছে, ঝোঁকের চাপে মুঠো মুঠো টাকা ভেল্‌কির মতন উবে যাচ্ছে, অর্কেস্ট্রা বাজছে, নর্তকী নাচছে, ভাড়াটে সঙ্গিনীরা টলছে ঢুলছে—এই হল নাইট-ক্লাবের ছবি। মধ্যযুগের রাজাবাদ্‌শাহদের 'বাগান-বাড়ি'র বিলাস-ব্যভিচার আজকের আধুনিক যুগে 'নাইট-ক্লাবে'র আত্মসংযমহীন প্রমোদে পরিণত হয়েছে। আধুনিকতার পথপ্রদর্শক ইয়োরোপই তাই এই জাতীয় ক্লাবের জন্মদাতা।

আমেরিকাতেও এই ক্লাবের হুজুকটা জাগে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে। হাজার হাজার ক্লাব ও অ্যাসোসিয়েশন সারা আমেরিকায় গজিয়ে ওঠে। মেয়েদের ক্লাবই হল মার্কিন সমাজের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। যদি কোন ফরাসী পর্যটকও আমেরিকা যান, তাহলে তিনিও আমেরিকার 'মেয়েদের ক্লাবে'র প্রাচুর্য দেখে অবাক হয়ে যাবেন। ফ্রান্স এ ব্যাপারে ইয়োরোপের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেও, আমেরিকা আজ ফ্রান্সকেও হার মানিয়েছে। ক্লাবের সভ্য হওয়াটা মার্কিন মেয়েদের ফ্যাশানের একটা অঙ্গবিশেষ। যে যত বেশি ক্লাবের সভ্য, সমাজ-জীবনে তার পদমর্যাদা তত বেশি। কিন্তু টাকাটাই হল মার্কিনী ক্লাব-সভ্যতার প্রাণস্বরূপ। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, যে সব অঞ্চলে অবস্থাপন্ন পরিবারের বসবাস বেশি সেখানে ক্লাবের সংখ্যাও বেশি। ধনিক মার্কিন দুলালীদের ক্লাবপ্রীতিটা একটু উগ্র দেখা যায়, গরীবরা ওসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর সময় পান না। যেমন ওয়েস্টচেস্টারে শতকরা পঞ্চার জনের বেশি মেয়ে ক্লাবের সভ্য, কিন্তু তার পাশেরই এক শহর-তলীর শতকরা প্রায় ছিয়াত্তর জন মেয়ে নিজেদের পরিবার নিয়ে ব্যস্ত, কোন ক্লাবের সংঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন। এও দেখা গেছে, যাঁদের রোজকার দশহাজার ডলারের উপর তাঁরা গড়ে তিনটি ক্লাবের সভ্য, আর যেসব মেয়ের রোজগার পাঁচ-হাজার ডলারের কম, তাঁরা গড়ে একটি ক্লাবের সভ্য কোন-রকমে হতে পারেন। সুতরাং আমেরিকার ক্লাব-জীবনের যে আড়ম্বর সেটা সমাজের উপরতলার লোকের জন্য। টাকাটাই মার্কিনী সভ্যতার ক্লাব-কৌলীন্যের মাপকাঠি।

বাংলাদেশে ইংরেজরা আসার পরে, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে, নানারকম সভা-সমিতি, সোসাইটি, অ্যাসোসিয়েশন, সংঘ, ক্লাব ইত্যাদির বিকাশ হতে থাকে। এক-একটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রত্যেক সভা ও সংঘ গড়ে ওঠে—কোনটা রাজনৈতিক, কোনটা সামাজিক, কোনটা সাংস্কৃতিক। যেমন রামমোহনের 'আত্মীয় সভা', দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী সভা', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা', 'সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ জেনারেল নলেজ', 'বাষ্পীয় সভা' ইত্যাদি। এগুলি হল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

সংঘ। এরই পাশাপাশি আমোদ-প্রমোদ ও অবসরবিনোদনের জন্য 'ক্লাব'ও অংকুরিত হতে থাকে। রামমোহন-দ্বারকানাথের মতন সমাজের কর্ণধার যাঁরা, তাঁরা সাহেবদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করেন এবং তাঁদের চা-পার্টি ইত্যাদিতেও নিয়মিত যোগদান করেন। ক্রমে ভোজসভা, নাচ-সভা প্রভৃতির আয়োজন তাঁরা নিজেরাও করেন এবং সেখানে নাচ-গান-পান-হল্লা সবই চলতে থাকে। সাহেবরাও এইসব ভোজসভায় নাচসভায় আপ্যায়িত ও আমন্ত্রিত হতেন। শোভাবাজার রাজবাড়ি, ঠাকুরবাড়ি, মল্লিকবাড়ি থেকেই ভোজসভা নাচসভার ভেতর দিয়ে আধুনিক ইয়োরোপীয়ান ফ্যাশানের ক্লাবের বিকাশ হয় ধীরে ধীরে। তারই পরিণতরূপ আজকাল আমরা দেখতে পাই, রোটারীর লাঞ্চে, হিন্দুস্থান ক্লাব, স্যাটার্ডে ক্লাব, ক্যালকাটা ক্লাব ইত্যাদির অভিজাত সামাজিকতায়—যে ধরনের হোক একটা সাংস্কৃতিক মুখোস এই সব ক্লাবের আছে, কিন্তু সেটা নিতান্ত গৌণ দিক। তার প্রধান দিক হল অবসরবিনোদন, আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান-পান ইত্যাদির ভেতর দিয়ে এনার্জি পরিপূরণ করা এবং তার মধ্যে সামাজিক শ্রেণীকৌলীন্য অটুট ও অক্ষুণ্ণ রেখে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থবন্ধন সুদৃঢ় করা। এই সব ক্লাবের দুর্ভেদ্য শ্রেণী-স্বাতন্ত্র্যের প্রাচীরটাই হল উল্লেখযোগ্য। সাধারণ লোকের যদি শখ হয় তাহলে হাতে হঠাৎ কিছু পয়সা এলে তাঁর শখ মেটাবার জন্য 'প্রিন্সেস্' 'ক্যাসানোভা' পর্যন্ত তিনি যেতে পারেন, কিন্তু এইসব ক্লাবের সভ্য হতে পারেন না। চায়ের ব্যবসা করে বা রেস্টুরেন্ট খুলে একজন লক্ষপতি হলেও' প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনে' তাঁর প্রবেশ নিষেধ। এই জাতীয় ক্লাব ও অ্যাসোসিয়েশনের এই আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধটাই বড় বিশেষত্ব। আমোদ-প্রমোদ, নাচ-গান-পান-হল্লাও একটা বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ।

শোভাবাজার রাজবাড়ি, ঠাকুরবাড়ি মল্লিকবাড়িতে যখন ভোজসভায় ও নাচসভায় সাহেব-বাঙালীর ঢলাঢলি, মদ্যপান, বাইজী-নাচ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠল, তখন বাঙালী সমাজে তার অনুকরণের প্রবল প্রবৃত্তি জাগাটাও স্বাভাবিক, বিশেষ করে নতুন ইংরেজী-শিক্ষিত

আধা-সাহেবদের মধ্যে। ইংরেজের প্রসাদজীবী শহরের হঠাৎ-বড়-লোকদের মধ্যে তার অনুকরণ পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকল। এই ধরনের গা-ঢালা ফুর্তির ব্যাপারটা নব্যযুগের কালচারের একটা অঙ্গ হয়ে উঠল। তার উপর রামমোহন রায় যখন শহরের বিখ্যাত নিকী বাইজীর নাচ দেখতে ভালবাসেন, বেদান্তচর্চার সঙ্গে যখন বাইজী-নাচও চলতে পারে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতন উদ্‌যোগী প্রগতিশীল ব্যক্তিও যখন বাগান-বাড়িতে ঘন ঘন নাচগান ভোজসভার আয়োজন করতে পারেন, তখন অন্যান্য সব বাঙালী হঠাৎ-বড়লোকদের ও নব্যবাবুদের আর ভাবনা কি? এই সময় হাফ্‌-আখড়াই, ফুল-আখড়াই, কবি-পাঁচালী ও যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ করল। শহরের যুবকরা 'গোকুরী', 'ঝকমারী' ও 'পক্ষীর-দলে' বিভক্ত হল। শ্যামবাজার, রামবাজার, চকবাজার, বাগবাজার, বৌবাজার জোড়াসাঁকোর বড় বড় নিষ্কর্মা বাবুরা হাফ্‌-আখড়াইয়ের দলের মুরুব্বী হলেন। মোসাহেব, উমেদার ও গেরস্তগোছের হাড়হাবাতেরা শৌখীন দোহারের দলে মিশলেন। অনেকের হাফ্‌-আখড়াইয়ের দৌলতে চাকরিও জুটে গেল। স্বয়ং মহারাজা নবকৃষ্ণই ছিলেন কবির দলের বড় পেট্রন। তাঁরই আমলে রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিলু, জগা, ভোলা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মায়। তাঁর দেখাদেখি শহরের অনেক বড়মানুষ কবির দল করতে মাতলেন। বাগবাজারের 'পক্ষীর দল' এই সময় গজিয়ে ওঠে। পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্তা শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন মহারাজ নবকৃষ্ণের একজন ইয়ার। বাগবাজারের রিফর্মেশনে তিনি নাকি সেকালে রামমোহনের সমতুল্য লোক ছিলেন। তিনিই বাগবাজারকে উড়তে শেখান। কিছুদিনের মধ্যে বাগবাজারেরা শহরের টেক্কা হয়ে ওঠে। পক্ষীর দলের একখানা পাবলিক আটচালা ছিল। দলের সভ্যরা সেই আটচালা ঘরে বসে নানারকমের পাখী সাজতেন, বুলি ঝাড়তেন ও উড়তেন। বোসপাড়ার মধ্যেও দু-চারটে গাঁজার আড্ডা ছিল। এই সময় কলকাতা শহরে গাঁজা খাওয়াটা ফ্যাশানে পরিণত হয়েছিল বলা চলে। শহরের স্থানে স্থানে এক-একটা বড় গাঁজার আড্ডা গজিয়ে উঠেছিল—বাগবাজারে, বটতলায়, বৌবাজারে, কালীঘাটে। রামমোহন-দ্বারকানাথ

নিজেরা যখন সাহেবদের সঙ্গে খানাপিনা করতেন, বাইনাচ দেখতেন, তখন নব্যযুগের বাবুরা যে, দিনে ঘুমিয়ে, ঘুড়ি উড়িয়ে, বুলবুলির লড়াই দেখে, সেতার এসরাজ বীণা বাজিয়ে, কবি হাফ্-আখড়াই পাঁচালী শুনে, রাত্রে বারাঙ্গনাদের গৃহে গীতবাদ্যে আমোদ করে কাল কাটাবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি! বুলবুলির লড়াই দেখা ও ঘুড়ি উড়োনো সে-সময় শহরের ভদ্রলোকদের একটা মহা আনন্দের বিষয় ছিল। এক-এক জায়গায় লোহার জাল দিয়ে ঘিরে অনেক বুলবুলি পাখী রাখা হত এবং মধ্যে মধ্যে এদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে কৌতুক দেখা হত। সেই কৌতুক দেখবার জন্য শহরের লোক ভেঙে পড়ত। ঢাউসঘুড়ি, মানুষঘুড়ি প্রভৃতি ঘুড়ির প্রকার ও উড়োনোর প্রণালী অনেক রকমের ছিল। ভদ্রলোকের ছেলেরা গড়ের মাঠে গিয়ে ঘুড়ির খেলা দেখতেন।

ইংরেজদের অবসরবিনোদন এবং সামাজিক আমোদপ্রমোদের রীতিটা বাঙালী বাবুরা প্রথম যুগে এইভাবে গ্রহণ করেন। ইংরেজদের সোসাইটি ও অ্যাসোসিয়েশনের বৈশিষ্ট্যটা বাঙালী শিক্ষিতসমাজ যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির কাজে লাগাননি, তা নয়। যথেষ্ট লাগিয়েছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্যরা বা 'ইয়ং বেঙ্গল' দল ভাল-ভাল অনেক 'সাংস্কৃতিক সংঘ' গড়ে তুলেছিলেন, কয়েকটি রাজনৈতিক সংঘেরও গোড়াপত্তন হয়েছিল। আমাদের স্থিতিশীল সমাজ-জীবনে এই সব সংঘ ও অ্যাসোসিয়েশন নতুন প্রাণ ও গতি সঞ্চার করেছিল। কিন্তু সামাজিক আমোদপ্রমোদের রীতিটা ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে বিশেষ কোন রুচি-সম্মত রূপ নেয়নি। নব্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতির গুরুস্থানীয় যাঁরা, তাঁরাই এক্ষেত্রে রীতিমত বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন। 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের মধ্যেও তাই মদ খাওয়া, এমন কি গরু খাওয়াটা পর্যন্ত প্রগতিসূচক ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখানে ইংরেজদের অনুকরণটা ভাল দিকে হয়নি। একটা বদ্ধ-ডোবার মতন পচাগলা সমাজে হঠাৎ পাশ্চাত্ত্য জীবনধারার বহুমুখী খরস্রোত যদি প্রচণ্ড বেগে মিশে যায়, তাহলে প্রথম দিকে তার তলার শতাব্দীসঞ্চিত পচা পাঁক পর্যন্ত বজ্‌বজিয়ে ওঠে। কলকাতার বাঙালী সমাজে প্রথম দিকটায় ঠিক তাই হয়েছিল। নবাবী আমলের

দুর্নীতি ও কুসংস্কারের পঙ্ককুণ্ড হঠাৎ পাশ্চাত্ত্য জীবন-ধারার গতিশীল আবর্তে কাঁচা ড্রেনের ময়লার মতন চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে বজ্‌বজিয়ে উঠেছিল। এ ছাড়াও এখানে অবশ্য আর একটা দিক বিচার করার আছে। ইংরেজরা যে আমাদের সবই ভাল করেছেন, তা একেবারেই সত্যি নয়। জর্জ টমসন আর ডেভিড হেয়ারের মতন ইংরেজের সঙ্গে, অথবা উইলসন-কোলব্রুকদের সঙ্গে সেকালের ইংরেজ লাটবাহাদুরদের, ইংরেজ ব্যবসায়ী ও সিবিলিয়ানদের কোন তুলনাই হয় না। উইলসন-হেয়ার-টমসন এঁরা পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট নির্যাসটুকু নিয়ে এসে আমাদের দান করেছিলেন, আর ইংরেজ লাটবেলাট, ব্যবসায়ী ও সিবিলিয়ানরা তার বিষাক্ত বীজাণুগুলো এনে আমাদের মধ্যে সংক্রামিত করেছিলেন। প্রথম দলের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি সাংস্কৃতিক সংঘ, রাজনৈতিক সংঘ, নানারকমের 'সোসাইটি' ও 'অ্যাসোসিয়েশন'। আর দ্বিতীয় দলের কাছ থেকে পেয়েছি—ভোজসভা, নাচসভার ভেতর দিয়ে 'পক্ষীর দল' 'গাঁজার আড্ডা', 'মাতালের আড্ডা', বাইনাচ, খেমটানাচ, কবিপাঁচালীর আসর এবং তার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে আধুনিক কালের বাঙালী বড়বাবুদের সব 'ক্লাব'। সেকালের কলকাতার গাঁজার আড্ডা, মদের আড্ডা, বাইনাচ ও খেমটানাচের আসরই আজ নবকলেবর ধারণ করেছে মহানগরের 'নাইট-ক্লাবে'।

তাহলেও বাঙালীর ক্লাব-জীবন বা দেশী দেহাতি ভাষায় যাকে 'আড্ডা' বলি, তার মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। প্রথম উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব হল তার আবেগ-প্রাধান্য এবং অসংযম-প্রবণতা। যে-কোন আড্ডাতে বসলে আমরা বাঙালীরা সাধারণত জ্ঞান হারিয়ে ফেলি, সময় বা পরিবেশ কোন কিছুরই যেন চেতনা থাকে না। চেতনা হারিয়ে ফেলে আড্ডার মহাসমুদ্রে যেন আমরা ডুবে যেতে চাই। ডুবে যেতেই যেন আমাদের ভাল লাগে। তাসের আড্ডাই হোক, দাবার আড্ডাই হোক, আর জুয়ার আড্ডাই হোক, অচৈতন্য হয়ে যাওয়াটাই আমাদের স্বভাবধর্ম। এর মধ্যে আর একটা দিকও আছে, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্ত্রীলোকের সঙ্গ, নেশা এবং খিস্তিখেউড়ের দিকে আমাদের

চারিত্রিক প্রবণতাটা যেন একটু বেশি, বিশেষ করে আড্ডার সময়। নারীসঙ্গ ও নেশা না হলে বাঙালীর কোন আড্ডাই যেন জমতে চায় না। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়ে আমোদ করাটাই যেন বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কোনরকম কৃত্রিমতা যেন আমরা সহ্য করতে পারি না। কোন হিসেবের রুদ্ধকারায় আমরা বন্দী হতে চাই না, বেহিসেবির দিগন্তরেখায় আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তাকে বিলীন করে দিতে চাই। তাই গণিকালয়েও আমরা যেন বণিকের হিসেবী মন নিয়ে যেতে পারিনে। 'পতিতালয়কে'ও আমরা অকৃত্রিম মনের রঙ দিয়ে 'কবিতালয়' করতে চাই। বারবনিতারা যেন কতকটা স্বভাবতঃই আমাদের 'কবিতা-কল্পনালতা' হয়ে ওঠে।

কথাগুলো শুনে রুচিবাগীশ ও নীতিবাগীশরা যেন ভ্রূ কুঁচকাবেন না। সমাজবিজ্ঞানীরা নীতিবাগীশদের ভ্রূকুটী উপেক্ষা করেই সামাজিক রীতিনীতির বিশ্লেষণ করেন। নৃবিজ্ঞানীরা তো করেনই। এ-সম্বন্ধে বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ম্যানিলাউস্কির একটা কথা বলে সকলকেই সাবধান করে দিচ্ছিঃ 'নৃবিজ্ঞানী ও সামাজবিজ্ঞানীর কর্তব্য হল, জীবনের ঘটনাবলী সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করা, অবশ্য যতটা সম্ভব বৈজ্ঞানিক ভাষায় এবং আমার মনে হয় তাতে কোন রুচিবাগীশের ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত নয়।' অশ্লীল রচনা যাঁরা খোঁজেন তাঁদের এ-সব বৈজ্ঞানিক রচনায় কোন ক্ষুধা মিটবে না। অপরিণত তরুণ মনকেও এ-রচনা বিষিয়ে তুলবে না। এখানেও যখন সেই বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক আলোচনা করা হচ্ছে, তখন টিকি নেড়ে চোখ রাঙানোর কোন সুযোগ নেই। 'ক্লাব' ও 'আড্ডা' আজকের বাঙালী সমাজের একটা মস্তবড় দিক। তার বৈশিষ্ট্যগুলিও তাই উপেক্ষা করা যায় না। কেন আমাদের দেশে ঠিক ইয়োরোপীয় মডেলে 'আড্ডা' দেওয়ার রীতি চালু হয়নি, কেনই বা সেরকম নিয়ম-শৃঙ্খলাবদ্ধ 'ক্লাব' অসংখ্য গড়ে উঠেনি, সেটা বিচার্য বিষয়। যদি বলি আমাদের চরিত্রের অকৃত্রিমতা ও আবেগপ্রবণতা, আমাদের মাত্রাতিশয্য ও উচ্ছৃঙ্খলতামুখিতাই তার প্রধান কারণ, তাহলে বোধ হয় খুব ভুল হয় না। ইয়োরোপীয় নেশা-পান ও অবাধ নারীসঙ্গের দিকটাও আমাদের 'ক্লাব'

গড়ে তুলতে বিশেষ উৎসাহিত করেনি। তার কারণ ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের সমাজে প্রকাশ্য বিধিসম্মত গণিকাবৃত্তির প্রচলন ও প্রসার হয়েছে এবং তার ফলে আমাদের ক্লাব-জীবনের অবাধ নারীসঙ্গ ও নেশা-পানের দিকটা গণিকালয়েই আমরা মিটিয়ে নিয়েছি। বারবনিতা-কেন্দ্রগুলিই এদেশের অসংখ্য 'ক্লাব' ও 'নাইট-ক্লাবে' পরিণত হয়েছে। সামাজিক সংঘজীবন, মেলামেশা, আলাপ-আলোচনা, গল্পগুজব, জটলা পরামর্শ ইত্যাদি আমরা চায়ের দোকানে আর প্রতিবেশীর রোয়াকে আড্ডায় সেরে নিই। বাংলাদেশের মতন অলি-গলিতে চায়ের দোকান বোধ হয় আর কোন প্রদেশে নেই। নিয়মশৃঙ্খলার বন্ধন মেনে, কৃত্রিম ঢলাঢলি মেলামেশার জন্য আমরা তাই ইয়োরোপীয় মডেলের 'ক্লাব' গড়ার দিকে তেমনভাবে ঝুঁকি নি। এটা আমাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের জন্যই হয়েছে। আমাদের দেশে স্বামী বিবেকানন্দ যেমন জন্মেছিলেন, তেমনি আবার তন্ত্রোপাসনার এমন উর্বর ক্ষেত্রও আর কোথাও ছিল না। সেই তন্ত্রের আদিম অকৃত্রিম ধারাই আমাদের বাঙালীদের রক্তে বইছে। তন্ত্রসাধনার 'মদ-মাংস-মেয়েমানুষে'র মূলে রয়েছে আদিম মানব-প্রবৃত্তি। সেই আদিমতার উত্তরাধিকার সমাজ-জীবনের আমোদ-প্রমোদ ও আড্ডার ক্ষেত্রে আজও আমরা সকলে বহন করে চলেছি। বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতিতে প্রাগার্য যুগের আদিম সংস্কৃতির যে প্রবাহ আজও বয়ে চলেছে, কোথাও ক্ষীণ, কোথাও প্রবলভাবে, আমাদের আমোদ-প্রমোদ ও আড্ডার ধারার উৎপত্তি সেখান থেকে। এটাই আমার আসল বক্তব্য।

বাঙালী 'বন্ধুত্বের'ও এমন একটা বিশেষত্ব আছে, যা সচরাচর অন্যদের মধ্যে দেখা যায় না। বন্ধুত্বের মধ্যে স্তরভেদ আছে অন্তরঙ্গতার দিক দিয়ে। 'বন্ধুত্ব' আমাদের গড়ে উঠলেও, 'বন্ধুত্ব' আমরা পাতাই। এই বন্ধুত্ব 'পাতানো'টা হল একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সামাজিক ঘটনা। বন্ধুত্ব 'পাতাই' মানে আমরা বন্ধুত্বের সম্বন্ধটা ঠিক 'বিবাহে'র মতন একটা সামাজিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করি। এর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল, এখানে কোন বর্ণভেদ বা জাতিভেদ নেই। বন্ধুত্ব পাতানো

হলে তুই বন্ধুর পরিবারের মধ্যে একটা সামাজিক মেলামেশা ও লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ঠিক 'বিবাহে'র ভিতর দিয়ে যেমন দুটি বিভিন্ন পরিবারের আত্মীয়তা ও সামাজিক বন্ধন স্থাপিত হয়, তেমনি হয় বন্ধুত্বের ভিতর দিয়েও। প্রাণের বন্ধুকে আমরা 'মিতে' বলি, তার সঙ্গে আমাদের 'হরিহর আত্মা'। মিতের মাকে মা, বাবাকে বাবা পর্যন্ত বলতেও আমরা কুণ্ঠিত হই না। সাধারণত তুই মিতের এক নামকরণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। পুরুষদের মধ্যে এখন এই 'পাতানো' বন্ধুত্বের খুব বেশি চলন না থাকলেও, আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে এখনও এর যথেষ্ট প্রচলন আছে। তরুণী ও যুবতী মেয়েরা যে-কোন ফুলের নামকরণ করে বন্ধুত্ব পাতায় এবং সেই ফুলের নাম ধরেই পরস্পরকে ডাকে—যেমন 'বকুল', 'যুঁই', 'গোলাপ', 'শিউলি', 'টগর', 'বেল' ইত্যাদি। এ ছাড়া 'সই' বা 'মকর' পাতানো আজও আছে। এই সব বন্ধুত্ব শুভ-দিনক্ষণ দেখে একটা বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে পাতানো হয়ে থাকে। বর্ণবিচার শ্রেণীবিচার না করে মেয়েদের মধ্যে এই ধরনের 'সই' ও 'মকর' পাতানো, যুঁই, বেল, বকুল পাতানো, আমরা ছেলেবেলা থেকে কলকাতা শহরেই ধনিক ও মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজে যথেষ্ট দেখেছি। সামাজিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে এই যে বর্ণ-বৈষম্যহীন 'মিতে' ও 'সই' পাতানো, এরও মূল রয়েছে আমাদের আদিম মানব-সমাজের মধ্যে। বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতিতে এও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'আদিম উত্তরাধিকার' যা কোনও সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি এড়ানো উচিত নয়।

আদিম মানব-সমাজে 'পরিবার', 'ক্ল্যান' বা 'সিব' ছাড়াও আরও একটি 'ইনস্টিটিউশনে'র সন্ধান নৃবিজ্ঞানীরা পেয়েছেন—আমাদের ভাষায় তাকে আমরা সভা-সমিতি, সংঘ বা ক্লাবও বলতে পারি। এ সম্বন্ধে হের কুনৌ, ডঃ শুর্‌জ, হাটন, ওয়েবস্টার, রিভার্স, লাউই, ম্যানিলাউস্কি প্রমুখ নৃবিজ্ঞানীরা অনেক অনুসন্ধান করেছেন এবং আমাদের ভারতীয় আদিবাসীদের মধ্যে এ বিষয়ে বিশেষভাবে কাজ করেছেন ভেরিয়ের এল্‌ইন ও ফন হাইমেনডর্ফ, সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন শরৎচন্দ্র রায়,

হাটন, মিলস এবং আরও অনেকে। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে, আদিম মানব-সমাজ কেবল 'পরিবার' ও 'ক্ল্যানে' বিভক্ত নয়, নানা রকমের সভা-সমিতি ও ক্লাবে বিভক্ত। সাধারণত স্ত্রী-পুরুষ ভেদে এবং বয়সের ভিত্তিতে এইসব সভা-সমিতি গড়ে ওঠে। অধিকাংশ আদিম জাতির মধ্যে অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের স্বতন্ত্র বাসস্থান আছে। বিবাহিত পরিবার থেকে একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর বালক-বালিকাদের পৃথক করে দেওয়া হয় এবং তারা একত্রে দলবদ্ধ হয়ে স্বতন্ত্র গৃহে বাস করে। অবিবাহিত যুবক ও যুবতীদের বাসস্থান Dormitory আলাদা হলেও, প্রায়ই দেখা যায়, তাদের মধ্যে অবাধ মেলা-মেশা, নাচ-গান, সামাজিক কাজকর্ম এবং যৌন-বিহার পর্যন্ত চলে। এর ভিতর থেকেই যে যার প্রেমিক-প্রেমিকাকে নির্বাচন করে নেয়, তারপর সেই মুক্তপ্রেমের সম্পর্ক 'বিবাহের বন্ধনে' যখন বাঁধা পড়ে, তখন নবদম্পতী বিবাহিতদের সঙ্গে বাস করতে চলে যায়, সাধারণত 'ডর্মিটোরী'তে থাকার তাদের আর অধিকার থাকে না।

কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের এই যে স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ সামাজিক মেলা-মেশা, কাজ-কর্ম নাচ-গান-হল্লা এবং তার ভিতর দিয়ে প্রেম ও বিবাহ, একেই আমরা আধুনিক ভাষায় 'ক্লাব-লাইফ' বলতে পারি। আমাদের আধুনিক 'ক্লাব-জীবন' এ ছাড়া আর কি? এ কথা আমরা নিশ্চয়ই ভাবতে পারি। কিন্তু আধুনিক সমাজের ক্লাব-জীবনের সঙ্গে আদিম সমাজের এই 'ক্লাব-জীবনে'র ব্যবধান অনেক। প্রথমত আধুনিক ক্লাবের মধ্যে বিবাহিত-অবিবাহিতের কোন বাদ-বিচার নেই, সকলের সঙ্গে অবাধ মেলা-মেশা ও যৌন-বিহার পর্যন্ত চলতে পারে। আদিম সমাজে তা চলে না। বিবাহিত জীবনের নিষ্ঠা ও আনুগত্য সেখানে অনেক বেশি। এমন কি অবিবাহিত জীবনের মেলা-মেশার মধ্যেও উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, যে যার প্রেমিক-প্রেমিকার সঙ্গেই স্বচ্ছন্দ বিহার করে থাকে এবং প্রত্যেকেই সেই প্রেমের সম্মান করে থাকে। অথচ স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে জঘন্য হিংসা, বিদ্বেষ, খুন-খারাবি, বেইমানি, বিশ্বাসঘাতকতা,—এসব আধুনিক 'সভ্য' সমাজের তুলনায় আদিম সমাজে অনেক কম দেখা যায়।

প্রাচীন বাংলার অন্তর্ভুক্ত বিহার উড়িষ্যা হল আদিম মানব-সমাজের এই জাতীয় সংঘ, ক্লাব বা 'ডর্মিটোরী'র স্বর্গরাজ্য। তা ছাড়া বাংলার প্রতিবেশী আসামের নাগা, খাসি ও গারোদের মধ্যেও তরুণ-তরুণীদের 'ডর্মিটোরী' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুরের ওরাঁও মুণ্ডা বিরহোড় সাঁওতাল জুয়াঙ ভুঁইয়া খন্দ শবর প্রভৃতি জাতির এই 'ক্লাব-জীবন' তাদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাঁওতাল ও হো-দের মধ্যে আজকাল আলাদা 'ডর্মিটোরী'র কোন ব্যবস্থা না থাকলেও, এক সময় যে বেশ ছিল তা তাদের সামাজিক মেলা-মেশা, কাজ-কর্ম ও যৌন-সম্পর্কের ধরন দেখলেই বোঝা যায়। ওরাঁওদের 'ধূমকুড়িয়া', মুণ্ডা ও বিরহোড়দের 'গিতিওড়া', জুয়াঙদের 'দরবার' ও 'ধাঙড়াবাসা' শুধু যে তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদের নাচ-গান, মেলা-মেশার কেন্দ্র বা স্বাধীন যৌন-বিহারের আড্ডাখানা তা নয়, সমস্ত জাতির সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন-কেন্দ্রও বটে। এলুইন সাহেব মারিয়াদের যে 'ঘোটুলের' সুদীর্ঘ ইতিহাস লিখেছেন তাও কেবল 'নাইট-ক্লাবে'র মতন খানাপিনা-নাচের আড্ডাখানা নয়, সমস্ত জাতির প্রাণকেন্দ্র। আসামের নাগাদের 'মোরুঙ', খাসিয়াদের 'চ্যাঙ' এবং গারোদের 'ডেকা-চ্যাঙ' বা 'নকপান্তে'ও ঠিক তাই, সমস্ত নাগা, খাসি ও গারো জাতির জীবনকেন্দ্র, সংস্কৃতি ও কলাকেন্দ্র, কেবল নাচ-গান-পান-মজলিসের আড্ডাখানা নয়, বা আধুনিক 'নাইট ক্লাব' নয়।

আমরা বাঙালীরা সমাজ-জীবনের অনেকাংশে এই আদিম প্রাণবন্ত সংস্কৃতিধারার উত্তরাধিকারী। বাঙালী তরুণ-তরুণী, যুবতীদের মধ্যে স্বাধীন মেলা-মেশার ঝোঁক তাই অত্যন্ত উগ্রভাবে দেখা যায়। অনেকে বলেন, সেটা বাঙালীর বৈশিষ্ট্য নয়, সব মানুষের বৈশিষ্ট্য। ঠিক কথা। কিন্তু এ রকম আবেগসর্বস্ব প্রেম, এরকম ব্যর্থ প্রেমের ফলে বৈরাগ্য ও আত্মহত্যার হিড়িক, জানি না এ দেশের আর কোন জাতের মধ্যে এত বেশি মাত্রায় আছে কিনা। তা ছাড়া, এ রকম আড্ডাবাজ জাত বাঙালীর মতন আর কেউ নেই। কেবল আড্ডা দিয়ে রাজার ছেলে পথের ভিখিরী হয়েছে বাংলাদেশেই। বাঙালী তাই 'চায়ের দোকান' করেছে 'মজলিশ'

ও 'গুলটিস' নাম দিয়ে অলি-গলিতে, তবু মুদির দোকান করে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে বসেনি। বাঙালীর এই আদিম অকৃত্রিম প্রাণধারাকে আর্য-ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু সংস্কৃতির শাস্ত্রকাররা অনুশাসনের বন্ধনে টুঁটিটিপে মারতে চেয়েছেন। কিন্তু বাঙালী তা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি, তাই শাস্ত্রীয় নীতির বিরুদ্ধে বাঙালীর মানস-বিদ্রোহ 'তান্ত্রিকতা'র মধ্যে ফুটে উঠেছে, সহজিয়া ও আউল-বাউলের ঢালু পথে পাশ কাটিয়ে প্রচণ্ড তোড়ে ছুটে গেছে। তান্ত্রিক সাধুদের নৈশ পঞ্চমকার সাধনা, আউল-বাউল নেড়া-নেড়ীদের আখড়া—এগুলো এক ধরনের ক্লাব ও নাইট ক্লাব ছাড়া আর কি? যে ধর্ম তার শাস্ত্রীয় অনুশাসন দিয়ে আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চেয়েছে, সেই ধর্মের মধ্যেই আমাদের মুখোসপরা আদিম প্রবৃত্তি তার চরম প্রতিশোধ নিয়েছে। অসংখ্য মঠ, আশ্রম আর ধর্মসংঘের মধ্যে আমরা ক্লাব ও ডর্মিটোরীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি। 'অন্যায়' ও 'পাপে'র গোপন চোরাগলির দিকে তাই আমরা সহজেই আকৃষ্ট হই। এমন কি, ইংরেজরাও আমাদের শৃঙ্খলার বন্ধনে বাঁধতে পারেন নি। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার গণিকালয়ে আমাদের 'ক্লাব' ও 'ডর্মিটোরীর' বাসনা মিটে গেছে। ধনিকদের গণ্ডীবদ্ধ শ্রেণীবদ্ধ 'ক্লাব' ও 'নাইট-ক্লাব' তার বিকৃত প্রকাশ মাত্র। আদিম সমাজের ডর্মিটোরীর বা ক্লাব সংঘের সেই প্রাণময়তা নেই, তার বদলে আছে আধুনিক ক্লাব-জীবনের নারীপুরুষ সম্পর্কের প্রাণহীন পণ্যময়তা। আদিম সমাজের মানুষের সঙ্গে মানুষের যে 'মানবিক' সম্পর্ক ছিল, প্রাণের সঙ্গে প্রাণের যে নিবিড় যোগাযোগ ছিল, তাতে নারী 'কমোডিটি' বা পণ্যে পরিণত হয়নি এবং টাকাও সমাজের সর্বাধিনায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীন স্বচ্ছন্দ মেলা-মেশা, এমন কি সহবাস পর্যন্ত হৃদয়হীন যান্ত্রিক যৌন-বিহারে পরিণত হয়নি। প্রত্যেক আদিম জাতির 'ডর্মিটোরী' তাই সমগ্র জাতির সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আমাদের টাকা আছে, গাড়ি আছে, বাড়ি আছে—নেই কেবল প্রাণ ও প্রেম। তাই ক্লাবে ও নাইট ক্লাবে আমরা মদের নেশায় অবসন্ন হয়ে ঢুলি, নারী সাহচর্য টাকা দিয়ে কিনি। নারী আমাদের শখের বস্তু, যেমন কিউরিও কিনি, ছবি

কিনি, ঘড়ি কিনি, হীরের আংটি কিনি, তেমনি তাদেরও কিনতে পাই। ক্লাব, নাইট ক্লাবগুলো এই ধরনের কেনা-কাটার বাজার ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু তার মধ্যে যেটুকু বাইরের নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, তাও বাঙালীর মনকে তেমনভাবে আকর্ষণ করেনি। তাই ক্লাব, নাইট-ক্লাবের প্রাধান্য বাঙালী সমাজে নেই। তার বদলে আছে অসংখ্য 'আড্ডা-কেন্দ্র', চায়ের দোকান কেন্দ্র করে, পাড়ায় প্রতিবেশীর রোয়াক বা খোলা মাঠে, আর নব্য ধনতান্ত্রিক যুগের গণিকালয়ে অথবা নবাবী আমলের ধ্বংসাবশেষ, পুরনো বাগানবাড়িতে।
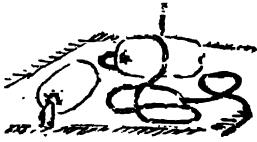
কর্তামশায়

'বাবু তো বাবু বড়বাবু, আর সব বাবু হাফবাবু'—কথাটা বাবুসমাজে খুব প্রচলিত। তেমনি আমাদের যৌথ পরিবারের কর্তা। কর্তা তো কর্তা যৌথ পরিবারের কর্তা, আর সব কর্তা খণ্ডিত বা কর্তিত কর্তা। সকলেই জানেন কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। এ-কর্তা যে-সে কর্তা নন। ইনিই সেই যৌথ পরিবারের কর্তা—বড়কর্তা বা কর্তাবাবু বলে যিনি সর্বজন-সম্বোধিত। একমাত্র তাঁর ইচ্ছাতেই সংসারের সকল কর্ম সম্পাদিত হয়, তা সে যেরকমের কর্মই হোক।

'পরিবার' বলতে মানবসমাজের যে ছোট্ট প্রাথমিক ইউনিটটিকে আমরা জানি, তা কেবল বাপ-মা ও তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গড়া পরিবার। সমাজের গোড়ার ইতিহাস এই ধরনের ছোট ছোট পরিবারের

ইতিহাস। আধুনিক পরিবারের গড়নও তাই, যদিও তার শ্রী অন্য রকম। যৌথ পরিবার মধ্যযুগের সমাজের সৃষ্টি। যেমন ছিল তখন সমাজের গড়ন, তেমনি ছিল পরিবারের গড়ন। তাই হবার কথা, কারণ পরিবার হল বাইরের বৃহত্তর সমাজের প্রতিচ্ছবি। মধ্যযুগের সম্রাট ও বাদশাহদের কথা মনে না করলে, যৌথ পরিবারের কর্তাদের কথা ভাবা যায় না। এক সম্রাট ও বাদ্‌শাহ, কিন্তু তাঁর পোষ্য কত? রানী-বেগম-দাসদাসী-আমলা-অমাত্য-আমীর-উজীর-শিল্পী-কারিগর, সব একজনের মনোরঞ্জনের জন্য প্রয়োজন। তাই নিয়ে মহলের পর মহল-যুক্ত গড়বন্দী রাজপ্রাসাদ এবং মধ্যযুগের ছোট ছোট কোর্ট-টাউন গড়ে ওঠে। যৌথ পরিবারের কর্তা হলেন এই সম্রাটেরই পকেট-সংস্করণ। বহু পোষ্য তাঁর এবং সব পোষ্যের তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপালক। রাজদরবারে সম্রাটের সামনে যেমন সকলে ঘাড় হেঁট করে কুর্নিশ করতে করতে আসে—আমীর উজীর থেকে সাধারণ আমলা পর্যন্ত—যৌথ পরিবারের বড়কর্তার বৈঠকখানাতেও তেমনি সকলে একে-একে বলির পাঁঠার মতন কাঁপতে কাঁপতে করজোড়ে আসেন—সহধর্মিণী সহোদর ভাইবোন, পুত্রকন্যা, মামাতো-পিসতুতো ভাইবোন, ভাগনে-ভাগনী, ভাইপো-ভাইঝি, সরকার গোমস্তা দাসদাসী সকলে। সম্রাট বসে থাকেন সিংহাসনে, বড়কর্তা বসে থাকেন গড়গড়ার নলমুখে, তাকিয়া ঠেস দিয়ে। সম্রাট হুকুম দেন, বড়কর্তা শুধু হুকুম নয়, তার সঙ্গে হুঙ্কারও দেন, তম্বিগম্বিও করেন। সে-হুঙ্কার সিংহের গর্জনের চেয়েও ভয়ঙ্কর। একেবারে হালের তরুণ যাঁরা তাঁদের হয়ত সে-হুঙ্কার শোনার সুযোগ হয়নি, কারণ তাঁরা সকলেই প্রায় একক পরিবারে মানুষ। তিনের কোঠার প্রান্তে যাঁরা পৌঁছেচেন, তাঁদের অনেকেরই সে-হুঙ্কার শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। 'সৌভাগ্য' ইচ্ছা করেই বলছি, কারণ হুঙ্কার হলেও কর্তাবাবুর হুঙ্কারের মধ্যে একটা অনির্বচনীয় থ্রিল আছে। বোঝা যায়, কিন্তু বুঝিয়ে বলা যায় না। দিনে অন্তত দু-চারবার না শুনলে যেন মনেই হয় না যে বড়কর্তার বটবৃক্ষের ছায়ায় বেশ দিব্যি খেয়েদেয়ে বেঁচে আছি এবং শুয়ে শুয়ে নিষ্ক্রিয়তা-জনিত চোঁয়াঢেঁকুর ও হাই তুলছি। উঠোন, বৈঠকখানা, দরদালান, অন্দরমহল,

পুজামণ্ডপ সব যেন তাঁর তম্বিগম্বিতে গমগম করে ওঠে, হুঙ্কারের ঝঙ্কারে চারমহলা বাড়ির খোপ্‌খুপরি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পোষা পায়রা উড়ে যায়, কাকাতুয়া-ময়না-হরবোলা সব একসঙ্গে শেখানো বুলি বলতে থাকে, পর্যাপ্ত উচ্ছিষ্টভোজী হৃষ্টপুষ্ট কুকুরের দল হঠাৎ ভয় পেয়ে চারিদিকে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে, পোষ্যের দল তটস্থ হয়ে যায়, দাসদাসীরা গললগ্নীকৃতবাসে দাঁড়িয়ে হরিনাম জপ করতে থাকে। এক হুঙ্কারে এত কাজ হয়। যার তার হুঙ্কার নয়, যৌথ পরিবারের বড়কর্তার হুঙ্কার।

একেই বলে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। হুঙ্কার না দিলেও চলে না, পরিবার অচল হয়ে যায়। কমপক্ষে একপণ অর্থাৎ চারকুড়ি ছোট-বড়-মাঝারি পোষ্যের একান্নভুক্ত বিশাল যৌথপরিবার চালানো কি সহজ ব্যাপার? প্রথম পক্ষের স্ত্রীর দুটি ছোট ভাই, দ্বিতীয় পক্ষের এক পিতৃমাতৃহীন ছোটবোন এবং তৃতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যার এক বৈমাত্রেয় ভাই থেকে আরম্ভ করে, চার সহোদরের চারজন স্ত্রীর চার-পাঁচে কুড়িটি পুত্রকন্যা, দুই বিধবা বোনসহ পাঁচটি ভাগনে-ভাগনী, গুটিকয়েক মামাতো পিসতুতো শ্যালিকা, নিজের তিনপক্ষের মিলিয়ে তিন-ছয় আঠারটি বংশধর, পুত্রবধূ জন সাতেক, নাতি-নাতনী তিন-সাত্‌তে একুশ—মোটামুটি এই নিয়ে একটি ক্রমবর্ধমান যৌথপরিবার। এতগুলি সামলাবার জন্য অন্তত জন দশবারো ভৃত্য থাকাও দরকার। সব যোগ করলে এক পণেও কুলোয় না, একশ পূর্ণ হয়ে যায় প্রায়। সারিবদ্ধভাবে সকলকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিয়ে যদি পরস্পরের সম্বন্ধনির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়, তাহলে স্বজনসম্বোধনের ভাষা খুঁজে পাওয়াও দুষ্কর হয়ে ওঠে। এঁরা সকলে যদি একই ছাদের তলায় বাস করেন, একই রান্নাঘরের রান্না অন্নব্যঞ্জনে প্রতিপালিত হন, এবং একই বড়কর্তার অধীনে থেকে মেজকর্তা, সেজকর্তা, ছোটকর্তা, মেজবৌ, ছোটবৌ ইত্যাদি বিভিন্ন র‍্যাঙ্কসুলভ মর্যাদা ও অধিকার দাবি করেন, তাহলে ব্যাপারটা কি হয় ভাবতে পারেন? পাগলাগারদের সমস্ত পাগলকে একটি হলঘরের মধ্যে বন্দী করে দিলে যা হয়, কতকটা তাই। এ-হেন যৌথ পরিবারের সর্বময় বড়কর্তা যিনি, তিনি যদি সম্রাটের মতন দোর্দণ্ডপ্রতাপ না হন, এবং হুকুম ও হুঙ্কার সমানতালে না দেন,

তাহলে পরিবার অচল হয়ে যায়। শোনা যায়, কলকাতা শহরে বাগবাজার অঞ্চলের বিখ্যাত 'হরি ঘোষ' বিগত শতাব্দীর এইরকম একজন যৌথ পরিবারের কর্তা ছিলেন। আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে প্রায় শতাধিক পোষ্য সব সময় তাঁর বাড়িতে বাস করত এবং জগন্নাথের মহাপ্রসাদের মতন প্রসাদ পেত। তাই উত্তর কলকাতার লোকেরা তাঁর বাড়িটিকে বলত 'হরি ঘোষের গোয়াল'। গোয়াল হলেও গরুর পালের রাখাল নন তিনি, যৌথ পরিবারের কর্তা। কেবল 'হেঁই হট্' শব্দ করে রাখাল গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু প্রচণ্ড দাপট দাবড়ানি ও হুঙ্কার ভিন্ন যৌথ পরিবারের কর্তা তাঁর বিপুল সংখ্যক পোষ্যদের কণ্ট্রোল করতে পারেন না। তাই বলে তাঁকে কেবল স্বেচ্ছাচারী ডেস্পট ভাবলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। মধ্যযুগের সম্রাট যেমন কেবল ডেস্পট নন, সদাশয় বা বেনাভলেণ্ট-ডেস্পট, যৌথ পরিবারের কর্তাও ঠিক তাই। যেমন সহজেই তিনি নির্দয় হতে পারেন, তেমনি সহজে তিনি সদয়ও হতে পারেন। 'দয়া' কথাটাই তাঁদের শ্রেষ্ঠ দান। 'জুতো মেরে গরু দানে'র যে চলতি প্রবাদ আছে আমাদের দেশে, আমার মনে হয়, যৌথ পরিবারের এই দয়াময় কর্তাদের বদান্যতা থেকেই তার উৎপত্তি হয়েছে।

যৌথ পরিবারের এই স্বর্ণযুগ আজ চলে গেছে এবং তার সঙ্গে কর্তারাও বিদায় নিয়েছেন। দু-চারজন যাঁরা এখনও আছেন, তাঁরা পুরনো ভূতের বাড়ি পাহারা দিচ্ছেন মাত্র। মধ্যযুগের সেই সমাজও নেই, সেই পরিবারও নেই। গোলাভরা ধানের পর্যাপ্ত অন্ন নেই, গোয়ালভরা গরুর অফুরন্ত দুধও নেই, বলদে-টানা সেই ঘানির ঘন তেলও নেই। নীতি-শাস্ত্রের নিয়মে আজকাল আর সংসার চলে না। সংসার চলে অর্থশাস্ত্রের জটিল নিয়মে। কোথায় সেই তপস্বিনী গৃহিণীরা, যাঁরা প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করে গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকতেন, কোমর বেঁধে কোঁদল করেও, শোনা যায়, যাঁরা সুবচনা ও সুখদর্শনা ছিলেন, পাতিব্রত্যের অর্জিত পুণ্যে যাঁরা গান্ধারীর মতন কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত অভিসম্পাত দিতে পারতেন, দময়ন্তীর মতন লম্পট ব্যাধকে ভস্মীভূত করতেন,

সাবিত্রীর মতন মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলতেন? তাঁরা সব আজ উপাখ্যানের নায়িকা। এখনকার গৃহিণীরা দশটা-পাঁচটা চাকরি করেন, করতে বাধ্য হন। নিজের পতিপুত্রের তদারক করার অবসরই তাঁদের এত কম, যে পোষ্যপালনের সময়ই তাঁরা পান না। সামর্থ্যও নেই তাঁদের। সবচেয়ে বড় কথা, আজ তাঁরা পুরুষের অনুগ্রহজীবী নন। আজ তাঁরা আত্মমর্যাদা-ও-সত্তা-সচেতন নারী। নারীর নারীত্ব নিয়েও তাঁরা 'মানুষ'। এমনকি, শিশু ও কিশোররাও আজ স্বতন্ত্র মানুষ—বেত্রতাড়িত অসহায় জীব নয়। বর্তমান যুগকে তাই সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন—দি সেঞ্চুরি অফ্ দি চাইল্ড। শিশুদের ও তরুণদের বিদ্রোহের যুগ। প্রত্যেকটি মানুষ আজ স্বতন্ত্র অধিকার ও সত্তা-বিশিষ্ট মানুষ। যৌথ পরিবারের কর্তার সর্বময় সত্তার মধ্যে সকলের সত্তা আজ বিলীন নয়। তাই হুঙ্কারে আজ আর কাজ হয় না। যৌথ পরিবারের দু-পাশের দুটি স্তম্ভই আজ ভেঙে পড়েছে, একটি পুরুষের অনুগ্রহজীবী নারীর স্তম্ভ, আর একটি অসহায় বালক-বালিকার স্তম্ভ, অনেকদিন ধরে তাতেও ভাঙন ধরেছে।

সমাজের গড়ন আজ আর মধ্যযুগের মতন স্থিতিশীল নয়। বিশাল একটি চারমহলা বাড়িতে, একই স্থানে, প্রচুর নিষ্কর্মা পোষ্যসহ পাঁচপুরুষ ধরে বাস করার পরিকল্পনা করা তখনই সম্ভব ছিল, যখন স্থাবর চাষের জমির সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ ছিল, কুটীরশিল্পের পণ্যেই জীবনের বাঁধা-ধরা প্রয়োজন মিটে যেত, বিশেষ নড়েচড়ে বেড়াতে হত না কাউকে এবং চলাচলের সুবিধাও ছিল না। এখন সেই স্থাবর জমির সঙ্গে জঙ্গম জীবনের কোন যোগ নেই, গৃহশিল্পের যুগও নেই। যন্ত্রশিল্পের যুগ, শিল্প-নগর ও শহরের যুগ এখন। চাকরির তাগিদে, কাজের প্রয়োজনে, আজ স্থান থেকে স্থানান্তরে চলে বেড়াতে হয়। সচল সমাজের অচল যৌথ পরিবারের মিশরীয় পিরামিড তাই গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। সমাজের ও জীবনের সচলতা আজ এত বেশি যে নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপমায়ের যে একক ক্ষুদ্র পরিবার, তাতেও ভাঙন ধরে। সাবালক পুত্র কর্মজীবনের গোড়াতেই হয়ত পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে চলে যায়। পুত্রের স্বতন্ত্র পরিবার সেখানে গড়ে ওঠে। কন্যাদেরও প্রায় তাই হয়।

দু-একটি নাবালক সন্তান নিয়ে বাপমায়ের পরিবারটি থাকে শুধু। মনে হয়, পরিবার যেন ক্রমেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে। তাই হবার কথা অবশ্য। সমাজ যত সচল ও সক্রিয় হবে, পরিবার তত সঙ্কুচিত হবে। পরিবারের যা কাজ ছিল, যা দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল, ক্রমে তা বাইরের সমাজ ও রাষ্ট্র করছে এবং ভবিষ্যতে আরও করবে। এমনকি শিশুপালন ও বৃদ্ধপোষণ পর্যন্ত। যৌথ পরিবারের কর্তা তাই বাইরের গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর জন্য দুঃখ করে লাভ নেই।
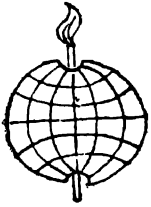
ধরণীর এক কোণে

ধরণীর এককোণে, আপন মনে, পরম নিশ্চিন্তে বসবাসের জন্য ছোট্ট একটি বাসা বাঁধার ইচ্ছা মানুষের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। পাখিরা নীড় বাঁধে, মৌমাছিরা বাঁধে মৌচাক। উইপোকারাও মাটির ঢিবি তৈরি করে। সকলের শ্রেষ্ঠ মানুষ যে গৃহনির্মাণ করার স্বপ্ন দেখবে, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে! ঘর যাদের নেই এবং ঘর বাঁধার কোন সুদূর সম্ভাবনাও নেই কোনদিন, তাদের যখন এই কলকাতার মতন শহরের আনাচে-কানাচে ও ফুটপাথে বেওয়ারিশ আবর্জনা কাটকুঠো ন্যাকড়াকানি-চাটাই দিয়ে ঘর বেঁধে বাস করতে দেখা যায়, তখন মনে হয়—সত্যিই মানুষের প্রাণ কতখানি গৃহগত। তখন মনে হয়, বাবুই পাখির চেয়ে গৃহনির্মাণে মানুষ কম কুশলী কিসে? কলকাতা শহরে একদিন এই রকম এক

ঘর-বাঁধা দেখতে আমার প্রতিবেশী হরিদাসদার গৃহনির্মাণের কথা মনে পড়ছিল। বাবুই পাখি মুখে করে একটি করে খড় যুগিয়ে যেমন বাসা বাঁধে, হরিদাসদাও তেমনি বহুকাল ধরে ইঁট সুরকি চুন বালি সিমেণ্ট লোহালক্কড় সব যোগাড় করে গৃহনির্মাণ শুরু করেছিলেন। হরিদাসদা একটু কাব্যিক প্রকৃতির, বৌদি হিসেবী। তার উপর বৌদির 'গুছিয়ে নেওয়া'র বাতিকটাও বেশ উগ্র। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা, প্রতিবেশীরা ও আত্মীয়স্বজনরা সকলেই যে-যার বেশ গুছিয়ে নিচ্ছে, কেবল তাঁরই সব অগোছালো হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেশী নরেনবাবু সামান্য একজন মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী, তিনিও টালিগঞ্জে নতুন গৃহনির্মাণ করে সেদিন উঠে গেলেন। বৌদির একজন ভগিনীপতি, সাধারণ স্কুল মাস্টার, তিনিও তো ঢাকুরিয়ায় গৃহনির্মাণ শুরু করেছেন। এই তো সেদিন কসবায় জমি কিনে এলেন কেনারামবাবু, মাত্র শ'আড়াই টাকা মাইনেতে আড়াই গণ্ডা পুষ্যি প্রতিপালন করেও। আর হরিদাসদা? পরম নিশ্চিন্তে ভাড়াটিয়া বাড়িতে দিন কাটাচ্ছেন। জানলার কব্‌জা ভাঙা, দরজার খিল নেই, দেওয়ালের চুনবালির চাপড়া ধসে পড়ছে, ছাদ ফুটো, বৃষ্টি হলে ছাতি মাথায় দিয়ে ঘরের মেজেয় বসে থাকতে হয়, তাতেও তাঁর সুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত হয় না। বৌদি যখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন হরিদাসদা তখন ধ্যান-নিমীলিত চক্ষে আবৃত্তি করতে থাকেন—

ওগো ভাড়াটিয়া বাড়ি!
তোমারও বক্ষ দেখিতেছি প্রায় আমারই মতন হায়া,
হাড়ে যত লাগে মরণের ঘুণ, বাড়ে চামড়ার মায়া!
জর্জর বুক ভরে আসে যত ভাড়াটে স্মৃতির ভারে,
অনাগত নব ভাড়াটের আশে জাগে সে অন্ধকারে।

কথায় কথায় কবিতা আওড়ে দিন অবশ্য কাটল না। শেষ পর্যন্ত পাড়ার আরও দু-চারজন প্রতিবেশীর মতন হরিদাসদাকে গৃহনির্মাণের পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করতে হল। হরিদাসদা ইতিমধ্যে গ্রেডান্তরিত হলেন। ছিলেন ৯০—৬—১৫০—১০—২৫০-এর গ্রেডে, উঠলেন ১২০—৮—২০০—১২—২৬০—২০—৩৬০-এর গ্রেডে। মধ্যবিত্ত জীবনে গ্রেডান্তরই

জন্মান্তরের সামিল। সুতরাং দাদার প্রেতান্তরিত হবার পর বৌদির নতুন গৃহে স্থানান্তরিত হবার বাসনা উগ্রতর হয়ে উঠল। অবশেষে হরিদাসদাকেও আত্মসমর্পণ করতে হল—গীতিকাব্যের বেদেনীর কাছে নয়,অমিত্রাক্ষর ছন্দের গৃহিণীর কাছে। ঠিক হল, গৃহনির্মাণ শুরু হবে।

কলকাতার উপকণ্ঠে বেহালায় একখণ্ড বাস্তুজমি কিনলেন হরিদাসদা। জমি কেনার পর থেকে নিয়মিত বৈঠক বসতে লাগল আমার বাড়িতে। গৃহের প্ল্যান নিয়ে কত যে জল্পনা-কল্পনা হল তার ঠিক নেই। দেড়গজ 'কাট-পিসে' কর্তাগিন্নী-ছেলেপিলের 'ওভারকোট' তৈরির প্ল্যানের মতন। 'গেস্ট রুম', 'স্টাডি' ও 'বাথরুম'-এর উপর দাদা যত জোর দেন, বৌদি তত 'কিচেন' আর 'স্টোর' নিয়ে তর্কাতর্কি করেন। দাদার 'স্টাডি' আর বৌদির 'স্টোর'-এর মধ্যে পড়ে আমার প্রাণ এক-একদিন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত। ভিত্‌পত্তনের আগে গৃহের প্ল্যান নিয়ে প্রায় গৃহবিবাদের উপক্রম হল।

শুভদিনে বাস্তুদেবতা পুজো দিয়ে, গৃহের ভিত্‌পত্তন করা হল যেদিন, হরিদাসদা সেদিন আমার বাড়ি এসে বললেন—বুঝলে ভাই, 'হোম্ সুইট হোম, দেয়ার্স নো প্লেস লাইক হোম্!' বেহালার হোম যখন তৈরি হবে তখন দেখো হোম্ কাকে বলে।

গৃহের ভিত্‌পত্তনের পর, কি করে যেন মৈত্রমশায়ের সাগরসঙ্গমে যাবার মতন হরিদাসদার গৃহনির্মাণের বারতাটা 'গ্রামে গ্রামে রটি গেল ক্রমে'। অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, উভয়পক্ষের, দাদার ও বৌদির, যে যেখানে ছিলেন, সকলেই পথেঘাটে বাজারে বাসেট্রামে অফিসে, কেউ কেউ বাড়িতে এসে পর্যন্ত বলে গেলেন—কাজের মতন কাজ করছে হরিদাস। এটা ইহকাল এবং পরকালের কাজ। অযাচিত উপদেশের ভিড় আরও দ্রুত জমতে লাগল, ভিটায় দু-গাড়ি ইট পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে। এ ইট নয়, অমুকের ইট ভাল—এ ইটে বালির ভাগ বেশি ইত্যাদি। 'বাড়ি যখন করছ, হরিদাস, তখন ভাল করেই করো, দু-চার পুরুষ ভোগ করা যায়', এমনি করে এরকম আরও অনেক উপদেশ। হরিদাসদা

বললেন: 'ইঁট আসতেই এই অবস্থা, দেয়াল গাঁথা আরম্ভ হলে যে কি হবে, তাই ভাবছি! উপদেশের ধাক্কায় দেয়াল না ধূলিসাৎ হয়ে যায়!'

তা অবশ্য হল না। হবার আগেই দেয়াল নিয়ে এক ঘোর সঙ্কট দেখা দিল। ইঞ্চি দুয়েক দেয়াল উঠেছে, এমন সময় ঝড় উঠল, বাইরে নয়, ঘরে। কালবৈশাখী ঝড়। প্রতিবেশী আমি, একদিন তার গুরুগুরু গর্জনে চমকে উঠলাম। হল কি? রাত তখন প্রায় এক প্রহর। দাদা হন্তদন্ত হয়ে আমাদের বাড়িতে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। বললাম—'হল কি, হরিদাসদা?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে দাদা বললেন: 'পাঁচ ইঞ্চিতে হবে না।' বলতে বলতে দেখি স্বয়ং বৌদি এসে হাজির। অত্যন্ত উত্তেজিত। দাদার কথা কেড়ে নিয়ে তিনি বললেন: 'ও বাড়িতে আর যে-ই বাস করুক, আমি অন্তত করব না।' বলেই তিনি দ্রুত অন্তর্ধান করলেন। দাদা বললেন: 'বুঝলে তো? পাঁচ ইঞ্চির ঠেলা সামলাতেই প্রাণ যায়, তার ওপর আবার দশ ইঞ্চি!'

বুঝলাম দেয়ালের প্রস্থ নিয়ে মতবিরোধ হয়েছে। বৌদির ইচ্ছা, দোতলার ভিতের উপর দশ ইঞ্চি দেয়াল দিয়ে একতলা হোক, কারণ চিরকাল যে তাঁরা একতলাতেই বাস করবেন এমন কোন কথা নেই। দোতলাতে অন্তত একখানা ঘর তৈরি করেও তিনি বাস করবেন, এই তাঁর ইচ্ছা। দাদারও যে ইচ্ছা নেই তা নয়। চাকরি-জীবনে গ্রেডান্তরের মতন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে 'তলান্তরিত' হবার ইচ্ছা মধ্যবিত্তের মধ্যে যে কত প্রবল তা একমাত্র মধ্যবিত্তরাই জানেন।

অবশেষে দশ ইঞ্চি দেয়ালই সাব্যস্ত হল। দীর্ঘ দু-বছর ধরে ধীরেসুস্থে কোনরকমে ঠেলে উঠল দেয়াল। ঠেলে তোলা কি সহজ? চাকরিতে গ্রেডান্তরিত হয়েও হরিদাসদার সাধ্য কি—দশ ইঞ্চি দেয়াল গেঁথে, সিঁড়ি দিয়ে বৌদিকে দোতলার ঘর পর্যন্ত ঠেলে তোলেন? অফিসের কো-অপারেটিভের ঋণ, ইন্‌সিওরেন্সের ঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ ও পুঁজি, বৌদির গহনাগাঁটি, সমস্ত ইনভেস্ট করার পরেও তিন বছরে যাবতীয় দেয়ালের কাজ শুধু শেষ হয়েছে। বাকি আছে

অন্য সব—ছাদ, দরজাজানলা, দেয়ালের বালি, মেজের সিমেণ্ট ইত্যাদি। হরিদাসদার লক্ষ্য হল—প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় দরজাজানলা ছাদ ও অন্তত একখানা ঘরের চুনবালি সিমেণ্টের কাজ শেষ করে, ভাড়াটে বাড়ি ত্যাগ করা। তারপর ধীরেসুস্থে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণ শেষ করা—মায় বৌদির দোতলার সিঁড়ি পর্যন্ত।

কিন্তু দাদা ভাবেন এক, বৌদি ভাবেন আর-এক, এবং উপর থেকে সালিশী করে ভগবান সব লণ্ডভণ্ড করে দেন। এর মধ্যে হরিদাসদার গৃহ নিয়ে আরও অনেক ঝঞ্ঝাট বেধে গেল। দশ-বাই-দশ দুখানি ঘর, তৎসংলগ্ন বারান্দাসহ যখন গাঁথা শেষ হল, তখন বৌদি একদিন দেখতে এসে বলে গেলেন, 'এর চেয়ে গরুর খোঁয়াড় অনেক ভাল।' মাতৃতুল্য মাসীমা একদিন ঘর দেখতে এসে বললেন—'পায়রার খোপ্ তৈরি করেছিস কেন? ঠাকুরঘর কই? অমন কাজ করিস নে হরিদাস, দোতলায় একখানা ছোট ঠাকুরঘর তৈরি কর্।' হরিদাসদা বললেন ঃ 'ঠাকুর তো এতদিন দেয়ালেই ঝুলতেন মাসীমা, হঠাৎ এখন দোতলার ঘরে রাখতে বলছ কেন? আর দোতলায় ঘর যদিও বা একটা ছোট্ট জোড়াতালি দিয়ে করা যায় সিঁড়ি করতে তো অনেক দেরি হবে।' মাসীমা খুশি হলেন না কথা শুনে এবং অখুশি ভাবটা বৌমাকেও জানিয়ে গেলেন। একদিন এক পিসতুতো বোন এসে বাড়ি দেখে বলে গেল—'আমরা যে এসে দু-একদিন থাকব মধ্যেসধ্যে, তার কোন উপায় নেই। এমন বাড়ি না করলেই পারতে! অন্তত বারান্দাটা ঘিরে নিও দাদা!' এ-সব তো তবু ভাল! এরমধ্যে একদিন মারাত্মক কাণ্ড বেঁধে গেল, সামান্য তাকের ব্যাপার নিয়ে। রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘরের দেয়াল তৈরি হবার পর বৌদি দেখে বললেন—'দেয়ালের তাক চওড়া হয়নি, কৌট-বাটা ধরবে না, সংখ্যাও খুব কম হয়েছে—ওতে চলবে না।' অতএব ভাঁড়ারের দেয়াল আবার ভেঙে তৈরি করতে হবে।

এদিকে ষষ্ঠবর্ষ প্রায় হতে চলল। এখনও দরজা জানলা ছাদ, সবই বাকি। অর্থের ভাণ্ডারও শূন্য। প্রেতান্তরিত হরিদাসদা নিচের তলাতেই প্রায় সমাধিস্থ হবার উপক্রম! দশ ইঞ্চি দেয়ালের চাপে, মনে

হয় যেন তিনি ধুঁকছেন। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ‘শুভদিনে গৃহের ভিত্‌পত্তন করেও, কে জানত, এরকম দুর্দিনের গোড়াপত্তন হবে? তবু নিশ্চিত জেনো, একবার যখন শুরু করেছি তখন এর শেষ কোথায় দেখে নেব। ভাঁড়ার ঘরে চারদেয়ালে চার-বারং আটচল্লিশটা চওড়া-চওড়া তাক লাগিয়ে, আর পাশ দিয়ে সিঁড়ি তৈরি করে, তোমার বৌদিকে অন্তত দোতলার চিলেকোঠা পর্যন্ত ঠেলে তুলবই। যেদিন তা পারব সেদিন আমার গৃহনির্মাণ শেষ হবে’—‘এবং’ আমি বললাম, ‘গৃহিণীও খুশি হবেন।’
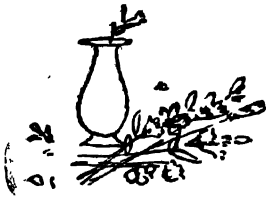
জীবনের দৌড়

আজকাল সকলেই বলেন, দিনকাল বদলে গেছে। বাস্তবিক এত দ্রুত বদলে গেছে যে, আমরা তার সঙ্গে যেন তাল রাখতে পারছি না। যত দিন যাচ্ছে তত পরিবর্তনের গতি বাড়ছে। পরিবর্তনের নিয়মই তাই। ক্রমে তার ছন্দ বদলায়। একশ’ বা এক হাজার বছর আগেও সমাজ পরিবর্তনশীল ছিল কিন্তু তার গতির ছন্দ ছিল অন্য রকম। ঢিমে তালে তখন পরিবর্তন হত এবং ধীরেসুস্থে আমরা তার সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নিতাম। এখন এত দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যে, অনেক সময় তার ধাক্কায় আমরা জীবনের স্বাভাবিক চলার পথ থেকে, আশপাশে ছিট্‌কে পড়ছি। আমাদের এই পরিবর্তনের গতির সঙ্গে একশ’ বছরের এক বৃদ্ধের জীবনের তুলনা করে একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী মন্তব্য

করেছেন—পঁচাশি বছর আমাদের কিন্দারগার্টেনে কেটেছে, দশ বছর কেটেছে প্রাইমারী স্কুলে, আর বাকি পাঁচ বছর মিডল্ ও হাইস্কুল শেষ করে আমরা কলেজ পর্যন্ত এগিয়ে গেছি। চলার ভাষায় বলা যায়—পঁচাশি বছর আমরা কেবল হামাগুড়ি দিয়ে চলেছি, দশ বছর চলেছি থপ্ থপ্ করে, আর বাকি পাঁচ বছর দৌড়েছি ঘোড়দৌড়ের মতন পড়ি-মরি করে। আমাদের এই এগিয়ে চলার কাহিনীই হল এ যুগের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর রূপকথা।

এগিয়ে চলা প্রসঙ্গে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে। রাজপুত্র রোহিত দীর্ঘকাল চলে চলে শ্রান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য যখন ঘরের দিকে চলেছেন তখন পথে তাঁকে দেবরাজ ইন্দ্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বললেন—হে রোহিত! যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্যও শুয়ে পড়ে, যে এগিয়ে চলে, তার ভাগ্যও এগিয়ে চলে—অতএব এগিয়ে চলো! ঘুমিয়ে থাকাটাই হল কলিকাল, জাগলেই হল দ্বাপর, উঠে দাঁড়ালেই ত্রেতা, আর এগিয়ে চলাই হল সত্য যুগ। অতএব, এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো! দেবরাজ ইন্দ্রের ভাষায়, আমরাই সেই সত্যযুগের মানুষ, এগিয়ে চলাই যাদের ধর্ম। বৈদিক যুগের কোনো ঋষি বা রাজপুত্র আজ যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে আমাদের এগিয়ে চলার বৈদ্যুতিক গতি দেখে নিশ্চয় তিনি শিউরে উঠতেন। দেখতেন, তাঁদের সেই আশ্রম ও তপোবনের জীবন, সেই সহজ সরল গ্রাম্যজীবন, সেই পৌর বা নাগরিক জীবনের কি আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে! কলকারখানা যন্ত্রপাতি যানবাহন রেডিও-টেলিফোন ইত্যাদি দেখে অবাক হতেন হয়ত, কিন্তু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতেন লোকসংখ্যা দেখে, লোকের ভিড় দেখে। কলকাতার ডালহৌসী স্কোয়ারের জনস্রোতের সামনে দাঁড়ালেই ভয়ে তাঁরা আড়ষ্ট হয়ে যেতেন।

আগের তুলনায় লোকসংখ্যা আজ শতগুণে বেড়ে গেছে, জীবন-যাত্রার মান ও ধারণাও আমূল বদলে গেছে। নগর ও শহর হয়েছে কর্মজীবনের উৎস। শহুরে জীবনযাত্রার স্রোত শতধারায় প্রবাহিত হয়ে গ্রামে গ্রামান্তরে পৌঁচচ্ছে এবং গ্রাম্যজীবনের আত্মকেন্দ্রিকতা ভেঙে

দিচ্ছে। আগে নগর ছিল গ্রামনির্ভর, এখন গ্রামও নগরনির্ভর হয়ে উঠেছে। কে কার উপর বেশি নির্ভর করে বলা কঠিন। গ্রামে হয়ত শহরের মতন রাস্তাঘাট নেই, ঘরবাড়ি নেই, ট্রাম-বাস-টেলিফোন নেই। বাস্তব জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের পার্থক্য আজও গ্রাম ও শহরের মধ্যে যথেষ্ট আছে। কিন্তু মূল অর্থনৈতিক জীবনের ব্যবধান—গ্রামের সঙ্গে শহরের—ক্রমেই ঘুচে যাচ্ছে। একঘেয়ে নাগরিক জীবনের ভারে ক্লান্ত হয়ে আগে যেমন আমরা গ্রামের সুলভ ও সাবলীল জীবনযাত্রার দিকে চেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতাম, আজকাল আর তা ফেলতে পারি না। মূল্য ও গুণাগুণ কোনদিক থেকেই আজ গ্রাম্য-খাদ্য বা পণ্যের সঙ্গে শহরের তফাত নেই। সব সমান হয়ে যাচ্ছে। কারণ গ্রাম ও শহরের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল, রাস্তাঘাট যানবাহনের উন্নতির জন্য, তা আর থাকছে না। শুধু তাই নয়, রেডিও ও সংবাদপত্র মারফত শহরের সব খবর, বাজার দর পর্যন্ত গ্রামে পৌঁচচ্ছে। আগেকার আত্মকেন্দ্রিক গ্রামের যে একটা স্বতন্ত্র জীবনযাত্রার মান ছিল, তা আর এখন থাকছে না। কি করে থাকবে? যুগটা হল কমেটের যুগ, গোরুর গাড়ি বা ছ্যাক্‌রা-গাড়ির যুগ নয়।

এই বিশাল পৃথিবীটা যখন কমেটের কল্যাণে ক্রমে একটা বিন্দুতে পরিণত হচ্ছে, তখন গ্রাম্য ও শহুরে জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য বজায় থাকবে কেমন করে? থাকা সম্ভব নয়, থাকছেও না। তার ফলে সমাজের গড়নও বদলে যাচ্ছে। কুলকৌলীন্যর বদলে অর্থকৌলীন্য আজ বিত্তকেন্দ্রিক, কুলকেন্দ্রিক নয়। বিত্তকেন্দ্রিক সমাজের বিভিন্ন স্তরের জীবনযাত্রার মানও বিভিন্ন। বিত্তোপার্জনের সাফল্য ও ব্যর্থতা অনুযায়ী প্রত্যেক স্তরের মধ্যেও আবার নিয়ত ভাঙাগড়া চলেছে। যেমন মধ্যবিত্তের মধ্যে। মধ্যস্তর থেকে মধ্যবিত্তের একটা অংশ যেমন উঁচুতে উঠছেন, তেমনি অন্য একটা অংশ আবার নিচুতে নামছেন। এই ওঠানামা অনবরত চলছে। এ যুগের পরিবর্তনশীল সমাজের এইটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শ্রেণীর স্থিতি নেই, স্তরের স্থিতি নেই—সুতরাং জীবনযাত্রার মানেরও স্থিতি নেই। খাওয়ানোর ক্ষমতা

বা 'adaptability', সবচেয়ে বড় জৈবিক সত্য, জীববিজ্ঞানীরা বলেন—তার জন্যই জীবজগতের ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছে। সামাজিক সত্যও তাই, বিশেষ করে আজকের এই পরিবর্তনের যুগে সবচেয়ে নিষ্ঠুর সত্য।

কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গেও জীবনযাত্রার মান জড়িত। জীবনযাত্রার তাগিদে ঘরের মেয়েরা আজ বাইরে কাজ করতে বেরিয়েছেন। তার জন্য পারিবারিক জীবনে নানারকম সমস্যা দেখা দিয়েছে। কেষ্টার মতন 'পুরাতন ভৃত্যরা' আজ কলকারখানার স্বাধীন মজুর, গৃহবন্দী দাস নয়। ভৃত্যের যুগ শেষ হয়ে গেছে, সুতরাং ঘরে-ঘরে ভৃত্য-সঙ্কট। ঘরণীরও নানারকম সমস্যা—রন্ধনের সমস্যা, শিশু পালনের সমস্যা। যৌথপরিবারের যুগের দু-একজন অনাথা পিসিমা বা 'সারপ্লাস' ভাইপো ভাগ্নেও নেই যে কোনরকমে কাজ চলে যাবে। এককথায় সংসার অচল, এদিকে না বেরুলেও চলে না। অর্থাৎ শুধু সঙ্কট নয়, উভয়সঙ্কট। এই আস্থায় জীবনের তরি প্রায় ভরাডুবির হবার উপক্রম। অথচ পরিত্রাণের পথ আছে। শুধু বাইরে নয়, ঘরে-বাইরে দু-জায়গাতেই জীবনযাত্রার মান বদলানোর দরকার। পারিবারিক জীবনকে পরিবর্তনশীল সামাজিক জীবনের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেওয়া প্রয়োজন। মধ্যযুগের ঘরে বাস করলাম আর আধুনিক অফিসে কাজ করলাম—স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন সকলে—তাতে সংসার তো বটেই, জীবন পর্যন্ত অচল হয়ে যাবার সম্ভাবনা। ঘরও যদি আধুনিক ঘর হয়, তাতে যদি আধুনিক বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক সাজসরঞ্জাম থাকে—রান্নাঘর থেকে শোয়ার ঘর পর্যন্ত—ঘরোয়া জীবনযাত্রা যদি আমিরী চালের না হয়, তাহলে পুরাতন ভৃত্য কেষ্টাকে আমরা স্বচ্ছন্দে বিদায় দিয়ে অনেকটা আত্মনির্ভর হতে পারি। পাড়ায় পাড়ায় কিন্ডারগার্টেন, নার্সারী থাকলে শিশুপালনের সমস্যাও কিছুটা মিটতে পারে। এইভাবে ঘরের সঙ্গে বাইরের জীবনযাত্রার বিরোধের অবসান করা যায় এবং করাও বাঞ্ছনীয়। তা না হলে প্রথমে বিরোধ, তারপর সঙ্কট এবং অবশেষে অধঃপতন ও ভাঙন।

ব্যক্তিগত জীবনেও তাই। সঙ্কট সেখানে আরও গভীর। জীবন-যাত্রার ধরনই এমন হয়েছে যে, ক্রমেই আমরা চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছি। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক আমরা একসঙ্গে চলাফেরা করেছি, কাজকর্ম করছি বড় বড় ম্যানসনের পাশাপাশি ফ্ল্যাটে বাস করছি, হয়ত একই সিঁড়ি দিয়ে অসংখ্যবার ওঠানামা করছি—তবু কেউ কাউকে আমরা বিশেষ চিনি না, জানি না, কারও সঙ্গে কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই আমাদের। মানবিকতা, সামাজিকতা, আন্তরিকতা, এসব যেন ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, মানুষ যত বাড়ছে, মনুষ্যত্ব তত কমছে। ফাইল-রেকর্ড, ডকুমেণ্ট-ডীড বণ্ডচেক্, মর্টগেজ-কণ্ট্রাক্ট, প্রসপেক্টাস-ক্যাটাগল, সুভেনির-সার্টিফিকেট, বিজ্ঞাপন-পত্রিকা ইত্যাদি নিয়ে বিচিত্র এক কাগজের কৃত্রিম জীবন যাপন করছি আমরা। প্রত্যেকে আমরা কাগজের ফুল, বর্ণের বাহার আছে বাইরে, ভিতরে মনুষ্যত্বের গন্ধ নেই। কে যেন বলেছিলেন, দলিল-দস্তাবেজ কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেল, তাহলে যত তাড়াতাড়ি এ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে; কোন ভূমিকম্পে বা মহাযুদ্ধে তা হবে না। কথাটা অনেকটা ঠিক। কাগজ ও সেলুলয়েডের সভ্যতা গড়েছি আমরা, জীবনযাত্রার মানদণ্ডও তৈরি করেছি তাই দিয়ে। একটা 'সেকেণ্ডহ্যাণ্ড' জীবনের মানদণ্ড। প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই কোথাও, সবুজের চিহ্ন নেই জীবনে। স্তূপাকার ইস্পাত-এলুমিনিয়াম-কংক্রীটের মধ্যে একটুক্রো কলে-ছাঁটা লন্ বা পার্ক, নগরবিজ্ঞানী লুইস মামফোর্ডের ভাষায়, ময়লা একখানা পকেট-রুমালের মতন বিসদৃশ। তার মধ্যে আমরা বাস করি, কাছাকাছি থাকি, পাশাপাশি চলি, অজ্ঞাতকুলশীলের মতন। এই অজ্ঞাতকুলশীলতাই, সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, আধুনিক যুগের যাবতীয় মানসিক বিকারব্যাধি, উন্মার্গগামিতা ও অপরাধপ্রবণতার কারণ। আধুনিক পরিবর্তনের যুগে মানুষের ব্যক্তিগত সঙ্কটই সবচেয়ে করুণ ও মর্মান্তিক।

এখানেও সেই সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রশ্ন—ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির। সামজিক জীবনযাত্রার সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের সমীকরণ প্রয়োজন। ছ'য়ের মানদণ্ড এক হওয়া দরকার—সমষ্টির ও ব্যক্তির।

তাহলে, এই বিদ্যুৎগতি পরিবর্তনের যুগে, আমরা অনেকটা আমাদের 'ব্যালান্স' রেখে চলতে পারব। সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনও ফিরে আসবে।

প্রথম জীবিকা

জীবনটা নাটক কি না জানি না। তবে সকলের জীবন সম্পূর্ণ নাটক নয়। জীবনের কিছুটা নাটক, কিছুটা নভেল, কিছুটা কাব্য। বাল্যকাল থেকে প্রৌঢ়ত্বের সীমা পর্যন্ত জীবনটাকে এই তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। বাকি জীবনটা প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। 'জীব' থেকে 'জীবন' ও 'জীবিকা' দুই কথারই উৎপত্তি হয়েছে এবং দুয়ের সম্পর্কের মধ্যে বোধ হয় বিপত্তির কারণও তাই। জীবের সঙ্গে জীবনের এবং জীবনের সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক কি, তাই নিয়ে অনেকদিন ভেবেছি, কিন্তু ভেবে কোন কূল পাইনি। ছেলেবেলা থেকে শুনেছি, জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি, অর্থাৎ জীবিকার সংস্থান করবেন তিনি। সেই ভরসাতে অনেকদিন কাটিয়ে প্রায় ভরাডুবি হতে চলেছিলাম। আমার প্রথম জীবিকার করুণ কাহিনী শুনলেই সেকথা বুঝতে পারবেন।

জীবনের এমন একদিন ছিল যখন মাটিতে পা দিতেই হত না। পরিবারের লোকজনের কোলেপিঠে ঘুরে-ঘুরেই দিন কাটত। স্নেহের প্রতিমূর্তি আত্মীয়-স্বজনরা তখন হাতে নাড় নিয়ে মুখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলতেন—

হাত ঘুরু ঘুরু নাড়ু দেব
নইলে নাড়ু কোথায় পাব—

সেটা হল জীবনের নাড়ুগোপাল অবতারের যুগ। আর একটু বয়স বাড়তে দেখলাম, নাড়ুগোপালী জীবনের নাড়ুটি খসে গেল, বাকি রইল 'গোপাল'। তাও কম নয়, তখনও সকলের কাছে 'আত্মরে গোপাল'। সোহাগের রামধনু-রঙ জীবনের আকাশ থেকে একেবারে মুছে যায়নি। তারপর ছাত্রজীবন। পরিবার ও দৈনন্দিন সংসার থেকে দূরে কচি-কচি কল্পনার প্রবালদ্বীপে নির্বাসিত এক বিচিত্র জীবন। জানতাম না, আত্মরে গোপালের অন্তিমকাল সেটা। ভেবেছিলাম জীবনটা এমনি করেই বুঝি কেটে যাবে—একটার পর একটা পরীক্ষা দিয়ে—আই-এ, বি-এ, এম-এ। কিন্তু তা কাটল না। শেষ পরীক্ষার পর একমাস দুমাস করে প্রায় একটা বছর কেটে গেল। ফাটকা বাজারের শেয়ারের মতন এম-এ ডিগ্রিধারীর দর হু হু করে নামতে লাগল। অর্থনীতির ছাত্র হয়েও জীবনের এই তেজীমন্দির মহাত্ম্য এতদিন উপলব্ধি করতে পারিনি। নাড়ুগোপালের কাল যে কবে কেটে গেছে, কালিদাসের কালের মতন, তাও খেয়াল ছিল না যেন। অবশ্য পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার পর হঠাৎ একটা সোনার চাঁদের স্বর্ণযুগ এসেছিল, কিন্তু সেটা যে এত ক্ষণস্থায়ী তা কল্পনা করতে পারিনি। সোনার চাঁদের নানারঙের দিনগুলি শেষ পর্যন্ত সোনার খাঁচায় বন্দী হয়ে রইল না। বাবা তো একরকম বাক্যালাপই বন্ধ করে দিলেন। মুখোমুখি দেখা হলেই মুখ গম্ভীর করে থাকতেন, কথা বলতেন না। সে-গাম্ভীর্য দেখলে ভয় করত, মনে হত, এর চেয়ে চিৎকার করাও ভাল। মধ্যে মধ্যে শুনতে পেতাম, মাকে তিনি বলছেন: 'ওকে বলে দিও নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিতে—এটা হরিঘোষের গোয়াল নয়।' বিছানায় শুয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে ভাবতাম—কোথায় নাড়ুগোপালের সেই মথুরা-বৃন্দাবন আর কোথায় হরিঘোষের গোয়াল।

কথার সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াও আরম্ভ হল। প্রথমে দেখলাম, খাদ্যের আইটেম্ কমতে লাগল। সকালে একবারের বেশি দুবার আর চা পাওয়া যায় না। মা-পিসিমা কেউ একটা কথাও জিজ্ঞাসা করেন না, কি দরকার

না-দরকার। মাছের টুকরো ছোট হতে হতে প্রায় কাঁটা-সর্বস্ব হয়ে দাঁড়াল। খাবার শেষে একটু দই খেতাম, আবাল্য অভ্যাস, সেটাও ছাঁটাই হয়ে গেল। বড়ভাই হিসেবে ছোট ভাই-বোনদের কাছে আমার খাতির ছিল রামচন্দ্রের মতন। তাও দ্রুত উবে যেতে লাগল। এমন কি, সেইসব দরিদ্র অসহায় আত্মীয়—'the most irrelevant thing in nature'—যাদের দরজার কড়া-নাড়া শুনেই চেনা যায়—মনে হয় এই রেঃ! ঐ এসেছে!—'a Lazarus at your door'—তারা পর্যন্ত দেখা হলে চিনতে পারত না। টাকার মতন মানুষের জীবনেরও যে এরকম ডিভ্যালুয়েশন হয় তা জানা ছিল না, অথচ ডিভ্যালুয়েশনের কত থিয়োরীই না ছাত্রজীবনে মুখস্থ করেছি।

পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়ে ডিভ্যালুয়েশনের ঢেউ বাইরেও পৌঁছতে লাগল। দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন, অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব, সকলেই যেন কেমন উদাসীন হয়ে উঠল আমার সম্পর্কে। ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, চায়ের আড্ডা, সব জায়গায় আমার উপস্থিতিটাও যেন অন্যের কাছে অসহ্য মনে হতে লাগল। কোথাও আমি কিছুই কন্ট্রিবিউট করতে পারি না। সুতরাং সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, কমিটি-মেম্বার থেকে অর্ডিনারী মেম্বার হয়ে, অবশেষে সেখান থেকেও পদচ্যুত হলাম। ছেলেবেলার সেই 'সেণ্টার ফরোয়ার্ডে'র কাহিনী মনে হল। ফুটবলম্যাচ খেলার সময় আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম, খেলার 'চান্স্' পাওয়ার জন্য। টস্ করে প্লেয়ার নির্বাচন করা হত। একজন প্লেয়ার শুধু আগে থেকেই ঠিক থাকত, সেণ্টার ফরোয়ার্ড। একদিন এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'আচ্ছা, সেণ্টার ফরোয়ার্ড বদলায় না কেন?' বন্ধুটি আমার অজ্ঞতায় অবাক হয়ে বলল: 'তাও জানিস্ না, বল্‌টা যে ওর!' সত্যিই জানতাম না যে এই দুনিয়ায় বল্ যার, তার হাত-পা ছোড়ার গুণ ছাড়া আর অন্য কোন গুণ না-থাকলেও, সে-ই সব সময় সর্বত্র সেণ্টার ফরোয়ার্ড খেলে। সংসারে টাকার মতন রোলিং বল্ আর কি আছে বলুন?

অবশেষে জীবিকার সংগ্রামে অবতীর্ণ হলাম, জীবনের প্রথম জীবিকা।

একদিস্তে কাগজ কিনে নিয়ে এসে লিখতে বসলাম ঘরে। মনটা কারও ওপর প্রসন্ন নয়। নিজের মনে লিখছি আর কবিতা আওড়াচ্ছি—

যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া…
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

কাব্যপাঠ শুনে মা একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেলেন, ছেলের ভাবান্তর হল কি না। কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পরে পিসিমা এসে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি হয়েছে কি তোর, কি করছিস কি?' গম্ভীরকণ্ঠে জবাব দিলাম—'কিছু হয়নি, দরখাস্ত করছি।' 'কিসের দরখাস্ত?' 'চাকরির দরখাস্ত'। 'ও'—বলে একগাল হেসে পিসিমা চলে গেলেন। একটু পরেই ঘুরে এসে হাসতে হাসতে বললেন: 'একটু চা-খাবার খাবি বাবা, এনে দেব?' সম্বোধন ও প্রস্তাব, দুই-ই অপ্রত্যাশিত। বললাম: 'দাও'। মনে মনে ভাবলাম: দরখাস্ততেই এই! এখনও ইন্টারভিউ, অ্যাপয়েন্টমেন্ট, সবই তো বাকি আছে। তারপর বরখাস্তও আছে। অবশ্য সেকথা দরখাস্তের সময় না ভাবাই ভাল ও বাঞ্ছনীয়।

চাকরি পেলাম—ব্যাঙ্কে—বংশগত চাকরি কেরানীগিরি। দেখতে দেখতে দাম চড়তে লাগল আমার, ঘরে-বাইরে সর্বত্র। ফাটকা-বাজারের শেয়ার কোথায় লাগে। দরখাস্ত লেখা দেখেই পিসিমা চা-খাবার দিয়েছিলেন। জীবিকাহীন জীবনে খাদ্যশেষের যে দইটুকু ছাঁটাই হয়ে গিয়েছিল, ইন্টারভিউয়ের দিন তার পুনর্বহাল হল। প্রথম যেদিন চাকরি করতে যাব সেদিন ঠিক অভিষেকের মতন আয়োজন হল বাড়িতে। বাবার পাশে খেতে বসলাম, অস্তগামী কেরানীর পাশে উদীয়মান কেরানী। মাছের মুড়োটা নিজের বাটি থেকে বাবা আমাকে তুলে দিলেন। মাকে বললেন: 'যাবার সময় টিফিনের কৌটোটা ওকে মনে করে দিয়ে দিও।' পিসিমা পাশে বসে পাখার বাতাস করতে লাগলেন। অপিস যাবার সময় মনে হল, সকলে যেন আমার দিকে চেয়ে দেখছে, রাস্তার লোক, ট্রামের লোক। সকলের মধ্যে আমি একজন, আমার

মূল্য আছে আজ। মনে হল, আমার মাইনেটা দিয়ে সকলে যেন আমার মূল্য যাচাই করছে।

একে-একে আত্মীয়-কুটুম্ব যে যেখানে ছিলেন, সকলেই আত্মীয়তা জানাতে এলেন। 'চিনতে পারছ বাবা, আমি তোমার পিসেমশাই!' চিনি না, শুনিওনি কখনও। কেউ বললেন: 'আমি তোমার কাকা হই—তোমার ঠাকুরদাদা আর আমার বাবা মামাতো-পিসতুতো ভাই'! সবই বুঝলাম, কিন্তু বুঝে করব কি? ভিক্ষার ঝুলি আর টাকার থলের কথা মনে আছে?

কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে
আমরা কুটুম্ব দোহে ভুলে গেলি কি রে?
থলি বলে, কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে।

কাকা-জ্যাঠা, মেসো-পিসে, যাঁরা এলেন তাঁদের এই কথাই বললাম। কোন এক ইংরেজ কবির চমৎকার কয়েকটি কথা মনে হল—

Man should not earn his living
If he earns his life, he will be lovely.

ভাবলাম, কি মূল্য আছে একথার? জীবনই সুন্দর, জীবিকা নয়। এই ডারুইনিয়ান জীবজগতে এ কথার কোন মূল্য নেই। এখানে আমরা জীবিকা অর্জন করি, জীবন বিসর্জন দিয়ে। এই আমার প্রথম জীবিকার অভিজ্ঞতা।
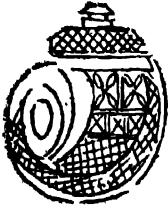
এক ছিলিম তামাক

"Staal, one of the ablest historians of tobacco, is correct in his statement that 'no other plant has influenced as extensively as the tobacco, the economic and cultural life of all humanity."

—Julius E. Lips.

তামাক ও ধূমপানের কাহিনী বলছি। কাহিনীটি পড়বার আগে মনে রাখবেন—it is not a tale told by an idiot, full of sound and fury—দু'জন বিশ্ববিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী স্টাল ও লিপ্‌সের মতে—'it signifies something.'

বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতিতীর্থ ত্রিবেণী পরিদর্শন করতে গিয়ে সেদিন নানারকমের মাটির পাত্র দেখলাম। মাটির কলসী-হাঁড়ি-মালসা, গামলা, পুতুল ইত্যাদি। যত্রতত্র এসব জিনিস প্রচুর দেখা যায়, মাটির পাত্রের ছড়াছড়ি বাংলাদেশে। তবু ত্রিবেণীর কয়েকটি হাঁড়ি-কলসীর বিচিত্র গড়ন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে লোকের ভিড় জমে যায়। মাটির হাঁড়ি-কলসীর আবার দেখবার কি আছে? মাটির পাত্রের অনেকটা অংশ যে এখনও কুম্ভকাররা হাতে পিটে তৈরি করে, একথা আগে অনুমানে জানা থাকলেও সঠিক জানতাম না। হাঁড়ি-কলসীর সমস্ত তলার অংশটাই হাতে পিটে তৈরি, এবং হাতে তৈরি অংশটুকু সবটাই মেয়েদের তৈরি। একথাও সম্পূর্ণ জানা ছিল না। কুম্ভকারের মুখে সব সবিস্তারে শুনলাম। কথাবার্তার সময়টুকুর মধ্যে কৌতূহলী লোকের বেশ ভিড় জমে গেছে দেখলাম। কৌতূহল ও ভিড় উভয়েরই একটা বিশেষ কারণ ছিল। সেটা তখন খেয়াল হয়নি। পরে যখন খেয়াল হল তখন আর পশ্চাদপসরণের সময় নেই। গম্ভীরভাবে

সমবেত জনমণ্ডলীর কাছে আমাদের সাধু উদ্দেশ্য সহজ কথায় ব্যাখ্যা করে আমরা প্রস্থান করলাম।

মাটির হাঁড়ি-কলসীর সঙ্গে ছোটবড় নানারকমের গড়নের মাটির কল্কে ছিল। তার মধ্যে এমন কতকগুলি অদ্ভুত গড়নের কল্কে ছিল যা আগে কোনদিন মনোযোগ দিয়ে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। সেই সব হরেকরকমের কল্কে নেড়েচেড়ে দেখছিলাম বলে ত্রিবেণীর ঘাটে আমাদের ঘিরে ভিড় জমেছিল। প্রথমে আমরা বুঝতে পারিনি। পরে কল্কে সম্বন্ধে কন্‌সাস হয়ে ব্যাপারটা কন্‌ট্রোল করে ফেললাম। যাই হোক, হাতেগড়া মাটির কল্কে যা আজীবন দেখছি তা হল হুঁকোকল্কের কল্কে অর্থাৎ তামাক খাওয়ার কল্কে। অনেক রকমের গড়ন দেখেছি তার। সবই হাতে তৈরি। কিন্তু গাঁজার কল্কের যে এতরকমের গড়ন হয়, কোনদিন ভাল করে দেখিনি। তামাকও গাছের পাতা, গাঁজাও তাই। আরও নানারকমের গাছের পাতা আছে, শুকনো অবস্থায় যার ধূমপান করলে নেশা হয়। কল্কে দেখলে মনে হয়, গাঁজার কল্কে একেবারে আদি অকৃত্রিম কল্কে। কিন্তু প্রমাণ করার কোন উপায় নেই। ধূমপানযোগ্য বন্য-গাছের পাতা, তৃণ-গুল্মলতার মধ্যে কোন্‌টি কবে মানুষ আবিষ্কার করেছে মৌতাতের জন্য, তা জোর বলা যায় না। কারণ তার কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসনে কোন সম্রাট তার কোন প্রমাণ রেখে যাননি। তামাক আগে, না গাঁজা আগে, না ভাং বা আফিম আগে তাও বলবার কোন উপায় নেই। যব, গম, ধান ইত্যাদি খাদ্যশস্য নিয়ে যেমন উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন এবং মোটামুটিভাবে তার প্রাথমিক চাষ-আবাদের ভৌগোলিক অঞ্চলও নির্দেশ করেছেন, নেশার বন্য-গাছপালার উৎপত্তি বা আবাদ সম্বন্ধে তেমনভাবে কেউ কোন গবেষণা করেননি। খাদ্য-শস্যের চাষ-আবাদের আগেই এই সব বন্য গাছপালার সন্ধান মানুষ পেয়েছিল কিনা এবং তার নির্যাস ও ধোঁয়ার মাদকতার কথা জানতে পেরেছিল কিনা, তাও বলা যায় না। পাওয়া খুবই সম্ভব। যাযাবর অবস্থায় মানুষ যখন বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, তখন তার প্রধান কাজ ছিল দুটি। বন্যজন্তু শিকার করা এবং বনের ফলমূল সংগ্রহ করা।

বনের ফলমূল সংগ্রহ করতে করতে তাদের মধ্যে কেউ বুনো তামাক ভাং ইত্যাদির পাতা ও বীজ যে কোনদিন খেয়ে দেখেনি তা নয়। খেয়ে নেশায় ঢুলে পড়েছে এবং তার অভিজ্ঞতার কথা সঙ্গীদের কাছে বলেছে। তারপর তামাক, গাঁজা, ভাং ইত্যাদির গুণাগুণ বুঝতে ও প্রচার করতে তাদের দেরি হয়নি।

আদিম যাযাবর বর্বর জীবনে তামাক, ভাং-এর প্রয়োজন বেশি ছিল, না সভ্য জীবনে তার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে, একথাও দলিল-দস্তাবেজের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় না। স্টাল ও জুলিয়াস লিপ্‌স, যাঁদের কথা গোড়াতে এক সঙ্গে উদ্‌ধৃত করেছি, তু'জনেই বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী। তাঁরা বলেছেন যে, সারা পৃথিবীর সকল জাতির মানুষের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে তামাক যেরকম প্রভাব বিস্তার করেছে, এমন আর অন্য কোন উদ্ভিদ্ করেনি। তামাক-প্রসঙ্গে বলে কথাটা হয়ত হাল্‌কা মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর কথা ছেড়ে দিয়ে নিজের বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত দিই। বাংলাদেশের সাধারণ দরিদ্র চাষীরা অনেকেই তুবেলা অন্নভক্ষণের বিলাসিতা কি তা জানে না। কিন্তু শহুরে যে কোন চেইন-স্মোকারের ধূমপানের বিলাসিতা গ্রামের যে কোন অর্ধভুক্ত দরিদ্র চাষীর তামাক সেবনের বিলাসিতার কাছে ম্লান হয়ে যায়। 'এক-ছিলিম তামাক' আর এক মুঠো ভাত—এই তুয়ের মধ্যে বাংলাদেশের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কোন্‌টির প্রাধান্য বেশি, তা বলা মুশকিল। ভাতের চেয়ে তামাকের গুরুত্ব বেশি, একথা উচ্চারণ করাও অন্যায়। মহাপাতকরাও এমন কথা বলবেন না, এবং আজকের দিনে আকাটা অধ্যাত্মবাদীরাও বলতে দ্বিধাবোধ করেন। তবু সাধারণ বাঙালীর জীবনে এক-ছিলিম তামাকের গুরুত্ব যে কত বেশি তা অসাধারণরা সহজে বুঝতে পারবেন না। বাঙালী নয় শুধু, বাঙালী, বিহারী ওড়িয়া, তামিল থেকে চীনা, নিগ্রো, ইয়োরোপীয় জনসাধারণের জীবনে একছিলিম তামাকের প্রভাব যথেষ্ট।

এ সম্বন্ধে একটি ছোট্ট গল্প মনে পড়ছে। মালদহ জেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে আমার মামার বাড়ি। ছেলেবেলায় প্রায় মামার বাড়ি যেতাম বৈশাখ-

জ্যৈষ্ঠ মাসে আম খেতে। একদিন দেখি এক বৃদ্ধ চাষী তার আট-নয় বছরের একটি ছোট ছেলেকে নিয়ে এসেছে, রাখালের কাজে বহাল করার জন্য। দিদিমার জিম্মায় ছেলেটিকে দিয়ে সে খুবই নিশ্চিন্ত, বারবার সেই কথা দিদিমাকে বলে সে বুঝিয়েও দিচ্ছে। কিন্তু তবু ছেলেটিকে রেখে সে চলে যেতে পারছে না। বাইরের দরজা পর্যন্ত যাচ্ছে আর আসছে এবং দিদিমার সামনে এসে কি যেন বলবে বলবে করছে। ভাবগতিক দেখে দিদিমা নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'কিছু বল্‌বি রে ?' সে বলল ঃ 'বুল্‌তে লাজ লাগছে দিদি! বুল্‌ছি কি ব্যাটাকে হামার একটু তামুক খেতে দিও। ভাত না খেলেও ব্যাটার কিছু হবে না, কিন্তু তামুক না খেলে প্যাট ফুলবে।' কথাটা আমার আজও মনে আছে। বৃদ্ধ পিতার আবেদন শুনে বালক পুত্র মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে দেখলাম। দিদিমা যখন তামাকের সুব্যবস্থার গ্যারান্টি দিলেন, তখন একগাল হেসে সে চলে গেল। এর মধ্যে দেখি সেই বাচ্চা ছেলেটি একদৌড়ে বাড়ির দফাদারের কাছে গিয়ে, তার হাত থেকে ধূমায়মান কল্কেটি কেড়ে নিয়ে দুই হাত মুঠো করে ধরে জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে ফিরিয়ে দিল। অবাক হয়ে গেলাম। কি চমৎকার এফিসিয়েন্সি। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার সময় পর্যন্ত কল্কে টানার ট্রেনিং না পেলে এরকম এক্সপার্ট হওয়া সাত-আট বছরের মধ্যে সম্ভব নয়। তামাক না খেলে ঐ ছেলের যে সত্যিই পেট ফুলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কল্কেতে ধূমপানের পদ্ধতিটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম।

তখন তামাকের মর্যাদা বুঝতাম না, সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বুঝবার মতন বয়সও হয়নি। এখনও সেই ছেলেটির কল্কের টানের কথা মনে পড়ে। দুই হাতের মধ্যে কল্কেটি ধরবার ভঙ্গি এবং হাতের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া টেনে বার করার কৌশলের কথা ভাবলে মনে হয়, এই হল ধূমপানের সবচেয়ে প্রিমিটিভ পদ্ধতি। মাটি দিয়ে হাতে কল্কে গড়া যায়। কল্কে গড়নের বৈজ্ঞানিক সূত্রটিও খুব সহজ সরল। উপর থেকে নিচে পর্যন্ত ডায়েমিটার ক্রমে ছোট করে গড়লেই তামাকের ধোঁয়া প্রস্তুত হয়ে আসতে পারে। হাতে পিটে মাটির পাত্র গড়ে, আগুনে পুড়িয়ে

ব্যবহারযোগ্য করে নেবার সময় মানুষের যে কল্কে গড়বার মতন বুদ্ধি হয়েছিল, তা অনায়াসেই কল্পনা করা যায়। কাঁচা বা শুকনো তামাকপাতা, ভাং, গাঁজা, আফিম ইত্যাদি না চিবিয়ে খেয়ে, এইভাবে কল্কের উপর পুড়িয়ে যদি তার ধোঁয়া সেবন করা যায়, তাহলে নেশাও হয়, আরামও লাগে এবং অবসর বিনোদনেরও সুবিধা হয়। এ সত্যও আবিষ্কার করতে আদিম মানুষের যে খুব বেগ পেতে হয়েছিল তা মনে হয় না। হুঁকোর জলে ধোঁয়াটাকে ধুয়ে নেওয়ার চিন্তাটা অনেক পরের। হুঁকো উন্নত বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রতীক। কিন্তু দুই-হাতের মুঠোয় কল্কে বাগিয়ে ধরার পদ্ধতিটি রীতিমত প্রিমিটিভ। কল্কের বয়সও স্থূল হাতে-গড়া মাটির পাত্রের বয়সের সমান। অর্থাৎ কল্কে আগে, হুঁকো পরে। কল্কে না থাকলে হুঁকোর বিচিত্র বিকাশ হত না। ধূমপানের বিলাসিতার দিকটা, অবসর-বিনোদনের দিকটা যত বেড়েছে, তত কল্কের সাঙ্গপাঙ্গ হুঁকো-গড়গড়া-আলবোলা ইত্যাদির বৈচিত্র্যও বেড়েছে। কর্মজীবনের প্রেরণা থেকে ধূমপান ক্রমেই অকর্মণ্যতার ইন্ধন হয়ে উঠেছে। কল্কে কর্মজীবনের প্রতীক, হুঁকো গড়গড়া আলবোলা ইত্যাদি আয়াস ও আলস্যের প্রতীক। এমন কি কল্কের প্রত্যক্ষ বংশধর পাইপও তাই। কল্কের এই ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে পরে আবার আলোচনা করব।

দেশ বিদেশের মানুষের ধূমপানের পদ্ধতি দেখলেই বোঝা যায় যে, কল্কে বা কল্কে-জাতীয় অন্য সব জিনিসই হল আদি ও অকৃত্রিম। কিন্তু কল্কের বা পাইপের কথা বলার আগে তামাক খাওয়ার কথা বলা দরকার। তামাক খাওয়ার প্রচলন হল কবে ও কোথায়? তামাক সম্বন্ধে সর্বশেষ গবেষণার ফলাফল জানিয়ে নৃবিজ্ঞানী লিণ্ডব্লোম (Lindblom) ১৯৪৭ সালে বলেছেন যে—Probably everyone is now agreed that tobacco reached America from the old world. একথা বলার উদ্দেশ্য হল বিশেষজ্ঞরা এতদিন মনে করতেন যে—Snuff, Cigarettes, Cigars, Pronged Cigar-holders and tobacco pipes are Indian inventions. এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা এখনও হয়নি।

বিড়ি-সিগারেট, চুরুট যাঁরা খান তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না যে পণ্ডিতমহলে তাই নিয়ে কিরকম গবেষণা হয়। সাধারণ গাঁয়ের লোক এক-ছিলিম তামাক খেয়ে দশ গ্যালন পেট্রলের সমান এনার্জি পান, তাতেই তাঁরা খুশি। ছাই হয়ে উড়ে যায় তামাক, তা নিয়ে গবেষণা করার কোন কারণ থাকে না। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা বিড়ি-সিগারেট খান একটু চাঙ্গা হবার জন্য। ধনিকরা ধূমপান করেন, বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেবার জন্য। কবি-শিল্পীরা হয়ত সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে নিজেদের কবিসত্তাকে বিলীন করে দেন। কিন্তু কেউ কোনদিন এক-ছিলিম তামাক খাওয়ার সময় তামাকের উৎপত্তি প্রসার বা তামাক খাওয়ার প্রচলনের ইতিহাস সম্বন্ধে এক-মুহূর্ত চিন্তার অবকাশ পান না। এক-ছিলিম তামাক খাব, তা নিয়ে আবার অত গবেষণার দরকার কি? সেকথা ঠিক, কিন্তু তামাক নিয়ে গবেষণার কথাটাও মিথ্যা নয়। যাঁরা তামাক নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁরা তামাক খান কি না জানি না, তবে যাঁরা খান তাঁদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন। যেমন তামাক, নস্য, সিগার-পাইপ ইত্যাদি সব আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের আবিষ্কার বলে অনেকে মনে করেন। আবার অনেকে মনে করেন, তা নয়। আমেরিকার বাইরে থেকে তামাক খাওয়ার রীতি আমেরিকায় প্রচলিত হয়েছে। দুই দলের পণ্ডিতদের মধ্যে আজও কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি এবং তার জন্য তামাক খাওয়া আটকে নেই। একদল পণ্ডিত আছেন তাঁরা বলেন যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে কলম্বাস ওয়েস্ট ইণ্ডীজের আদিম জাতির কাছ থেকে প্রথমে ধূমপানের সন্ধান পান। এলিজাবেথের রাজত্বকালে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে ইংলণ্ডে ধূমপানের প্রথা প্রচলন করেন। মোগল-যুগের শেষে পর্তুগীজরা নাকি ভারতবাসীদের ধূমপান করতে শেখায়, এবং তারপর ধূমপান সারা এশিয়ায় ছড়িয়ে ওড়ে। কেউ বলেন যে শ্বেতাঙ্গরা প্রথমে যখন আমেরিকা মহাদেশে যান, তখন সেখানকার স্থানীয় আদিবাসীদের মধ্যে 'habit of producing smoke from an herb held in mouth' দেখে চমৎকৃত হন এবং সেই অভ্যাসটি ইয়োরোপে বহন করে নিয়ে এসে বদভ্যাসে পরিণত করেন। জ্যঁা নিকত (Jean Nicot)

নামে পর্তুগীজ রাজসভার একজন ফরাসী রাষ্ট্রদূত ধূমপানের অভ্যাস সেখানকার রাজকর্মচারী মহলে প্রথমে চালু করবেন। এই ফরাসী রাষ্ট্রদূতই নিকোটিনের আবিষ্কারক শোনা যায়। পণ্ডিতমহলে এক-ছিলিম তামাকের এরকম অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। বেশ কড়া দু-চার ছিলিম তামাক না খেলে এ রকম বিচিত্র গবেষণা করা সত্যিই যে সম্ভব নয়, একথা পণ্ডিতদের প্রতি কোনরকম অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেও বলা যায় পরের হাতে তামাক খেতে যেদিন থেকে পণ্ডিতেরা শিখেছেন তার অনেক আগে থেকে নিজের হাতে মানুষ তামাক খেয়ে আসছে।

প্রথমে আদিবাসীদের কথা বলব। আমাদের ভারতবর্ষে প্রায় সকল শ্রেণীর আদিবাসীই তামাক খায়। কেবল তামাক খায় বললেই সব বলা হয় না। ধূমপানের এত রকমের সব যন্ত্র ও পাত্র তাদের আছে যা সাজিয়ে রাখলে যে কোন আধুনিক উঁচুদরের টোবাকোনিস্টের দোকানকেও টেক্কা দিতে পারে। আসামের নাগারা খুব তামাক খায়, আফিমও খায়। নিজেরাই তারা তামাক চাষ করে। অবশ্য সাধারণত নাগারা কল্কেতে তামাক খায় না, আধুনিক সভ্য মানুষের মতন পাইপে তামাক খায়। পাইপটা কিন্তু সভ্য পাইপ নয়, বর্বর পাইপ, নাগাদের নিজেদের তৈরি। পর্তুগীজ বা বৃটিশ কোন সাহেবের পাইপ দেখে তৈরি নয়। সেমা নাগাদের পাইপের নাম আখথু। দু-রকমের পাইপ আছে, এক রকমের নাম তলুপ, আর এক রকমের নাম তস্নুনকুবা। তলুপের সঙ্গে যে কোন আধুনিক পাইপের তুলনা করা যায়। একটি বা দুটি খণ্ড বাঁশ দিয়ে তলুপ তৈরি। আর তস্নুনকুবা হল কতকটা আমাদের দিশি হুঁকোর মতন। তিনখণ্ড বাঁশ দিয়ে তৈরি, তার মধ্যে একটি হল বাঁশের চোঙ বা খোল, যাতে জল থাকে, একটি নল লাগানো পাইপ, আর একটি উপরের তামাকপাত্র। দিশি বাঁশের তৈরি তামাক খাবার পাইপ ও হুঁকো যে কত সুন্দর হতে পারে তা সেমা নাগাদের তলুপ ও তস্নুনকুবা না দেখলে বোঝা যায় না। নাগাদের মতন অন্যান্য আদিম জাতির মধ্যে ধূমপান রীতিমত প্রচলন আছে। আদিবাসীদের মধ্যে যারা হিন্দুসমাজের তলায় এসে পড়ে রয়েছে তারা আজও স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে ধূমপান করে। হাড়ি, ডোম,

চর্মকার, এদের কথা বলছি। সাধারণ চাষী ছেলের এক ছিলিম তামাক না হলে তৃপ্তি হয় না, কাজে প্রেরণা আসে না। এসব দেখলে মনে হয়, তামাক না-খাওয়াটাই আশ্চর্য, খাওয়াটা নয়। আর তামাক খাওয়ার রীতিটা যে পর্তুগীজ সাহেবরা আসার অনেক আগে থেকেই এদেশে চালু ছিল, তাও পরিষ্কার বোঝা যায়। ওড়িয়াদের তামাক ও পানের চমৎকার থলিয়াটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন যে ওটা একটা সুদীর্ঘকালের জাতীয় অভ্যাসের শিল্পপ্রতীক। ধার-করা অভ্যাসের ফলে ওরকম সুন্দর থলে তৈরি হয় না। মেলানেসিয়া মাইক্রোনেসিয়া, পূর্ব-আফ্রিকা, সর্বত্রই পান খাওয়ার অভ্যাস প্রবল দেখা যায়। বিচক্ষণ নৃবিজ্ঞানীরা বলেন যে, ওটা নাকি আমাদের ভারতীয় সদাগরদের দান। তাঁরাই এসব দেশের লোককে পান চিবুতে শিখিয়েছেন এবং পান-চিবনো এখন আফ্রিকা থেকে মেলানেসিয়া পর্যন্ত একটা সামাজিক শিষ্টাভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তামাকের মতন পানও গাছের পাতা (অবশ্য ডালপালা-যুক্ত গাছের নয়) এবং পানের সঙ্গে তামাকের সম্পর্কও কতকটা মামা-ভাগনের সম্পর্কের মতন বলে পানের কথা বলছি। তামাক না হলে পান খাবার কোন মানেই হয় না, এরকম কথা পানবিলাসীদের প্রায়ই বলতে শোনা যায়। যাই হোক, পান খাওয়ার অভ্যাসটা আমাদের দেশ থেকে সদাগররা যদি নিয়ে গিয়ে থাকেন বাইরে, তাহলে সেটা তমলুক অথবা দক্ষিণ-ভারতের কোন বন্দর থেকে গেছে। ভাং-এর প্রচলন বাইরে কি রকম আছে জানি না, আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে। সকলেই জানেন, আমাদের জাতীয় দেবতা শিব ভাং ও গাঁজার ভক্ত। ভাং ছাড়া শিব কিছুতেই খুশি হন না। সম্প্রতি তারকেশ্বরে গিয়ে শুনেছি, বিশেষ উৎসবপার্বণে তারকেশ্বরে যে পরিমাণ সিদ্ধি বিক্রি হয় তা কল্পনাতীত। চৈত্রমাসের গাজনের সময় বোধ হয় কয়েক মণ ভাং ও গাঁজা শিবের ভক্তরা নিজেরা সেবন করেন এবং 'বাবা'কে নিবেদন করেন। শিবের সঙ্গে ভাং ও গাঁজার যেরকম নিবিড় ধর্মানুষ্ঠানিক সম্পর্ক দেখা যায়, তাতে মনে হয় শিবের উৎপত্তিস্থানের কাছাকাছি কোথাও এই দুই মহানেশার প্রচলন হয়েছিল। শিব হলেন কিরাতদের দেবতা এবং কিরাতরা হল

আদিম মঙ্গোলজাতি। হিমালয় হল শিবের বাসস্থান। হিমালয়ের গাছপালা সম্বন্ধে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁরা জানেন, সেখানে সিদ্ধি ও গাঁজা হয় কি না। হয় বলে মনে হয়। হিমালয় বা পার্বত্য অঞ্চলের বন্য উদ্ভিদ্ প্রথমে পার্বত্য জাতির লোকরাই হয়ত সেবন করতে আরম্ভ করে। নেশার জন্যই যে করে তা নয়। হয়ত প্রথমে বনৌষধির মতন ব্যবহার করে, তারপর তার মাদকতার আস্বাদ পেয়ে মাদকদ্রব্যে পরিণত করে। পার্বত্য অঞ্চল থেকে ক্রমে উপত্যকার অধিবাসীদের মধ্যে ভাং ও গাঁজার প্রচলন হয়। এটা অনুমান হলেও বেশ যুক্তিযুক্ত অনুমান নয় কি ? তামাক ভাং, গাঁজা, আফিম, চরস ইত্যাদি নেশার প্রসার সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখা উচিত। অভ্যাস হিসেবে এগুলিও 'cultural item' এবং এরও প্রসার হতে পারে নানাকেন্দ্র থেকে। সাধারণত অন্যান্য সাংস্কৃতিক আচার বা অভ্যাসের প্রসার হয় নানা সংঘাতের মধ্য দিয়ে। এক জায়গার আচার অন্য জায়গায় অনায়াসে ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু ধূমপান বা নেশার মতন আচার অবাধগতিতে প্রসারলাভ করে। তার কারণ এই ধরনের সাংস্কৃতিক আচার গ্রহণ করার ফলে কোন দেশের বা কোন অঞ্চলের 'কালচার-প্যাটার্ন'-এর কোন পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ এই সব আচার-অভ্যাস প্রথার কোন সামাজিক সাংস্কৃতিক function বা কাজ নেই। বিজ্ঞানীরা এই জাতের আচারকে তাই 'নিউট্রাল' বা নিরপেক্ষ আচার-অভ্যাস বলেন। নিরপেক্ষ আচারের প্রসারণ-গতি অবাধ ও দুর্নিবার। সব বাধা ঠেলে সে স্বচ্ছন্দে এই কারণে এগিয়ে যেতে পারে। ভারতের কল্কে, হুঁকো বা তামাক, কি পান—যদি আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে প্রসারিত হয়, তাহলে তাতে নিগ্রোদের যে নিজস্ব কালচার-প্যাটার্ন বা সংস্কৃতি-ডৌল আছে, তার কোন মারাত্মক পরিবর্তন হয় না। কিন্তু বাংলার খোল-করতাল যদি আফ্রিকায় একবার প্রবেশাধিকার পায়, তাহলে সংস্কৃতিক্ষেত্রে তা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। সেইজন্য নিগ্রোরা ভারতীয় তামাক বা হুঁকো-কল্কেকে যত সহজে আমল দেবে, তত সহজে খোল-করতালকে দেবে না। এটা সমস্ত নিউট্রাল আচারের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। নিউট্রাল আচার বা অভ্যাস স্বচ্ছন্দে সর্বত্র বিচরণ করতে

পারে, সক্রিয় আচার পারে না। যত রকমের নিউট্রাল আচার বা অভ্যাস মানবসমাজে আছে, তার মধ্যে আদর্শ নিউট্রাল হল তামাক খাওয়ার অভ্যাস। সেইজন্য তামাক অবাধগতিতে সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ক্রোবার (Kroeber) তাই বলেছেন :

Tobacco, as a relatively harmless indulgence, habit-forming but not leading to incapacity, and reasonably economical at that, has had a rapid, world-wide diffusion. It is also essentially neutral towards the ideology or value pattern of most of the cultures it entered. (Anthropology)

এই কথা বলে ক্রোবার তামাকের বিশ্বভ্রমণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ক্রোবারের বিবরণ সবিস্তারে এখানে উদ্‌ধৃত করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁর বিবরণ সঠিক বলে মনে হয় না। ক্রোবার বলেছেন, প্রধানত স্প্যানিয়ার্ডরা তামাকের প্রচলন করে ইয়োরোপে এবং স্পেনীয় 'tabaco' কথা থেকে ইংরেজী 'tobacco' কথা হয়েছে। একথা হয়ত ঠিক। কিন্তু স্প্যানিয়ার্ড, পর্তুগীজ ও আরবরা তামাক ও চুরুট খাওয়ার প্রথা আফ্রিকা ও এসিয়ায় প্রচলন করেছে, একথা ঠিক নয়। তার একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি এখানে। আদিবাসীদের তামাক খাওয়ার অভ্যাস কতদিনের প্রাচীন, সে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন না করেও বলা যায় যে স্প্যানিয়ার্ড পর্তুগীজ বা আরবদের দেশবিদেশে যাত্রার অনেককাল আগে আমাদের দেশের চরক ও সুশ্রুত ধূমপানের কথা, বিশেষভাবে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে, আলোচনা করে গেছেন। চরক বলেছেন :

স্নাত্বা ভুক্তা সমুল্লিখ্য ক্ষুত্বা দন্তান বিঘৃষ্য চ।
নাবনাঞ্জন নিদ্রান্তে চাত্মবান ধূমপো ভবেৎ॥

অর্থাৎ স্নানান্তে, ভোজনান্তে, বমনান্তে, হাঁচি হলে দাঁত ধুয়ে, নস্য দ্বারা শির বিরেচনান্তে, নিদ্রান্তে এবং অঞ্জনান্তে ধূমপান করবে। সুশ্রুত বলেছেন :

নরো ধূমোপযোগাচ্চ প্রসন্নেন্দ্রিয়বাঙ্মনঃ।
দৃঢ়কেশদ্বিজশ্মশ্রু-সুগন্ধি বিশদাননঃ॥

অর্থাৎ ধূমপানে মানুষের ইন্দ্রিয় বাক্য ও মন প্রসন্ন হয়, কেশ দাঁত শ্মশ্রু দৃঢ় হয়, মুখ সুগন্ধি ও বিশদ হয়।

ধূমপানের প্রথা লোকসমাজে কতকাল ধরে প্রচলিত থাকলে চরক ও সুশ্রুতের মতন মনীষীদের পক্ষে এরকম বিধান আয়ুর্বেদশাস্ত্রে দেওয়া সম্ভব হতে পারে, তা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ধূমপানের প্রথা চলে আসছে। স্প্যানিয়ার্ড ও পর্তুগীজদের জন্মের অনেক আগে থেকে। আমাদের ভারতবর্ষের আদিবাসীদের মধ্যে নয় শুধু, পৃথিবীর সমস্ত আদিমজাতির মধ্যেই ধূমপানের বিশেষ প্রচলন ছিল দেখা যায়। বিখ্যাত জার্মান নৃবিজ্ঞানী জুলিয়াস লিপ্‌স বলেছেন:

The smoking of hemp and opium was probably known to the prehistoric Lake-dwellers, as extant implements indicate···In the primitive world, however, the desire to let the mind sojourn in 'artificial paradise' often had religious reasons.

—(The Origin of Things).

আদিবাসীদের মধ্যে ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গেও ধূমপানের প্রথা জড়িত আছে দেখা যায়। তামাক ভাং গাঁজা বা আফিম জাতীয় উদ্ভিদের পাতা বা বীজ খেয়ে মত্ত হয়ে তারা ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দেয়। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এক ছিলিম তামাক না খেলে, দেবতারা বা ভূতপ্রেতরা তাদের স্কন্ধে ভর করে না। মায়া পুরোহিতরা ধূমপানকে ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ বা আচরণ বলে মনে করেন। মধ্য ও উত্তর আমেরিকার অনেক আদিম জাতির মধ্যে ধূমপানের বিচিত্র অভ্যাস দেখা যায়। পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকাতেও এক ছিলিম তামাকের প্রভাব যথেষ্ট।

নৃতত্ত্বের কণ্টকাকীর্ণ তথ্যের ভিতর প্রবেশ করলে এইটুকু বোঝা যায় যে, এক ছিলিম তামাকের সামাজিক মূল্য যথেষ্ট। তার উৎপত্তি ও প্রসার যেভাবেই হোক, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। কারণ, যাঁরা ধূমপানের মাহাত্ম্য বাইরে প্রচার করেছেন বলে শোনা যায়, তাঁদের জন্মের

অনেক আগে থেকেই মানুষ সর্বত্র খুশি মতন ধূমপান করেছে দেখা যায়। এক ছিলিম তামাক শুধু যে মানুষকে কাজের অফুরন্ত প্রেরণা দিয়েছে তা নয়, তার ধর্মানুষ্ঠানেরও অপরিহার্য উপকরণ হয়েছে। তবু তামাক অনেকটা নিউট্রাল আচার বলে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণের পথে বিশেষ কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি। এত স্বাধীনভাবে যে আচার সর্বত্র বিচরণ করেছে তার উৎসকেন্দ্র কোথায় তা আজ আর ঠিক করা সম্ভব নয়। করার দরকারও নেই। শুধু এইটুকু স্বীকার করলেই হল যে এক ছিলিম তামাকের একটা সামাজিক ভূমিকা আছে। তা যদি না থাকত তাহলে তার অভাবে সেই রাখাল বালকটির পেট ফুটে উঠত না।

তামাক যখন মানুষ খেতে শিখল তখন তার মাদকতায় বিভোর হয়ে থাকা তার উদ্দেশ্য ছিল না। তা যদি হত তাহলে তামাক খেয়েই অনেক কাল আগে মানুষ উচ্ছন্নে যেত, এতদূর এগুতে পারত না। আদিম শিকারী বা চাষীরা তামাক খেয়ে, ভাং বা আফিং খেয়ে যদি মাঠেঘাটে অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকত, তাহলে আজ তামাকের ইতিহাস লিখত কে? তামাক যাঁরা খান এবং যাঁরা খান না, তাঁরা সকলেই এই কথাটা ভেবে দেখবেন। তামাক কি সত্যিই 'নিউট্রাল' ছিল? এইদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বলতে হয়, কোনকালেই ছিল না। তামাক চিরকালই অ্যাক্টিভ বা সক্রিয়। মাঠে হাল চষতে যাবার সময় এক ছিলিম তামাক চাই, কারণ হালচাষ সম্বন্ধে চৈতন্য বাড়বে বলে, অচৈতন্য হবার জন্য নয়। মাঠ থেকে ফিরে সবার আগে এক ছিলিম তামাক চাই, কারণ দেহের ক্লান্তি দূর হবে তাতে। দাঁড় টানতে, বোঝা বইতে, মেহনত করতে, এক ছিলিম তামাক না হলে চলে না। কারণ তামাক বলসঞ্চার করে। ধর্মের অনুষ্ঠানে ওঝা বা পুরোহিতের যখন তামাকের প্রয়োজন হয়, তখনও তামাকের ভূমিকা সক্রিয়। ধর্ম হল সংঘবদ্ধ জীবনের অতৃপ্ত কামনার প্রকাশ, তামাক তার প্রেরণা, তামাকের ধোঁয়া তার বাষ্পীয় শক্তি। তাই আদিম ও অসভ্য লোকসমাজে ধূমপানের এত বিচিত্র আয়োজন ও সরঞ্জাম। সভ্য মানুষ তামাকের সক্রিয় ভূমিকাকে নিউট্রাল করেছে। তামাক হয়েছে নিছক মাদকতা নেশা ও বিলাসিতার উপকরণ। কল্কের

সঙ্গে যত সব লম্বাচওড়া আনুষঙ্গিক যোগ করা হয়েছে তামাককে একেবারে নিষ্ক্রিয় করার জন্য। এক ছিলিম তামাক যখন শুধু কল্কেতে ধূমায়িত হত তখন সেই ধোঁয়া জীবন-ইঞ্জিনের বাষ্পের কাজ করত। কিন্তু কল্কে যখন ক্রমে থেলো হুঁকো থেকে বিশাল গড়গড়া বা আলবোলার মাথায় বসল এবং তার লম্বাচওড়া নল কয়েক গজ দূরে গিয়ে ধোঁয়া উদ্‌গীরণ করতে আরম্ভ করল, তখন বোঝা গেল মধ্যযুগের আলস্য, অকর্মণ্যতা ও বিলাসিতার প্রতীক হয়েছে তামাক। জীবনের সঙ্গে মুষ্টিবদ্ধ কল্কের যে-রকম ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, লম্বা নলওয়ালা গড়গড়ার তা নেই। কল্কের যুগে হাতের জোর ছিল বোঝা যায়, ফুস্‌ফুস্‌ও সজীব ছিল। গড়গড়ার নলের যুগে হাতের জোর গেল কমে, তাকিয়া ঠেস দেবার প্রয়োজন হল। তারপর এল বিড়ি-সিগারেটের আধুনিক যুগ। একটার পর একটা ফুঁকে যাচ্ছি, কেন ফুঁকছি বলতে পারি না। অত্যন্ত তরল-চরিত্র ইণ্ডিভিডুয়ালদের যুগ। বিড়ি-সিগারেট এই নব্যযুগের 'ইণ্ডিভি-ডুয়ালে'র প্রতীক। মেহনতী মানুষের মেরুদণ্ডহীন বংশধরের লিক্‌লিকে আঙুলের ডগায় শোভা পায় সিগারেট। এমন কি সিগার বা চুরুটও যে ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে তার কারণ আমাদের পৌরুষ ও জীবনশক্তি কমে যাচ্ছে। যাঁদের কমেনি, যাঁরা এখনও বীরের মতন কাজ করতে পারেন, তাঁরা চুরুট বা পাইপ খান। চার্চিল ও স্টালিন তার প্রমাণ। চুরুটপন্থী চার্চিল এখনও একা ইংলণ্ডের হাল ধরে রেখেছেন, সিগারেটপন্থী হলে পারতেন কি না সন্দেহ। আর স্টালিন যদি সবচেয়ে প্রিমিটিভ পাইপপন্থী না হতেন, তাহলে তাঁর সমাজতন্ত্রের তরী অনেককাল আগেই ভরাডুবি হত।

এক ছিলিম তামাক পোড়া মাটির কল্কেতে বা বাঁশের কিংবা কাঠের পাইপে সেজে খাবার যুগ ক্রমেই যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে। হুঁকো বা গড়গড়ার যুগ আর ফিরে আসবে না কোনদিন, না এলেও দুঃখ নেই। কারণ ফরাশ ও তাকিয়ার হারানো জীবন ফিরে না-আসাই মঙ্গল। কিন্তু কল্কে বা দেশী পাইপের যদি পুনর্জীবন হয়, তাহলে হয়ত আমরাও আবার নতুন জীবন পেতে পারি। কিন্তু যতদিন অভাব-অভিযোগ থাকবে, জীবনের ব্যর্থতা ও গ্লানি থাকবে, দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থাকবে, বেকার

জীবন নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে, ততদিন বিড়ি-সিগারেটের স্বর্ণযুগ চলবে। ততদিন কেবল ফুঁকে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। কেবল ফোঁকার পালা যতদিন না শেষ হবে, ততদিন কল্কের ও পাইপের যুগ আসবে না। ফোঁকার বদলে টানার যুগ আসবে তখন। একটার পর একটা সিগারেট ফোঁকার ফক্কাবাজির যুগ নয়, এক ছিলিম তামাক টানার বলিষ্ঠ সক্রিয় যুগ।

বাজার ভাও ও বহুবিবাহ

১৯৫১ সালের আগস্ট মাস। কলকাতা শহরের কোন হোটেলে বসে এক বন্ধুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ চলছে। ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের হিসেব-নিকেশ। বন্ধুটি এক বনেদী পরিবারের কুলীন ব্রাহ্মণ-নন্দন। বয়স চল্লিশাভিমুখী, দু-চারটে চুলে পাক ধরেছে। কিন্তু বন্ধুবর তখনও অবিবাহিত 'কুমার', ছদ্মবেশী কুমার নন, বিশুদ্ধ ভেজালশূন্য 'কুমার'। বিয়ে করবার ষোল আনা ইচ্ছে আছে, অথচ বিয়েটা যেমন করেই হোক, শেষ পর্যন্ত আর ঘটে ওঠেনি। আলাপটা তাই নিয়েই হচ্ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষণার দিনে জন্মগ্রহণ করেও তৃতীয় মহাযুদ্ধ ঘোষণার আগে পর্যন্ত কোন রকমেই বিয়ে করা সম্ভব হল না কেন, তার একটা সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ৎ দিচ্ছিলেন বন্ধু। কৈফিয়তের মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই, আজকালকার সেই একঘেয়ে কৈফিয়ৎ—আর্থিক অনিশ্চয়তা। কিন্তু 'একঘেয়ে' হলেও এ যে কত বড় বৈপ্লবিক সত্য তা বোধহয় একমাত্র

'বর্ণাশ্রমধর্মীরা ছাড়া' আর সকলেই উপলব্ধি করবেন। 'বর্ণাশ্রমধর্মীরা ছাড়া' এই জন্য বললাম যে, তাঁরা অর্থনৈতিক শক্তিকে 'সত্য' বলে মনে করেন না, তার সক্রিয়তাতেও তাঁদের বিশ্বাস নেই। তাঁরা মনে করেন 'মনুসংহিতাই' চরম সত্য, শাস্ত্রীয় বাক্য অকাট্য, অর্থনীতি তার কাছে ফুৎকারে উড়ে যায়। তাঁরা মনে করেন মানুষের সমাজ, বিশেষ করে ভারতবর্ষের সমাজ, কতকটা হিমালয়ের মতন অচল অটল। হিমালয়েরও একটা ভাঙাগড়ার ইতিহাস আছে, অটল হিমালয়ও মধ্যে মধ্যে টলে ওঠে, ভূকম্পন হয়, কিন্তু 'ভারতীয়' সমাজ তার চেয়েও অটল অচল অপরিবর্তনীয়। তাই তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে 'বর্ণাশ্রমধর্ম' এবং তারই ঔরসজাত কুলাঙ্গার 'কৌলীন্যপ্রথা' নূতন যুগের অর্থনৈতিক শক্তির চাপে ভেঙে যাচ্ছে এবং না ভেঙে গেলে সমাজের প্রসার ও প্রগতি কোনটাই সম্ভব নয়। তাঁরা মনে করেন যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিলিতি ভাবোন্মাদ বামুণ্ডুলে জোর-জবরদস্তি করে মনু-যাজ্ঞবল্কের স্তম্ভগুলো সমাজের বুক থেকে উপড়ে ফেলছে এবং তারই ফলে সমাজের মধ্যে অনাচারের বন্যাস্রোত বইছে। কিন্তু যদি কোন বর্ণাশ্রমধর্মী আমার এ 'অবিবাহিত' বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ করেন (এবং এই রকম আরও হাজার হাজার কুমার কুলীনপুত্র ও লক্ষ লক্ষ বেশি-বয়সে-বিবাহিতদের সঙ্গে) তাহলে বুঝতে পারবেন 'কে' বর্ণাশ্রমধর্ম ভাঙছে, 'কেন' কৌলীন্যপ্রথা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে এবং কেন মনু বা বল্লালসেন চিরন্তন সত্য নয়। দশরথের সাড়ে তিনশ' পত্নী থাকা সত্ত্বেও শ্রীরামচন্দ্র কেন এক ভার্যানুরক্ত হলেন তা গবেষণা করে জানা সম্ভব নয়। মনে হয় ওটা স্রেফ শ্রীরামচন্দ্রের খেয়াল-খুশি ছাড়া আর কিছু নয়। তখন গাওয়া ঘি বা পাটনাই চালের বাজারদর কত ছিল তাও মহর্ষি বাল্মীকি কোথাও লিখে যাননি। তবে সংসারত্যাগী মুনি-ঋষিদের আশ্রমে পর্যন্ত আতিথ্যের বহর দেখলেই আন্দাজ করা যায়—কি আরামে রামচন্দ্রেরা ও মুনিঋষিরা তখন ছিলেন। ভরদ্বাজ মুনি তাঁর আশ্রমে ভরত-সেনাদের আপ্যায়ন করছেন এই বলে ঃ

সুরাং সুরাপাঃ পিবত পায়সং চ বুভুক্ষিতাঃ।
মাংসানি চ সুমেধ্যানি ভক্ষ্যন্তাং যো যদিচ্ছসি॥

সুরাপায়িগণ, সুরা পান কর, বুভুক্ষিতগণ পায়স ও সুসংস্কৃত মাংস যা ইচ্ছা যত খুশি খাও। আশ্রমেই যখন এই, তখন রাজবাড়িতে কি হত তা কল্পনা না-করাই ভাল। বাল্মীকির যুগের ভরদ্বাজ মুনি এযুগের ভাইস্‌রয় বা প্রেসিডেন্টের 'পার্টি' দেওয়াকেও হার মানিয়েছেন। এত ভোগের যুগে যিনি রাজপুত্র ছিলেন, যাঁর পিতার তিনশো পঞ্চাশ পত্নী ছিল, তিনি কেন একটি মাত্র স্ত্রীতেই খুশি রইলেন, তা বলা মুশকিল। এক বিবাহ তখন যে সমাজের আদর্শ ছিল তাও নয়, কারণ পিতার তিনশো পঞ্চাশ আর পুত্রের এক অর্থাৎ ৩৫০ : ১ এই 'হারে' সামাজিক আদর্শের বৈপ্লবিক লম্ফন সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং ওটা হয় শ্রীরামচন্দ্রের 'খুশি', না হয় বাল্মীকির 'খেয়াল'। আমার বন্ধু রামচন্দ্র (দশরথ পুত্র নন, দামোদর পুত্র) খুশি মতন 'একটি' বিয়েও করতে পারেননি। রামচন্দ্রের পিতা দামোদরবাবুর অবশ্য তিনশো পঞ্চাশ নয়, মাত্র চারটি স্ত্রী ছিল। সুতরাং রামরাজ্যের আদর্শ অনুযায়ী বলা যেতে পারে, বন্ধু রামচন্দ্রের বিবাহের কোন অধিকারই নেই। সহজ অঙ্ক কষলে দেখা যায় :

রাজা দশরথ : ৩৫০ স্ত্রী
পুত্র শ্রীরামচন্দ্র : ১ স্ত্রী
দামোদরবাবু : ৪ স্ত্রী
পুত্র রামচন্দ্র : ৪।৩৫০ = ২।১৭৫ স্ত্রী

সুতরাং বন্ধু রামচন্দ্রের 'কুমার' থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ কোন নারীর ১৭৫ অংশের দুই অংশকে বিবাহ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যাপারটা যদি রামায়ণের যুগের দিক থেকে বিচার না করে, বন্ধুর নিজের পারিবারিক ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যায় যে, তাঁর অন্তত দুটি স্ত্রী থাকা উচিত, অথচ একটিও নেই। আগেই বলেছি, বন্ধুটি বনেদী কুলীন ব্রাহ্মণপরিবারের সন্তান। পারিবারিক ইতিহাস যা তাঁর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছি তাই জানাচ্ছি। ছয় পুরুষ পর্যন্ত 'ডেটা' সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, সাতপুরুষ' নয়। তাই এখানে table-বদ্ধ করছি স্থান সংক্ষেপের জন্য :

(ঠা=ঠাকুরদাদা, বা=বাবা)

আনুমানিক কাল—খৃস্টাব্দ		বংশানুক্রম		ভার্যানুক্রম
১৮০০	:	ঠা+ঠা+বা	:	৬৪
১৮৫০	:	ঠা+ঠা	:	৩২
১৮৭৫	:	ঠা+বা	:	১৬
১৯০০	:	ঠা	:	৮
১৯২৫	:	বা	:	৪
১৯৫০-৫১	:	রামচন্দ্র	:	২ (??)

[কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য : ১৯০০-২৫ সালের মধ্যে রামচন্দ্রের পিতা দামোদরবাবু চারটি বিবাহ করেন। দ্বিতীয় বিবাহ করেন ১৯১৩ সালে এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান হলেন রামচন্দ্র—জন্ম ১৯১৪ সাল। এইভাবে পূর্বপুরুষদের বিবাহেরও হিসাব করা উচিত।]

অতএব, রামরাজ্যের আদর্শ অনুযায়ী না হলেও, পারিবারিক আদর্শ অনুসারে 'কুমার' রামচন্দ্রের বিবাহের অধিকার আছে। তার উপর তিনি কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান যখন তখন তো আছেই। রামরাজ্যের আদর্শ অনুযায়ী তিনি বিবাহ করতে পারেন ২।১৭৫ ভগ্নাংশ নারীকে, আর পারিবারিক আদর্শ অনুসারে দু-জনকে (পুরুষানুক্রমিক ভার্যা হ্রাসের ধারা ৫০% বা ½)। এই ধারাতে রামচন্দ্রের 'কুমার' থাকার কোন কারণ নেই, রামচন্দ্রের পুত্রেরও একজন স্ত্রী প্রাপ্য, রামচন্দ্রের নাতি অবশ্য 'ব্যাচিলার' থাকতে বাধ্য। কিন্তু সে কথা থাক। এখন দেখা যাক এত বড় বনেদী কুলীন ব্রাহ্মণপরিবারের একমাত্র 'বংশধরে'র আজ এই শোচনীয় কৌমার্য-জীবনে দণ্ডিত হবার কারণ কি? স্বভাবতই অনেকে বলেন যে, 'কৌলীন্যপ্রথা' উঠে গেছে, এখন আর সেযুগ নেই, সুতরাং আর্থিক সঙ্কটের জন্য এরকম পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের বিপর্যয় হতে বাধ্য। কিন্তু 'কৌলীন্যপ্রথা' উঠে গেছে বললেই 'বর্ণাশ্রমী'রা মানতে রাজি হবেন না। সুতরাং 'কৌলীন্যপ্রথা' কেন ও কি অবস্থায় গজিয়ে উঠেছিল, কি সামাজিক রূপ ধারণ করেছিল, তার ফলাফলই বা কি হয়েছিল, সে সব কথা কিছুটা জানা দরকার।

কৌলীন্যপ্রথার কথা ভাবলে একটা হাই তুলে বলতে ইচ্ছে করে 'আমি যদি জন্ম নিতেম কৌলীন্যের কালে।' কিন্তু জন্ম যখন নিইনি তখন হাই তুলে লাভ কি? এখানে ইতিহাসের গবেষণা করেও লাভ নেই, কারণ তা পড়বার মতন ধৈর্যও অনেকের নেই, জানি। তবু মনে হয় সেই যে ব্রাহ্মণ বা পরমপুরুষের শ্রীবদন, শ্রীবাহু, শ্রীজানু ও শ্রীচরণ থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছিল, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এত সব কাণ্ড ঘটল কি করে? অর্থাৎ ১৯০১ সালের মধ্যে ২৩৭৮টি 'জাতি' গজিয়ে উঠলো কোথা থেকে? 'মনুসংহিতা'য় তার একটা নির্দেশ পাওয়া যায়। চারবর্ণের প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্ণের সংমিশ্রণ এবং বিভিন্ন সংকরবর্ণ ও শুদ্ধবর্ণের মিশ্রণে এইসব নানা জাতি-উপজাতির উদ্ভব হয়েছে। অর্থাৎ বিশাল একটা বাওলজিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ব্রিডিং ও ক্রস-ব্রিডিংয়ের ফলে এই তিন হাজার জাতের উৎপত্তি হয়েছে ভারতবর্ষে। ব্রিডিং থেকেই বিবাহের কথাটা এসে পড়ছে। বর্ণসম্মত বিবাহকে বলা হয় 'অনুলোম' বিবাহ এবং বর্ণবিরুদ্ধ বিবাহকে 'প্রতিলোম' বিবাহ। উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের নারীর 'ক্রসিং' তেমন আচার-বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু নিম্নবর্ণের পুরুষ আর উচ্চবর্ণের নারী মিলিত হলে একেবারে চরম অনাচার। সুতরাং চারবর্ণের মধ্যে এইভাবে পুরুষ-নারী ভেদে মিশ্রণের পার্মুটেশন-কম্বিনেশন সহজ ব্যাপার নয়। যেমন— ক, খ, গ, ঘ, যদি চারবর্ণ হয়, তাহলে মিশ্রণ বা ক্রসিং এত রকমের হতে পারে—

ক—পুং × খ—স্ত্রী = চ
ক—স্ত্রী × খ—পুং = ছ
ক—পুং × গ—স্ত্রী = জ
ক—স্ত্রী × গ—পুং = ঝ
ক—পুং × ঘ—স্ত্রী = ঞ
ক—স্ত্রী × ঘ—পুং = ট ইত্যাদি

এইভাবে ঘ, গ-এর মিশ্রণ হবে। তারপর সে সব সংকরবর্ণ হল,— যেমন চ, ছ, জ ঝ ইত্যাদি, তাদের উচ্চ-নীচ স্তরভেদে ও পুং-স্ত্রী ভেদে

আবার ক্রসিং হবে। এই মাল্টিপ্লিকেশনের ফলেই নাকি এত জাত, আর জাতের নামে এত বজ্জাতি।

এবারে কৌলীন্যপ্রথা সহজে বোধগম্য হবে। বর্ণভেদে বিবাহের বিধি-নিষেধ একটা চিরকালই ছিল সমাজে, কিন্তু গুপ্তযুগ বা পালযুগ পর্যন্ত তার মধ্যেও 'উদারতা' বা 'সাবলীলতা' ছিল। ভিন্ন প্রদেশাগত সেন-বর্মণ রাজাদের আমল থেকেই 'কৌলীন্যপ্রথা'র প্রবর্তন হয় বাংলাদেশে। বাঙালী সমাজে কৌলান্যপ্রথা-রূপ বিষবৃক্ষের বীজ বপন করে ছিলেন অবাঙালী রাজারা এবং তার ফলেই বাঙালী সমাজ জাহান্নমের পথে দ্রুত নেমে গেছে। একমাত্র 'ব্রাহ্মণ' ছাড়া আর সকলকে 'শূদ্র' বলে অভিহিত করা হল এবং শূদ্রের মধ্যে 'জল-আচরণীয়' ও 'জল-অনাচরণীয়'—এই দুটো ভাগ করা হল। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও 'ভাগ' আছে, তার মধ্যে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের কথাই বলি। রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা 'কুলীন' ও 'শ্রোত্রিয়' দুই ভাগে বিভক্ত, শ্রোত্রিয়রা আবার 'সিদ্ধ, সাদ্ধ ও কাষ্ঠ'—এই তিন উপশাখায় পল্লবিত। বিবাহের নিয়ম হল—

ক-পুং = সিদ্ধ স্ত্রী বা সাদ্ধ স্ত্রী বা কুলীন স্ত্রী
সিদ্ধ-পুং = সিদ্ধ স্ত্রী বা সাদ্ধ স্ত্রী
সাদ্ধ-পুং = সাদ্ধ স্ত্রী
কাষ্ঠ-পুং = কাষ্ঠ স্ত্রী
কাষ্ঠ-স্ত্রী = কাষ্ঠ-পুং
সাদ্ধ-স্ত্রী = সাদ্ধ-সিদ্ধ-কুলীন পুং
সিদ্ধ-স্ত্রী = সিদ্ধ-কুলীন পুং
কুলীন-স্ত্রী = কুলীন পুং

এরই নাম 'কৌলীন্যপ্রথা'। 'পুরুষ' যত উচ্চবর্ণের হবে, স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রও তত তার প্রসারিত হবে, কিন্তু 'নারী' যত উচ্চবর্ণের হবে স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্র তত তার সঙ্কুচিত হবে। কুলীন পুত্ররা একমাত্র কাষ্ঠ-কন্যা ছাড়া শ্রোত্রিয়শাখার অন্যান্য কন্যাদের বিবাহ করতে পারেন। কিন্তু কুলীন কন্যাদের কুলীন পুত্র ছাড়া নান্য পন্থাঃ। ব্রাহ্মণদের মতনও

কৌলীন্যপ্রথার প্রসার বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি জাতের মধ্যে পর্যন্ত হয়েছিল, কিন্তু 'প্রাক্‌টিসের' দিক থেকে ব্রাহ্মণরাই 'পার্ফেকশনে' পৌঁচেছিলেন। কৌলীন্যপ্রথার প্রত্যক্ষ ফলাফল কি হল সমাজে? কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুমারী কন্যার প্রাচুর্য স্বভাবতই দেখা দিল, কারণ যে-কোন পাত্রের সঙ্গে তাদের বিবাহ দেওয়া চলবে না, একমাত্র কুলীনপাত্র ছাড়া। কুলীন পাত্ররা অবশ্য শ্রোত্রিয় কন্যাদেরও বিবাহ করতে পারেন। সুতরাং কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে অবিবাহিত পাত্রের চেয়ে পাত্রীর সংখ্যাই বেশী থাকা স্বাভাবিক। অথচ কুমারী কন্যাদের 'কুমারী' রাখা চিরকাল চলে না, বিবাহ তাদের দিতেই হয়। অবিবাহিত পাত্রসংখ্যা কম বলে একই বিবাহিত পাত্রে একাধিক কন্যাদানের প্রশ্ন দেখা দেয়। সুতরাং একজন কুলীন ব্রাহ্মণ পুত্রের শতাধিক স্ত্রী থাকতেও বাধা নেই। ষাট জন কুলীন কন্যা আর চল্লিশ জন শ্রোত্রিয় কন্যা মিলিয়ে স্বচ্ছন্দেই যে-কোন কুলীন-নন্দনের একশো স্ত্রী থাকতে পারে। তারপর পালা করে তিনদিন অন্তর শ্বশুরবাড়ি গেলেই পরম নিশ্চিন্তে ও তোয়াজে জীবনের গোণা দিনগুলো কেটে যেতে পারে, এমন কি পুরোহিতগিরি বা গুরুগিরি করারও দরকার হবে না।

কিন্তু বিয়ে তো হল, তারপর? একশো স্ত্রী যাঁর, তাঁর মৃতদার হবার সম্ভাবনা নেই, কারণ একশো স্ত্রী পট্ পট্ করে মরে যেতে পারে না। আর যদিও বা এমন কোন 'বড় মড়কে'র কল্পনা করা যায় যাতে যুগপৎ বিভিন্ন অঞ্চলের শ্বশুরালয়ে একশো স্ত্রীই মরে গেল, তাহলেও কুলীননন্দনের 'কোলীন্য' বজায় থাকা পর্যন্ত, অর্থাৎ শ্বাস ওঠা না-পর্যন্ত 'স্ত্রী'র অভাব হবে না। গঙ্গার ঘাটে শেষ অবস্থায় 'অন্তর্জলি' করা পর্যন্ত কুলীন-পুত্রের বিবাহ হতে পারে। সুতরাং কুলীন-পুত্র চির-বিবাহিত, কিন্তু কুলীন-কন্যা? কুলীন ব্রাহ্মণ-কন্যা সধবা হয়েও প্রায়-বিধবা এবং চির-বিধবা। একশো স্ত্রীর জীবনের একমাত্র সম্বল 'একটি' কুলীন স্বামী। স্বামী তো পালাক্রমে শ্বশুরালয়ে ঘুরছেন এবং তিনি সর্বদাই গতিশীল ও ভ্রাম্যমাণ। ভোজনও করছেন সর্বত্র। যে-কোন্ শ্বশুরালয়ে হয়ত ভোজনাধিক্যে তিনি দেহত্যাগ করতে পারেন। তখন বাকি

নিরেনব্বই জন স্ত্রী সেই শ্বশুরালয়ে জমায়েত হয়ে যদি ক্রোধের জ্বালায় সেই সতীনের মাথার চুল সমস্ত উপড়ে ফেলে দেন তাহলেও তাদের 'সধবা' হবার আর সম্ভাবনা থাকে না। এ শুধু একটা বিশেষ কারণে মৃত্যুর কথা বললাম। মৃত্যু অনেক কারণে হতে পারে। শ্বশুরবাড়ি যাবার পথের মধ্যেও তাঁর মৃত্যু হওয়া আশ্চর্য নয়। যে কোন কারণেই হোক, মৃত্যু হলে আর রক্ষা নেই। 'এক' স্বামীর মৃত্যুতে একশো স্ত্রী বিধবা। এরকম দশটি স্বামীর মৃত্যুতে ১০ × ১০০ = এক হাজার স্ত্রী বিধবা অর্থাৎ কৌলীন্যপ্রথার ফল বিধবার প্রাচুর্য এবং তার ফল কি-? তার ফল, সমাজের বুকে গোপন দুর্নীতি, কলঙ্ক ও ব্যভিচারের বন্যাস্রোত। 'মনু'র চেয়েও শক্তিশালী যে 'প্রকৃতি'—এ সেই 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'।

এর আরও একটা ফল আছে। সংখ্যা হ্রাস হতে হতে ক্রমে কুলীনরা নির্বংশের পথে এগিয়ে গেছেন। অসংখ্য নারী বৈধব্যের ফলে বন্ধ্যা হয়ে থাকে এবং তার ফলে কুলীন সমাজের লোকসংখ্যা কমে, বংশ ক্রমে নির্বংশ হতে থাকে। হয়েছেও তাই। আজ লোকগণনার ফলে যে দেখা যায়, উচ্চবর্ণের সংখ্যা তথাকথিত নিম্নবর্ণের তুলনায় অনেক কম এবং ক্রমে কমছে, তার কারণ ঐ কৌলীন্যপ্রথা এবং বিধবা-প্রাচুর্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কৌলীন্যপ্রথা উচ্চবর্ণের আত্মহত্যার 'প্রথা' ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু শাস্ত্র বা সমাজ-বিজ্ঞানের তত্ত্বকথা বাদ দিয়ে পরিষ্কার বলা যায় যে, 'বহুবিবাহে'র সঙ্গে 'বাজার ভাও'-এর একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। সেনরাজাদের-আমলে বাংলাদেশে জিনিসপত্রের 'বাজার দর' কত ছিল, তা ঠিক আমার জানা নেই। তবে চাল, ডাল, ঘি, তেল, মাছ, মাংসের দর যে এখনকার তুলনায় অনেক কম ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা যদি না থাকত তাহলে কৌলীন্যপ্রথা—তথা বহুবিবাহ কোন মতেই সম্ভব হত না। কেন হত না তাই বলছি। একশো স্ত্রী যাঁর, তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত স্ত্রীকে স্বগৃহে প্রতিপালন করতে পারেন না। তা করতে হলে প্রথমে তাঁর বিশাল রাজপ্রাসাদের মতন অন্তত শতকামরাযুক্ত বাড়ি থাকা দরকার, কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণদের অনেকেরই তা ছিল না। থাকলেও, একশো স্ত্রী পালন করা সহজ ব্যাপার

নয়। 'বাজার ভাও' কত কম থাকলে তা করা যেতে পারে? তা অবশ্য কেউ করতেন না। যদি ধরা যায় যে, দশ জন করে স্ত্রী পালাক্রমে স্বগৃহে রেখে, বাকি নব্বই জনের গৃহে তিনি ঘুরে বেড়াতেন, তাহলেও যৌথ পরিবারে দশ জন স্ত্রীর বোঝা কম নয় এবং তা বহন করা 'বাজার দর' কম না থাকলে সম্ভবও নয়। অন্যদিক থেকে বিচার করলেও একই প্রশ্ন ওঠে। কুলীন কন্যার বিবাহ হলেও পতিগৃহে যাত্রা তার ভাগ্যে ঘটত না। পিতার গৃহে, পিতার অন্নই তাকে খেতে হত। মনে করুন, কোন কুলীন ব্রাহ্মণের পাঁচ কন্যা, প্রত্যেকেরই তিনি বিবাহ দিয়েছেন, কিন্তু 'সধবা' অবস্থাতেও 'কুমারী'র মতন তাদের পালন করতে হচ্ছে, এমন কি 'বিধবা' অবস্থাতেও করতে হবে। তা ছাড়া, সধবা অবস্থায় পাঁচ জামাইয়ের ঘুরে-ফিরে পালাক্রমে শ্বশুরালয়ে আসা, থাকা ও খাওয়ার সমস্যা আছে। অর্থাৎ গড়ে বছরে একমাস জামাই-সেবার খরচ, উপরন্তু পাঁচ কন্যার সারাজীবনের ভরণপোষণের খরচ। সুতরাং 'বাজার ভাও' কম না হলে কিছুতেই এইভাবে কন্যাদান করা সম্ভব হত না। এখনকার কোন গোঁড়া কুলীন ব্রাহ্মণ কি এই শর্তে কোন কুলীন পাত্রকে কন্যাদান করতে রাজি আছেন? জানি না, যদি কেউ থাকেন, জানাবেন। আমার বন্ধু রামচন্দ্রের মতন অনেক কুলীনপাত্র আজও অবিবাহিত রয়েছেন, বিবাহের আর্থিক দায়িত্বটুকু না নিতে হলে তাঁরা বিয়ে করতে খুশি-মনে রাজি আছেন। কিন্তু তবু কি কেউ কন্যাদান করবেন? দু-একজন অবস্থাপন্ন কুলীন শ্বশুর হয়ত ঘরজামাই রাখতে রাজি হবেন, কিন্তু অনেকেই রাজি হবেন না, ঐ বাজার ভাও-এর জন্য।

সেন-আমলের 'বাজার ভাও' জানা না থাকলেও, যখন পর্যন্ত এই কৌলীন্যপ্রথা—তথা বহুবিবাহ পূর্ণোদ্যমে চালু ছিল, তখনকার বাজার ভাও কিছু কিছু জানা যায়। মাত্র একশো-দেড়শো বছর আগেকার কথা বলছি। ১৮৩৬ সালের ২৩ এপ্রিল, মাত্র একশো কুড়ি বছর আগেকার, 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় 'ইয়ং বেঙ্গলের' মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' থেকে কুলীন-বিবাহের একটি তালিকা উদ্ধৃত করে ছাপা হয়েছিল। তালিকাটির একাংশ আমি উল্লেখ করছি:

নাম	বিবাহ-সংখ্যা
রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬২
নিমাই মুখোপাধ্যায়	৬০
রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৬০
খুদিরাম মুখোপাধ্যায়	৫৪
দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়	৫৩
দর্পনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৫২
কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭
শম্ভু চট্টোপাধ্যায়	৪০
রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৩৭
কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৪
রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০
নকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮
তারাচাঁদ মুখোপাধ্যায়	১৫
কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩
রামকানাই চট্টোপাধ্যায়	১২
গিরিবর বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি	৮

'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার সামাজিক তথ্যানুসন্ধানকে আজকালকার 'ডেটা'-বাগীশরা নিশ্চয়ই হিংসা করবেন। আজকাল তো এ সব কাজ করাই হয় না বললে হয়, বিশেষ করে প্রগতিশীল পত্রিকার তরফ থেকে, যা 'জ্ঞানান্বেষণ' বা 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় তখন করা হত। যাই হোক, ১৮৩৬ সালেও কুলীনদের বহুবিবাহের বহর এই পর্যন্ত ছিল। অর্থাৎ আমার অবিবাহিত বন্ধু রামচন্দ্রের ঠাকুরদার কালেও কৌলীন্যপ্রথার যথেষ্ট প্রতাপ ছিল সমাজে। এখন দেখা যাক, 'বাজার ভাও' কি রকম ছিল। ১৮১৯ সালের ২০ নভেম্বর 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় 'বাজার ভাও' সম্বন্ধে জানা যায়ঃ

এই সপ্তাহের বাজার ভাও :

পাটনাই তণ্ডুল তিন টাকা বার আনা মণ।
পাছড়ি তণ্ডুল উত্তম তিন টাকা দুই আনা মণ।
মধ্যম তণ্ডুল দুই টাকা দশ আনা মণ।
মুগী তণ্ডুল উত্তম এক টাকা বার আনা মণ।
মধ্যম তণ্ডুল এক টাকা এগার আনা মণ।
বালাম তণ্ডুল এক টাকা তের আনা মণ।

১৮২২ সালের ১২ জানুয়ারির 'বাজার ভাও' হচ্ছে :

জিনিস	মণ	মূল্য
অড়হর ডালি	১	৩।০-৩৸০
উত্তম গাওয়া ঘৃত	১	২৭৲-২৮৲
ভৈসা ঘৃত	১	২৫৲-২৬৲
মিছরি উত্তম	১	১৪।০-১৫৲

১৯৫১ সালের সঙ্গে এই বাজার ভাও-এর তুলনা করা যাক :

জিনিস (প্রতি মণ)	১৮১৯-২২	১৯৫১	বৃদ্ধির হার
চাল	১৸০	৪০৲—৬০	প্রায় ৩০।৪০ গুণ
অড়হর দাল	৩।০	৩০৲	প্রায় ১০ গুণ
গাওয়া ঘি	২৭৲	৪০০৲—৫০০৲	প্রায় ২০ গুণ
ভয়সা ঘি	২৫৲	৩০০৲—৩২০৲	প্রায় ১২ গুণ
মিছরি	১৫৲	১৬০৲	প্রায় ১০ গুণ

এখানে 'চাল' যদি প্রধান খাদ্য ধরা যায়, তাহলে চালের মূল্য বৃদ্ধিকেই আসল ধরতে হয়। চালের প্রাধান্য অনুপাতে গড়্‌পড়তা মূল্যবৃদ্ধি সব জিনিসের আমরা কুড়ি থেকে বাইশ গুণ পর্যন্ত ধরতে পারি। এইবার বাজার দরের সঙ্গে বহুবিবাহের সম্পর্কটা পরিষ্কার হবে।

'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রের যে তালিকাংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে সেখানে কুলীন ব্রাহ্মণদের গড়পড়তা বিবাহ-সংখ্যা হল ৫৯৬+১৬=প্রায় সাঁইত্রিশ জন। এটা সম্পূর্ণ তালিকা নয়, তা ছাড়া 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর তালিকাও সমাজের পূর্ণাঙ্গ ছবি নয়। সুতরাং যথেষ্ট বাদ-সাধ দিয়েও আমরা কুলীন ব্রাহ্মণদের

গড়পড়তা বিবাহ-সংখ্যা মোটামুটি ৩৭/২ = প্রায় আঠার জন ধরতে পারি। তাতে ভুলচুকের সম্ভাবনা অনেক কমে আসবে। 'বাজার ভাও' কুড়ি-বাইশ গুণ বৃদ্ধির হিসেবে এবং চালের গুরুত্ব সত্ত্বেও অনেক বাদসাধ দিয়ে করা হয়েছে। এইবার 'বাজার ভাও' ও 'বহুবিবাহে'র সম্পর্ক বা 'কো-রিলেশন' কি দেখা যাক:

(১৮১৯-২২ সালের বাজার দর এক ইউনিট ধরা হচ্ছে)

বাজার দর	বিবাহ
১ (১৮১৯—২২)	গড়ে ১৮ জন স্ত্রী
২০ (১৯৫১)	১৮/২০ = ৯/১০
= পুরো ১ জনও	অবিবাহিত নয়

সুতরাং আমার বন্ধু রামচন্দ্রের আর্থিক কারণে অবিবাহিত থাকার যুক্তি আদৌ যুক্তিহীন নয় এবং কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও কেবল বাজার ভাও-এর জন্যই যে তিনি 'একটি' বিবাহও করতে পারেননি, তাও মিথ্যা নয়। বর্ণাশ্রমীরা মানুন, আর নাই মানুন, প্রধানত আর্থিক কারণেই যে আমাদের সমাজের কৌলীন্যপ্রথা বহুবিবাহ ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াশীল স্তম্ভগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, তাতে কোন ভুল নেই এবং যা ভাঙছে তা ভালর জন্যই ভাঙছে, বিশেষ করে বহুবিবাহপ্রথা তো নিশ্চয়ই।

স্ট্যাটিস্টিক্স, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান ও ইতিহাস একত্রে পাঞ্চ করে কক-টেল করা হল বলে কেউ যেন মনে করবেন না যে, আমার কোন সিরিয়াস বক্তব্য নেই। বক্তব্যটা আশা করি পরিষ্কার হয়েছে এতক্ষণে। বক্তব্য এই:

আমাজের সমাজে বৃত্তিভেদ অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রাক্-বৈদিক যুগ থেকেই ছিল। সেই বৃত্তিভেদ বর্ণভেদে রূপান্তরিত হয় বৈদিক আর্যদের যুগ থেকে। বর্ণভেদ থাকা সত্ত্বেও প্রথম যুগে সমাজের মধ্যে সচলতা যথেষ্ট ছিল, কারণ বর্ণভেদটা ছিল প্রধানত বৃত্তিগত, ধর্মগত নয়। হিন্দু-যুগে ধর্মগত বর্ণভেদের উপর ঝোঁক পড়ে বেশি এবং ক্রমে ঝোঁকটা অত্যন্ত উগ্র হয়ে ওঠে। তারই পরিণতি হল ব্রাহ্মণ-সর্বস্বতা, কৌলীন্যপ্রথা এবং কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহের উন্মত্ত প্রসার। এটা হল মৌলিক বৃত্তিভেদ, বৃত্তিগত শ্রমভেদ ও বৃত্তিগত বর্ণভেদের চরম সামাজিক বিকৃতি ও

অবনতি। আদর্শের এই বিকৃতি তখনই সম্ভবপর, যখন সমাজের মূল্যের অর্থনৈতিক শক্তি অন্তঃসারশূন্য হয়ে যায়, প্রাণহীন কঙ্কালের মতন সেটা অচল অনড় হয়ে পড়ে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝির আগে পর্যন্ত আমাদের দেশে অর্থনৈতিক শক্তির মূলগত কোন পরিবর্তন হয়নি। একথাটা সামাজিক নীতি বা আদর্শের আলোচনাপ্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার। তাই উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত আবহমান কালের সমস্ত সামাজিক কুপ্রথা ও দুর্নীতি আমাদের সমাজে রীতিমত প্রচলিত ছিল। কৌলীন্যপ্রথা ও বহুবিবাহ তার একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। অর্থনৈতিক শক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক নীতি ও আদর্শেরও ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে থাকে। কৌলীন্যপ্রথা ভাঙতে থাকে, বহুবিবাহ দ্রুত কমে যায়, বিধবা-বিবাহের প্রচলন হয়, সহমরণ-প্রথা উঠে যায়। আজকের দিনে অনেক গোঁড়া কুলীনও, মনে মনে ইচ্ছে থাকলেও, বহুবিবাহের কথা কল্পনা করতে পারেন না। তার কারণ, মনুসংহিতার চেয়ে অর্থসংহিতা এযুগে অনেক বড় সত্য, না এড়িয়ে চলতে গেলে খানায় পড়ে অপমৃত্যু ঘটা ছাড়া উপায় নেই। অতএব 'বহুবিবাহ' করার ইচ্ছা যাঁদের আজও আছে তাঁরা সেটা চেপে যান এবং সে অবদমিত ইচ্ছাকে অনর্থক একটা প্রাচীন অচল নীতি সমর্থন করে প্রকাশ করবেন না। অবশ্য 'বর্ণাশ্রমধর্মী'রা যে বহুবিবাহের এই অবদমিত গোপন ইচ্ছাকেই বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং তাঁদের মধ্যে একটা চরিত্রগত দুর্নীতিপ্রবণতা আছে, এমন কথা আমি বলছি না। আমি মনোবিজ্ঞানী নই। তবে যাঁরা মনোবিজ্ঞানী তাঁরা হয়ত এমন কথা বললেও বলতে পারেন। আমি বলছি, যা মৃত তাকে ফুঁ দিয়ে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করা বৃথা। ফুঁ দিতে দিতে ফুসফুস ফেটে যাবে, তবু মৃত কঙ্কালে প্রাণ-সঞ্চার করা সম্ভব হবে না। 'জাতের নামে বজ্জাতি'র দিন, বর্ণাশ্রমের নামে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠত্বের যুগ, কৌলীন্যের নামে বহু-বিবাহ ও পেশাদার জামাইগিরির কাল, অনেক দিন কেটে গেছে। নতুন পোশাক পরিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলে লাভ হবে না কিছু।